

গর্কির শ্রেষ্ঠ গল্প

ভাষান্তর / অসিত সরকার

প্রথম খণ্ড

পরিবেশক ঃ কথা ও কাহিনী ঃ ১৩, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

Best stories of Maxim Gorky Vol. 1
Translated into Bengali
by Asit Sarkar

প্রথম প্রকাশ । ভাদ্র ১৩৭১

পত্রপুট

প্রকাশিকা : শিবানী দে। ২।৩ এ, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-১২
মুদ্রক : বিজয় কুমার চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন। ১৩ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
অলঙ্করণ : অরুণ কুমার ঠাকুর

গল্পসূচী

না, আজকের দিনে গর্কি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই—তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে তো নয়-ই। সে নিয়ে মাথা ঘামাবেন যাঁরা বিদগ্ধজন। শুধু এই সংকলন প্রসঙ্গে যে কথাটা আগেভাগেই বলে রাখা ভালো, তা হলো 'শ্রেষ্ঠ গল্প' এর পরিবর্তে 'ভবঘুরে জীবনের স্মৃতিকথা' বা ওই ধরনের কোন নামকরণ করতে পারলেই সবচেয়ে খুশি হতাম। কেননা, প্রথমত 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে, দ্বিতীয়ত আকৈশোর রাশিয়ার বিভিন্ন পথে প্রান্তরে তিনি যে মুসাফিরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেইসব বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, দু-চোখ-মেলে-দেখা নানা ধরনের মুখ, নানান চরিত্র সারা জীবন আনাগোনা করেছে তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোট গল্পে, যা আজও সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের এক দুর্লভ সম্পদ।

জন্ম ১৮৬৮ সালে নিঝনি নভগোরদের এক শ্রমিক পরিবারে। সাত বছর বয়েসে বাবা-মাকে হারান, তার দু বছর পর থেকেই নিজের রুটির সংস্থান নিজে-কেই করে নিতে হয়। একটানা তিন বছর জুতো তৈরির একটা দোকানে কাজ করেন, তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যান। ১৮৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত নিঝনি নভগোরদে ঠিকেদার ভাসিলি সের্গেইয়েভের অধীনে উপদর্শকের কাজ করেন। ১৮৮৪ সালে উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্যে চলে আসেন কাজানে। কিন্তু লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সত্যিকারের পাঠ নিতে হলো পৃথিবীর পাঠশালায়। কাজানে মাটির নিচের একটা চোরা-কুঠরিতে সেমিয়ানভের রুটির কারখানায় শুরু হলো এক কারিগরের জীবন। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই তাঁর জীবন মোড় নেয় এক নতুন পথে। এখানে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং বিপ্লবী সংস্থায় যোগ দেন। এই সময়েই তিনি মার্কসীয় সাহিত্য, দর্শন এবং অর্থনীতির ওপর গভীরভাবে পড়াশোনা করার সুবর্ণসুযোগ পান।

১৮৯১ সালে সারা দেশ জুড়ে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সেই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা নিপীড়িত কৃষকের মতো তাঁকেও বেরিয়ে পড়তে হয় রাশিয়ার নানান পথে প্রান্তরে। বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে পুলিশের তাড়া খেতে খেতে এগিয়ে যান ইউক্রেন, ক্রিমিয়া, ককেসাসের মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই শুরু হয় তাঁর ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবন। এর ফাঁকে ফাঁকেই চলেছে সাহিত্যচর্চা। এই পাঁচ-ছ বছর জীবনধারণের জন্যে হাতের কাছে যখন যা পেয়েছেন করেছেন—রেল-সড়ক মেরামতির কাজ, ডক-শ্রমিক, ক্ষেত-

মজুর, বজরার মাঝি। পরবর্তীকালে এইসব অভিজ্ঞতা নিবিড় ছায়া ফেলেছে তাঁর অজস্র ছোট গল্পে।

১৮৯২ সালে প্রকাশিত হলো প্রথম ছোট গল্প 'মাকার চুদ্রা,' এতেই তিনি প্রথম ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন 'ম্যাকসিম গর্কি,' আসল নাম আলেক্সি ম্যাক্সি-মোভিচ পেশকভ। মাকার চুদ্রাকে গল্প না বলে বরং লোককাহিনী বলাই ভালো, মরমী ভাষায় যাকে তিনি নতুন করে উপস্থিত করলেন সবার সামনে! এমনি কয়েকটি লোককাহিনীর মধ্যে 'মাকার চুদ্রা' 'বুড়ি ইজেরগিল' 'বাজ-পাখির গান' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ সালে ওডেসার নিকলায়েভ হাস-পাতালে আহত একজন মুসাফিরের সঙ্গে পরিচয় হয়, যাকে তিনি হুবহু রূপ দেন 'চেলকাশ' গল্পে। ওই একই বছরে ওডেসা থেকে তিফলিস পরিভ্রমণের পথে দেখা হলো সুলুকিজ নামে পরগাছা ভদ্রলোকটির সঙ্গে, তাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে আত্মজীবনীমূলক 'সহযাত্রী' গল্পটি। গর্কির অন্যান্য আত্মজীবনীমূলক কাহিনীগুলোর মধ্যে 'আমার প্রথম প্রেম' এবং 'কারামোরা'র সত্যিই কোন তুলনা হয় না।

মুসাফিরি জীবনের নানান টুকরো টুকরো স্মৃতি, অজস্র মুখ ধরা পড়েছে 'নোনাবাদায়', 'কোন এক শরত-সন্ধ্যায়', 'জীবন থেকে নেওয়া', 'সেমাগা কেমন করে ধরা পড়লো', 'কলুসা', 'একটি মেয়ের অবদান', 'নীল-নয়না', 'স্বপ্ন নিয়ে' প্রভৃতি ছোট গল্পে। যাদের নিয়ে এইসব কাহিনী তারা সবাই ভালো-মন্দয় মেশা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—চোর বদমাস গুণ্ডা মুচি ফেরিওয়ালা কামার ছুঁতোর দেহপণ্যা ইত্যাদি। কাজানে সেমিয়ানভের রুটির কারখানার বাস্তব জীবন নিয়ে লিখলেন 'কনোভালভ', 'ছাব্বিশজন পুরুষ ও একটি মেয়ে' 'মনিব'। জুতো তৈরির দোকানে থাকা-কালীন সময়ের অভিজ্ঞতাকে আশ্চর্য নিপুণতায় রূপ দিলেন 'অরলভ' গল্পে। ১৮৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত ঠিকেদারের অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে উঠলো, 'ভাংকা মাজিন' ও 'ভাঙন' নামে আশ্চর্য সুন্দর দুটি গল্প। ১৮৯২ সালে ককেসারের সুকুমে গর্কি যখন রেল-সড়ক মেরামতির একজন সাধারণ মজুর, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচনা করলেন বিখ্যাত দুটি গল্প 'আর্কহিপদাদু ও লেয়নকা' এবং 'একটি শিশুর জন্ম'। সারা দেশ জুড়ে যে নিঃসীম হতাশা, তাকে তিনি রূপ দিলেন তাঁর অন্য একটি বড় গল্পে 'একদিন যারা মানুষ ছিলো'। মোটামুটি ভাবে বলা যায় ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত গর্কির সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্ব।

১৮৯৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ

জুড়ে সাড়া পড়ে যায়। এমন মরমী ভাষায় সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি। 'দোস্ত' গল্পটিই তার সবচেয়ে বড প্রমাণ। এর কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হলো অন্য দুটি গল্প সংগ্রহ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিপীড়িত মানুষ হতাশার অন্ধ তমিস্রা থেকে মুক্তির, সহজ ভাবে বাঁচার একটু আলো খুঁজছে। গর্কি নিজেও তখন সাম্যবাদের পথে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

১৯০১ সাল। গর্কি তখন সেন্ট পিটারসবার্গে। একদিন দেখলেন বিপ্লবী ছাত্র শোভাযাত্রার ওপর পুলিশ নৃশংসভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে! এই বর্বর অত্যাচারের প্রত্যুত্তরে লিখলেন 'ঝোড়ো পাখির গান'। বিপ্লবের স্বপক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠার জন্যে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। সারা দেশ জুড়ে দাবী উঠলো তাঁর মুক্তির—তলস্তয়, চেকভ, কারলেংকো প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকরা অগ্রণী হলেন এই মুক্তি আন্দোলনে। জার সরকার বাধ্য হলেন গর্কিকে মুক্তি দিতে, কিন্তু নির্বাসনে পাঠালেন। ক্ষুব্ধ লেনিন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে এইভাবে বিনা বিচারে নির্বাসনের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। 'ঝোড়ো পাখির গান'এর যে আহ্বান, তা সত্যিই শুরু হলো ১৯০৫ সালের 'নয়ই জানুয়ারি'তে। বিক্ষুব্ধ রাশিয়া। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী তখনও সুসংগঠিত হতে পারেনি। এমনই একটা অসতর্ক মুহূর্তে পুলিস সেন্ট পিটারসবার্গে বিরাট শ্রমিক-মিছিলের ওপর বর্বর আক্রমণ চালালো। গর্কিও ছিলেন সেই মিছিলে। উন্মুক্ত রাজপথে সুপরিকল্পিত নরহত্যা আখ্যা দিয়ে গর্কি প্রকাশ্যে সংগ্রামের আহ্বান জানালেন। ১৯০৫ সালের ১১ই জুনে গর্কি আবার বন্দী হলেন। এবার প্রতিবাদের ঝড় উঠলো সারা ইউরোপ জুড়ে। জার সরকার এবারেও তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। গর্কি মস্কোয় ফিরে এসে বিপ্লবের কাজে মনোনিবেশ করলেন। আবার গ্রেফতারি পরোয়ানা বের হলো তাঁর নামে। ১৯০৬ সালে বন্ধুদের পরামর্শে গর্কি দেশ ছেড়ে ইতালিতে পালিয়ে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই লেনিনের সঙ্গে তাঁর গভীর হৃদ্যতা জমে ওঠে।

১৯০৬-১৩ সাল পর্যন্ত ইতালিতে থাকাকালীন সময়ে 'স্বয়ং জীবনের হাতে রচিত সবচেয়ে সুন্দর যে রূপকথা,' মেহনতি মানুষের সেইসব কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত হয় দুর্লভ গল্পসংগ্রহ 'ইতালির রূপকথা'। এগুলিকে ঠিক গল্প না বলে বরং রেখাচিত্র বলাই ভালো, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে আজও যার জুড়ি মেলা ভার। এমন দশটি রেখাচিত্রকে স্থান দিয়েছি এই সংকলনে। ১৯২১ সাল পর্যন্ত বলা যায় গর্কির ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায়। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে গর্কির সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'মা', ১৯১৭ সালে ঘটে গেছে রুশ-

বিপ্লব। আমার ব্যক্তিগত ধারণা আঙ্গিকের অনন্যতায়, স্বচ্ছ ঋজু রাজনৈতিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে গর্কির এই পর্যয়ের গল্পগুলিই সবচেয়ে শক্তিশালী, বিশেষ করে 'মোরদ্‌ভিনিয়ান মেয়ে', 'ঘুমপাড়ানি গান', 'দুঃসময়' এবং 'রাশিয়ার পথে প্রান্তরে' সংকলিত গল্পগুলির সত্যিই কোন তুলনা হয় না।

১৯২১ সালে লেনিনের সনির্বন্ধ অনুরোধে গর্কি রোগমুক্তির জন্যে দেশে ফিরে আসেন, দীর্ঘদিন ক্ষয়রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলো, আরোগ্যের কোন লক্ষণই দেখা গেলো না। শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটা সত্ত্বেও ১৯৩৩ সালে গর্কি চিরদিনের জন্যে স্বদেশে থাকা স্থির করলেন, কেননা দিকে দিকে ফ্যাসিবাদ তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, পৃথিবী ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছে আর একটা বিশ্বযুদ্ধে। গর্কি সেটা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেন। এদিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশবাসীকে প্রস্তুত করা, অন্যদিকে শান্তি আন্দোলনে সমগ্র বিশ্বকে সুসংগঠিত করার মহান দায়িত্ব অসুস্থতা সত্ত্বেও তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। ১৯৩৪ সালে নির্বাচিত হলেন সমগ্র সোভিয়েত লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি। এর দু বছর বাদে ট্রটস্কিপন্থী চক্রান্তের শিকার হয়ে বিশ্ববিশ্রুত এই জীবনশিল্পীর মৃত্যু ঘটে ১৯৩৬ সালে।

শেষ পর্যায়ে উপন্যাস, নাটক, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সম্পাদকীয়ের তুলনায় গর্কি ছোট গল্প লিখেছেন অত্যন্ত কম। প্রকৃতপক্ষে 'একটি উপন্যাসের কাহিনী' এবং 'আকাশ-নীল জীবন ও অন্যান্য গল্প' ছাড়া অন্য কোন গল্পসংকলনই আমার চোখে পড়েনি।

বিভিন্ন পর্যায় থেকে বাছাই করা তেত্রিশটা গল্প নিলাম এই সংকলনে, দ্বিতীয় সংকলনে নিলাম 'কনোভালভ', 'অরলভ', 'একদিন যারা মানুষ ছিলো', 'মালভা', 'একটি উপন্যাসের কাহিনী, 'আমার প্রথম প্রেম', 'কারামোরা', 'একটি বিরস কাহিনী', 'আকাশ-নীল জীবন' প্রভৃতি সুদীর্ঘ কাহিনীগুলোকে। উপরোক্ত বাকি কাহিনীগুলোকে নিয়েছি তৃতীয় সংকলনে। আর অনুবাদ প্রসঙ্গে যে-কথাটা বিশেষ ভাবে বলা দরকার—গর্কি এমনই একজন শিল্পী, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের ভাবনাকে চলিত ভাষায় রূপ দেবার জন্যে সারাজীবন যিনি মননের গহন তুলিতে কেবল একটা মাত্র রঙই ব্যবহার করেছেন—কলজের টকটকে লাল তাজা রক্ত; যার প্রকৃত অনুরণন শুধু বাংলা কেন, অন্য আর যে কোন ভাষাতেই প্রায় অসম্ভব। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তাঁর শিল্পমানসকে এই সংকলনে ধরে রাখতে। কতটা ব্যর্থ হয়েছি, সে বিচারেরও ভার রইলো পাঠক আর যাঁরা বিদগ্ধজন, তাঁদের ওপর।

মাকার চুদ্রা

স্তেপের ওপর দিয়ে হুহু করে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ভিজে হিমেল হাওয়া। সেই হাওয়ায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সমুদ্রবেলায় আছড়ে-পড়া জল-ঢেউয়ের বিষণ্ণ সুর আর শুকনো লতাগুল্মের মৃদু মর্মর। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে-আনা হলুদ ঝরা-পাতা এসে পড়ছে আমাদের তাঁবুর সামনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায়, হঠাৎ দীপ্ত হয়ে তা জ্বলে উঠছে। যেন ভয়ে কেঁপে উঠছে শারদ-রাত্রির অতল অন্ধকার। আর মুহূর্তের জন্যে বাঁদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে স্তেপের সীমাহীন উন্মুক্ত প্রান্তর, দক্ষিণে দিগন্তলীন সমুদ্র, আর আমার সামনে—বৃদ্ধ বেদে মাকার চুদ্রা। অদূরে বেদে-তাঁবুর ঘোড়াগুলোর দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

এলোমেলো হিমেল হাওয়ায় ফুলে উঠছে ওর গায়ের ককেশীয় কোটটা, চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে ওর নগ্ন লোমশ বুকে। সুঠাম, আন্তরিক ভঙ্গিতে আমার দিকে ফিরে ও তার পেল্লাই পাইপটা টানছে। নাক মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার ঘন মেঘ থমথম করছে আমার মাথার ওপরে। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ও স্তেপের নিস্তব্ধ নিথর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আর অনর্গল বকবক করছে। বাতাসের নির্মমতা থেকে নিজেকে আড়াল করার একটুও চেষ্টা করছে না।

'তাহলে তুইও যাযাবর? পৃথিবী ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিস, কি তাই তো? বাঃ, বেশ! ঠিক পথই বেছে নিয়েছিস। এইটেই তো আসল। দু চোখ ভরে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখবি। তারপর যখন দেখবি পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে সারা মন তোর ভরে উঠেছে, তখন আর মরতেও কোন কষ্ট হবে না।'

'কিন্তু, জীবন···'

আমাকে প্রতিবাদ করতে দেখে বৃদ্ধ বাধা দিলো। 'কি বল্লি, জীবন? তোর আত্মীয়স্বজন? তাদের জন্যে তোর এত মাথাব্যথার কি আছে? তোর জীবনও তো একটা জীবন, না কি? আর আত্মীয়স্বজন? তোকে ছাড়া ওরা যেমন দিব্যি বেঁচে আছে, তেমনি বেঁচে থাকবে। তুই কি ভাবিস সত্যিই তোকে কারুর প্রয়োজন? তুই তো আর রুটি বা লাঠি নোস যে তোকে ওদের প্রয়োজন হবে!

'হয়তো একখুনি বলবি শিখতে চাই, শেখাতে চাই। কিন্তু কি করে

মানুষকে সুখী করা যায় শেখাতে পারবি ? পারবি না। তার জন্যে চুলে পাক না ধরা পর্যন্ত তোকে অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া নতুন কি শেখাবি ? সবাই নিজের প্রয়োজনটা বোঝে। যারা চালাক-চতুর জীবনে তারা গুছিয়ে নেয়, যারা বোকা তারা পারে না। কিন্তু জীবনে ঠেকে শেখে সবাই।

'আর এই অদ্ভুত জীবন—মানুষ। এত জায়গা পড়ে থাকতেও সবাই এক জায়গায় গুঁতোগুঁতি করবে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে মাড়িয়ে যাবে…' উপেক্ষার ভঙ্গিতে বৃদ্ধ স্তেপের দিকে নির্দেশ করে বললো, 'অথচ আমাদের এই পৃথিবীটা কি বিশাল ! সবাই কাজ করছে, কিন্তু কেউ জানে না কেন কিসের জন্যে কাজ করছে। যখনই কাউকে জমি চষতে দেখি, মনে মনে ভাবি, আহাঃ, সমস্ত শক্তি ঢেলে কপালের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরাচ্ছে মাটিতে, শুধু একদিন এই মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়বে বলে। তারপর গলে পচে নষ্ট হয়ে যাবে। জন্মের মতো মৃত্যুও ওর কাছে রয়ে গেলো উপেক্ষিত। নিজের জমিটুকু ছাড়া এ জীবনে ও আর কিছুই রেখে গেলো না, কিছু দেখলো না।

'তুই কি ভাবিস জীবন শুধু মাটি চষার জন্যে, কিংবা নিজের কবর নিজে খোঁড়ার সময় না পেয়েই মরার জন্যে ? মুক্তির স্বাদ কি জিনিস, ও কি কখনও অনুভব করেছিলো ? কখনও জেনে ছিলো স্তেপের সীমাহীন বিশালতা, সমুদ্রের আশ্চর্য মর্মর ? জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি সারা জীবন কেবল গোলামিই করে গেলো।

'এই আমার কথাই ধর্ না কেন, আটান্ন বছর বয়সে আমি যা দেখেছি, লিখে রাখতে গেলে তোর ওই ঝোলার মতো হাজারটা ঝোলাতেও ধরবে না। এমন একটা জায়গার নাম করতে পারবি না, যেখানে আমি যাইনি। এমন সব জায়গায় গেছি যার নামও তুই কখনও শুনিসনি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা কেবল ঘুরে বেড়িয়েছি, বেশিদিন কোথাও আটকে থাকিনি। আর থাকবোই বা কিসের জন্যে ? চলমানতাই তো জীবন ! পৃথিবীকে ঘিরে দিন রাত্রি যেমন ছুটে চলেছে, তোকেও তেমনি ছুটতে হবে। না হলে ভাবনা-চিন্তায় জীবনটা হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর রকমের একঘেঁয়ে, স্থবির। এ আমার নিজের চোখে ছাখা। কেননা জীবনে একবার আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিলো। শুধু একবারই…

'আমি তখন গ্যালিসিয়ার কয়েদখানায় জেল খাটছি। হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তার পোকা ঢুকলো—কেন আমি জন্মালুম। বিশেষ করে কয়েদ-

খানার সেই অবরুদ্ধ পরিবেশে এমন একটা করুণ বিষাদ আমাকে পেয়ে বসলো, যখনই আমি গারদের ফাঁক দিয়ে উন্মুক্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতুম আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেতো। যেন শক্ত মুঠোয় আমার হৃৎপিণ্ডটা কে নিঙড়ে নিতো। কিসের জন্যে মানুষ বাঁচে এর জবাব কেউ জানে না। কেউ না। আর তার জন্যে নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন লাভ নেই। বেঁচে থাকো, ঘুরে বেড়াও, যা কিছু ছাখার ছাখো, তাহলেই দেখবি বিষাদ বলে আর কিছু থাকবে না।' বৃদ্ধ হাসলো। 'আর একটু হলে আমি তো তখন গলায় দড়িই দিচ্ছিলুম।'

'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম। একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। বেশ রাশভারী গোছের, তোর মতোই রাশিয়ান। উনি বলতেন, মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে বাঁচা উচিত নয়, ঈশ্বর যেভাবে চান সেইভাবেই বাঁচা উচিত। তাহলেই উনি তোমার সব আশা পূর্ণ করবেন। ভদ্রলোকের শতছিন্ন পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করে বললুম—ঈশ্বরের কাছ থেকে একপ্রস্থ নতুন পোশাক চেয়ে নিন না! উনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন। অথচ একটু আগে উনিই আমাকে বোঝাচ্ছিলেন প্রতিবেশীকে ভালোবাসা এবং অন্যের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করা উচিত। যদি আমি ওঁকে আঘাত করেই থাকি, ভদ্রলোকের উচিত ছিলো আমাকে ক্ষমা করা। এঁরা হলেন সব দ্রষ্টাব্যক্তি। অন্যকে উপদেশ দেবেন কম খেতে, আর নিজেরা খাবেন দিনে দশবার।'

বৃদ্ধ বেদে পাইপে নতুন করে তামাক ঠাসলো। অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে বাতাসের করুণ বিলাপ, হ্রেষাধ্বনি আর জিপসি-তাঁবু থেকে ভেসে আসা কামনাবিধুর মিষ্টি একটা সুর। মাকার চুদ্রার রূপসী মেয়ে নোনকা গান গাইছে। কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য ধ্বনিমাধুর্যে আমি ওকে চিনতে পারলাম। উজ্জ্বল কালো চোখের দীঘল পল্লব ঘেরা গর্বিত রাণীর মতো গাঢ়-বাদামী বর্ণের মুখ। অসম্ভব রকমের আকর্ষণীয় রূপ সম্পর্কে নোনকা সচেতন, এবং নিজের ছাড়া আর সবকিছুর ওপর ওর নিদারুণ বিতৃষ্ণা।

মাকার তার পাইপটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

'নে, টান্। মেয়েটা কিন্তু চমৎকার গায়! এরকম একটা মেয়ে তোর প্রেমে পড়লে খুব ভালো লাগতো, তাই না?'

'না।'

'তা অবশ্য ঠিক। মেয়েদের কক্ষোনো বিশ্বাস করবি না। এই পাইপটাতে

টান লাগাতে আমার যত ভালো লাগে, মেয়েরা চুমু খেতে তার চাইতে বেশি ভালবাসে। কিন্তু ওদের কাউকে একবার চুমু দিলেই দেখবি তোর স্বাধীনতা কোথায় মিলিয়ে গ্যাছে। অদৃশ্য বাঁধনে তোকে এমনি বাঁধবে যে তুই আর কোনদিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবি না। তখন মন প্রাণ বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। তাই যতটা সম্ভব মেয়েদের থেকে সাবধান থাকবি। ওরা কখনও সত্যি বলে না। ওদের কেউ যদি বলে এ পৃথিবীতে সবচেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি, জানবি সামান্য একটা কাঁটার খোঁচায় ও তোর কলজে উপড়ে নিতেও ছাড়বে না। না, কথাটা মিথ্যে নয়। যদি চাস এ সম্পর্কে তোকে একটা সত্যি গল্প শোনাতে পারি। গল্পটা যদি মনে রাখতে পারিস, দেখবি সারাটা জীবন পাখির মতো মুক্ত স্বাধীন হয়ে কাটিয়ে দিতে পারবি।'

'তাই নাকি?' আমি অবাক হয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালাম।

'তাহলে শোন্। একসময়ে জোবার, লোইকো জোবার নামে একজন জোয়ান বেদে ছিলো। হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, স্লেভোনিয়া আর সমুদ্রের আশেপাশের তল্লাটে দুঃসাহসী হিসেবে ওর যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো। এমন দুঃসাহসী যে ভালো একটা ঘোড়া পেলে এক পল্টন সৈন্যকেও ও তোয়াক্কা করতো না, এমনকি স্বয়ং যমরাজকেও নয়।

'প্রতিটা বেদে-তাঁবুর সবাই হয় ওকে জানতো, না হয় ওর নাম শুনেছিলো। জীবনে কেবল একটা জিনিসই ও ভালোবাসতো—ঘোড়া। তাও একটা ঘোড়া বেশিদিনের জন্যে নয়। ভালো না লাগলেই ঘোড়াটাকে বিক্রি করে ও টাকাটা কাউকে না কাউকে দিয়ে দিতো। সত্যিকারের কারুর প্রয়োজন হলে নিজের বুকের কলজেটাও ছিঁড়ে দিতে ও দ্বিধা করতো না। ও ছিল ঠিক এই ধরনের বেপরোয়া।

'আমি প্রায় বছর দশেক আগেকার কথা বলছি…আমাদের দলটা তখন বুকোভিনার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। বসন্তের এক রাত্তিরে আগুনের চারপাশে আমরা সবাই তখন গোল হয়ে বসে গল্প করছি…আমি, কোসাথের লড়াই থেকে ফিরে-আসা পুরনো সেপাই দানিলো, দানিলোর মেয়ে রাদ্দা, বুড়ো নুর, আরও অনেকে।

'আমার মেয়ে নোনকাকে তো তুই দেখেছিস্? রীতিমত রূপসী। কিন্তু রাদ্দার সঙ্গে তুলনা করলে ওর রূপকে বড্ড বেশিই সম্মান দেওয়া হবে।

রাদ্দার রূপকে ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হয়তো খানিকটা বোঝানো যায় বেহালার সুরের সঙ্গে, তাও আবার সমস্ত সত্তা ঢেলে যে সত্যিকারের বাজাতে জানে।

'রাদ্দার রূপে অনেকেরই হৃদয় ঝলসে গ্যাছে। একবার মোরাভিয়ার এক বৃদ্ধ আমির তো ওকে দেখে বোবাই হয়ে গিয়েছিলো। ঘোড়ার পিঠে বসে বৃদ্ধ ওর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলো আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলো। গায়ে সোনার সুতোয় নক্শা-করা উজ্জ্বল ইউক্রেনিয়ান অঙ্গরাখা, মাথায় মখমলের উষ্ণীষটা যেন একটুকরো নীল আকাশ। কোমরে বাঁকা তরোয়ালের রকমারি দামী পাথরগুলো ঘোড়ার প্রতিটা পদবিক্ষেপে বিদ্যুতের মতো ঝলমল করছিলো। সব মিলিয়ে সে যেন পরিভ্রমণরত সাক্ষাৎ কোন শয়তান! ও যে রীতিমত ধনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাদ্দার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ও বললো, 'একটা চুমু দিলে আমার এই টাকার থলিটা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি।' রাদ্দা পেছন ফিরে সোজা হাঁটতে শুরু করলো। এতে বৃদ্ধের গলার সুর গেলো পালটে। 'যদি তোমায় অপমানকর কিছু বলে থাকি, আমায় তুমি ক্ষমা করো। কিন্তু আমার দিকে তুমি একবার অন্তত প্রসন্ন চোখে তাকাও।' এই বলে টাকার থলিটা ফেলে দিলো ওর পায়ের কাছে। কিন্তু রাদ্দা অবজ্ঞা ভরে লাথি মেরে ওটা দূরে সরিয়ে দিলো। ওতে কি আছে একবার দেখারও প্রয়োজন বোধ করলো না।

"উঃ, অদ্ভুত মেয়ে তো!' চাবুকের তীক্ষ্ণ স্বননে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে বৃদ্ধ চলে গেলো।

'পরের দিনই ও আবার এলো। আমাদের তাঁবুর সামনে প্রতিধ্বনিত হলো ওর ভরাট কণ্ঠস্বর। 'কে এই মেয়েটি বাবা? ডাকো তাকে।' দানিলো সামনে এগিয়ে এলো। 'তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। কত টাকা চাই বলো?' দানিলো বললো, 'ভদ্রলোকেরাই তাদের সবকিছু বিক্রি করে, শুয়োরছানা থেকে শুরু করে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি পর্যন্ত। কিন্তু আমি একদিন কোসাথে লড়াই করেছিলুম, দুটো পয়সার লোভে কোন কিছু বিক্রি করি না।'

'বৃদ্ধ গর্জন করে উঠলো, খাপ থেকে টেনে বার করতে যাচ্ছিলো তার বাঁকা তরোয়াল, কিন্তু আমাদের কে একজন জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে আসতেই ঘোড়া ছুটিয়ে ও হাওয়া হয়ে গেলো। তাঁবু গুটিয়ে আমরা আবার যাত্রা

শুরু করলুম। পথে দুদিন কাটবার পর হঠাৎ আবার দেখা হলো সেই বৃদ্ধের সঙ্গে। 'এই যে! ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তোমরা যদি মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও, আমার যা কিছু আছে তোমাদের সবাইকে ভাগাভাগি করে দেবো। আমার অঢেল সম্পদ আছে।' কামনায় তখন ও ঝড়ের মুখে শুকনো কুটোর মতো থরথর করে কাঁপছে।

'ওর এই কথাগুলো আমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তুললো। দানিলো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মেয়েকে জিগেস করলো, 'কি রে বেটি, তুই কি বলিস?'

'রাদ্দা বললো, 'ঈগল যদি স্বেচ্ছায় কাকের বাসায় ঢুকতে চায়, তাহলে আমার আর কি বলার আছে?'

'দানিলো হেসে উঠলো। আমরাও সবাই।

"বাঃ, বেশ বলেছিস তো বেটি! কি মশাই, শুনলেন তো? এখানে আর কিছু হবে না। বরং কোন পায়রার খোপে গিয়ে খোঁজ করুন, ওরা বেশ ভালো পোষ মানে।' এই বলে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলুম। আর ওর ঘোড়ার খুরের শব্দে দিগন্ত তখন কেঁপে উঠছে। রাদ্দা, ঠিক এই রকম তেজী, বুঝলে ভায়া।

'এর বেশ কিছুদিন পরে, একদিন রাত্তিরে তাঁবুর সামনে আমরা সবাই বসে আছি, হঠাৎ স্তেপের ওপর দিয়ে মিষ্টি একটা গানের সুর ভেসে এলো। আশ্চর্য মিষ্টি একটা গানের সুর! যেন রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়, আর মনকে টেনে নিয়ে যায় সুদূর কোন্ অজানার দেশে। এমনই অদ্ভুত সেই সুর, যা শুনে মনে হলো আমরা পরিপূর্ণ। এর পরে বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। আর বাঁচলে তামাম এ দুনিয়ার মালিক হয়েই বাঁচতে হয়।

'অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো একজন ঘোড়সওয়ার। বেহালা বাজাতে বাজাতে ও আমাদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালো। আমাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। দানিলো আনন্দের অতিশয্যে চিৎকার করে উঠলো, 'আরে জোবার, তুমি!'

'হ্যাঁ, এই সে লোইকো জোবার। প্রকাণ্ড গোঁফজোড়াটা কাঁধের দু পাশে কোঁকড়ানো কালো চুলের গোছার মধ্যে এসে মিশেছে। উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ওর চোখদুটো ঝিকমিক করছে, হাসিটা সূর্যের মতো দীপ্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ও আর ঘোড়াটা যেন একই পাথর কুঁদে তৈরি। প্রজ্বলিত আগুনের সামনে ওকে রক্তের মতো টকটকে লাল দেখাচ্ছে, আর হাসিতে

ঝলসে উঠছে সাদা দাঁতগুলো। আমার দিকে ও ফিরেও তাকায়নি, অথচ এক নজরেই আমি যেন ওর প্রেমে পড়ে গেলুম।

'হ্যাঁ, এমন কিছু লোক থাকে, যার দিকে একবার তাকালেই মনে হবে তুমি তার কেনা গোলাম হয়ে গ্যাছো। অথচ তার জন্যে তোমার লজ্জা করবে না, বরং মনে মনে গর্বই অনুভব করবে। অবশ্য তেমন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আর একদিক দিয়ে সেটা ভালো। কেননা পৃথিবীতে ভালো জিনিসের ছড়াছড়ি হলে তার সত্যিকারের কদর কেউ বুঝতে পারে না। হ্যাঁ, তারপর কি হলো বলি শোন।

'রাদ্দা বললো, 'তুমি তো বেশ ভালোই বাজাও জোবার, তা তোমার মিষ্টি সুরের এই বেহালাটা কে বানিয়ে দিলো?'

"কেন, আমি নিজেই বানিয়েছি।' জোবার হাসলো। 'তা বলে কাঠ দিয়ে নয়, আমি যাকে ভালোবাসতাম সেই কুমারী মেয়ের স্তন আর তার হৃদয়-তন্ত্রী দিয়ে এই বেহালাটা বানানো। এখনও মাঝে মাঝে বেসুরো বাজে বটে, কিন্তু তাকে কেমন করে মুচড়ে দিতে হয় আমি জানি।'

'তুই বোধহয় জানিস না, আমাদের পুরুষেরা কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার একেবারে গোড়াতেই অন্য প্রেমিকার কথা বলে তার চোখদুটোকে এমনভাবে ধাঁধিয়ে দেয় যাতে তার আড়ালে নিজেকে ও বাঁচিয়ে চলতে পারে। এবং জোবারও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু ও তো জানে না কার পাল্লায় পড়েছে। রাদ্দা সে-জাতেরই মেয়ে নয়। তাই ঠোঁট উলটে ও বললো, 'আমি শুনেছিলুম জোবার নাকি অসম্ভব রকমের চালাক আর বেপরোয়া। কিন্তু এখন দেখছি সব মিথ্যে।' এই বলে ও চলে গেলো।

"বাঃ, তোমার জিবে বেশ ধার আছে তো!' হাসতে হাসতে জোবার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। 'আদব, ভাইসব। তোমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এলাম।'

'দানিলো স্বাগত জানালো। 'তোমাকে পেয়ে আমরাও খুব খুশি হয়েছি, জোবার।'

'তারপর আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলুম। অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করে শেষে শুতে গেলুম। ভোরে উঠে দেখি জোবারের মাথায় ফেট্টি বাঁধা। কি ব্যাপার, না রাত্তিরে ঘোড়ায় নাকি চাঁট মেরেছে। আমাদের আর বুঝতে বাকি রইলো না ঘোড়াটা কে। গোপনে সবাই হাসাহাসি করলুম। তা বলে,

জোবার যে রাদ্দার উপযুক্ত নয়, তা কিন্তু নয়। বরং দুজনেই সমান এবং মানাবেও বেশ সুন্দর।

'যাই হোক, ওই জায়গায় আমরা কিছুদিন রয়ে গেলুম। দিনগুলো বেশ সুন্দরই কাটছিলো। কেননা সঙ্গী হিসেবে জোবার সত্যিই দুর্লভ—অভিজ্ঞতায় বাপ-ঠাকুদ্দাদের মতো, দুনিয়ার হালচালের খবরও বেশ ভালো রাখে। রাশিয়ান আর ম্যাজেয়ার ভাষায় লেখাপড়াও জানে। ও যখন গল্প করতো কিংবা বেহালায় সুর তুলতো, ঘুম ভুলে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনতুম। ছড়ের প্রতিটা টানে আমাদের কান্না পেয়ে যেতো, হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে লাফিয়ে উঠে থরথর করে কাঁপতো। কখনও মনে হতো প্রেমিকের কাছ থেকে বিদায়-নেওয়া কুমারীর করুণ মিনতি, কিংবা স্তেপের প্রান্তে ছুরিবেঁধা বুকে গুমরে-ওঠা অসহ্য আর্ত বিলাপের মতো। কখনও মনে হতো সে যেন আকাশকে গল্প শোনাচ্ছে—রূপকথার গল্প। আবার হঠাৎ করেই আনন্দের ক্ষ্যাপা সুরে কখনও মনে হতো সূর্য যেন আকাশে নাচছে। সব মিলিয়ে মনে হতো আমরা যেন সুরের কেনা গোলাম হয়ে গেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে জোবার যদি কাউকে খুন করতে বলতো, আমরা চোখের পলকে খাপ থেকে ছুরি টেনে বার করতুম। আমরা সবাই ওকে দারুণ ভালোবাসতুম। অথচ রাদ্দা ওর দিকে ফিরেও তাকাতো না। বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপে ওকে বিদ্ধ করতো। আর জোবার তখন দাঁতে দাঁত ঘষে নিজের গোঁফ টেনে ছিঁড়তো, চোখদুটো আগুনের ভাটার মতো জ্বলে উঠতো। মাঝে মাঝে রাত্তিরে স্তেপের অনেক গভীরে ও চলে যেতো। ভোর না হওয়া পর্যন্ত শোনা যেতো ওর বেহালার করুণ সুর—হারানো স্বাধীনতার জন্যে বুকফাটা হাহাকার। শুয়ে শুয়ে আমরা কান পেতে শুনতুম আর ভাবতুম কি করা যায়! দুটো পাথর যখন ওপর থেকে একসঙ্গে গড়িয়ে আসছে পরস্পরের ঠোকাঠুকি তাদের লাগবেই!

'সেদিন আগুনের সামনে সবাই বসে গল্প করছি, দানিলো বললো, 'জোবার, আমাদের একটা গান শোনাও। মনটা একটু চাঙ্গা হোক।' জোবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো রাদ্দা আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে শুয়ে আছে। মুচকি হেসে জোবার বেহালাটা তুলে নিলো। ছড়ে টান দিতেই মনে হলো ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা কে যেন সোজা টেনে আনলো কুমারীর বুকের ওপর দিয়ে। ও গান ধরলো :

হেই-ও হো হো, হেই-ও হো !
হৃদয়ে আমার অগ্নি-দাহন
সমুদ্র যেন ধু ধু তেপান্তর,
বাতাসের বেগে তোমাকে আমাকে নিয়ে
আহা, ছুটে যাবে বুঝি দীপ্ত তুরঙ্গম ।

'কনুইয়ে ভর রেখে রান্দা মুখ ফিরিয়ে হাসলো। রাঙা হয়ে উঠলো জোবারের সারা মুখ।

হেই-ও হো হো, হেই-ও হো !
বন্ধু, তেপান্তরের রাত্রি হলো ভোর
আমরা এখন দুজনে কোথায় যাবো ?
ঘোড়ার খুরে দিনের আলো মেশে
রূপসী চাঁদ তখনও প্রিয়ার কেশে।

'রান্দা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'দেখো, রূপসী চাঁদ ধরতে আবার যেন খানাখন্দে উলটে পোড়ো না। তাহলে তোমার অমন খাসা গোঁফজোড়াটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

'জোবার কোন কথা বললো না, শুধু জ্বলন্ত চোখে একবার ওর দিকে তাকালো। তারপর নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে ও আবার গেয়ে চললো ঃ

হেই-ও হো হো, হেই-ও হো !
দিনের আলো যদি এসে ছাখে
অশ্বারূঢ় আমরা দুজনে ঘুমিয়ে,
আমাদের মুখ লজ্জায় রাঙা হবে
যখন আমরা লাফিয়ে নামবো সবে।

"বাঃ চমৎকার !' দানিলো বললো, 'এমন সুন্দর গান এর আগে আমি আর কখনও শুনিনি।' একমাত্র রান্দা ছাড়া আমরা সবাই তখন খুশিতে ঝলমল করছি। হঠাৎ ও দুম করে বলে বসলো, 'আহা, কি গানের ছিরি ! মাছি হয়ে যেন ঈগলের ডাককে নকল করতে যাওয়া !' আমাদের সমস্ত আনন্দ ও যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলো। দানিলো তো প্রচণ্ড রাগে ওর দিকে তেড়ে গেলো। 'দাঁড়া ছেমড়ি, আজ তোকে আমি চাবকে সিধে করছি !' কিন্তু জোবার দ্রুত উঠে ওকে বাধা দিলো। বেচারীর সারা মুখ পোড়া মাটির

মতো শুকিয়ে কালো হয়ে গ্যাছে। 'থামো দানিলো, থামো। তেজী ঘোড়ার জন্যে চাই শক্ত লাগাম। তোমার মেয়েকে বরং আমার সঙ্গে বিয়ে দাও।'

"সাব্বাস!' দানিলো খুশিতে চলকে উঠলো। 'ও যদি রাজি থাকে তুমি ওকে বিয়ে করো।'

"ঠিক আছে।' জোবার রাদ্দার দিকে ফিরে বললো, 'শোন, জীবনে আমি অনেক অনেক মেয়ে দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো কেউ এমন করে আর আমার হৃদয় কেড়ে নিতে পারেনি। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই, যা হবার তা হবেই। কেউ তো আর নিজের মনের কাছ থেকে পালাতে পারে না। তাই ঈশ্বর আর নিজের বিবেককে সাক্ষী রেখে তোমার বাবা আর এইসব ভাইবন্ধুদের সামনে আমি তোমাকে বউ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। কিন্তু একটা কথা—আমার স্বাধীন ইচ্ছেয় তুমি কখনও বাধা দিতে পারবে না। স্বাধীনতা আমি দারুণ ভালোবাসি এবং সেইভাবে সারাটা জীবন কাটাতে চাই।' আমরা দেখলাম কথা বলতে বলতেই ও দু হাত বাড়িয়ে রাদ্দার দিকে এগিয়ে গেলো। মনে মনে ভাবলুম, যাক, স্তেপের দুর্দান্ত ঘোড়াটাকে শেষ পর্যন্ত রাদ্দাই বশ মানালো। কিন্তু হঠাৎ দেখলুম দু হাত ওপরে তুলে জোবার মাটিতে আছড়ে পড়লো, শক্ত মাটিতে মাথাটা ঠুকে শব্দ হলো ঠক্ করে।

'কেমন করে হলো? মনে হলো যেন ওর বুকে গুলি বিঁধেছে। আসলে, রাদ্দা চাবুকের দড়িটা ওর পায়ে জড়িয়ে আচমকা এক টান দিয়েছিলো। টাল সামলাতে না পেরে জোবার পড়ে গিয়েছিলো।

'তারপর আবার নিশ্চল ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে রাদ্দা শুয়ে রইলো, দু ঠোঁটে চাপা তার একটুকরো অবজ্ঞার হাসি। এর পরে কি ঘটে দেখার জন্যে আমরা ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলুম। জোবার ধীরে ধীরে উঠে বসলো। দু হাতে ও মাথাটা এমনভাবে চেপে ধরে আছে যেন এক্ষুণি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ও শান্ত পায়ে স্তেপের দিকে চলে গেলো, কারুর দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। নুর আমার কানে কানে বললো, 'ওর ওপর একটু নজর রাখো।' অন্ধকারে আমিও তখন চুপিচুপি ওর পিছু নিলুম।'

পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে মাকার আবার নতুন করে তামাক ঠাসলো। কোটটা ভালো করে টেনেটুনে আমিও একপাশে কাত হয়ে শুলাম, যাতে

রোদে-পোড়া ওর তামাটে মুখটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। বাজ-পড়া অথচ তখনও বেশ শক্ত আর মজবুত পুরনো ওক্ গাছের মতো সুঠাম ভঙ্গিতে ও আমার মুখোমুখি বসে রয়েছে। এলোমেলো চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। সমুদ্রের মর্মর, স্তেপের বুক থেকে উড়িয়ে-আনা বাতাসের অশান্ত বিলাপ শোনা যাচ্ছে। নোনকার গান থেমে গেছে। কালো মেঘগুলো শরতের রাত্রিকে আরও নিবিড় কালো করে তুলেছে।

'তারপর তুমি কি করলে?' আমি উৎসুক হয়ে জিগেস করলাম।

'অন্ধকারে আমি দেখলুম জোবার পা টেনে টেনে হাঁটছে। মুখটা নিচু, হাতদুটো পাশে চাবুকের ফিতের মতো ঝুলছে। বেশ কিছুটা এগিয়ে ছোট্ট একটা নদীর ধারে উঁচু একটা পাথরের ওপরে ও বসলো। তখনও যন্ত্রণায় গুঙিয়ে-ওঠা ওর আর্তনাদে আমার বুকের ভেতরটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু আমি ওর সামনে যেতে পারছি না। তাছাড়া শুধু কথা দিয়ে তো আর কারুর দুঃখ দূর করা যায় না, তাই অপেক্ষা করলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলুম।

'খানিকটা পরে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠলো। ঝিলিমিলি জ্যোৎস্নায় ভেসে গেলো প্রান্তরের সারা বুক। অনেক দূরের জিনিসও বেশ স্পষ্ট নজরে পড়ে। হঠাৎ দেখি কি রাদ্দা দ্রুত পায়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে আমার মনে স্ফূর্তি হলো। মনে মনে তারিফ করলুম, নাঃ, মেয়েটার সত্যিই সাহস আছে! কোনরকম পায়ের শব্দ না করে রাদ্দা জোবারের দিকে এগিয়ে গেলো, পিছন থেকে দু হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলো। চমকে উঠে জোবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর চকিতে কোমর থেকে ছুরিটা টেনে বার করলো। সর্বনাশ, ও কি ওকে খুন করে ফেলবে নাকি! সবে চিৎকার করে বাধা দিতে যাবো, হঠাৎ শুনলুম, 'হাত থেকে ছুরিখানা ফেলে দাও, নইলে তোমার মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেবো।' দেখলুম রাদ্দার হাতের পিস্তলটা জোবারের মাথা লক্ষ্য করে উঁচিয়ে রয়েছে। আচ্ছা শয়তান তো! তবু ভাবলুম, যাক, দুজনের কেউ এক পাও কম যায় না। দেখা যাক এর পরে কি হয়।

'কোমরে পিস্তল গুঁজে রাদ্দা বললো, 'শোন, তোমাকে আমি খুন করতে আসিনি, এসেছি কিছু বলতে। ছুরিটা তুমি নামিয়ে নাও।' ছুরিটা ফেলে দিয়ে জোবার ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! যেন হিংস্র

দুটো পশু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনেই যেমন সুন্দর, তেমনি সাহসী। চাঁদ আর আমি ছাড়া এ দৃশ্য দেখার সুযোগ আর কেউ পায়নি।

"শোন জোবার, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' রাদ্দার কথায় জোবার শুধু হাত-পা-বাঁধা অসহায় মানুষের মতো কাঁধ ঝাঁকালো, কোন কথা বললো না। 'জীবনে আমিও অনেক দুঃসাহসী জোয়ান দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো দুঃসাহসী আর সুন্দর পুরুষ আমি আর একজনও দেখিনি, জোবার। আমি চাইলে ওদের যে কেউ গোঁফ কামিয়ে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তো। কিন্তু ওদের কেউই তেমন দুঃসাহসী নয়। এখন পর্যন্ত কোন জিপসিকেই আমি ভালোবাসতে পারিনি, জোবার। শুধু তোমাকে ছাড়া। আমিও স্বাধীনতা ভালোবাসি। তোমাকে যতটা ভালোবাসি হয়তো তার চাইতে বেশি। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি যে বাঁচতে পারবো না, জোবার। দেহে মনে আমি যে তোমার সবটুকুকে চাই। শুনতে পাচ্ছো?'

"পাচ্ছি। দোহাই তোমার, থেমো না, বলে যাও।'

"আর কি বলবো, জোবার? তুমি আমার, আমি তোমাকেই চাই! এক-মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চুমু আর আদরে আমার কামনাকে তুমি পরিপূর্ণ করে ভরিয়ে দাও। আর আমিও তোমাকে চুমুর জাদুতে ভুলিয়ে দেবো তোমার অতীতের বেপরোয়া জীবন। তোমার বিষাদের করুণ গান স্তেপের জিপসিরা আর কোনদিন শুনতে পাবে না। তার বদলে ওরা শুনবে রাদ্দার জন্যে গাওয়া মিষ্টি প্রেমের গান। তাই আর দেরি না করে কালই তুমি তাঁবুর সকলের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আমার ডান হাতে চুমু দেবে—তারপরেই আমি তোমার হয়ে যাবো।'

'শয়তানী আর কাকে বলে! পাগলেও এমন কথা কখনও শোনেনি। হয়তো প্রাচীন বুড়োরা বলবে আদিমকালে মন্তেনগ্রীনদের মধ্যে এরকম একটা রীতি ছিলো বলে শুনেছি বটে, কিন্তু বেদেদের মধ্যে এমন রেওয়াজ কোনকালেই ছিলো না। তাই জোবার শিউরে উঠলো, ওর চাপা আর্তনাদ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো প্রান্তরের বুকে।

"তাহলে আজকের মতো বিদায়, জোবার। যা বললুম কাল মনে থাকবে তো?'

"থাকবে রাদ্দা, থাকবে।'

'রাদ্দা চলে যাবার পর জোবার ডানা-ভাঙা পাখির মতো ঘাড় গুঁজে

বসে রইলো। ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে আমাকে বেশ খানিকটা কষ্ট করতে হয়েছিলো। ওর যন্ত্রণায় আমার নিজেরই বুক যেন ফেটে যাচ্ছিলো। তাঁবুতে ফিরে এসে বৃদ্ধদের সব বললুম। ওরা ভেবেচিন্তে ঠিক করলো—ছাখা যাক কি ঘটে। সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় আগুনের সামনে আমরা সবই গল্প করছি, জোবার এলো। থমথমে মুখ, চোখের পাতা দুটো নামানো। এক রাত্তিরেই চোখদুটো বসে গ্যাছে, পাতার নিচে কালি। মাটির দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'ভাইবন্ধুরা সব, নিজের মনকে আমি ভালো করে যাচাই করে দেখেছি। কিন্তু এতদিন যে স্বাধীন জীবন আমি যাপন করেছি, আজ আমার কাছে তার আর কোন স্থান নেই। তার সবটুকুর স্থান অধিকার করে রয়েছে রূপসী রাদ্দা। সেখানে ও গর্বিত রানীর মতো বসে হাসছে। আমাকে যতটা ভালোবাসে তার চাইতে স্বাধীন জীবনকে ও বেশি ভালোবাসে, আর আমি আমার স্বাধীন জীবনের চাইতে রাদ্দাকে বেশি ভালোবাসি। তাই আমি ঠিক করেছি রাদ্দার আদেশ মতোই ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসবো, আর সবাই দেখবে দুঃসাহসী লোইকো জোবার, যে এতদিন পায়ের নিচে মেয়েদের পোষা বেড়ালের মতো খেলিয়েছে, আজ সে রাদ্দার রূপের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিলো। কেননা চুমুতে সোহাগে ও আমাকে এমনভাবে ভরিয়ে দেবে যে আমি আর কখনও গান গাইতে পারবো না। তুমি ঠিক এই চাও, তাই না রাদ্দা?' জোবার ভীষণ চোখে রাদ্দার দিকে তাকালো। রাদ্দা নিঃশব্দে ওর পায়ের নিচের মাটি নির্দেশ করলো। আমরা কল্পনাও করতে পারছি না কেমন করে তা সম্ভব। আমাদের তখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো উঠে চলে যাই। এমন বিষণ্ণ আর খারাপ লাগছিলো যে নিজেরাই লজ্জায় মরে যাচ্ছিলুম।

"কি ব্যাপার?' রাদ্দা বিরক্ত হয়ে জিগেস করলো।

"এত ব্যস্ত কিসের? এখনও অনেক সময় আছে, রাদ্দা।' ইস্পাতের মতো কঠিন হাসিতে ঝিকমিক করে উঠলো জোবারের সাদা দাঁতগুলো। 'তাহলে ভাইসব, তোমরা নিজে চোখেই দেখলে। এখন একটা জিনিস শুধু আমার ছাখা বাকি আছে—রাদ্দা যতটা ভাবে তার হৃদয় সত্যিই ততটা কঠিন কিনা। আর সেটা যাচাই করবো আমি নিজে। তোমরা আমায় ক্ষমা কোরো।'

'কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা দেখলুম রাদ্দা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

জোবারের বাঁকানো ছুরিটা আমূল বেঁধানো রয়েছে ওর বুকে। আমরা সবাই নির্বাক।

'কিন্তু রাদ্দা একটানে ছুরিটা বুক থেকে তুলে ফেললো। ঘন কালো চুলের গুচ্ছ চেপে ধরলো গভীর ক্ষতে। তারপর কোনরকমে দু ঠোঁটের কোলে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তুলে বললো, 'বিদায়, জোবার। আমি জানতুম তুমি এমন করবে।' তারপর ও আর কোন কথা বলতে পারলো না, মরে গেলো।

'ও যে কি মেয়ে সে তুই কল্পনাও করতে পারবি না!

"এইবার আমি তোমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসবো, গর্বিতা রাণী আমার!'

'এতক্ষণে জোবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। প্রান্তরের বুকে ছড়িয়ে পড়লো ওর বুক-ফাটা হাহাকার। মৃত রাদ্দার দু পায়ে ঠোঁট চেপে ও নিথর হয়ে পড়ে রইলো। আমরা মাথা থেকে টুপি খুলে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলুম।

'ওইরকম একটা মুহূর্তে আর কিইবা বলার আছে? কিছু না। নুর ফিসফিস করে বললো, 'ওকে বেঁধে রাখা উচিত।' কিন্তু জোবারকে বাঁধাতে কারুর হাতই উঠবে না। এবং সেটা নুরও ভালো করে জানতো। তাই দু হাতে মুখ ঢেকে ও ঘুরে দাঁড়ালো। দানিলো ছুরিটা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। ঝকঝকে ধারালো ফলাটা তখনও রাদ্দার তাজা রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে। তারপর দানিলো জোবারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো, ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিলো ওর পিঠে। ফলাটা সোজা গিয়ে বিঁধলো ওর হৃদপিণ্ডে। কেননা, হাজার হোক দানিলো পুরনো সেপাই, রাদ্দার বাবা।

"আমি ঠিক এইটেই চেয়েছিলাম।' দানিলোর দিকে ফিরে জোবার পরিষ্কার গলায় বললো। তারপর ও-ও রাদ্দার সঙ্গে চলে গেলো।

'আমরা ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। বুকে চুলের গুচ্ছ নিয়ে রাদ্দা শুয়ে রয়েছে, চোখগুলো মেলা রয়েছে নীল আকাশের দিকে। আর ওর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে দুঃসাহসী লোইকো জোবার। কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুলে ঢেকে গ্যাছে সারা মুখ।

'আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বৃদ্ধ দানিলোর গোঁফজোড়াটা মৃদু কাঁপছে, ঘন ভ্রূদুটো কুঁচকে গ্যাছে। নির্নিমেষ চোখে আকাশের দিকে

তাকিয়ে রয়েছে। বুড়ো নুর কিন্তু আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, মাটিতে আছড়ে পড়লো। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে ওর সারা শরীর।

'সত্যি, কাঁদবার যথেষ্ট কারণ ছিলো বইকি। তাই বলছিলুম তুই যে পথেই যাস না কেন, কোন প্রলোভনের মোহে নিজেকে বিকিয়ে দিবি না। তাহলে দেখবি কোনদিন আর অনুশোচনা করতে হবে না। এই কথাটাই শুধু তোকে বলতে চেয়েছিলুম।'

মাকার চুপ করলো। পাইপটা তামাকের থলেতে ভরে কোটটা ভালো করে বুকের ওপর টেনে দিলো। বউ-নাচুনি বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসের বেগ আরও বাড়লো। ক্রুদ্ধ আক্রোশে সমুদ্র ফুলছে। এবার একটা দুটো করে ঘোড়াগুলো নিভন্ত আগুনের আশেপাশে জড়ো হতে শুরু করলো। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ মেলে আমাদের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ালো।

'আয়, আয়!' মাকার আদর করে ডাকলো। তারপর ওর সবচেয়ে প্রিয় কালো ঘোড়াটার গলায় হাত বুলতে বুলতে আমাকে বললো, 'নে, এবার শুয়ে পড়্।' তারপর নিজেও ককেশীয়ান কোটটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। আমার কিছুতে ঘুম এলো না। চুপচাপ বসে অন্ধকার প্রান্তরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো গর্বিতা, অনন্যা রূপসী রাদ্দার ছবি। চূর্ণকুন্তল চেপে রয়েছে বুকের ক্ষতে, দীঘল বাদামী আঙুলের ফাঁক দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে মাটিতে। আর ওর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে দুঃসাহসী বেদে লোইকো জোবারের বিশাল দেহটা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ঢেকে গেছে সারা মুখ।

এবার আকাশ ঝামরে বৃষ্টি নামলো। লোইকো জোবার আর বুড়ো দানিলোর রূপসী মেয়ে রাদ্দা—অপূর্ব দুটি জিপসির জন্যে সমুদ্র শোকগাথা গাইছে।

আর ওরা দুজন যেন অন্ধকার ঘন কুয়াশার মধ্যে ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও বেপরোয়া জোবার গর্বিতা রাদ্দাকে কিছুতেই ধরতে পারছে না।

১৮৯২

দক্ষিণের নীল আকাশ ধুলোয় এমন ঢেকে গেছে যেন সায়াহ্নের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। হালকা ধূসর ওড়নার ভেতর দিয়ে গনগনে সূর্যটা তাকিয়ে রয়েছে নীলাভ সমুদ্রের দিকে। জলের বুকে তার সামান্য প্রতিবিম্বটুকুও দাঁড়ের আঘাত আর স্টীমারের চাকার ঘূর্ণনে ছিন্নভিন্ন হয়ে চলকে উঠছে। মুখর বন্দরের চারপাশে তুর্কী বাণিজ্য-পোত আর অন্যান্য জলযানগুলো সমুদ্রের জল যেন চষে ফেলছে। প্রচণ্ড গুরুভারে সমুদ্রের ঊর্মিমালা বন্দরের গ্রানাইট পাথর-প্রাচীরে অবরুদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে, উন্মুক্ত বালিয়াড়ির বুকে। যতরকম আবর্জনাময় বিক্ষুব্ধ ফেনিল জলরাশি যেন নিজেদেরই আঘাত করার জন্যে ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ছে।

নোঙর-শৃঙ্খলের ঝনঝনা, মালবাহী রেল-কামরার জোড়া লাগার প্রচণ্ড শব্দ, শানবাঁধানো পাথরে লোহাব-পাত ফেলার যান্ত্রিক আওয়াজ, বড় বড় কাঠের গুঁড়ি নামানোর দুমদাম শব্দ, ঠেলাগাড়ির ঘড়ঘড়, স্টীমারের বাঁশির তীক্ষ্ণ স্বনন, ডক-মজুর আর নাবিকদের হৈ-হল্লা, শুল্ক বিভাগের প্রহরীদের চেঁচামেচি—সব একাকার মিশে গিয়ে কর্মব্যস্ত দিনের মুখর কোলা-হলে বন্দরের ওপরের আকাশ যেন থরথর করে কেঁপে উঠছে। যেন মাটির অতল থেকে উঠে আসা শব্দের ঢেউগুলো গুরুগম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে আছড়ে পড়ছে গুমোট বাতাসে।

লোহা কাঠ পাথর, শানবাঁধানো মেঝে, জাহাজ আর লোকজন সবকিছুই যেন জলদেবতার বন্দনারত আবেগময় সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। অথচ সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, মানুষ, যারা এইসব শব্দের স্রষ্টা, কল-তানের মধ্যে থেকে তাদের কণ্ঠস্বরই খুব অস্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এত অস্পষ্ট যে ভাবতেও হাসি পায়, মায়া হয়। বোঝার ভারে নুয়ে পড়া নোংরা, জীর্ণ চেহারা। শব্দ, ধুলো আর গরমের মধ্যে ব্যস্ত পায়ে ওরা ছুটছে। বিরাট বিরাট যন্ত্রদানব, মালপত্রের পাহাড়, বজ্র-নিনাদিত মালগাড়ি—যা তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে, অথচ তাদের তুলনায় মানুষ কত তুচ্ছ, অসহায়! যেন তাদেরই সৃষ্টি আজ বেঁধে রেখেছে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে, ছিনিয়ে নিয়েছে যা-কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

দৈত্যের মতো অতিকায় জাহাজগুলো বাঁশির শব্দে বাষ্প ছাড়ছে। যেন

তারা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। আর ডকের ওপর ধুলো-মলিন যেসব মানুষগুলো চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, অক্লান্ত পরিশ্রমে ভরিয়ে তুলছে জাহাজের বিরাট খোল, তাদের যেন বিদ্রূপ করছে। দেখে সত্যিই হাসি আসে, কান্নাও পায়। সারি সারি খালাসিরা হাজার হাজার মন রুটির বোঝা পিঠে করে নিয়ে জাহাজের লৌহ-উদর ভর্তি করছে শুধু নিজেদের উদর পূর্তি করার জন্যে কয়েক পাউণ্ড রুটি পাবে বলে। নিদারুণ পরিশ্রমে ঘামে-ভেজা মানুষগুলো যখন ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন, মানুষেরই হাতে তৈরি বিরাট বিরাট যন্ত্রগুলো তখন সূর্যস্নাত উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে। এইসব যন্ত্রের কলকব্জা সচল হয়েছে মানুষেরই রক্ত, ঘাম আর বলিষ্ঠ পেশীর জোরে। সত্যিই, এই বৈপরীত্য যেন নিষ্ঠুর পরিহাসের এক মহাকাব্য!

আর্ত কোলাহল যেন চেপে বসে বুকের পরে, ধুলো ঢোকে নাকে, ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি। দারুণ তাপে ঝলসে যায় সর্বাঙ্গ, যেন ভয়ঙ্কর বিপর্যয় কিংবা প্রলয়ে ফেটে চৌচির হয়ে পড়তে চাইছে সবকিছু। তারপর এই মহাপ্রলয়ের শেষ বাতাস নির্মল হবে, সহজ স্বচ্ছন্দে মানুষ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবে। পৃথিবীতে নামবে শান্তি, নৈঃশব্দ। যা মানুষের মনকে বিষণ্ণ, উত্ত্যক্ত করে তোলে, তখন আর থাকবে না সেই ধূলিকণা আর প্রচণ্ড কোলাহল। সমুদ্র, শহর আর লোকালয়ের আকাশ বাতাস জুড়ে নামবে স্বচ্ছ স্নিগ্ধ নিবিড় একটা প্রশান্তি।

এক

ঢং ঢং করে বারোটার ঘন্টা পড়লো। শেষ ঘন্টাধ্বনি কেঁপে কেঁপে বাতাসে হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থিতিয়ে এলো কুলিকামিনদের বর্বর ঐকতান। মিনিট খানেক পরে তা রূপান্তরিত হলো চাপা মর্মরধ্বনিতে। এখন মানুষের কণ্ঠস্বর আর সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস আলাদা আলাদা স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে। এটা ওদের খাওয়ার সময়।

খালাসিরা কাজ বন্ধ করে দলে দলে ডকের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে গোলমাল করছে, ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে নানারকমের খাবার কিনে শানবাঁধানো প্রাঙ্গণে কোণগুলোর ছায়ায় বসে খেতে শুরু করে দিয়েছে। এমন সময় গ্রিশকা চেলকাশ সেখানে এসে হাজির হলো। লোকটা পুরনো ঘাগী,

ডকের লোকজনদের কাছে সে পাঁড় মাতাল আর দুঃসাহসী পাকা চোর বলে সুপরিচিত। খালি পা, মাথায় টুপি নেই, পরনে জীর্ণ মোটা সুতির পায়জামা, গায়ে ময়লা ছেঁড়া সার্ট। তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কণ্ঠার হাড়-বার-করা চওড়া বাদামি বুক। এলোমেলো ধূসর-তামাটে চুল, থমথমে ভয়ঙ্কর মুখ, বাজের মতো তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। দেখলেই মনে হবে যেন এইমাত্র ও ঘুম থেকে উঠে এলো। খড়ের কুটো আটকে রয়েছে গোঁফে, বাঁ গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। কানের পেছনে গোঁজা রয়েছে বাতাবিলেবুর ছোট একটা পল্লব। হাড়-বার-করা লম্বা-চওড়া চেহারা, সামান্য ঝুঁকে হাঁটে। চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে বঁড়শির মতো বাঁকানো নাক ঘুরিয়ে ডক-মজুরদের মধ্যে কি যেন খোঁজে। সে সময় বেড়ালের গোঁফের মতো কাঁপে তার দীঘল কালো গোঁফের প্রান্তদুটো, আর পেছনে রাখা দু হাতের বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলো আপনা থেকেই মুঠো হয়ে যায়। এমনকি এখানেও ওর মতো অজস্র ভবঘুরে রয়েছে, কিন্তু ওর উপস্থিতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলের আগে। কেননা অনশনক্লিষ্ট তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, ওর অস্বাভাবিক সতর্ক চলা-ফেরার সঙ্গে তেপান্তরের শকুনদের আশ্চর্য একটা মিল রয়েছে, যেন এখনই ও শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাইরে থেকে দেখতে সহজ সরল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও শিকারী বাজেরই মতো সতর্ক, নিপুণ।

কয়লার ঝুড়ির আড়ালে বিশ্রামরত একদল খালাসির সামনে সে দাঁড়াতেই মুখে কালিঝুলি-মাখা গাট্টাগোট্টা চেহারার একজন তরুণ ওর দিকে এগিয়ে এলো। ঘাড়ে কালশিরে পড়া দাগগুলো দেখলে বোঝা যায় সম্প্রতি ও দারুণ মার খেয়েছে। চেলকাশের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ও চাপা গলায় বললো, 'ডক-কর্মচারীরা হারানো দু গাঁট কাপড়ের খবর জানতে পেরেছে। ওরা এখন চারদিকে খোঁজ করছে।'

চেলকাশ ছেলেটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শান্তস্বরে বললো, 'তাতে আমার কি?'

'ওরা খুঁজছে, তাই শুধু তোমাকে বললুম।'

'তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো খোঁজাখুঁজির কাজে আমিও ওদের সঙ্গে হাত লাগাবো?'

'জাহান্নমে যাও।' ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ালো।

'আরে শোন শোন। তারপর, দোকানের বিজ্ঞাপনের মতো তোমার

চেহারার এই দশা কে করলো ? একি, হাঁটা দিলে কেন ? মিশকাকে দেখেছো নাকি ?'

সঙ্গীদের দিকে ফিরে যেতে যেতে ও চেঁচিয়ে বললো, 'না, অনেকক্ষণ ওকে দেখিনি।'

চেলকাশের সঙ্গে যাদেরই দেখা হলো, সবাই ওকে পুরনো বন্ধুর মতো সম্ভাষণ জানালো। সাধারণত ও খুব স্ফূর্তিবাজ আর রসিক। কিন্তু আজ ওর মেজাজটা খিঁচড়ে রয়েছে। তাই সবাইকে ও অল্প কথায় কাটা কাটা জবাব দিচ্ছে।

হঠাৎ স্তূপাকার মালপত্রের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো শুল্ক-বিভাগের একজন প্রহরী। গায়ে গাঢ়-সবুজ উর্দি, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর। তবু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বেশ ঋজু। রুক্ষমূর্তিতে ও চেলকাশের পথ আগলে দাঁড়ালো। বাঁ হাত দিয়ে ধরে আছে কুক্‌রির উঁচু হাতল, ডান হাত দিয়ে চেলকাশের জামার কলারটা চেপে ধরার চেষ্টা করছে।

'এই, এদিকে কোথায় যাচ্ছো ?'

চেলকাশ এক পা পেছিয়ে এলো। প্রহরীর রোদে পোড়া লাল মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো।

জোড়া-ভ্রূ উঁচিয়ে, চোখ পাকিয়ে প্রহরী তার গোলগাল মুখখানায় রুক্ষতার ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। 'তোমাকে কতবার বলেছি না ডকের এদিকটায় কখনও আসবে না, এলে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো। তবু এসেছো !' লোকটা গর্জন করে উঠলো।

চেলকাশ তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত স্বরে বললো, 'অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, সেমিওনিচ। তারপর, কেমন আছো বলো ?'

'তোমার সঙ্গে আরও পঞ্চাশ বছর দেখাসাক্ষাৎ না হলে কান্নাকাটিও করবো না। এখন সোজা এখান থেকে কেটে পড়ো।'

মুখে বললেও চেলকাশের প্রসারিত হাতখানা ও না ধরে পারলো না।

'আমি শুধু একটা খবর জানতে এসেছি, সেমিওনিচ,' প্রহরীর একটা হাত শক্ত মুঠোয় ধরে আন্তরিক ভঙ্গিতে নাড়া দিতে দিতে বললো। 'মিশকাকে কোথাও দেখেছো ?'

'মিশকা ! কে মিশকা ? কোন মিশকাকেই আমি চিনি না। সরে পড়ো

দোস্ত। নইলে মালখানার অন্য প্রহরীরা তোমাকে দেখে ফেলবে, আর তখন…'

'মিশকাকে চিনলে না? সেই যে লাল-চুল লোকটা, গতবারে যার সঙ্গে আমি কাস্ত্রোনায় কাজ করেছিলুম।' চেলকাশ ওকে পটাবার চেষ্টা করলো।

'বরং বলো যার সঙ্গে তুমি চুরি করেছো। তোমার মিশকাকে ওরা লোহার রড দিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছে। ও এখন হাসপাতালে আছে। ভদ্রভাবেই বলছি, এবার সোজা কাটো, নইলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে বাধ্য হবো।'

'এই তো কথার মতো কথা। আর এতক্ষণ বলছিলে কিনা মিশকাকে তুমি চেনোই না। মিছিমিছি এত চটার কি আছে, সেমিওনিচ?'

'আর একটাও কথা নয়। সোজা এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

প্রহরী ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, এদিক ওদিক তাকিয়ে চেষ্টা করলো চেলকাশের বজ্রমুঠি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। চেলকাশ কিন্তু তার ঘন ভ্রূর নিচে থেকে শান্তভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলে চললো, 'এত তাড়া কিসের, ইয়ার? দাঁড়াও, আগে আমার কথাগুলো শেষ করে নিই। তারপর, কেমন আছো? তোমার বউ ছেলেপুলের খবর কি? ভালো তো?' কটাক্ষে কুঁচকে গেলো ওর ভ্রূদুটো, বিদ্রূপে ঝলসে উঠলো সাদা দাঁত। 'অনেক দিন থেকেই তোমার বাড়িতে যাবো যাবো ভাবছিলুম, কিন্তু ঠিক সময় করে উঠতে পারছিলুম না। বুঝতেই পারছো, সব সময় এত মদ গিললে…'

'থামো থামো, পাঁড় মাতাল কোথাকার! সব সময় ঠাট্টা ইয়ারকি ভালো লাগে না, বুঝলে? তারপর এখন কি করছো, বাড়ি-বাড়ি চুরি, না ছিনতাই?'

'কেন, তার আর দরকার কি? এখানেই যা মালপত্তর রয়েছে, তোমার আমার সারা জীবন চলে যাবে। তাই কি না বলো? কিন্তু একটু সমঝে চোলো, সেমিওনিচ। আমি শুনেছি কাপড়ের দুটো গাঁট তুমি এখান থেকে সরিয়েছো। দেখো, কোন্‌দিন যেন আবার ধরা না পড়ে যাও!'

প্রচণ্ড রাগে সেমিওনিচ কেঁপে উঠলো এবং কিছু বলতে গিয়ে কেবল থুতুই ছেটালো। চেলকাশ এবার ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ডক-ফটকের দিকে এগিয়ে গেলো। প্রহরী তখনও ওর পিছনে চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে।

চেলকাশের ফুর্তি এখন বেড়ে গেছে। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সরিফ

মেজাজে শিস দিতে দিতে ও এগিয়ে চললো। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপগুলো ছুঁড়ে দিলো ডাইনে-বাঁয়ে। বলা বাহুল্য যথাযোগ্য উত্তরগুলোও ফিরে পেতে তার এতটুকু দেরি হলো না।

খাওয়াদাওয়ার পর মেঝেতে শুয়ে বিশ্রামরত অন্যান্য খালাসিদের মধ্যে থেকে কে যেন বললো- 'কি হে গ্রিশকা, কর্তারা তো তোমার ওপর বেশ ভালোই নজর রেখেছে বলে মনে হচ্ছে?'

'সে কথা আর বলতে,' চেলকাশ জবাব দিলো। 'আমার খালি পায়ের ওপর সেমিওনিচের ভারি কড়া নজর, পাছে আমার পায়ে কোন কাঁটা ফোটে।'

ফটকের কাছে এসে পৌঁছতে দুজন সৈনিক চেলকাশের দেহ খানাতল্লাস করলো, তারপর ওকে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে ফটকটা বন্ধ করে দিলো।

রাস্তা পেরিয়ে চেলকাশ সরাইখানার উলটো দিকে পাথরের একটা স্তম্ভের ওপর গিয়ে বসলো। একসারি মাল-বোঝাই গাড়ি প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেলো ফটক দিয়ে, একসারি খালি গাড়ি ঢুকলো অন্যদিক দিয়ে। সারা ডক আবার ক্রুদ্ধ কোলাহল আর ধুলোর মেঘে ভরে উঠলো।

অর্ধনিমীলিত চোখে চেলকাশ মনে মনে কল্পনা করে নিলো আজ রাতে লাভের অঙ্কটা। সামান্য একটু পরিশ্রম আর যথেষ্ট নিপুণতা—তাহলেই বাজিমাত! যথেষ্ট নিপুণতার ওপর সন্দেহ তার কোনকালেই ছিলো না। তাই পরের দিন ভোরে কর্‌করে নোটগুলোতে কিভাবে ফুর্তি করবে, সে কথা ভেবে নিতেও ওর কোন অসুবিধে হলো না। শুধু ওর সঙ্গী মিশকার অভাবটাই যা ওকে একটু বিব্রত করে তুললো। ঠিক এই সময়ে পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে না থাকলে ও অনেক কাজে আসতো। চেলকাশ মনে মনে নিজেকেই অভিসম্পাত দিলো, কেননা মিশকা ছাড়া একা সবদিক সামলানো মুশকিল। তাছাড়া রাত্তিরে আবহাওয়া কেমন থাকবে কে জানে! একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে চেলকাশ আবার পথের ওপর দৃষ্টি নামিয়ে নিলো।

ওর থেকে অল্প কয়েক হাত দূরে স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে শানবাঁধানো পাথরে পা ছড়িয়ে বসেছিলো একজন তরুণ। পরনে ঘরে-বোনা নীল সুতোর সার্ট আর পায়জামা, পায়ে বাকলের চটি, মাথায় ছেঁড়া বাদামী রঙের টুপি। পাশে পড়ে রয়েছে ছোট একটা থলে আর হাতলবিহীন কাস্তে। কাস্তের বাঁটটা খড় জড়িয়ে সুতো দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। ছেলেটার চওড়া কাঁধ, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, একমাথা সুন্দর সোনালী চুল, রোদে-পোড়া লালচে

মুখ। বড় বড় নীল চোখের দৃষ্টি মেলে ও চেলকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে।

দাঁত বার করে, জিব ভেঙিয়ে, বিকট ভঙ্গিতে চেলকাশ চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো।

ছেলেটা প্রথমে বিমূঢ় বিস্ময়ে দু-একবার চোখ মিটমিট করলো, তারপর হো হো করে হেসে উঠলো। 'বাঃ, তুমি তো ভারি মজার লোক দেখছি!' সোজা হয়ে বসে পায়জামার পায়াদুটো গোটাতে গোটাতে বললো, 'মৌজে আছো বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া, ঠিক বলেছিস্।' মুহূর্তের মধ্যে চেলকাশের শিশুর মতো স্বচ্ছ চোখদুটো আনন্দে নেচে উঠলো। 'তারপর ঘাস নিড়োতে বেরিয়েচিস্ বুঝি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, কাজ কোথায়! আকাল অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকজন এসে ভিড় করেছে সব জায়গায়। কাজ যাওবা পাওয়া যায়, এত অল্প পয়সা দেয়, সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। কুবানে এখন ষাট কোপেক মজুরী, ভাবো একবার! অথচ কয়েক বছর আগেও ছিলো তিন চার, এমন কি পাঁচ রুবল পর্যন্ত।'

'কয়েক বছর আগে? থু!' চেলকাশ উপেক্ষার ভঙ্গিতে থুতু ফেললো। 'ঘাস নিড়োনো তো দূরের কথা, কয়েক বছর আগে কোন রুশকে দেখা মাত্রই ওরা তিন রুবল দিয়ে দিতো। দশ বছর তো আমি এই করে করেই জীবনধারণ করেছি। অথচ আমি এসেছিলুম এক কশাক গ্রাম থেকে, আর এখানে আমি তখন পুরোদস্তুর একজন ভদ্র রুশ নাগরিক। সবাই তখন আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াতো, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকতো, অবাক বিস্ময়ে গা ছুঁয়ে দেখতো, তারপর হাসতে হাসতে আমার হাতে তিনটে রুবল গুঁজে দিতো। এ ছাড়া খাবার দিতো, পানীয় দিতো, যতদিন খুশি থাকার জন্যে অনুরোধ করতো।'

প্রথমে ছেলেটা চেলকাশের কথাগুলো হাঁ করে গিলছিলো, বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিলো আয়ত চোখের মণিদুটো। কিন্তু যখনই বুঝতে পারলো চেলকাশ গুল দিচ্ছে, তখনই ওর হাঁটা বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো। চেলকাশ গোঁফের আড়ালে হাসি চেপে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'বাঃ, বেশ মজার লোক তো তুমি! এমনভাবে কথাগুলো বললে, আমি তো ভেবেছিলুম বুঝি সত্যিই। কিন্তু বিশ্বাস করো, কয়েক বছর আগেও...'

'আমি কি একবারও অস্বীকার করেছি? কয়েক বছর আগেও...'

'থামলে কেন? বলো, বলে যাও। না, তার আগে বলো, তুমি কি? দর্জি, মুচি, না আর অন্য কিছু?'

'আমি?' মুহূর্তের জন্যে থেমে চেলকাশ কি যেন ভাবলো। 'আমি একজন জেলে।'

'আয়িব্বাশ! জে-লে! তুমি মাছ ধরো বুঝি?'

'শুধু মাছ কেন? এখানকার জেলেরা শুধু মাছই ধরে না—জলে ডোবা লোক, পুরনো নোঙর, ডুবে-যাওয়া নৌকো, সবই ধরে। এসবের জন্যে আলাদা বঁড়শি আছে, বুঝলি?'

'ফের গুল দিচ্ছো। তুমি যে দেখছি সেইসব জেলেদেরই একজন, যারা গায়:

আমরা জাল ফেলি
শুকনো বালিয়াড়ির বুকে,
গুদমের আনাচে কানাচে
গৃহস্থের খোলা দরজার সম্মুকে।'

ছেলেটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চেলকাশ বিদ্রূপ করলো, 'কেন, এরকম কোন জেলের সঙ্গে তোর কখনও দেখা হয়েছে নাকি?'

'না, দেখিনি। তবে শুনেচি।'

'ওদের তোর কেমন লাগে?'

'কেন, খারাপ কি? আর কিছু না হোক অন্তত স্বাধীন। যা খুশি তাই করতে পারে।'

'স্বাধীনতার জন্যে খুব লালায়িত হয়ে উঠেচিস বলে মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই, স্বাধীনতার জন্যে লালায়িত সব্বাই। নিজেই নিজের মনিব হও, যেখানে খুশি যাও, যা ইচ্ছে করো—এই স্বাধীনতা কে না চায়? তবে হ্যাঁ, যেখানেই যাও না কেন চোখ কান খোলা রাখতে হবে, যাতে কোন ঝক্কি না তোমার কাঁধে এসে পড়ে। তারপর যত খুশি ভোগ করো আর ঈশ্বরের কথা স্মরণ রাখো, ব্যাস, ঝামেলা মিটে গ্যালো।'

চেলকাশ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে থুতু ফেললো।

'অথচ আমার কিছুই করার নেই।' ছেলেটি আপন মনেই বলে চললো। 'সঞ্চিত কিছু না রেখেই বাবা মরে গ্যালো। মা বুড়ি। সামান্য জমিজমা যাওবা ছিলো আকালে শুকিয়ে গ্যালো। আমি আর কি করতে পারতুম বলো? তবু আমাকে তো বাঁচতে হবে। হয়তো বড়লোকের কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারতুম, যদি মেয়ের নামে আলাদা কোন অংশ লিখে ছায়। কিন্তু আমি জানি, কিপটে বুড়োটা তার মেয়েকে একটা ছিটেফোঁটাও দেবে না। ফলে সারা জীবন গোলামি ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। তাও যদি একশো কি দেড়শো রুবল রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতুম, বুড়োটাকে না হয় বলতে পারতুম, 'মার্ফাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান? চান না? ভারি বয়েই গ্যালো। ও ছাড়া গ্রামে আরও অনেক মেয়ে আছে।' ছেলেটা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'কিন্তু তা আর হলো না। ভেবেছিলুম কুবান থেকে শ দুয়েক রুবল রোজগার করে আবার ফিরে আসবো, ভদ্রলোক হবো। সে আশা আর মিটলো না। সারা জীবন কেবল গোলামিই করে কাটবে, নিজের বলতে আর কিছুই হবে না।'

চেলকাশ দেখলো নিঃশব্দ যন্ত্রণায় ম্লান হয়ে উঠেছে ছেলেটার সারা মুখ।

'এখন কোথায় যাবি ঠিক করেছিস?'

'বাড়িতে। এ ছাড়া আর কোথায়ই বা যাবো, বলো?'

'সেটা বলা মুশকিল। ইচ্ছে করলে তুরস্কেও চলে যেতে পারিস।'

'তু-র-স্কে!' বিস্ময়ে ছেলেটির ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে উঠলো। 'কোন সৎ খৃষ্টান সেখানে যায় নাকি? ভালো একটা বললে যা হোক!'

'মাথামোটা গর্দভ আর কাকে বলে।' চাপা অসন্তোষে বিড়বিড় করে চেলকাশ ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলো। তবু সহজ সরল এই গ্রাম্য ছেলেটা তার মনে কেমন যেন একটা অনুভূতির ভাব জাগিয়ে তুলেছে, যা তার নৈশ-অভিযানের পরিকল্পনাকে বারবার কেবল ব্যাহতই করছিলো।

আর ছেলেটি অভিমান-বিক্ষুব্ধ আহত চোখে ভ্রূ কুঁচকে চেলকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। নিঃসন্দেহে উগ্রস্বভাবের তস্কর এই ভবঘুরেটার সঙ্গে তার কথাবার্তা এত দ্রুত এমন অপমানজনকভাবে শেষ হয়ে যাবে ও আশাই করেনি। ভবঘুরে কিন্তু তার দিকে আর ফিরেও তাকালো না। ওর মন এখন অন্যদিকে। পাথরের স্তম্ভে বসে গোড়ালি দিয়ে তাল ঠুকে ঠুকে ও এখন আপন মনে শিস দিচ্ছে।

ছেলেটার ইচ্ছে হলো এর প্রতিশোধ নেবে।

'এই যে, ও জেলে ভাই, তুমি কি প্রায়ই জাল ফ্যালো নাকি?'

'হ্যাঁ রে, বিচ্ছু।' ক্ষীণ একটা আশায় চেলকাশ আবার ওর দিকে ঘুরে বসলো। 'আজ রাতে যাবি নাকি আমার সঙ্গে? ছাখ্‌, ভালো করে ভেবে ছাখ্‌।'

ছেলেটা অবিশ্বাসের সুরে জিগেস করলো, 'কি করতে হবে?'

'কি করতে হবে! যা তোকে করতে বলবো। আমরা নৌকো করে মাছ ধরতে যাবো, তুই দাঁড় টানবি।'

'বেশ, তাই হবে। ছাখো, কাজ করতে আমি ভয় পাই না। শুধু কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না, এই যা। গভীর জলের মাছ, তোমাকে তো বোঝা দুষ্কর বলে মনে হচ্ছে।'

চেলকাশ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত স্বরে বললো, 'তোর যাই মনে হোক না কেন, যা বুঝবি না তা নিয়ে কখনও টুঁ-শব্দ করবি না। নইলে এক চড়ে তোর মুণ্ডু আমি ঘুরিয়ে দেবো।'

'তাই নাকি!'

চকিতে চেলকাশ লাফিয়ে উঠলো। চোখদুটো বাঘের মতো জ্বলছে। বাঁ হাতে গোঁফ চুমরে, ডান হাতে ঘুষি পাকিয়ে ও তেড়ে এলো। ছেলেটা ভয়ে আঁতকে উঠলো। চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে ও-ও উঠে দাঁড়ালো। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ কঠিন চোখে পরস্পরকে জরিপ করে দেখলো।

'কি রে, লড়বি নাকি?' রুক্ষস্বরে চেলকাশ বললো। পুঁচকে একটা ছোঁড়ার তুচ্ছ অবজ্ঞায় ভেতরে ভেতরে ও তখন ফুলছে। সাহস তো কম নয়! আর তখনই কেমন যেন একটা ঘৃণায় সারা বুক ওর ভরে উঠলো। কেননা ছেলেটার স্বচ্ছ নীল দুটো চোখ, রোদে পোড়া তামাটে মুখ, নিটোল স্বাস্থ্য, দীঘল বলিষ্ঠ দুটো বাহু—সুদূর কোন পল্লীগ্রামে নিজেদের বাড়ি আছে, সম্পন্ন কোন চাষী তাকে জামাই করতে চায়, যেহেতু সে তার অতীতকে ঘৃণা করে, ভবিষ্যতে সুন্দর করে বাঁচতে চায়; চেলকাশের হাঁটুর বয়েসীও নয়, তবু স্বাধীনতার জন্যে লালায়িত। কেউ—যাকে তুমি নিজের চাইতে ছোট মনে করো, তার ভালোমন্দ বা রুচিজ্ঞান যদি তোমার সমকক্ষ হয়, স্বভাবতই তার প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা খারাপ-লাগা কাজ করে।

চোখের দৃষ্টিতে ছেলেটা মনে মনে চেলকাশকে তার মনিব বলে স্বীকার করে নিলো। 'লড়াই? না, মানে···তার আর দরকার কি? তাছাড়া, সত্যি বলতে কি, আমি তো কাজই খুঁজছি। সে তুমি বা অন্য কেউ, যার কাছেই হোক না কেন। আমি শুধু বলছিলুম তোমাকে তো ঠিক মজুরের মতো দেখতে নয়। কেমন যেন একটু···অবশ্য অনেককেই তেমন মনে হতে পারে। ভাবছো, তোমার মতো পাঁড় মাতাল আমি দেখিনি? ঢের দেখেছি। তোমার চাইতেও আরও পাঁড় মাতাল আমি দেখেছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আগের চাইতে অনেক কোমল স্বরে চেলকাশ বললো, 'তাহলে তুই রাজি তো?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কত দেবে?'

'সেটা কাজের ওপর নির্ভর করছে। কোথায় কতটা ধরতে পারবো, সে কি আর আগেভাগে বলা যায়? বলা যায় না, হয়তো পাঁচ রুবলও পেয়ে যেতে পারিস।'

'কিন্তু কত পাবো, সেটা আগেই পাকাপাকি···'

'তর্ক না করে, একটু সবুর করেই ছাখ্ না। চল্, এখন পানশালায় গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক।'

রাস্তা দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চললো। মনিবের মতো ভারিক্কি চালে চেলকাশ গোঁফে তা দিতে দিতে চলেছে আর ছেলেটা আশঙ্কা, দ্বিধা সত্ত্বেও যেন এখনই কাজে লেগে পড়তে প্রস্তুত।

'ও, ভালো কথা, তোর নামটা কি রে?'

'গেভ্রিলা।'

ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার নোংরা পানশালার ভেতরে প্রবেশ করে চেলকাশ প্রতিদিনকার পরিচিত খদ্দেরের মতো এক বোতল ভদ্‌কা, বাঁধাকপির সুরুয়া, মাংসের কাবাব আর চায়ের হুকুম দিলো। ওঁছা দেখতে হলে কি হবে, এখানে তার মনিবের পরিচিতির বহর দেখে গেভ্রিলার মন সম্ভ্রমে ভরে উঠলো।

'এখানে একটু বোস্, আমি দু-এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি। তারপর দুজনে বসে খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

চেলকাশ বেরিয়ে গেলো। গেভ্রিলা চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। পানশালাটা মাটির নিচের তলায়। যেমন অন্ধকার, তেমনি স্যাঁতসেঁতে।

ভদ্‌কা, তামাক, ধোঁয়া, আলকাতরা, আরও কিসের যেন উগ্র গন্ধে সারা ঘর ভরে রয়েছে। সারা গায়ে কয়লার গুঁড়ো আর আলকাতরা মাখা, লালচে দাড়ি, নাবিকের পোশাকপরা একজন মাতাল গেভ্রিলার উলটো দিকের টেবিলে বসে রয়েছে। প্রতিমুহূর্তে হেঁচকি তোলার ফাঁকে ফাঁকে ও স্খলিত স্বরে গুনগুন করে গান গাইছে। নিঃসন্দেহে লোকটা রুশ নয়।

ওর ঠিক পেছনে বসে রয়েছে দুজন কৃষ্ণাঙ্গী মোল্ডাভিয়ান কামিনা। কালো চুল, ছেঁড়া ঘাঘরা, মাতালের মতো স্খলিত স্বরে ওরাও গান গাইছে।

অস্পষ্ট আঁধারে অন্য ছায়াগুলো নড়ছে। সবাই অবিন্যস্ত, মাতাল। হৈ-হল্লা, চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

গেভ্রিলা ভয়ে কাঠ হয়ে রইলো। ইস্‌, এখন যদি ওর মনিব ফিরে আসতে পারতো! দেখতে দেখতে ওদের মিলিত চিৎকার ক্রুদ্ধ পশুর গলিত তর্জনের মতো তীব্র হয়ে উঠলো, কিন্তু পাথরের গুহা ছেড়ে সে-চিৎকার বাইরে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেলো না। অসহ্য চিৎকারে গেভ্রিলার গা ঘুলিয়ে উঠছে-মাথা ঝিমঝিম করছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি।

শেষ পর্যন্ত চেলকাশ ফিরে এলো। দুজনে খেতে খেতে গল্পগুজব করলো। তৃতীয় গেলাস ভদ্‌কা শেষ করার পর থেকে গেভ্রিলা মাতাল হয়ে উঠলো। নিজেকে এখন ওর দারুণ সরিফ মনে হচ্ছে। এমন সুন্দর সুন্দর সব খাবার-দাবার দিয়ে যে তাকে আপ্যায়ন জানালো, তাকে কিছু ভালো ভালো কথা শোনাবার জন্যে গেভ্রিলা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। কিন্তু গলা-পর্যন্ত-উঠে-আসা শব্দগুলো হঠাৎ কেন জানি ভারি-হয়ে-জড়িয়ে-যাওয়া জিভ দিয়ে আর কিছুতেই বেরুতে চাইলো না।

চেলকাশ ওর দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে হাসলো।

'কিরে ছোঁড়া, এক্কেবারে পাঁচ চুমুকেই গলে গেলি! তাহলে রাত্তিরে কাজ করবি কি করে?'

'ভয় নেই, ওস্তাদ!' গেভ্রিলা জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, 'সে আমি তোমাকে দেখিয়ে ছাড়বো। তার আগে দাও দিকি, তোমাকে একটা চুমু খাই।'

'তা অবশ্য মন্দ নয়। নে, আর এক পাত্তর টান্‌।'

গেভ্রিলা টেনেই চললো। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছলো যখন তার চোখের সামনে মনে হলো সবকিছু যেন ঘুরছে, ছন্দিল তরঙ্গের

তালে তালে উঠছে নামছে। অবস্থাটা নিঃসন্দেহে সুখকর নয়, ও বরং অসুস্থই বোধ করতে লাগলো। সারা মুখে ফুটে উঠেছে নির্বোধ বিষণ্ণতার একটা অভিব্যক্তি। যখনই কিছু বলার চেষ্টা করছে, দু ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে চাপা গোঙানির মতো অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে। গোঁফে তা দিতে দিতে চেলকাশ নির্নিমেষ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ম্লান ঠোঁটে হাসলো। তার মন পড়ে রয়েছে এখন অন্য দিকে।

প্রতিদিনকার মতো সারা পানশালা তখন মাতালের উন্মত্ত কোলাহলে ভরে উঠেছে। লালচে-চুল সেই নাবিকটা ইতিমধ্যে দু হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চেলকাশ উঠে পড়লো। 'চল্, এবার যাওয়া যাক।'

গেভ্রিলা ওকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলো, পারলো না। যাচ্ছেতাই একটা গালাগালি দিয়ে মাতালের মতো হো হো করে হেসে উঠলো।

'কি রে, একেবারে নেতিয়ে গেছিস!' গজগজ করতে করতে চেলকাশ আবার বসে পড়লো।

ঝাপসা চোখে মনিবের দিকে তাকিয়ে গেভ্রিলা তখনও হো হো করে হাসছে। আর চেলকাশ ওর দিকে স্থির সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে ভাবলো ছেলেটার ভাগ্য এখন আমার হাতের হিংস্র থাবার মধ্যে। চেলকাশের মনে হলো ওকে নিয়ে সে এখন যা-খুশি তাই করতে পারে। ইচ্ছে করলে ছেঁড়া তাসের মতো ওকে তুচ্ছ ছুঁড়ে ফেলতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে চাষীর শান্ত জীবনে ওকে ফিরে যেতে সাহায্য করতে পারে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে চেলকাশ সচেতন হয়ে উঠলো। জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতার যে পেয়ালা একদিন ও প্রাণভরে পান করেছে, এই গ্রাম্য যুবকটিকে তা আর কখনও পান করতে হবে না। ছেলেটার প্রতি তার ঈর্ষা, আবার করুণাও হলো। কেননা তার চাইতে আরও খারাপ অন্য অনেকেরই হাতে ছেলেটা গিয়ে পড়তে পারে একথা মনে হতেই সে চিন্তিত হয়ে উঠলো। সব অনুভূতি-গুলো একত্রে মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ভাবই চেলকাশের মনে উদয় হলো— পিতার মতো অভিভাবকত্ববোধ। ছেলেটার জন্যে তার দুঃখ হলো, মনে হলো ওকে তার প্রয়োজন। তাই গেভ্রিলার বগল ধরে চেলকাশ ওকে টেনে তুললো। হাঁটুর সামান্য ধাক্কা দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে এলো পানশালার উঠোনে। তারপর কাঠের বড়ো একটা গাদার ছায়ায় ওকে শুইয়ে দিয়ে তার

পাশে বসে ধূমপান করতে শুরু করলো। গেভ্রিলা দু-একবার ছটফট করতে করতে বিড়বিড় করে কি যেন বললো, তারপর গভীর ঘুমিয়ে পড়লো।

দুই

'কি রে, এখনও তোর হলো না?' চেলকাশ ফিসফিস করে জিগেস করলো।

'আর একটু বাকি।' গেভ্রিলা তখন দাঁড়দুটো নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। 'দাঁড়ের খিলটা বড্ড নড়বড় করছে। একটু ঠুকে দিই, কি বলো?'

'উঁহু! কোন শব্দ নয়। হাত দিয়ে চেপে দে, দেখবি ঠিক বসে গ্যাছে।'

সাইপ্রাস, তাল, চন্দন কাঠের বড় বড় গুঁড়ি বোঝাই নোঙরে বাঁধা সারি সারি নৌকো, তুর্কি বাণিজ্য-পোতগুলোর মধ্যে থেকে ওরা দুজনে নিঃশব্দে একটা ছোট নৌকোকে বার করে আনলো।

অন্ধকার রাত। একটাও তারা নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ঘন স্তরগুলো ভেসে চলেছে আকাশে। শান্ত, নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। তেলের মতো গাঢ় আর কৃষ্ণবর্ণ। সোঁদা সোঁদা লবণাক্ত গন্ধ উঠছে। সমুদ্রবেলা আর জাহাজের দু পাশে ধাক্কা খেয়ে ছোট ছোট ঢেউগুলো চেলকাশদের নৌকোকে মৃদু দোলাচ্ছে। তীর থেকে খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে বড় বড় মাস্তুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজের কালো কালো ছায়াগুলো। মাস্তুলের মাথায় নানা রঙের আলো। কালো মখমলের মতো মসৃণ সমুদ্রের বুকে সে-আলোর রেখা প্রতিবিম্বিত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে এক অপরূপ সৌন্দর্য। দিনের কঠিন কঠোর শ্রমের শেষে শ্রমিকের নিঃশব্দ গাঢ় ঘুমের মতো সমুদ্র এখন ঘুমচ্ছে।

একটা দাঁড় জলের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গেভ্রিলা বললো, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

'চল্।'

চেলকাশ সজোরে দাঁড় ঘুরিয়ে দুটো বজরার মধ্যে থেকে ওদের নৌকো-টাকে সন্তর্পণে বাইরে বার করে আনলো, তারপর তরতর করে বয়ে চললো জলের ওপর দিয়ে। দাঁড়ের আঘাতে ছিটকে ছিটকে উঠলো নীলাভ ফসফরাস।

'কি রে, মাথার যন্ত্রণা তোর এখন কেমন আছে?'

'খু-উ-ব! যেন সীসের মতো ভারি হয়ে রয়েছে। একটু জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবো?'

'তাতে আর কি লাভ হবে? বরং এটা দিয়ে মাথার ভেতরটা ধুয়ে সাফ করে ফ্যাল্, দেখবি সব ব্যথা সেরে গ্যাছে।' চেলকাশ একটা বোতল বের করে গেভ্রিলার দিকে এগিয়ে দিলো। 'নে, ধর্।'

'ধন্যবাদ।'

গেভ্রিলা ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা তরল পানীয় গলায় ঢেলে দিলো।

চেলকাশ ওকে বাধা দিলো। 'থাক, থাক। ওতেই হবে।'

আর একবার অন্যান্য জাহাজের মধ্যে দিয়ে পথ করে নৌকোটাকে নিঃশব্দ অথচ ক্ষিপ্রগতিতে টেনে বের করে আনতেই দেখা গেলো সামনে সীমাহীন উন্মুক্ত সমুদ্র গাঢ়-নীল দিগন্তরেখার সঙ্গে ঢালু হয়ে মিশে গেছে তার বিপুল জলরাশি, যার বুক থেকে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে ঝোড়ো মেঘ। মেঘের কোলে থমথম করছে সমুদ্র-নীল, ধূসর, গাঢ়-সবুজ, সোনালী, নানা রঙের আভা। আকাশে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে মেঘগুলো। কখনও একটা মেঘ আর-একটা মেঘকে অতিক্রম করছে, কখনও মিশে যাচ্ছে, কখনও আবার নতুন রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে। ওদের এই নিষ্প্রাণ ভেসে-চলা অবয়বগুলোতে কেমন যেন করুণ একটা বিষণ্ণতা জড়িয়ে রয়েছে। দেখলে মনে হবে অসংখ্য মেঘমালা সমুদ্রের প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে আকাশের বুকে উঠে যাচ্ছে আর আপ্রাণ চেষ্টা করছে মানুষের বুকে আশার তুফান তুলে সেইসব স্বপ্নময় উজ্জ্বল অগণন নক্ষত্রগুলোকে তাদের কালো ডানায় ঢেকে ফেলতে, যাতে না ওরা আর সোনালী চোখ মেলে ঘুমন্ত সমুদ্রকে দেখতে পায়।

'কি রে, সমুদ্রটা সুন্দর নয়?' চেলকাশ জিগেস করলো।

'হয়তো সুন্দর, কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করছে।' জোরে সমান তালে দাঁড় টানতে টানতে গেভ্রিলা বললো। দাঁড়ের প্রতিটা আঘাতে জলের বুকে অস্পষ্ট শব্দ উঠছিলো ছল ছল ছলাৎ, আর ঠিকরে ঠিকরে উঠছিলো নীলাভ ফসফরাসের উজ্জ্বল দীপ্তি।

'ভয় করছে?' চেলকাশ ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো। 'আচ্ছা উজবুক তো তুই!'

সে চোর, তবু সমুদ্রকে ভালবাসে। সে অবাধ্য উদ্দাম, তবু নতুনত্বের প্রতি তার অসীম আগ্রহ। সীমাহীন, উন্মুক্ত এই অতল জলরাশির দিকে তাকিয়ে ও কখনও ক্লান্ত হয় না। তাই যে অতুল সৌন্দর্যকে সে ভালবাসে, তার সম্পর্কে এই বিরূপ মন্তব্যে চেলকাশ মর্মাহত হলো। হালে বসে দাঁড়ের

সাহায্যে সে তরতর করে জল কেটে চললো আর শান্ত অপলক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার বুকে ফেনিয়ে উঠলো কেবল একটাই কামনা—মসৃণ এই সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে যত দূর ভেসে যাওয়া সম্ভব যদি সে ভেসে যেতে পারতো !

যখনই ও সমুদ্রে আসতো, উষ্ণ প্রশান্ত একটা ব্যাপ্তিতে ভরে উঠতো সারা মন। দৈনিন্দন জীবনের গ্লানিমা ছাপিয়ে তা ধীরে ধীরে ভরিয়ে দিতো ওর সমগ্র সত্তা। তাই জল-ঢেউ আর এই খোলা হাওয়ায় ও হয়ে উঠতো এক অন্য মানুষ। জীবনের দুঃখ বেদনা কঠোরতা হারিয়ে নিজেকে মনে হতো দুর্লভ। রাত্রে জলের বুকে ঘুরে বেড়ানো নিদ্রালস সমুদ্রের অস্ফুট কোমল ধ্বনি তার সারা বুক ভরিয়ে তুলতো নিবিড় প্রশান্তিতে, আর অশুভ প্রবণতা ভুলে জন্ম দিতো সুন্দর সুন্দর সব অজস্র স্বপ্নের।

'তোমার মাছ ধরার সরঞ্জাম সব কোথায়?' গেভ্রিলা সন্দিগ্ধ চোখে চেলকাশের দিকে তাকালো।

'সরঞ্জাম !' চেলকাশ চমকে উঠলো। 'পেছনের গলুইয়ে আছে।'

নিতান্তই তরুণ এই ছেলেটার কাছে মিথ্যে বলতে ও লজ্জা অনুভব করলো এবং এইভাবে চিন্তার জালকে ছিন্ন হয়ে যেতে দেখে চেলকাশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। আগের সেই তিক্ত অনুভূতিটা আবার যেন তার বুকের মধ্যে তীব্র জ্বলে উঠলো। তাই রুক্ষ গলায় চাপা স্বরে ও গেভ্রিলাকে বললো, 'যেখানে বসে আচিস্, চুপ মেরে বসে থাক্। আমি তোকে দাঁড় টানার জন্যে এনেচি। ফের যদি একটাও রা কেড়েচিস্ তো তোর মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেবো। বুঝলি?'

মুহূর্তের জন্যে সামান্য একটু ধাক্কা খেয়ে নৌকোটা থেমে গেলো, দাঁড়দুটো নিষ্ক্রিয় পড়ে রইলো জলের ওপর। গেভ্রিলা অস্বস্তির সঙ্গে তার জায়গায় নড়েচড়ে বসলো।

'কি রে, দাঁড় টান্।'

দাঁতে দাঁত চেপে গেভ্রিলা দাঁড়দুটো তুলে নিলো আর সামান্য একটু ঝাঁকুনি দিয়ে নৌকোটা যেন ভয় পেয়ে দ্রুত জল কেটে ছুটতে শুরু করলো।

'সামলে, সামলে চল্, বুদ্ধু কোথাকার !'

হাল না ছেড়েই চেলকাশ সামনের দিকে ঝুঁকে জলন্ত চোখে গেভ্রিলার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকালো। যেন একটা বেড়াল তার শিকারের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে শোনা গেলো দাঁতে দাঁত ঘষার বিচিত্র শব্দ।

'কে? কে যায়?' তীরের দিক থেকে ভেসে এলো ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন।

'আরে, ভালো করে টান্ না শয়তান। দেখিস, দাঁড়ের যেন একটুও শব্দ না হয়। খবোদ্দার! একটুও শব্দ করেচিস্ তো তোর টুঁটি আমি ছিঁড়ে ফেলবো। এই বলে রাখলুম।'

ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে গেভ্রিলার সারা শরীর, থরথর করে ও কাঁপছে। 'হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি রক্ষা করো…'

দূরে যেখানে নানা রঙের আলোগুলো ভিড় করে রয়েছে আর খাড়া মাস্তুলগুলো দেখা যাচ্ছে, নৌকোটা অনায়াসে ঘুরে এবার সেই বন্দরের দিকে মোড় নিলো।

'এই যে, কে চেঁচাচ্ছো ওখানে?' আবার শোনা গেলো সেই চাপা গর্জন। কিন্তু শব্দটা এবার আরও দূর থেকে আসছে বলে মনে হলো।

'তুমি নিজেই চেঁচাচ্ছো, বন্ধু!' যেদিক থেকে চিৎকারটা এলো সেদিক ফিরে চেলকাশ ফিসফিস করে বললো। তারপর গেভ্রিলার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলো ও তখনও বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে।

'নে রে ছোঁড়া, এবার তোর ভাগ্য ভালো। একবার যদি ওই শয়তানগুলো আমাদের ধরতে পারতো, তোর ভবলীলা এ জন্মের মতো সাঙ্গ হয়ে যেতো। আর আমিও তোকে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঠেলে দিয়ে হাঙ্গরদের ভোজ দিতুম।'

শান্তস্বরে ঠাট্টা করেই চেলকাশ কথাগুলো বলেছিলো, গেভ্রিলা কিন্তু আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে অনুনয়ের সুরে বললো, 'আমাকে যেতে দাও। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ডাঙায় কোথাও নামিয়ে দাও। হায় হায়, কি কুক্ষণেই না ফাঁদে পা দিলাম! দোহাই তোমার, আমাকে যেতে দাও। আমাকে নিয়ে কি করবে? এ কাজ আমি করতে পারবো না। এমন কাজ আমি জীবনে কখনও করিনি। এই প্রথম। হে ভগবান, কেন আমার এমন সর্বনাশ করলে! এ যে পাপ! কেন তুমি একটা লোকের পরকাল এভাবে নষ্ট করে দিলে! কেন এ কাজ তুমি…'

'কি কাজ?' চেলকাশ গর্জে উঠলো। ছেলেটার আতঙ্ক দেখে ও খুশি হলো। ও যে একটা সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক, একথা ছেলেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে ভেবে চেলকাশ মনে মনে আনন্দ উপভোগ করলো।

'নোংরা কাজ, বন্ধু। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তুমি যেতে দাও। আমি তোমার কোন কাজেই আসবো না, বিশ্বাস করো···'

'চুপ। তুই যদি নিজের ইচ্ছেয় না আসতিস, আমি তোকে জোর করে আনতুম না, বুঝলি? এখন চুপ মেরে থাক্।'

'হা ভগবান।' গেভ্রিলা বিড়বিড় করে বললো।

'ফের?'

গেভ্রিলা কিন্তু নিজেকে আর সামলাতে পারলো না, নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ভয়ে অস্বস্তিতে মনে মনে ছটফট করলেও, প্রাণপণ শক্তিতে মরিয়া হয়ে ও দাঁড় টেনে চললো। আর নৌকোখানা তীরবেগে ছুটে চলেছে জলের ওপর দিয়ে। আর একবার জাহাজের কালো ছায়াগুলো যেন ওদের গিলতে এলো, কিন্তু নেকড়ের মতো ক্ষিপ্রবেগে নৌকোখানা গলে গেলো জাহাজশ্রেণীর সংকীর্ণ জলরেখার মধ্যে দিয়ে।

'শোন্। বাঁচতে যদি চাস তো একটা কথাও বলবি না, বুঝলি?'

এতক্ষণ গেভ্রিলা ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলো, এবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'নাঃ, এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই।'

'ফের রা কাড়চিস্।' চেলকাশ চাপা গলায় ধমক দিলো।

এ চাপা গর্জনে গেভ্রিলার মানসিক বোধশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে গেলো, এবং নিদারুণ বিপদের আশঙ্কায় ও মূক অভিভূত হয়ে পড়লো। বিহ্বলের মতো দাঁড়দুটো জলে নামিয়ে দিলো, তারপর নিজের পায়ের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে সামনে ঝুঁকে ও সমানে দাঁড় টেনে চললো।

জলের ছপ্ ছপ্ শব্দে কেমন যেন গা ছমছম করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা জাহাজঘাটায় এসে পৌঁছলো। পাথরের নিটোল দেওয়ালে ওপাশে শোনা যাচ্ছে মানুষের কণ্ঠস্বর, গানের সুর, শিস দেওয়ার শব্দ, আর জল-ঢেউয়ের ছল-ছলাৎ আওয়াজ।

'থাক্।' চেলকাশ ফিসফিস করে বললো। 'দাঁড়দুটো এবার তুলে ফ্যাল্। দেওয়াল ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্। খবদ্দার, একদম শব্দ করবি না।'

গেভ্রিলা পিচ্ছিল পাথরের দেওয়ালের ধার দিয়ে নৌকোটাকে সাবধানে ঠেলে দিলো আর নৌকোটাও নিঃশব্দে দেওয়ালের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো।

'থাম্। দাঁড়তুটো আমাকে দে। তোর ছাড়পত্রটা কোথায়? পকেটে? শীগগিরি বার কর্। এসব কেন চাইছি জানিস? পাছে তুই না পালিয়ে যাস। যাক, এখন আর পালাতে পারবি না। এখানেই চুপচাপ বসে থাক্। মনে রাখিস, বেতালা কিছু করিস তো, সোজা সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবি।'

তারপর দু হাতে কি যেন ধরে চেলকাশ শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে দেওয়ালের ওপারে মিলিয়ে গেলো।

ব্যাপারটা এমন চোখের নিমিষে ঘটে গেলো যে গেভ্রিলা ভয়ে শিউরে উঠলো। তবু এতক্ষণ গোঁফওয়ালা বদমাশ চোরটার উপস্থিতিতে যে অভিশপ্ত গুরুভার তার বুকের ওপরে চেপে বসেছিলো, তা যেন পোশাকের মতো পলকে তার বুক থেকে শিথিল হয়ে খসে গেলো। এবার ও পালাবে। স্বস্তির সহজ নিঃশ্বাস ফেলে ও চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। বাঁদিকে অতিকায় শবাধারের মতো বিশাল পরিত্যক্ত মাস্তুলবিহীন একটা জাহাজের কালো ছায়া। প্রতিবারে জলের ঝাপটায় তার ভাঙা খোলের মধ্যে থেকে চাপা গোঙানির মতো শোঁ শোঁ একটা শব্দ উঠছে। ডানদিকে হিম-শীতল প্রকাণ্ড অজগরের মতো পিচ্ছিল পাথরের দেওয়াল। তার ওপারে চাপ চাপ কালো ছায়া। দেওয়াল আর ভাঙা জাহাজের সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নির্জন সমুদ্র। তার ওপরে থমথম করছে অমঙ্গলের ঝোড়ো মেঘ। অন্ধকারে বিশাল, হিমেল···ধীরে ধীরে নিঃশব্দ ভেসে চলেছে···যেন তার গুরুভার চেপে বসে সত্তার গহন গভীরে। গেভ্রিলা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। চেলকাশের উপস্থিতির চাইতে এই শঙ্কা যেন আরও ভয়াবহ। হিম-শীতলতায় সারা বুক যেন তার জমাট বেঁধে যাচ্ছে, আত্মরক্ষার শেষ সম্বলটুকুকেও কে যেন কাঁটায় কাঁটায় বিদ্ধ করছে।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। সমুদ্রের মৃদু কলকলানি ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মেঘেরা আগেরই মতো মন্থর বিষণ্ন মূর্তিতে ভেসে চলেছে, আর আকাশটা মনে হচ্ছে সমুদ্র—তন্দ্রাচ্ছন্ন, অথচ বিক্ষুব্ধ। মেঘগুলো যেন তরঙ্গ, তাদের সফেন চূড়ায় পালকের মতো উষ্ণীষ। ওরা যেন মহাশূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, হাওয়ার ঝাপটায় প্রচণ্ড বিক্ষোভে যেন নীলাভ ফেনার মধ্যে ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

বিষণ্ন সৌন্দর্য আর এই নিস্তব্ধতা গেভ্রিলার বুকে এমনভাবে চেপে বসলো যে মনিবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ও উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো। আচ্ছা, ও যদি

না আর ফিরে আসে ? আকাশে ভেসে চলা মেঘেদের চেয়েও মন্থর সময় ধীরে ধীরে বহে চললো। ওর প্রতীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতাও হয়ে উঠলো আরও ভয়ঙ্কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হঠাৎ জল-প্রাচীরের ওপার থেকে ও জলের মৃদু শব্দ, জামা-কাপড়ের খস্‌খস্‌ আর বাতাসের মতো চাপা ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। গেভ্রিলার মনে হলো আর একটু দেরি হলে ও বুঝি ভয়েই মরে যেতো।

'কি রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' শোনা গেলো চেলকাশের থমথমে কণ্ঠস্বর। 'নে, এটা ধর্। দেখিস্ সাবধানে।'

চৌকো মতো ভারি কি যেন একটা বস্তু নেমে এলো দেওয়ালের ওপর থেকে, গেভ্রিলা সেটা নৌকোয় নামিয়ে রাখলো। একই রকম আর একটা বস্তু নেমে এলো। তারপর ঝুলে পড়লো চেলকাশের দীর্ঘ দেহটা। এবার দাঁড়-দুটোকেও দেখা গেলো, শোনা গেলো ওর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ। চেলকাশ পেছনের গলুয়ের কাছে তার জায়গায় গিয়ে বসলো। হালকা খুশির স্মিত হাসিতে ভরে উঠলো গেভ্রিলার সারা মুখ। 'কি, খুব মেহনত হয়েছে তো?'

'তা নয় তো কি! নে, এবার জোরসে দাঁড় টান্। আজ তুই অনেক কামালি, বুঝলি ছুঁচো? সবে অর্ধেক হয়েছে, আরও অর্ধেক কাজ বাকি। এখন বেজম্মাগুলোর নাকের তলা দিয়ে গলে সটকাতে পারলে হয়। তারপর টাকা পয়সা নিয়ে তুই তো সোজা তোর মাশা না মাশকার কাছে চলে যাবি, তাই না?'

'মাশকা? উঁহু, মাশকা নয়, মারফা।' গেভ্রিলা প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানছে। বুকখানা হাপরের মতো ফুলে উঠছে, হাত দুখানা ইস্পাতের স্প্রিংয়ের মতো ওঠা-নামা করছে। নৌকোর নিচে জলের কলকল শব্দ, আর পেছনে ফিতের মতো নীল রেখাটাকে আরও চওড়া দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে গেভ্রিলা ঘেমে নেয়ে উঠলো, তবু দাঁড় টানা বন্ধ করলো না। সে-রাত্তিরে দু-দুবার তাকে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়েছে, তৃতীয় বার ঘটুক এটা তার কাম্য নয়। এখন তার প্রাণে কেবল একটা কামনা—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অভিশপ্ত কাজটা শেষ করে একবার ডাঙায় নামতে পারলে হয় এবং জেলখানার ফটক এড়িয়ে প্রাণ থাকতে থাকতে এই বদমাশ লোকটার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারলে বাঁচে। মনে মনে স্থির করলো লোকটার সঙ্গে ও আর একটা কথাও বলবে না বা প্রতিবাদ করবে না, যা বলবে তাই

করবে। যদি সত্যিই ওর হাত থেকে মুক্তি পায় তাহলে কাল সকালেই গির্জায় গিয়ে সেন্ট নিকোলাসের কাছে প্রার্থনা করবে। এবং বুকের ভেতর থেকে আবেগময় একটা প্রার্থনা তখনই বেরিয়ে আসার জন্যে আকুলিবিকুলি করছিলো, কিন্তু নিজেকে ও কোনরকমে সামলে নিলো। তারপর হাঁপিয়ে-ওঠা ইঞ্জিনের মতো বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে ও ভ্রূ কুঁচকে চেলকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো।

আর চেলকাশ, তার বিশাল দীর্ঘ শরীরটা ডানা-মেলা উড্ডীন পাখির মতো সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বসে রয়েছে। অন্ধকারে বাজের মতো তীক্ষ্ণ চোখদুটো ওর জ্বলছে, বঁড়শির মতো নাকটা এদিক ওদিক ঘুরছে। এক হাতে হালটা ও শক্ত করে ধরে আছে, অন্য হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে মুচকি মুচকি হাসছে। নিজের সাফল্যে চেলকাশ খুশি এবং ছেলেটাকে দারুণ ভয় পাইয়ে তাকে গোলাম বানাতে পেরেছে, এর জন্যে সে মনে মনে রীতিমত গর্বিত। আবার ছেলেটার পরিশ্রম দেখে তার কষ্টও হলো, ভাবলো কিছু বলে ওকে উৎসাহিত করবে।

'কি রে! খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলিস, তাই না?'

গেভ্রিলা গলাটা পরিষ্কার করে নিলো। 'না, মানে···ঠিক তা নয়।'

'আচ্ছা, এবার আস্তে আস্তে দাঁড় টান্। বিপদ কেটে গ্যাছে। এখন শুধু আর একটা জায়গায় হানা দিতে হবে। এবার একটু জিরিয়ে নে।'

সুবোধ বালকের মতো গেভ্রিলা হাত-পা ছড়িয়ে বসলো। জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছে নিলো।

'খুব আস্তে আস্তে, দেখিস যেন জলে শব্দ না হয়। আমাদের এখন ফটকটা পেরুতে হবে। সাবধান। এখানের লোকগুলো দারুণ সাংঘাতিক। টুঁ শব্দ করার আগেই দেখবি বন্দুকের গুলিতে তোর মাথাটা ফুটো হয়ে গ্যাছে।'

জলের ওপর দিয়ে নৌকোটা এখন নিঃশব্দে ভেসে চলেছে। শুধু দাঁড় থেকে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জলের শব্দ, আর ফোঁটাগুলো যখন পড়ছে সমুদ্রের ফসফরাসে জ্বলে উঠছে নীলচে আলোর দ্যুতি। রাত্রি এখন আরও গাঢ় আর নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। আকাশকে এখন আর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে না। মেঘগুলো চারদিকে বিস্তীর্ণ ছড়িয়ে পড়ে ভারি চাঁদোয়ার মতো নিচু হয়ে ঝুলছে জলের ওপরে। সমুদ্রটাও নিকষ কালো আর নিস্তরঙ্গ। উষ্ণ বাতাসে থমথম করছে তার ঝাঁঝালো লবণ-গন্ধ।

'আঃ, যদি একটু বৃষ্টি হতো !' চেলকাশ ফিসফিস করে বললো। 'তাহলে আমরা বৃষ্টি মুড়ি দিয়ে সোজা কেটে পড়তে পারতুম।'

নৌকোর ডাইনে বাঁয়ে বড় বড় কতকগুলো বজরা কালো কালো ভীষণ ছায়া ফেলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার একটাতে আলো নড়ছে। কে যেন লণ্ঠন নিয়ে হাঁটছে। বজরায় তার পায়ের ধুপধাপ ফাঁপা শব্দ উঠছে, যেন রাত্রির নৈঃশব্দকে ভেঙে খানখান করে দেবে বলে সে উঠে-পড়ে লেগেছে।

চেলকাশ অস্ফুটস্বরে বললো, 'উপকূল রক্ষী !'

যে মুহূর্তে চেলকাশ গেভ্রিলাকে আস্তে আস্তে দাঁড় টানতে বলেছিলো, তখন থেকেই আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ও আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। দেহের হাড় আর স্নায়ুগুলো ব্যথায় বিষ হয়ে উঠেছিলো, কপালটা যন্ত্রণায় টনটন করছিলো। পিঠের চামড়া কুঁকড়ে উঠেছিলো আর পায়ে কে যেন ক্রমাগত ছুঁচ ফোটাচ্ছিলো। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখদুটো ব্যথা করছিলো, কেননা যে-কোন মুহূর্তে ও আশা করছিলো অন্ধকার ফুঁড়ে এই বুঝি কে চিৎকার করে উঠলো : এই চোর, থাম্ !

তাই চেলকাশের মুখ থেকে 'উপকূলরক্ষী' কথাটা শুনে গেভ্রিলা ভয়ে আঁতকে উঠলো। ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা ঝলসে গেলো, ছমছম করে উঠলো ওর দেহের প্রতিটা শিরা-উপশিরা। ভাবলো সাহায্যের জন্যে লোকজনদের চিৎকার করে ডাকবে। এমন কি মুখও খুলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ে গলা ওর বন্ধ হয়ে গেলো। চাবুকের মতো কি যেন কেটে বসলো ওর গলার চারপাশে। চোখ বন্ধ করে ও গড়িয়ে পড়লো তার আসনের পাশে।

অদূর, অন্ধকার জলের রেখার ওপরে ঝলসে উঠছে নীলাভ আলোর তরবারি। তার তীক্ষ্ণ ফলায় রাত্রির আঁধারকে ছিঁড়েখুঁড়ে, মেঘের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে সমুদ্রের বুকে নেমে আসছে নীলচে আলোর দ্যুতি। আর তার প্রতিটা ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে অন্ধকারের বুকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা অদৃশ্য জাহাজগুলো, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে এগুলো দীর্ঘদিন আটকে পড়েছিলো সমুদ্রের তলায়। এতক্ষণ আকাশে, জলের ওপরের যা-কিছু অদৃশ্য ছিলো, এখন তা সমুদ্রজাত এই জ্বলন্ত তরবারির প্রভাবে হয়ে উঠেছে দীপ্ত, উদ্ভাসিত। আর মাস্তুলের গায়ে জড়ানো দড়িদড়াগুলো মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসার সময় কালো কালো দৈত্যগুলোর

গায়ে আটকে গেছে সমুদ্র-শৈবালের জটাজাল। তারপর ভয়ঙ্কর সেই নীল আলোর তরবারি রাত্রির অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে আবার যেখানে গিয়ে পড়ছে, সেখানে আলোকিত হয়ে উঠছে অন্য অদৃশ্য জাহাজের বিশাল অবয়ব।

চেলকাশদের নৌকোটা থেমে গেছে এবং কি করতে হবে বুঝতে না পেরে যেন অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলছে। দু হাতে মুখ ঢেকে গেভ্রিলা পড়ে রয়েছে নৌকোর খোলে। চেলকাশ পা দিয়ে ওকে ঠেলে ক্রুদ্ধ অথচ অস্ফুটস্বরে বললো, 'ওঠ, বোকা কোথাকার। ওটা শুল্ক-বিভাগের জাহাজ। আর ওটা ওদের অনুসন্ধান-করার আলো। যে কোন মুহূর্তে ওরা আমাদের ওপর ফেলতে পারে। তখন কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে, বুঝলি? নে নে, ওঠ্ এখন।'

শুধু কথায় কাজ হলো না। চেলকাশ যখন জুতোর আগা দিয়ে ওর পিঠে সজোরে ঠোক্কোর দিলো, গেভ্রিলা সোজা হয়ে বসলো। তখনও চোখ মেলতে ভয় পাচ্ছে। চোখ বন্ধ করেই হাতড়ে হাতড়ে দাঁড়দুটো তুলে নিয়ে বাইতে শুরু করলো।

'যতটা পারিস আস্তে আস্তে টান্' চেলকাশের গলার স্বর এখন অনেকটা মোলায়েম। 'আমি তোর সঙ্গে রয়েছি, এতে এত ভয় পাবার কি আছে? আচ্ছা মেনি-মুখো তো তুই! এটা শুধু একটা আলো বই তো নয়। নে, এখন খুব আস্তে আস্তে দাঁড় টান্। আলো ফেলে ফেলে ওরা আমাদের মতো চোর-জোচ্চোর-বাটপাড়দের খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু ওরা এখন অনেক দূরে, আমাদের আর ধরতে পারবে না। এখন আমরা নাগালের বাইরে চলে এসেছি।' চেলকাশ বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসলো। 'মাথা-মোটা হলে কি হবে, তোর বরাত ভালো।'

কোন কথা না বলে গেভ্রিলা দাঁড় বাইছে আর চোরাচোখে সেই জ্বলন্ত তরবারির ওঠা-নামার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ভারি হয়ে উঠেছে তার শ্বাসপ্রশ্বাস। এটা যে কেবল একটা অনুসন্ধানী-আলো, চেলকাশের কথায় ও তা বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে সমুদ্রকে রূপোলী আভায় উদ্দীপ্ত করে তুলছে যে হিমশীতল আলো, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোন অশুভ রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

সম্মোহিত এক আতঙ্কে গেভ্রিলা আবার বিমূঢ় হয়ে পড়লো। যন্ত্রের মতো দাঁড় বেয়ে চললো, অপ্রত্যাশিত এক আঘাতের আশঙ্কায় ওর পেশীগুলো হয়ে

উঠলো বিবশ। যেন এখন ওর আর কিছু চাওয়ার নেই—শূন্য, নিষ্প্রাণ! রাত্রির এই অসহ্য উত্তেজনা ওর মানবিক সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

কিন্তু চেলকাশ আবার বিজয়ী হলো। তার ক্লান্তি, তার সমস্ত দুশ্চিন্তা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। গোঁফজোড়া উল্লাসে নড়ছে, দু চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। এমন মজা এর আগে ও আর কখনও অনুভব করেনি। দাঁতের ফাঁকে শিস দিচ্ছে, প্রাণ ভরে নিচ্ছে সমুদ্রের ভিজে হাওয়া। যখনই গেভ্রিলার দিকে চোখ পড়ছে মুচকি মুচকি হাসছে।

বাতাস বইছে, ছোট ছোট তরঙ্গের হিল্লোলে সমুদ্র জেগে উঠছে। মেঘগুলোকে মনে হচ্ছে স্বচ্ছ আর হালকা। তবু ওরা ঢেকে রয়েছে সারা আকাশ, যেন নিশ্চল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার স্বপ্ন দেখছে।

'নে, এবার তৈরি হয়ে নে। দেখে তো মনে হচ্ছে একতাল হাড়ের বস্তা।'

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে গেভ্রিলা চাঙ্গা হয়ে উঠলো, হোক না তা চেলকাশের কণ্ঠস্বর। 'না না, আমি ঠিক আছি।'

'আচ্ছা, তুই বরং এবার হালের কাছে এসে বোস্, আমাকে দাঁড়দুটো দে। নিশ্চয়ই তুই খুব ক্লান্ত হয়ে গেছিস।'

গেভ্রিলা নিঃশব্দে জায়গা বদল করলো। উঠে আসার সময় চেলকাশ লক্ষ্য করলো ছেলেটার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, পা দুটো টলছে। ছেলেটার জন্যে এবার ওর সত্যিই দুঃখ হলো। তাই ওর কাঁধ চাপড়ে বললো, 'হয়েছে, হয়েছে, আর ভয় পেতে হবে না। আজ তুই বেশ ভালোই দাঁড় বেয়েছিস। আচ্ছা, আমি তোকে যদি পঁচিশ রুবল দিই, তখন তোর কি মনে হবে বল্ তো?'

'না না, আমি কিচ্ছু চাই না। আমাকে শুধু তুমি ডাঙায় নামিয়ে দাও।'

চেলকাশ কোন কথা বললো না, হাত নেড়ে থুতু ফেললো। তারপর লম্বা হাতে বড় বড় দাঁড় ফেলে বাইতে শুরু করলো।

সমুদ্র এখন জেগে উঠেছে। চঞ্চল ফেনিল তরঙ্গপুঞ্জ একের পর এক বেলাভূমিতে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। মর্মরিত হচ্ছে তার মৃদুল সংগীত। রাত্রির অন্ধকারও যেন এখন চলকে উঠছে।

'তাহলে তুই তোর গ্রামেই ফিরে যাচ্ছিস? গিয়ে তো চাষবাস করবি, বে-থা করে বউ ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার পাতবি। জীবনটা আবার সেই জাঁতাকলের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। কি মজাটা পাবি?'

'মজা ?' প্রতিধ্বনিত হলো গেভ্রিলার ম্লান কণ্ঠস্বর। 'কি জানি !'

ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এখন নীলাকাশ আর দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে। জলের বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে তাদের ছায়া। কখনও ঝিকমিক করছে, কখনও আবার হারিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের দোলায়।

'আর একটু ডাইনে যেতে হবে। আমরা প্রায় এসে গেছি। যাক, যা পাওয়া গেছে, তাই যথেষ্ট। এক রাতে পাঁচশো রুবল, কি এমন মন্দ বল্ ?'

'পাঁচশো !' গেভ্রিলার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এলো। 'কি আছে এতে ?'

'টাকার পাহাড়। ঠিক দামে বিক্রি হলে হাজার রুবলও পাওয়া যেতে পারে। তবে আমি সস্তায় ছাড়বো, উচিত দামের জন্যে হা-পিত্যেস করে বসে থাকলে চলবে না। আর এতে কি আছে জানিস ? রেশম, রেশমী কাপড়, বুঝলি ছোঁড়া ?'

গেভ্রিলার চোখ তখন কপালে উঠে গেছে। 'ঈশ, টাকাটা যদি সব আমি পেতুম !' কথাটা ও এমনভাবে বললো যেন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে গেলো—তার গ্রাম, ছোট্ট ভিটে, তার মা আর সুদূর সেইসব প্রিয়জনদের কথা, যাদের ছেড়ে ও পাড়ি দিয়েছে এই এতদূরে, যার জন্যে সয়েছে রাত্রির এই অসহ্য নির্যাতন। সে তো শুধু অর্থেরই জন্যে। ছায়া-ঘেরা তার ছোট্ট গ্রাম, পাহাড়-ঢল-বেয়ে-নামা নদী, তার ধারে ধারে বার্চ, উইলো, পাহাড়ি-অ্যাস আর অর্জুন গাছের ঝোপ—একে একে সব তার স্মৃতিতে ভিড় করে এলো। 'সত্যি কি চমৎকারই না হতো !'

গেভ্রিলা আবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'তা তো বটেই। অমনি রেলগাড়ি চেপে সোজা চোঁ-চাঁ বাড়িতে দৌড়তিস, আর মেয়েরা তোর পেছন পেছন ঘুরঘুর করতো। পছন্দ হলে হয়তো তাদের একটাকে বিয়েও করতিস, কিংবা নতুন একটা বাড়ি বানাতিস। যদিও এ টাকায় বাড়ি হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'না, বাড়ি করা যাবে না। আমাদের ওদিকে কাঠের দাম বড্ড চড়া।'

'আর কিছু না হোক, পুরনো বাড়িটা তো সারিয়ে নিতে পারবি। আর ঘোড়া ? ঘোড়া তোর আছে ?'

'আছে, তবে বুড়ো একটা বেতো ঘোড়া।'

'তাহলে তো নতুন একটা কিনতেই হবে। বেশ ভালো জাতের ঘোড়া। একটা গাই, কয়েকটা ভেড়া আর কিছু মুরগি, কি বলিস ?'

‘কি হবে মিছিমিছি আলোচনা করে। জীবনে আমি তো আর এসব কিছু পাবো না।’

‘পাবি পাবি। দেখবি জীবন তোর ভরে উঠেছে গানের সুরের মতো। এসব বিষয়ে আমি কিছু কিছু জানি। একদিন আমারও ঘর ছিলো। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে ধনী।’

চেলকাশ ধীরে ধীরে দাঁড় বাইছিলো। তীর-ভাঙা ঢেউয়ে নৌকোখানা ভীষণ দুলছিলো, অন্ধকারে মনে হচ্ছিলো ওটা বুঝি এগুচ্ছেই না। আর দুজন মানুষ নিঃশব্দে নৌকোর দোলায় দুলতে দুলতে বিভোর হয়ে গেছে যে যার স্বপ্নে। গেভ্রিলাকে উৎসাহিত করার জন্যেই চেলকাশ প্রথমে ঠাট্টা করে ওকে গ্রামের কথা বলেছিলো। কিন্তু পল্লীজীবনের স্নিগ্ধ মাধুরিমায় ওকে মগ্ন হয়ে যেতে দেখে চেলকাশেরও এই মুহূর্তে একে একে মনে পড়লো সব স্মৃতি, দীর্ঘকাল যা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো, যা নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাকে করে তুললো অন্তর্মুখীন।

‘কৃষিজীবনের সবচেয়ে বড় কথা হলো মানুষের স্বাধীনতা, যেখানে সে নিজেই নিজের মনিব। নিঃস্ব হলেও অন্তত তার সামান্য একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকে, চাষবাসের একচিলতে জমি। অল্প হলেও তবু তা নিজের। অধিকারের জোরে তুমিই তোমার রাজা। প্রত্যেকের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারো সম্মান, তাই নয় কি?’

কৌতূহলী চোখে গেভ্রিলা ওর মুখের দিকে তাকালো। আর চেলকাশও অসীম উৎসাহে মেতে উঠলো তার পূর্ব-আলোচনায়। এখন ও ভুলে গেলো নিজের অস্তিত্ব। তার বদলে ফুটে উঠলো—পুরুষানুক্রমে কত শ্রম, রক্ত আর ঘামে মাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা, শৈশবের কত মধুর স্মৃতি দিয়ে বাঁধা শান্ত এক কৃষকের ছবি, যে স্বেচ্ছায় এইসব মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করে আজ নিজেই নিজেকে নির্বাসিত করেছে এই নির্মম নির্যাতনের দেশে।

‘নিশ্চয়ই, খুব খাঁটি কথা।’ কৌতূহলের পরিবর্তে এবার গেভ্রিলার চোখদুটো যেন খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। ‘একবার নিজের দিকেই তাকিয়ে ছাখো না, মাটি ছেড়ে এসে তোমার কি হাল হয়েছে? মাটি হলো গিয়ে মায়ের মতো, তাকে ভুলে বেশিদিন থাকা যায় না।’

হঠাৎ চেলকাশ যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠলো। আবার তার বেপরোয়া, অশান্ত ভবঘুরে জীবনের সেই অহংকার-বোধটা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠলো,

টনটন করে উঠলো বুকের ভেতরটা। বিশেষ করে তার চেয়ে নগণ্য কেউ আঘাত দিলে রক্ত তো গরম হবেই।

'খুব যে জ্ঞান দিচ্ছিস।' হিংস্র হয়ে উঠলো চেলকাশের কণ্ঠস্বর। 'তুই কি ভেবেছিস আমি সত্যি করে বলেছি? একটুও না।'

'বেশ মজার লোক তো তুমি!' গেভ্রিলা আবার শঙ্কিত হয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিলো। 'আমি কি শুধু তোমার কথা বলেছি? দুঃখ কষ্টে এ পৃথিবীতে তোমার মতো আরও কত লোকই তো রয়েছে। যাদের চালচুলো নেই, ভবঘুরে…'

'থাক্ থাক্, খুব হয়েছে। নে, এবার দাঁড় টান্।'

আবার ওরা জায়গা বদল করলো। এবং উঠে আসার সময় চেলকাশের দুর্মর ইচ্ছে হলো এক লাথিতে গেভ্রিলাকে জলে ফেলে দেয়। কিন্তু কোন-রকমে ও নিজেকে সামলে নিলো।

দুজনে কেউ আর কোন কথা বললো না। কিন্তু গেভ্রিলার এই নীরবতা চেলকাশের কাছে যেন পল্লীস্মৃতিতে মুখর হয়ে উঠলো। ওর মনে পড়লো অতীতের কথা। হাল ঘোরাতে ও ভুলে গেলো। স্রোতের মুখে নৌকোটা ঘুরে চললো সমুদ্রের দিকে। ঢেউগুলো যেন বুঝতে পারলো নৌকোয় মাঝি বলতে কেউ নেই। তাই মনের আনন্দে নৌকোখানাকে নিয়ে ওরা খেলতে শুরু করলো, দোলাতে লাগলো বড় বড় ঢেউয়ের মাথায়। দাঁড়ের চারপাশে ছিটকে উঠতে লাগলো ছোট ছোট নীলচে ফেনা। আর চেলকাশের চোখের সামনে স্বচ্ছ ভেসে উঠতে লাগলো অতীতের ছবি। সুদূর অতীতে ছন্নছাড়া এগারো বছরের একটা বালকের ছবি। ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো সেই ছোট্ট শিশু, তার গ্রাম আর তার মাকে। গোলগাল সুন্দর গড়ন, আরক্ত চিবুক, কোমল চোখদুটিতে জড়ানো অপত্য স্নেহ। আর তার বাবার কঠিন চোখের দৃষ্টি। একমুখ লালচে দাড়ি, দৈত্যের মতো বিরাট পৌরুষদীপ্ত চেহারা। মনে পড়লো তার নিজের বিয়ের স্মৃতি। কৃষ্ণকলির মতো আনফিসার আয়ত দুটো চোখ। দীর্ঘল বেণীটা দুলছে পিঠের পরে, হাসিখুশি কোমল প্রকৃতির। তারপর সৈনিক বেশে নিজের সুন্দর চেহারাটা ওর মনে পড়লো। বাবার শরীর তখন পরিশ্রমে ভেঙে পড়েছে, মাথায় পাকা চুল। মার মুখেও অজস্র বলিরেখা। সৈনিক-জীবন শেষ করে যখন গ্রামে ফিরে এলো সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানালো। গর্বে ভরে উঠলো বাবার বুক। গ্রামের সবাইকে তিনি

ডেকে ডেকে দেখালেন—লম্বা-চওড়া, বুদ্ধিদীপ্ত, তাঁর সুদর্শন ছেলেকে। সত্যি-স্মৃতি এমনই একটা জিনিস, যা হতভাগ্যের বেদনাকে করে তোলে মুখর আর অতীত পাথরগুলোকে সজীব। এমন কি বিষের পাত্রও ভরিয়ে তোলে অমৃতে!

অতীত স্বপ্নে বিভোর চেলকাশের রক্ত-শিরায় এখন উত্তাল প্রবাহিত হয়ে চলেছে ছিন্নমূল, পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ একটা জীবনের বিষণ্ণ স্রোত।

'এই যে, এ আমরা কোথায় চলেছি?'

গেভ্রিলার হঠাৎ-কণ্ঠস্বরে চেলকাশ চমকে উঠলো। শিকারী বাজের মতো সতর্ক দৃষ্টিতে ও চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

'তাই তো! চুলোয় যাগ্‌গে।' হালটা ও ঘুরিয়ে দিলো। 'নে, এবার জোরে জোরে টান্‌।'

গেভ্রিলা হাসলো। 'তুমি স্বপ্ন দেখছিলে?'

'খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'এখন আবার বামাল সমেত ধরা পড়বো না তো?'

'না না, কোন ভয় নেই। এগুলো গছিয়ে টাকাটা নিতে পারলেই খেল খতম।'

'পাঁচশো রুবল?'

'খুব কম করেও।'

'টাকার মতো টাকা বটে! সবটা যদি পেতুম, সুন্দর একটা জীবন যাপন করতে পারতুম।'

'সুন্দর জীবন?'

'তা নয় তো কি?'

এবার গেভ্রিলা তার কল্পনার ডানায় ভেসে চললো। চেলকাশ কোন কথা বললো না। গোঁফজোড়া তার ঝুলে পড়েছে, ডান পাশটা ঢেউয়ের ঝাপটায় ভিজে গেছে, চোখদুটো বিষণ্ণ ম্লান। শিকারী বাজের ক্ষিপ্রতা মিলিয়ে গিয়ে সারা দেহে, ছেঁড়া কামিজের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে মলিন দৈন্যতা।

নৌকোখানাকে দ্রুত ঘুরিয়ে জলের ওপর যে বিরাট কালো ছায়াটা দাঁড়িয়ে ছিলো তার দিকে নিয়ে চললো। আর একবার সারা আকাশ ঢেকে গেলো ঘন মেঘে। বড় বড় ফোঁটায় বেশ সুন্দর উষ্ণ এক পসলা বৃষ্টি নামলো, জলের বুকে শব্দ হলো—টুপটাপ, টুপটাপ।

'থামা এবার ! দেখিস, সাবধানে !'

নৌকোর ছুঁচোলো মুখটা বজরার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিলো।

'বেজম্মাগুলো সব ঘুমিয়ে পড়লো নাকি ?' বজরার গায়ে ঝোলানো দড়িদড়া ধরে চেলকাশ নৌকোটাকে আড়াআড়ি করে রাখলো। 'এই যে, সিঁড়িটা নামিয়ে দাও। আর শালার বৃষ্টিটাও জ্বালাচ্ছে তেমনি। কি রে বাব্বা, সব কুম্ভকর্ণের বাচ্চা নাকি ! এই যে, কে আছো ?'

'সেলকাস নাকি ?' পাটাতনের ওপর থেকে কে যেন জিগেস করলো।

'মইটা নামিয়ে দাও।'

'কে, কালিমেরা সেলকাস ?'

'হ্যাঁ রে ব্যাটা ভূত কোথাকার ! দে, এবার মইটা নামিয়ে দে।'

'ওঃ বাব্বা, আজ যে দেখছি মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে আছে ! এলোহ্‌ই, সেলকাস এসেছে।'

চেলকাশ গেভ্রিলাকে ডাকলো। 'আয়, ওপরে উঠে আয়।'

পরমুহূর্তে দুজনে পাটাতনের ওপরে উঠে এলো। ভেতরে বসে তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ, ছুঁচোলো দাড়ি, দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব যেন বলাবলি করছে। চতুর্থ জন লম্বা আলখাল্লা পরা, চেলকাশকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এলো, ওর একটা হাত নিঃশব্দে চেপে ধরে সপ্রশংস চোখে চেলকাশের মুখের দিকে তাকালো।

চেলকাশ সংক্ষেপে বললো, 'সকালে টাকাটা তৈরি রেখো। এখন আমি ঝিমুতে চললুম। আয়, গেভ্রিলা। কি, খুব খিদে পেয়েছে ?'

'তার চেয়ে বেশি ঘুম পাচ্চে।'

মিনিট পাঁচেক পরেই নৌকোর খোলে শুয়ে গেভ্রিলা নাক ডাকাতে শুরু করলো। চেলকাশ তার পাশে বসে অন্য একজনের বুটজোড়াটা পায়ে গলাবার চেষ্টা করছিলো আর আপন মনে শিস দিয়ে বিষণ্ণ একটা সুর ভাঁজছিলো। একটু পরে মাথার নিচে হাত রেখে ও-ও গেভ্রিলার পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

ঢেউয়ের দোলায় বজরাটা দুলছে। কোথায় যেন একটা আলগা তক্তার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছে। খোলা পাটাতনে বড় বড় ফোঁটায় ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বজরার দু পাশে ঢেউগুলো ছলছল ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। এত কিছু বিষণ্ণতার মধ্যেও, ছেলেবেলায় শোনা মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের মতো মিষ্টি একটা সুর মনে করতে করতে চেলকাশ ঘুমিয়ে পড়লো।

তিন

ওরই ঘুম ভাঙলো সবার আগে। চারপাশে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বস্ত হলো। গেভ্রিলার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো স্থির নিশ্চিন্তে তখনও সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। শিশুর মতো সুন্দর রোদে-পোড়া উজ্জ্বল মুখটায় জড়িয়ে রয়েছে ক্ষীণ একটা হাসি। চেলকাশ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দড়ির সরু মই বেয়ে ওপরে উঠে এলো। মাথার ওপরে দেখলো সীসে রঙের একফালি আকাশ। দিনের আলো ফুটলেও, শরতের ম্লান একটা বিষণ্ণতা জড়িয়ে রয়েছে তার সর্বাঙ্গে।

ঘণ্টা দুই পরে চেলকাশ আবার তার নৌকোয় ফিরে এলো। মুখটা লাল; গোঁফজোড়া মৌজ করে পাকানো। শরিফ মেজাজ। পায়ে একজোড়া মজবুত উঁচু বুট, গায়ে শিকারীদের মতো চামড়ার খাটো কোর্তা আর আঁটসাঁট চোগা। একেবারে নতুন না হলেও বেশ মজবুত, আর মানিয়েছেও খুব সুন্দর। দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন কোন সেনানায়ক।

'ওঠ্, কুঁড়ের বাদশা কোথাকার।' পা দিয়ে ও গেভ্রিলাকে ঠেলা দিলো।

গেভ্রিলা চমকে উঠে বসলো। আধো-ঘুমের মধ্যেও বিস্ফারিত চোখে চেলকাশের মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু চিনতে পারলো না। চেলকাশ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

'বাঃ, তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে তো!' গেভ্রিলা সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসলো। 'ঠিক ভদ্রলোকের মতন।'

'হ্যাঁ, আমাদের বদলাতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু তুই যে দেখি ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাস। কাল রাত্তিরে তুই কতবার মরতে চেয়েছিস বল্ তো?'

'তার জন্যে আমাকে দোষ দেওয়া যায় না। ভেবে দ্যাখো, এই প্রথম হাতে খড়ি। হয়তো প্রাণটাই হারাতে পারতুম।'

'কিন্তু হারায়নি যখন, তখন আবার আসচিস তো?'

'আবার? দেখি···আগে থেকে কত পাবো যদি জানতে পারি···'

'ধর্ যদি দুটো রামধনু পাস।'

'মানে দুশো রুবল? মন্দ নয়। তাহলে অবশ্য চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'কিন্তু যদি প্রাণটা হারাস?'

'আবার নাও তো হারাতে পারি।' গেভ্রিলা মুচকি মুচকি হাসলো।

'নে, হাসি রেখে এবার ডাঙার দিকে চল্।'

যাত্রার জন্যে তুজনে প্রস্তুত হলো। গেভ্রিলা দাঁড় ধরলো, চেলকাশ বসলো হালে। মাথার ওপরে ধূসর মেঘে-ছাওয়া বিস্তীর্ণ আকাশ। নীল সমুদ্র ওদের নৌকোখানাকে নিয়ে যেন খেলছে, চলকে উঠছে ফেনা। সামনে হলুদ বেলাভূমি, পেছনে দিগন্তলীন ধুধু সমুদ্র। উন্মুক্ত ঢেউগুলোকে মনে হচ্ছে লাঙল-দেওয়া বিস্তীর্ণ জমির মতো। বাঁদিকে জাহাজ আর মাস্তুলের নিবিড় অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বন্দরের সাদা সাদা বাড়িগুলোকে। সমুদ্র পেরিয়ে জাহাজঘাটার দিক থেকে ভেসে আসছে মাঝিমাল্লাদের মিষ্টি ভাটিয়ালি। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ঢেউয়ের উচ্ছল মর্মর। আর এ সবকিছুর ওপরে ঝুলছে হালকা একটা কুয়াশার অবগুণ্ঠন। ফলে সবকিছুকে মনে হচ্ছে কেমন যেন বিষণ্ণ করুণ।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চেলকাশ বললো, 'আজ সন্ধ্যেবেলায় দেখিস না এর কি অবস্থা হয়!'

'কেন, ঝড় উঠবে?' প্রচণ্ড ঢেউয়ের মুখে দাঁড় বাইতে বাইতে গেভ্রিলা জিগেস করলো। বাতাস-বওয়া জলকণায় ওর সর্বাঙ্গ তখন ভিজে গেছে।

'উঁ? হুঁ!'

গেভ্রিলা ওর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালো। টাকার সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করতে না দেখে গেভ্রিলা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো, 'ওরা তোমাকে কত দিলো?'

'এই ছাখ্।' চেলকাশ পকেট থেকে কি যেন টেনে বার করলো।

উজ্জ্বল একতোড়া নোটের দিকে তাকাতেই গেভ্রিলার চোখ যেন ঝলসে গেলো। 'প্রথমে ভেবেছিলুম তুমি বুঝি আমাকে গুল দিচ্ছো। এখন দেখছি, না—সত্যি। কত পেলে?'

'পাঁচশো চল্লিশ।'

'ও-রে বাব্বা!' নোটগুলোকে আবার পকেটে ফিরে যেতে দেখে গেভ্রিলা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। 'ঈশ্, এর সবটা যদি আমি পেতুম!' বুক খালি করে গেভ্রিলা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'আজ রাতে তুজনে ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাবো রে ছোঁড়া,' ভাবে গদগদ হয়ে চেলকাশ বললো। 'দেখিস না, সারা শহর এক্কেবারে রাঙিয়ে ছাড়বো।

ভয় নেই, তুই অবশ্য তোর ভাগ পাবি। আমি তোকে চল্লিশ রুবল দেবো। কি, খুশি তো ? চাই কি টাকাটা তুই এখনও নিয়ে নিতে পারিস।'

'ইচ্ছে হলে দাও।'

'ইচ্ছে হলে মানে ! এটা তো তোর পাওনা। তাছাড়া এত টাকা দিয়ে আমি কি করবো।' কয়েকটা নোট চেলকাশ ওর দিকে এগিয়ে দিলো। 'নে।'

দাঁড় ছেড়ে গেভ্রিলা প্রকম্পিত হাতে সেগুলো নিয়ে পকেটে পুরে রাখলো। লুব্ধ চোখের দৃষ্টি এখন ওর কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে— যেন তপ্ত একটা কিছু ও পান করছে। চেলকাশের ঠোঁটদুটো বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। গেভ্রিলা আবার অস্থিরভাবে দাঁড়দুটো তুলে নিয়ে জোরে জোরে বাইতে শুরু করলো। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাজিত মানুষের মতো চোখের দৃষ্টি নামানো নিচের দিকে।

'তুই কিন্তু বড্ড লোভী। এতটা ভালো নয়। কেননা হাজার হোক, তুই তো চাষী।'

'কিন্তু টাকায় কি না হয় !' গেভ্রিলা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। যেন চিন্তার ছিন্ন সূত্রগুলো বাতাসে উড়ে যাবার আগেই ও ধরে ফেললো। গ্রামে যাদের টাকা আছে আর যাদের নেই, তাদের তুলনামূলক জীবনযাত্রা, সম্মান, প্রাচুর্য আর আনন্দের কথা অনর্গল বলে গেলো।

চেলকাশ মনোযোগ দিয়ে ওর কথাগুলো শুনছিলো। গম্ভীর মুখ, স্বপ্নাচ্ছন্ন দুটো চোখ, মাঝে মাঝে ফুটে উঠছিলো তৃপ্তির মৃদু হাসি। হঠাৎ ও গেভ্রিলার বক্তৃতায় বাধা দিলো, 'আমরা এসে গেছি।'

একটা ঢেউ এসে নৌকোখানাকে সোজা তুলে নিয়ে গেলো বালির ওপর।

'নৌকোটাকে আর একটু ওপরে তুলে রাখতে হবে, যাতে ঢেউ এসে না টেনে নিয়ে যায়। তারপর যার নৌকো সে এসে খুঁজে নিয়ে যাবে। তাহলে আজকের মতো বিদায় ! শহর তো এখান থেকে প্রায় সাত মাইল, তুই এখন ওখানেই ফিরে যাবি তো ?'

চেলকাশের মুখটা এখন ধূর্তমির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যেন ছেলেটাকে হঠাৎ তাক্ লাগিয়ে দেওয়ার আত্মতৃপ্তিতে ও ঝলমল করছে। পকেটে হাত দিয়ে নোটগুলোতে খসখস শব্দ করলো।

'শহরে ? না না, আমি···আমি ওখানে আর ফিরে যাচ্ছি না···' গেভ্রিলার গলার স্বর যেন রুদ্ধ হয়ে এলো।

চেলকাশ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। 'তাহলে খাবি কি ?'

'কিচ্ছু না।'

গেভ্রিলার মুখখানা আরক্ত হয়েই আবার হঠাৎ নিভে গেলো। ও দু পা পেছিয়ে এলো, যেন এখনই চেলকাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিংবা এমন একটা কিছু করবে যা এখনও ও স্পষ্ট করে কিছু ভেবে উঠতে পারেনি। ওর উত্তেজনা দেখে চেলকাশ স্তম্ভিত হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত কি করে দেখার জন্যে প্রতীক্ষা করে রইলো।

গেভ্রিলা হাসলো। ওর হাসিটা মনে হলো যেন কান্নায় ভেজা। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। চেলকাশ স্পষ্ট দেখতে পেলো না ওর মুখের অভিব্যক্তি। কিন্তু দেখলো কানের পাশদুটো ওর লাল হয়ে উঠেছে।

'তাহলে তুই জাহান্নমেই যা!' চেলকাশ উপেক্ষার ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। আবার কি ভেবে ওর দিকে ফিরলো। 'কেন, তুই কি আমার প্রেমে পড়ে গেলি নাকি ? মেয়েদের মতো একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিস। না কি আমার কাছ থেকে চলে যেতে হচ্ছে বলে মুষড়ে পড়ছিস ? বল্, কিছু বল্... না হলে আমি কিন্তু চলে যাবো বলে দিচ্ছি।'

'না, তুমি যেও না।' গেভ্রিলা আর্তনাদ করে উঠলো।

সে-আর্তস্বরে শিউরে উঠলো নির্জন তটরেখা, কেঁপে গেলো জলে-ধোয়া ঢেউখেলানো বালির প্রতিটা স্তর। চেলকাশও চমকে উঠলো। হঠাৎ গেভ্রিলা ছুটে এসে চেলকাশের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো, দু হাত দিয়ে তার হাঁটু-দুটো জড়িয়ে নাড়া দিলো। চেলকাশ টাল সামলাতে পারলো না, ধপ্ করে পড়ে গেলো বালির ওপরে। দাঁত কিড়মিড় করে লম্বা হাতে ঘুষি ছুঁড়লো। কিন্তু আঘাত হানার আগেই গেভ্রিলার মিনতির মতো করুণ কণ্ঠস্বরে ও থেমে গেলো।

'আমাকে তুমি সব টাকাগুলোই দিয়ে দাও। যীশুর দোহাই, ও টাকা-কটা তোমার কাছে কিছুই নয়। এক রাত্তিরে রোজগার করেছো, এক রাত্তিরেই উড়িয়ে দেবে...মাত্র এক রাত্তিরে। আর আমার ওতে বছরের পর বছর চলে যাবে। দোহাই তোমার, ওগুলো আমাকে দিয়ে দাও। ঈশ্বরের কাছে তোমার নামে প্রার্থনা করবো...গোলামি থেকে তোমার আত্মার মুক্তির জন্যে আমি পর পর তিনটে গির্জায় প্রার্থনা করব। তুমি তো এগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে, আর আমি ? আমি জমি কিনবো। আমাকে দিয়ে দাও।

তোমার কি হবে? এক রাত্তিরেই তুমি আবার বাদশা হয়ে উঠবে। জীবনে একবার অন্তত পুণ্য করো। আর কিছু না হোক, তুমি তো ভ্রষ্ট মানুষ··· তোমার সামনে আশা বলতে কিছু নেই। অথচ আমি··· আমাকে তুমি ওটা দিয়ে দাও।'

আর চেলকাশ—ভয়বিহ্বল, ক্রুদ্ধ, মূক হয়ে বালির ওপর কনুইয়ের ভর রেখে স্তব্ধ বসে রয়েছে। মুখে একটাও কথা নেই, চোখদুটো হাঁটুতে-মুখ-গোঁজা ছেলেটার মাথার দিকে তাকিয়ে নির্নিমেষ। চকিতে গেভ্রিলাকে ঠেলে দিয়ে চেলকাশ লাফিয়ে উঠলো। তারপর পকেট থেকে নোটের তোড়াটা বার করে ছুঁড়ে দিলো গেভ্রিলার দিকে।

'নে ব্যাটা কুত্তা কোথাকার, খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে নে।' পা-চাটা লোলুপ এই ক্রীতদাসটার প্রতি বিদ্বেষে করুণায় ক্রুদ্ধ রাগে চেলকাশ গর্জন করে উঠলো। এবং টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ও মনে মনে গর্ব অনুভব করলো। 'ভেবেছিলুম তোকে আমি আরও দোবো। রাত্রির নির্জনতায় তুই যখন আমাকে নিজের গ্রামের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলিস, তখন তোর জন্যে আমার কষ্ট হয়েছিলো। নিজেই মনে মনে ঠিক করেছিলুম তোকে আমি সাহায্য করবো। কিন্তু আমি অপেক্ষা করছিলুম তুই নিজে থেকে চাস কি না। তুই একটা নোংরা, আস্তো শয়তান। সামান্য পাঁচটা ফুটো পয়সার জন্যে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন সম্মান নেই, বুঝলি?'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এখন আমার কত টাকা! ইস্, আমি বড়-লোক!' টাকাকটা পকেটে পুরে গেভ্রিলা আনন্দের আতিশয্যে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো। 'সত্যিই তোমার মঙ্গল হোক, বন্ধু। আমি তোমাকে কখনও ভুলবো না। আমার বউ ছেলেপুলেও তোমার জন্যে সারা জীবন প্রার্থনা করবে।'

লোলুপতায় কুঁচকে-ওঠা গেভ্রিলার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার আনন্দ-আতিশয্যের বিলাপ শুনতে শুনতে চেলকাশের মনে হলো—চোর লম্পট হলেও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে এতটা হীন, এত নিচে ও কোনদিন নামতে পারবে না। না, কোনদিনও না। সে যে মুক্ত স্বাধীন—এই ভাবনা, এই চেতনাবোধ তাকে ভেতরে ভেতরে পরিপূর্ণ করে তুললো। তাই নির্জন সাগরবেলায় গেভ্রিলার পাশে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

গেভ্রিলা চেলকাশের একটা হাত নিয়ে রাখলো নিজের মুখের ওপর। 'তুমি আমাকে চিরসুখী করলে বন্ধু।' চেলকাশ হিংস্র নেকড়ের মতো দাঁত

বার করলো। গেভ্রিলা সেদিকে খেয়ালই করলো না। 'নৌকোয় করে ফিরে আসার সময় কি ভেবেছিলুম জানো? ভেবেছিলুম তুমি যখন অন্যমনস্ক হবে তোমার মাথায় দাঁড়ের বাড়ি শুধু এক ঘা···ব্যাস, তারপরেই টাকাগুলো নিয়ে নৌকো থেকে তোমাকে জলে ফেলে দেবো। কে আর তোমাকে খুঁজে পাচ্চে? আর যদি খুঁজে পায়ও, কে করেছে কেমন কোরে লোকে জানতে পারবে? ও নিয়ে কারুর মাথা ঘামাবার কোন দরকারই হবে না।'

'দিয়ে দে ব্যাটা আমার টাকাগুলো!' গেভ্রিলার টুঁটি চেপে ধরে চেলকাশ বাঘের মতো ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলো।

দু-একবার মোচড় দিয়ে গেভ্রিলা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু চেলকাশের অন্য হাতটা তখন সাপের মতো ওকে পেঁচিয়ে ধরেছে। সার্ট ছেঁড়ার শব্দ হলো, তারপরেই দেখা গেলো গেভ্রিলা বালির ওপরে পড়ে রয়েছে। বিস্ফারিত চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, পাগলের মতো আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরছে হাওয়া, অসহায়ের ভঙ্গিতে পাদুটো ছুঁড়ছে মাটিতে। আর চেলকাশ হিংস্র ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে। উন্মুক্ত দাঁতগুলো ঝকঝক করছে, শক্ত চোয়ালের দু পাশে গোঁফের প্রান্তদুটো ঘনঘন কাঁপছে। জীবনে এর আগে কখনও ও এমন নির্মম আঘাত পায়নি, কখনও এমন ক্রুদ্ধ জিঘাংসায় জ্বলেও ওঠেনি।

'কি রে, এবার সুখী হয়েচিস তো?' হাসতে হাসতে চেলকাশ শহরের দিকে ফিরে চললো। পাঁচ পা যেতে না যেতেই গেভ্রিলা বেড়ালের মতো লাফিয়ে উঠলো, এবং বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারলো ওকে লক্ষ্য করে।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে চেলকাশ দু হাতে মাথা চেপে মুখ থুবড়ে পড়লো বালিতে। তার অবস্থা দেখে গেভ্রিলার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো। দেখলো চেলকাশের একটা পা কাঁপছে, মাথাটা ও তোলার চেষ্টা করছে, সারা শরীর বাঁকানো ধনুর মতো টানটান। কুয়াশাচ্ছন্ন স্তেপের ওপর যেখানে ঘন কালো মেঘ থমথম করছে, সেই অন্ধকারের দিকে গেভ্রিলা ভয়ে ছুটে পালালো। মর্মরিত গুঞ্জনে ঢেউগুলো ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্র-সৈকতে, তারপর বালির সঙ্গে মিশে আবার গড়িয়ে ফিরে যাচ্ছে। ফেনরাশির মৃদু ফিসফিস শব্দ হচ্ছে, জলকণা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

এবার বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে গুঁড়িগুঁড়ি, তারপর বেশ বড় বড় ফোঁটায়

আকাশের বুক ভেঙে মুষলধারে। এখন অবিশ্রান্ত ধারায় স্তেপ আর সমুদ্রকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। গেভ্রিলা এই বৃষ্টিধারার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে রইলো। অনেকক্ষণ শুধু বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না। সমুদ্র-সৈকতে বালির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দৈত্যের মতো বিশাল মানুষটা পড়ে রয়েছে। হঠাৎ গেভ্রিলা ডানা-মেলা পাখির মতো অন্ধকার থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো এবং চেলকাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে তোলার চেষ্টা করলো। তার একটা হাত উষ্ণ গাঢ় রক্তে ভিজে গেলো। গেভ্রিলা শিউরে ছিটকে সরে এলো। সারা মুখ তখন তার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের ভেতর চেলকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গেভ্রিলা বললো, 'এই যে, ও ভাই, শুনচো, ওঠো।'

চোখে মুখে জলের ঝাপটায় চেলকাশের সম্বিৎ তখন ফিরে এসেছিলো। এবার ধীরে ধীরে ও চোখ মেললো। আবার গেভ্রিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'যা, সরে যা এখান থেকে।'

'আমাকে ক্ষমা করো, ভাই।' চেলকাশের একটা হাত চুম্বন করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গেভ্রিলা বললো, 'আমার মাথায় তখন ভূত চেপেছিলো।'

'দূর হয়ে যা। আমাকে একা থাকতে দে।'

'আমার পাপ ভুলে যাও, ভাই। আমাকে মার্জনা করো।'

'দূর হ আমার সামনে থেকে। যা, জাহান্নমে যা।'

হঠাৎ চেলকাশ প্রচণ্ড চিৎকার করে বালির ওপর উঠে বসলো। মুখখানা বিবর্ণ, ক্রুদ্ধ চোখদুটো জ্বলছে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না, যেন ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। 'আর কি চাস তুই? যা চেয়েছিলিস, তা তো পেয়ে গেচিস। যা, ভাগ্ এখান থেকে।' কেঁদে বুক-ভাসানো ছেলেটাকে ও লাথি মেরে দূর করে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। গেভ্রিলা হাত বাড়িয়ে চট্ করে ওর কাঁধদুটো জড়িয়ে না ধরলে, হয়তো ও আবার পড়ে যেতো। এখন চেলকাশের মুখটা রয়েছে গেভ্রিলার মুখের সমান্তরালে, ঠিক পাশাপাশি। দুটো মুখই বিবর্ণ ম্লান।

'থুঃ!'

চেলকাশ তার সঙ্গীর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলো। গেভ্রিলা নীরবে জামার আস্তিন দিয়ে থুথুটা মুছে অস্ফুট স্বরে বললো, 'তোমার যা ইচ্ছে করো, আমি একটা কথাও বলবো না। ভগবানের দোহাই, আমাকে তুমি ক্ষমা করো ভাই।'

'আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে তো তুই! সত্যিকারের শয়তানি করার ক্ষমতাও তোর নেই।' কোর্তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চেলকাশ কামিজের পাশ থেকে একটা ফালি ছিঁড়ে নিয়ে মাথায় বাঁধলো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'আমার এই ভেতরের পকেটের টাকাগুলো তুই নিয়েছিস?'

'না, ভাই। ওগুলোর খবর আমি জানি না, ছুঁইওনি। তাছাড়া ওগুলো অপয়া। আমার দরকার নেই।'

চেলকাশ পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আর এক তোড়া নোট বার করলো। তার থেকে একখানা মাত্র একশো রুবলের নোট রেখে বাকিগুলো গেভ্রিলার দিকে এগিয়ে দিলো। 'এগুলো নিয়ে সোজা এখান থেকে চলে যা।'

'না ভাই, এ আমি নিতে পারবো না। যা করে ফেলেচি তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

চোখ পাকিয়ে চেলকাশ হিংস্রভাবে তাকালো। 'আমি বলছি নে।'

ভিজে বালির ওপর বসে গেভ্রিলা চেলকাশের পাদুটো জড়িয়ে ধরলো। 'ক্ষমা না করলে আমি কিছুতেই নিতে পারি না।'

'মিথ্যে কথা! আমি জানি আর দু-একবার সাধলেই তুই নিবি।' তীক্ষ্ণ কঠিন হয়ে উঠলো চেলকাশের কণ্ঠস্বর। গেভ্রিলার চুলের মুঠি ধরে তুলে নোটগুলো তার মুখের মধ্যে ঠেসে ধরলো। 'নে, নিয়ে নে। তাছাড়া তুই মাগনা খাটিসনি। ভয়ের কিছু নেই, নে, টাকাগুলো রেখে দে। আর আমার মতো মানুষকে খুন করার মধ্যে লজ্জারও কিছু নেই। কেউ তার জন্যে তোর খোঁজ করবে না। আর খোঁজ পেলেও ওরা বরং তোকে ধন্যবাদই দেবে। নে, ধর্।'

চেলকাশকে হাসতে দেখে গেভ্রিলার বুক অনেকটা হালকা হয়ে গেলো। নোটগুলো সে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো। 'তাহলে আমাকে ক্ষমা করলে তো? নাকি, করলে না?' সজল চোখে ও চেলকাশের মুখের দিকে তাকালো।

'না রে, না,' কোমল স্বরে চেলকাশ বললো। কোনরকমে টলতে টলতে ও উঠে দাঁড়ালো। 'কিসের জন্যে ক্ষমা করবো? আজ আমি তোর জন্যে করলুম, কাল তুই আমার জন্যে করবি। এর মধ্যে ক্ষমা করার তো কিছু নেই।'

'আঃ, ভাই···বন্ধু···' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেভ্রিলা সান্ত্বনাতীত বেদনার্ত স্বরে মাথা নাড়ালো।

চেলকাশ ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠোঁটে অদ্ভুত একটুকরো হাসি।

মাথার পটিটা রক্তে লাল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে ঠিক যেন তুর্কি ফেজের মতো।

আকাশ ঝামরে অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। শোনা যাচ্ছে সমুদ্রর চাপা গর্জন, ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে বালুবেলায়।

দুজনেই নীরব।

'আচ্ছা, তাহলে চলি।' চেলকাশ ঘুরে দাঁড়ালো। পাদুটো ওর টলছে। মাথাটা ও এমনভাবে ধরে রেখেছে যেন এখনই খসে পড়বে।

'আমাকে তুমি মার্জনা কোরো, ভাই।' গেভ্রিলা আবার অনুনয়ের সুরে বললো।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' গম্ভীরভাবে জবাব দিয়ে চেলকাশ পা বাড়ালো।

বাঁ হাতে মাথাটা চেপে ধরে ডান হাতে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে চেলকাশ টলমলে পায়ে এগিয়ে চললো।

যতক্ষণ না দিগন্তলীন স্তেপের ওপার থেকে ধেয়ে-আসা বৃষ্টির কালো পর্দার আড়ালে চেলকাশ অদৃশ্য হয়ে গেলো, গেভ্রিলা তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ভিজে টুপিটা মাথা থেকে খুলে নিয়ে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো। হাতের মুঠোয় ধরা নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। টাকাগুলো সন্তর্পণে রেখে দিলো সার্টের পকেটে। তারপর বিপরীত দিকের বেলাভূমি ধরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চললো।

উত্তাল তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র এখন গর্জন করছে। জলের ঝাপটায় ছিটকে উঠছে ফেনা। জল আর স্থলে বৃষ্টি চাবুক চালাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বাতাসের হুঙ্কার। গর্জন, আর্তনাদ আর মর্মরধ্বনিতে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠেছে। অঝর বৃষ্টিধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সমুদ্র আর আকাশ।

বৃষ্টি আর ঢেউয়ে ধুয়ে গেছে রক্তের দাগ, বালির বুক থেকে মুছে গেছে চেলকাশ আর তরুণ ছেলেটির পায়ের চিহ্ন। নির্জন এই সমুদ্রবেলায় দুটো মানুষের মধ্যে যে নাটকটির অভিনয় হয়ে গেলো তার আর কোন চিহ্নই রইলো না।

১৮৯৪

কোন এক শরত-সন্ধ্যায়

শরতের কোন এক সন্ধ্যায় বিশ্রী, অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিলো। সবেমাত্র শহরে এসে পৌঁচেছি, কাউকেই চিনি না। পকেটে একটাও পয়সা নেই, না মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই।

প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়তি জামা-কাপড় সব বিক্রি করে দিয়ে উস্তি নামে একটা শহরতলির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ওখানে ছোট একটা ফেরিঘাট আছে। জল যখন নাব্য থাকে, ফেরিঘাটটা কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই শীতের মরসুমে জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ নির্জন। অতল জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভিজে বালুবেলার ওপর খানিকক্ষণ এলোমেলো-ভাবে এদিক-ওদিক ঘুরলাম। শেষে একমুঠো খাবারের আশায় পরিত্যক্ত বাড়ি আর দোকানগুলোয় হানা দিলাম। মনে মনে ভাবলাম পেট ভরা থাকলে জীবনটা কি চমৎকারই না হতো!

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। উত্তর থেকে ঝোড়ো হওয়া বইছে। শূন্য চালা আর দোকানগুলোর মধ্যে দিয়ে সোঁ-সোঁ করে হিমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে সরাইখানার বন্ধ জানলাগুলোর গায়ে। উত্তাল হয়ে উঠছে নদীর ঢেউ, ভেঙে পড়ছে উঁচু বালিয়াড়ির বুকে। ছিটকে উঠছে ফেনা। নদীটা যেন বুঝতে পেরেছে শীতের পদসঞ্চার, তাই তুষার-শৃঙ্খলে জমে যাওয়ার ভয়ে পাগলের মতো ছুটে পালাতে চাইছে। আকাশটা ভারি হয়ে নেমে এসেছে অনেক নিচে আর বৃষ্টির সূক্ষ্ম কণাগুলোকে সোজা ছুঁড়ে দিচ্ছে পৃথিবীর বুকে। ডালপালা-ভাঙা বিধ্বস্ত দুটো উইলো আর তাদের শিকড়ের কাছে উলটে-পড়ে-থাকা একটা ভাঙা নৌকোও যেন প্রকৃতির এই করুণ বিষণ্ণতার সঙ্গে সমানে শোকগাথা গেয়ে চলেছে।

পিঠের পাঁজর-ভেঙে-যাওয়া উলটোনো একটা নৌকো, হিমেল হাওয়ায় পাতা-ঝরা নগ্ন দুটো গাছ···সব মিলিয়ে দৃশ্যটা আশ্চর্য করুণ। আশেপাশের সবকিছুই ভাঙাচোরা, রিক্ত আর মৃত। আকাশ অবিরাম অশ্রু ঝরিয়ে চলেছে। নির্জন অন্ধকার। মৃত্যুলীন এই সবকিছুর মধ্যে মনে হচ্ছে আমিই একমাত্র জীবন্ত, আর আমার জন্যেও অদূরে ওত পেতে রয়েছে হিমেল মৃত্যু।

আমার বয়েস তখন সতেরো—জীবনের এক দুর্লভ সন্ধিক্ষণ! হিমেল ভিজে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। শীত আর খিদেয় দাঁত আমার ঠকঠক করে

কাঁপছে। খাবারের সন্ধানে একটা বন্ধ দোকানের সামনে উঁকিঝুঁকি মারতেই দেখলাম হুমড়ি-খেয়ে-পড়া একটা নারীমূর্তি। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে কাঁধ বেঁকিয়ে কি যেন করছে। ভালো করে লক্ষ্য করার জন্যে আমি ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম বালিতে গর্ত খুঁড়ে দোকানের তলায় সুড়ঙ্গ কাটছে।

ওর পাশে উবু হয়ে বসে জিগেস করলাম, 'এখানে কি কোরছো?'

চকিতে অস্ফুট আর্তনাদ করে ও ছিটকে লাফিয়ে উঠলো। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। আমি দেখলাম আমারই বয়েসি একটি তরুণী। মুখখানা ভারি সুন্দর। কিন্তু সুস্পষ্ট তিনটে আঘাতের চিহ্ন মুখের সমস্ত লাবণ্যকে যেন নষ্ট করে দিয়েছে। দুটো চিহ্ন তার মসৃণ দু চিবুকে, অন্যটা আরও গম্ভীর, ঠিক ভ্রূর কাছে। এমন ভারসাম্য রেখে মানুষের মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করার পেছনে যেন একটা যথেষ্ট শিল্পিক নিপুণতার পরিচয় রয়েছে।

আমার দিকে খানিকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে মেয়েটির মুখ থেকে মুছে গেলো ভয়ের রেখা। হাত থেকে বালি ঝেড়ে মাথায় বাঁধা সুতির রুমালটা ও ঠিক করে নিলো। তারপর কাঁধ বেঁকিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় তোমারও খিদে পেয়েছে, তাই না? তাহলে তুমিও একটু খোঁড়ো, আমার হাত ব্যাথা হয়ে গ্যাছে। এখানে নিশ্চয়ই রুটি আছে,' ইঙ্গিতে ও দোকানটা দেখিয়ে দিলো। 'এরা এখনও পর্যন্ত বেচা-কেনা করে।'

আমি খুঁড়তে শুরু করলাম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও আমাকে লক্ষ্য করলো, তারপর আমার পাশে বসে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে আমাকে সাহায্য করতে লাগলো।

নীরবে আমরা কাজ করে যেতে লাগলাম। এখন আমি বলতে পারব না ঠিক সেই মুহূর্তে অপরাধবোধ, নৈতিকতা, অপরের সম্পত্তি অধিকার বা ওই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাকে আলোড়িত করেছিলো কি না। যদিও সে সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, তবু যতটা সম্ভব সত্যের নামে হলফ করে বলতে পারি সে সময়ে আমি দেওয়ালের নিচে সুড়ঙ্গ কাটার কাজে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে ভেতরে কি পাওয়া যেতে পারে সে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুই ভাবতে পারিনি।

পায়ে পায়ে সন্ধ্যে এগিয়ে আসছে। হিম আর আঁধার আমাদের ক্রমশ ঘিরে ধরছে। ঢেউয়ের মাতন এখন আগের চেয়ে কিছুটা কম বলে মনে হলেও,

দোকানের কাঠের চালায় তখনও অঝরে বৃষ্টি পড়ছে। কোথায় যেন নৈশ-প্রহরীর জুতোর আওয়াজও শুনতে পেলাম।

'এর নিচে আবার কাঠের মেঝে নেই তো?' আমার সহকারী মেয়েটি ফিসফিস করে জিগেস করলো। ও কি বলছে কিছু বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটি আমার কানের কাছে মুখ এনে আর একটু জোরে বললো, 'আমি বলতে চাই কি, দোকানটার নিচে যদি শক্ত কাঠের মেঝে থাকে তাহলে খামোকা সুড়ঙ্গ কেটে কোন লাভ নেই। মিছিমিছি খাটুনিই সার হবে। তার চাইতে এসো বরং তালাটা ভেঙে ফেলি।'

মেয়েদের মাথায় ভালো বুদ্ধি খুব কমই আসে। কিন্তু এ মতলবটা মন্দ নয়। তাই কাজে লাগতেও দেরি করলাম না। দেখলাম তালাটা খুব সাধারণ। একটু চাপ দিতেই আংটা সমেত খুলে এলো। আর আমার অপকর্মের সঙ্গিনী চকিতে সাপের মতো পিছলে ভেতরে প্রবেশ করলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেলো ওর উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে!'

পুরুষদের স্তুতিগাথার চাইতে মেয়েদের সামান্যতম প্রশংসাও আমার কাছে অনেক বেশি রমণীয়। তবু এই মুহূর্তে মেয়েটির প্রশংসায় কান না দিয়ে আমি ভীত-উৎচকিত কণ্ঠে জিগেস করলাম, 'ওখানে কিছু আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই!' একটু নীরবতার পর ও আবিষ্কারের সুদীর্ঘ একটা ফিরিস্তি দিলো। 'বোতল রাখার পুরনো একটা ঝুড়ি, খালি থলে, ছেঁড়া ছাতা আর লোহার একটা বালতি।' সবকটাই অখাদ্য! মনে মনে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, হঠাৎ মেয়েটি উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই! পেয়েছি!'

'কি, কি পেয়েছো?'

'রুটি! একতাল সাদা রুটি···একটু যা ভিজে গ্যাছে···ধরো।'

অপকর্মের দুঃসাহসিকা রুটিটা আমার হাতে গছিয়ে দিলো। আর আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটুকরো ভেঙে মুখে পুরে চিবুতে শুরু করলাম।

'এই, আমাকে একটু দাও। চলো, তার আগে এখান থেকে পালাই।' বাইরে বেরিয়ে এসে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের মধ্যে ও চারদিকে তাকালো। 'কিন্তু কোথায় যাই বলো তো?'

'ওদিকে একটা ওলটানো নৌকো আছে। ইচ্ছে করলে আমরা ওখানে যেতে পারি।'

'চলো, যাই।'

লুটের মাল চিবুতে চিবুতে আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, শোনা যাচ্ছে নদীর তোলপাড়। অনেক দূরে কোথা থেকে যেন শিস দেওয়ার শব্দ ভেসে এলো। যেন নির্ভীক কোন দৈত্য বিষণ্ণ এই শরত-সন্ধ্যার সবকিছুকে দু হাতে ছিঁড়েখুঁড়ে উপহাস করছে, বিদ্রূপে বিচ্ছিন্ন করছে আমাদের মতো অসমসাহসী দুটি বীরকে। যত তাড়াতাড়িই আমরা গিলি না কেন, শব্দটা যেন ক্রমশ আমাদের বুকের ওপর চেপে বসতে লাগলো।

হঠাৎ কোনকিছু না ভেবেই জিগেস করলাম, 'তোমার নাম কি ?'

সশব্দে রুটি চিবুতে চিবুতে ও জবাব দিলো, 'নাতাশা।'

ওর দিকে তাকাতেই যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা আমার যেন ভিজে উঠলো। আমি সামনের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। মনে হলো নিয়তি যেন বিদ্রূপের চাপা হাসিতে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করছে।

অবিরাম বৃষ্টিধারা নৌকোর পিঠের ওপর মাদল বাজিয়ে চলেছে, ফুটে উঠছে চাপা বিষণ্ণ একটা দ্রিমি-দ্রিমি সুর। ভাঙা নৌকোর ফাটল দিয়ে হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে। বালিয়াড়ির বুকে বিরামবিহীন ব্যর্থ হতাশায় আছড়ে-পড়া নদীর ঢেউগুলো যেন কিছু শোনাতে চাইছে—তীব্র অসন্তোষভরা কিছু, যা সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে, যা থেকে ওরা পালাতে চাইছে, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছে না। কেবল গুমরে উঠছে চাপা আর্তনাদে। নৌকোর ওপরে একটানা বেজে চলেছে বৃষ্টির মাদল, পৃথিবীর বুক থেকে উঠছে বুক-ফাটা কান্নার হাহাকার। ঝোড়ো হাওয়ার বিষণ্ণ করুণ শোকগাথা।

নৌকোর নিচে আমাদের আশ্রয়টা যে-কোন পশুর পক্ষেও আরামপ্রদ নয়। নিচেটা ভিজে, ওপরের ফাটল দিয়ে টুপটাপ টুপটাপ হিমেল বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে, দমকে দমকে ঢুকছে ঝোড়ো হাওয়া। চুপচাপ গুটিসুটি মেরে বসে দুজনে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিলো ঘুমবার। নাতাশা নৌকোর গায়ে হেলান দিয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসে রয়েছে। হাঁটুদুটো জড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছে নদীর দিকে। মুখের কালশিরে-পড়া দাগ-গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ও একটুও নড়ছে না। ওর এই নিথর নিস্তব্ধতায় আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম, চাইছিলাম ওকে কথা বলাতে। কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে শুরু করবো নিজেই ভেবে পাচ্ছি না।

নাতাশাই প্রথম কথা বললো। 'উঃ, কি অভিশপ্ত জীবন !'

নৈর্ব্যক্তিক হলেও ওর কণ্ঠস্বরে এমন স্পষ্ট একটা বলিষ্ঠতা ছিল যাকে ঠিক

অভিযোগ বলে মেনে নিতে পারলাম না। হয়তো আগে এ সম্পর্কে ও বহুবার ভেবেছে, এখন হঠাৎ করেই বলে ফেললো। তাই ওর এই উক্তির বিরোধিতা না করে আমি চুপ করে বসে রইলাম। আর ও যেন আমার অস্তিত্বই সম্পূর্ণ ভুলে গেলো। 'যদি চিৎকার করে কাঁদতে পারতুম···' নাতাশার কণ্ঠস্বর আগের চাইতে এখন অনেক বেশি শান্ত আর মগ্ন, যেন অতীতের গহন গভীরে ও হারিয়ে গেছে। তবু এবারেও অনুযোগের কোন সুর খুঁজে পেলাম না। এটা স্পষ্ট যে জীবন সম্পর্কে ওর ভাবনা, যার চরম পরিহাস থেকে ও নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়, তার সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে না এলে চিৎকার করে কাঁদতে না পারা ছাড়া ওর কোন উপায় নেই।

ওর চিন্তার এই স্বচ্ছতার কাছে আমি নিজেকে যেন অসহায় বোধ করলাম। মনে হলো আর কিছুক্ষণ যদি চুপ করে থাকি তাহলে হয়তো অসহ্য কান্নায় ভেঙে পড়বো। আর তখন নিশ্চুপ মেয়েটির কাছে, বিশেষ করে যে কাঁদছে না, তার কাছে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। তাই ঠিক করলাম আমি কথা বলবো। এবং হাতের কাছে ভালো কিছু প্রশ্ন না পেয়ে হঠাৎ করেই জিগেস করলাম, 'কে তোমাকে মারলো?'

শান্ত স্বরে ও জবাব দিলো, 'পাশকা ছাড়া আবার কে!'

'লোকটা কে?'

'আমার বন্ধু, একজন রুটিওয়ালা।'

'ও তোমাকে প্রায়ই মারে?'

'মাতাল হলেই মারে।'

হঠাৎ আমার আরও কাছে ঘেঁষে এসে ও নিজের, পাশকার আর ওদের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে শুরু করলো। ও হচ্ছে রাস্তার মেয়ে আর লোকটা রুটিওয়ালা। লাল গোঁফ, খুব ভালো অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে পারে। নাতাশা ওকে পছন্দ করতো, কেননা লোকটা বেশ আমুদে আর ফিটফাট বাবু। ওর কোটের দামই পনের রুবল, সুন্দর চামড়ার বুট পরে। এইসব কারণে নাতাশা ওর প্রেমে পড়লো, আর পাশকা হয়ে উঠলো তার বিশেষ 'বন্ধু'। এইরকম একটা অবস্থায় অন্যান্য খদ্দেররা যখন নাতাশাকে মিষ্টি খাবার জন্যে যে পয়সা দিতো পাশকা সেগুলো হাতিয়ে নিয়ে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতো আর মাতাল হয়ে ওকে পিটতো। তাতেও ওর শান্তি হলো না, শেষে নাতাশার চোখের সামনে দিয়ে অন্য মেয়েদের নিয়ে ও ফুর্তি করতো।

'তাতে আমার কষ্ট হবে না বলো? আমি তো আর অন্য মেয়েদের চাইতে বেশি খারাপ নই। শয়তানটা শুধু আমাকে জ্বালাবার জন্যেই এসব করে। গতকাল আমি 'মাসি'র কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ওর বাড়িতে যাই, গিয়ে দেখি দুনকা ওর কাছে বসে রয়েছে। দুজনেই তখন পুরোদস্তুর মাতাল। আমি পাশকাকে বললুম, 'তুমি শয়তান। তুমি···তুমি একটা দু-মুখো সাপ।' ও তখন আমাকে প্রচণ্ড মারধোর করলো। চুলের মুঠি ধরে লাথি মেরে বাইরে বার করে দিলো। তাতেও আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু ও আমার নতুন জামাটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিলো। এখন আমি কি করবো বলো? কি করে মাসির কাছে গিয়ে মুখ দ্যাখাবো? উঃ, এখন আমার কী যে হবে!' হঠাৎ বিলাপের অসহ্য করুণ কান্নায় বুজে এলো ওর কণ্ঠস্বর।

বাতাসের দুরন্ত গর্জন, ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ হিমেল হাওয়া ঢুকছে। দাঁত আমার ঠকঠক করে কাঁপছে। আর নাতাশা আমার এত কাছে সরে এসেছে যে অন্ধকারেও আমি ওর জ্বলজ্বলে স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

'তোমরা সব পুরুষেরাই সমান। তোমাদের সব্বাইকে আমি দু পায়ে দলবো, মুখে থুতু দোবো। কোন ক্ষমা করবো না। তোমরা সবাই অকম্মার ধাড়ি! কেবল নোংরা নেড়িকুত্তার মতো লেজ নেড়ে ঘেউ ঘেউ করবে, আর বোকা মেয়েরা একবার আ-তু করে ডাকলেই অমনি তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে! যত সব হাড়-বজ্জাত পাজি বদমাইসের দল।'

ওর গালাগালিগুলো নিঃসন্দেহে বিচিত্র, কিন্তু তেমন কোন ভার নেই। ওর 'যত সব হাড়-বজ্জাত পাজি বদমাইসের দল' শব্দগুলোর মধ্যে আমি তো কোনটাতেই রাগ বা ঘৃণার কিছু খুঁজে পেলাম না। এমন কি উত্তেজনার বশে যে-কথাগুলো ও বললো, তা বিষণ্ণ হতাশা ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না। এ হতাশা এমনই মর্মস্পর্শী যে সত্তার গহন গভীরে আমাকে আলোড়িত করে তুললো। মৃত্যুর যথাযথ শিল্পিক বর্ণনার চাইতে যন্ত্রণাহত প্রকৃত মৃত্যু যেমন বাস্তব, ওর বুক-ফাটা যন্ত্রণার নিঃসঙ্গ এই হতাশাও ঠিক তেমনি বাস্তব।

ঠাণ্ডার চাইতে আমি আমার সঙ্গিনীর কথাবার্তায় যেন আরও বেশি জমে যাচ্ছিলাম। অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার দাঁতগুলো ঠকঠক করে উঠলো, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার গলার চারপাশে অনুভব করলাম ওর হিমেল দুটো বাহুর কোমল স্পর্শ। 'এই, কি হয়েছে তোমার?'

আমার ভাবতে ইচ্ছে হলো, এইমাত্র যে প্রশ্ন করলো সে নাতাশা নয়, অন্য কেউ। কেননা একটু আগে যে বললো সব পুরুষেরাই সমান, যাদের ও দু পায়ে দলে পিষে মেরে ফেলতে চায়, কেমন করে সে এত দ্রুত বদলে যেতে পারে!

'এই, তোমার কি হয়েছে বলো তো? ঠাণ্ডা লাগছে? তুমি জমে যাচ্ছো? কি অদ্ভুত! বলবে তো, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে। এসো, এসো, পেঁচার মতো চুপচাপ বসে না থেকে শীগ্গির শুয়ে পড়ো। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো…আমিও তোমার পাশে শোবো…হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার দু হাত দিয়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। দেখো, এবার গরম লাগবে। এর পর পিঠে পিঠ দিয়ে আমরা কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দেবো। এই, কি ব্যাপার…মদ খেতে পাওনি, না কি ওরা তোমাকে বরখাস্ত করেছে? তার জন্যে এত ঘাবড়াবার কি আছে?'

ও আমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিচ্ছে, আমাকে উদ্দীপ্ত করছে, যাতে না আমি শীতে জমে যাই। ভাগ্যের কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা! যখন আমি সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নিয়ে গুরুগম্ভীর চিন্তা করি, সমাজব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার স্বপ্ন দেখি, রাজনীতি এবং বিপ্লব নিয়ে মাথা ঘামাই, বইয়ে পড়া অতলস্পর্শী পাণ্ডিত্যগুলো নিয়ে রীতিমত মগ্ন থাকি, সমাজে বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে যে-আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সচেতন করে তোলার চেষ্টা করি, সেই আমি কিনা সামান্য একজন বেশ্যার দেহের উষ্ণতা নিয়ে নিজেকে উত্তপ্ত করছি! নিতান্তই সাধারণ প্রহার-জর্জরিত হতভাগ্য একটা মেয়ে, জীবনে যার মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই নেই, আমাকে সাহায্য করার আগে যাকে সাহায্য করার কথা আমার একবার মনেও আসেনি, আর এলেও তাকে কি সাহায্য করবো তখনও পর্যন্ত আমি নিজেই জানি না। আঃ, এ সবকিছুই একটা স্বপ্নে ঘটছে, অদ্ভুত বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্নে ঘটছে যদি ভাবতে পারতাম!

কিন্তু হায়, আমি সে-কথা ভাবতে পারি না। বড় বড় হিমেল বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে আমার গায়ে, নিটোল দুটো স্তন শক্ত করে চাপা আমার বুকের মধ্যে, ওর নিশ্বাসের উষ্ণ স্পন্দন পাচ্ছি আমার মুখে, যদিও তাতে ভদকার সামান্য একটু গন্ধ রয়েছে, তবু আমাকে তা উদ্দীপ্ত করে তুলছে। হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, বৃষ্টির মাদল বাজছে নৌকোর গায়ে, ছলকে ছলকে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে, আর নিবিড় আলিঙ্গনে তখনও আমরা দুজনে শীতে

ঠকঠক করে কাঁপছি। এ সবই নির্মম বাস্তব। এমনই বাস্তব যে সবচেয়ে কুৎসিত দুঃস্বপ্নেও কেউ কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ।

এদিকে নাতাশা অনর্গল বকেই চলেছে, কোমল স্নেহভরা সুরে, যা শুধু কেবল মেয়েরাই বলতে পারে। ওর প্রীতিমাখা আন্তরিক শব্দগুলো আমার বুকের মধ্যে দীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠছিলো আর তার স্নিগ্ধ কবোষ্ণতায় কি যেন গলে গলে মিশে যাচ্ছিলো আমার সত্তার গহন গভীরে।

এতদিন আমার বুকের মধ্যে জমা হয়েছিল অস্বাচ্ছন্দ্যভরা যে নগ্ন কুৎসিত ধূলি-ম্লানিমা, তা যেন একটি রাতেই ধুয়ে-মুছে আমার চোখ থেকে দু-ফোঁটা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। নাতাশা আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। 'থাক থাক, আর কাঁদে না, এই যথেষ্ট! দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে···' কথা বলতে বলতেই ও আমাকে চুমু দিলো, অগনন উষ্ণ চুম্বন।

কোন নারীর কাছ থেকে পাওয়া জীবনে এই আমার প্রথম চুম্বন, আর তা সবচেয়ে রমণীয়। কেননা এর পরে যা পেয়েছি রীতিমতো ব্যয়সাধ্য, এবং প্রতিদানে তা আমাকে প্রায় কিছুই ফিরিয়ে দেয়নি বললেই চলে।

'থাক, আর কেঁদো না লক্ষ্মীটি, এবার চুপ করো! কাল যদি তোমার কোথাও যাবার জায়গা না থাকে আমি সব ব্যবস্থা করে দোবো।' যেন ঘুমের ঘোরে আমি শুনতে পেলাম ওর অস্ফুট কোমল আশ্বাসধ্বনি।

ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমরা পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে শুয়ে রইলাম। নিশান্তিকার প্রথম আলো যখন ফুটে উঠলো, নৌকোর তলা থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। শহরে গিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বন্ধুর মতো আন্তরিক ভঙ্গীতে বিদায় নিলাম। ওর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। তারপর দীর্ঘ ছ মাস শহরের সবকটা বেশ্যাপল্লীতে আমি প্রিয়তমা নাতাশাকে খুঁজেছি, যার সঙ্গে শরতের একটি হিমেল রাত্রি আমি ওইভাবে অতিবাহিত করেছিলাম।

যদি ও ইতিমধ্যে মরে গিয়ে থাকে, ওর আত্মা শান্তিলাভ করুক। মৃত্যু হলেই ওর পক্ষে শ্রেয়! আর যদি বেঁচে থাকে, ওর যেন শুভ হয়। ওর হৃদয় যেন কখনও না অনুভব করে পাপবোধ, কেননা তাতে অহেতুক দুঃখের বোঝা কেবল বাড়বেই, জীবনকে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কোনদিন।

১৮৯৪

জীবন থেকে নেওয়া

গ্রামের কুঁড়েঘর ছাড়িয়ে মেঠো পথ ভেঙে এগিয়ে চলেছে একটা জটলা। ওদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

উত্তাল ঊর্মিমালার মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে মিছিল। সবার আগে আগে চলেছে জরাজীর্ণ একটা বেতো ঘোড়া, মাথাটা নোয়ানো। প্রতিবারে যখনই ও সামনের পা তুলছে, মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়লো ধুলোর মধ্যে নাক গুঁজে। আর যখন পেছনের পা তুলছে, দাবনার দিকটা তার নড়বড় করছে।

ছ্যাকড়া গাড়ির পাশাপাশি চলেছে একটি তরুণী। খুব বেশি হলে ষোলো-সতেরো বছর বয়স, শীর্ণ চেহারা, সম্পূর্ণ নগ্ন। গাড়ির হাতলের সঙ্গে ওর হাতের কব্জিদুটো শক্ত করে বাঁধা। চলতে গিয়ে পাদুটো কাঁপছে, টলে টলে পড়ছে। এলোমেলো চুলে ঢেকে গেছে সারা মুখ। কেবল ওর দীর্ঘায়ত উদাস চোখদুটো সোজা সামনের দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। সারা গায়ে চুন-কালির ডোরা-কাটা দাগ। কুমারীর মতো নিটোল বাঁ স্তনে গভীর ক্ষতচিহ্ন। তা থেকে গাঢ় একটা রক্তের ধারা নাভি পেরিয়ে পায়ের ঢাল বেয়ে সোজা নেমে গেছে গোড়ালি পর্যন্ত। দূর থেকে হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে সরু একফালি লাল রেশমী ফিতে কে সেঁটে দিয়েছে ওর গায়ে। শীর্ণ পায়ের পাতা-দুটো ধুলোয় ধূসর। সারা শরীরে, পেটে অপর্যাপ্ত বেপরোয়া লাঠি আর বুটের আঘাত, ফুলে কালশিরে পড়ে গেছে।

ধুলোর মধ্যে পা টেনে টেনে চলতে ওর কষ্ট হচ্ছে, সারা শরীর কুঁকড়ে উঠছে। যেন ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে ও আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না। তবু ও মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে পারছে না। কেননা পড়ে যাওয়ার আগে ওর হাতে-বাঁধা দড়িটাকে টেনে ওপরে তোলা হচ্ছে।

গাড়ির ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়া লম্বা-চওড়া একজন রুশ কৃষক। গায়ে তার সাদা বহির্বাস, মাথায় এস্ত্রেকানদের মতো কালো টুপি। কপালের ওপর দুলছে একগুচ্ছ উজ্জ্বল লালচে চুল। এক হাতে লাগাম, অন্য হাতে চাবুক দিয়ে ও একবার বেতো ঘোড়া আর একবার প্রায় অচেতন মেয়েটাকে সমানে চাবকে চলেছে। লোকটার চোখদুটো রক্তের মতো টকটকে লাল, হিংস্র উল্লাসে যেন ঝলসে উঠছে। মাঝে মাঝে তার ওপর পড়ছে চুলের

কালো ছায়া। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে, ঝকঝক করছে দু সারি সাদা দাঁত। থেকে থেকে প্রচণ্ড হেঁড়ে গলায় হুঙ্কার ছাড়ছে, 'এই মাগী, ছোট্! ছোট্!'

মেয়েটার ঠিক পেছনেই জনতার জটলা—হাসছে, চেঁচাচ্ছে, চিৎকার করছে, শিস দিচ্ছে, গালমন্দ আর বিদ্রূপ করছে। ফোচকে ছোঁড়াগুলো হাত পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে কেউ কেউ মেয়েটার সামনে ছুটে এসে অশ্লীল মন্তব্য করছে, আর জনতার মধ্যে হাসির রোল পড়ে যাচ্ছে। তার ফাঁকে ফাঁকেই শোনা যাচ্ছে চাবুকের তীক্ষ্ণ স্বনন, ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের মুখগুলোই সবচেয়ে বেশি খুশিতে ঝলমল করছে। ওদের চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে চাপা হাসির দীপ্তি। পুরুষরা কুৎসিত ভাষায় চিৎকার করে গাড়ির ভেতরের চাষীটাকে উৎসাহিত করছে। চাষীটা হা হা করে হাসছে আর মেয়েটার ওপর চাবুক চালাচ্ছে। চাবুকের প্রান্ত যখন সাপের লেজের মতো মেয়েটার কাঁধের চামড়া কেটে বসছে, মেয়েরা হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

মন্থর পায়ে নড়বড় করতে করতে বেতো ঘোড়ায় টানা গাড়িটা এগিয়ে চলেছে আর তার পাশে পাশে নির্যাতিত সেই মেয়েটা।

দক্ষিণে আকাশে একটাও মেঘ নেই। নির্মেঘ উন্মুক্ত আকাশ। মধ্যাহ্নের সূর্য অকৃপণ হাতে ঢেলে চলেছে তার জ্বলন্ত উত্তাপ।

না, ওপরের কাহিনীটা আমার কল্পনাপ্রসূত কোন শাস্তি-বিধানের প্রতিচ্ছবি নয়। ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্যি, যাকে বলে একেবারে জীবন থেকে নেওয়া। ঘটনাটা আমি নিজে চোখে ঘটতে দেখেছি ১৮৯১ সালের পনেরোই জুলাইতে, নিকোলায়েভস্কি জেলায় খারসন গুবারনিয়ার কাছে কাণ্ডিবোভকা গ্রামে।

যেখান থেকে আমি এসেছি, সেই ভলগা অঞ্চলেও আমি শুনেছি যেসব অবিশ্বাসিনী স্ত্রী স্বামীদের প্রতারণা করে, শাস্তিস্বরূপ তাদের সারা শরীরে আলকাতরা মাখিয়ে পাখির পালক সেঁটে দেওয়া হয়। কখনও কখনও চর্বি আর ঝোলাগুড় মাখিয়ে প্রখর গ্রীষ্মের দিনে ভীমরুলের চাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন কি আমি এমনও শুনেছি সেইসব মেয়েদের হাত পা বেঁধে বিষাক্ত পিঁপড়ের উঁচু উঁচু ঢিপিতেও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

সেদিন দেখা আমার নিজের চোখই প্রমাণ করে দিলো—অজ্ঞ নিষ্ঠুর জনসমাজে এরকম ঘটনা এখনও সম্ভব, লোভ আর বিদ্বেষে কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি-করা জীবন যাদের আজ বন্য পশুতে পরিণত করেছে।

১৮৯৫

সেমাগা কেমন করে ধরা পড়লো

সরাইখানার একটা টেবিলের সামনে কুড়ি আউন্স ভদকার একটা বোতল আর পনেরো কোপেকের কষা-মাংস নিয়ে সেমাগা চুপচাপ বসেছিলো।

ঝুল-কালি-পড়া নিচু সিলিং থেকে টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। কালো কালো কাল্পনিক কতকগুলো ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে তার বুকে। যেন ওরা হাসছে, গান গাইছে, হৈ-হল্লা করছে।

শেষ শরতের প্রচণ্ড ঝড়ের মাতন শুরু হয়েছে বাইরে। তার সঙ্গে বড় বড় কণায় দারুণ তুষারপাত। সে-তুলনায় সরাইয়ের ভেতরটা অনেক বেশি উষ্ণ আর মুখর। পরিচিত একটা গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে তার সর্বাঙ্গে।

ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই সেমাগা একাগ্র দৃষ্টিতে ঠায় দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যখনই কেউ ভেতরে প্রবেশ করছে, ওর চোখদুটো তীক্ষ্ণ আর সজাগ হয়ে উঠছে। কখনও সামনে টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে আসছে, কখনও আবার হাত দিয়ে নিজের মুখটা আড়াল করছে। নবাগতদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে ও নিজে যখন আশ্বস্ত হচ্ছে, গেলাস থেকে একটু একটু করে ভদকা গলায় ঢালছে কিংবা খানিকটা করে মাংসের টুকরো আর আলু কাঁটায় বিঁধে তুলে মুখে পুরছে। তারপর খুব ধীরে ধীরে মুখ নাড়ছে। আর মাঝে মাঝে সৈনিকদের মতো পাকানো গোঁফজোড়াটা চুমরে নিচ্ছে।

সামনের নোনাধরা রঙচটা দেওয়ালে তার এলোমেলো হেঁড়ে মাথার বিশ্রী ছায়া পড়েছে। আর প্রতিবার চিবুনোর সময় সেই ছায়াটা দেওয়ালে মৃদু ওঠা-নামা করছে, যেন অদৃশ্য কারুর জবাবের প্রত্যুত্তরে ও সমানে মাথা নাড়ছে।

সেমাগার মুখটা চওড়া, উঁচু চোয়াল, পরিষ্কার কামানো চিবুক। ধূসর রঙের বড় বড় দুটো চোখ, সামনের দিকে ঝুঁকে-আসা ঘন কালো ভ্রূ। চোখের পাতা কুঁচকে কুতকুতে চোখে তাকানো ওর অভ্যেস। কাকের বাসার মতো এলোমেলো কোঁকড়ানো কটা চুল।

মোটের ওপর সেমাগার মুখটা আহা-মরি-মরি গোছের কিছু নয়। ওর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তিতে এমন একটা ব্যর্থতার ছাপ রয়েছে, যা সাধারণত আশেপাশের লোকজনদের মধ্যে বড় একটা চোখে পড়ে না।

পরনে ওর জীর্ণ একটা পশমের কোট, কোমরের কাছটায় দড়ি দিয়ে বাঁধা। টুপি আর দস্তানাদুটো পড়ে রয়েছে টেবিলের এক পাশে।

ধীরে ধীরে মাংসটুকু শেষ করে সবে যখন আর একটা ভদকার কথা বলতে যাবে, দরজাটা হঠাৎ দুম করে খুলে গেলো, আর শনের পাকানো বড় একটা বলের মতো কি যেন সরাইখানার ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো।

'উঃ, বাপরে বাপ···শালার ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে গেলো!' বাচ্ছাদের মতো উত্তেজিত গলায় কে যেন চেঁচিয়ে কথাটা বললো।

'কেন? কি হয়েছে কি?'

আশেপাশের কয়েকজন ছেলেটাকে ছেঁকে ধরলো। ও তখন সামনের একটা চেয়ারে বসে হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতেই জবাব দিলো, 'পুলিস।'

'পুলিস!'

'যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই ধরে পেঁদাচ্ছে। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে ওরা দুদিক থেকে জায়গাটা ঘিরে ফেলেছে।'

'সেকি!'

'তবে আর বলছি কি। দুজন অফিসার আর একগাদা পুলিস এদিকে এগিয়ে আসছে।'

'কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'কাকে খুঁজছে ওরা, সেসব কিছু শুনেছো?'

'সেমাগা বোলে ওরা কাকে যেন খুঁজছে। নিকিফোরিচকে ওরা তার সম্পর্কে জিগেস করছিলো।' কুমড়ো-পটাসের মতো বেঢপ চেহারাটা এবার তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো।

'কেন, নিকিফোরিচকে কি ওরা ধরতে পেরেছে নাকি?' ঝাঁকড়া মাথায় টুপিটা চাপিয়ে নিয়ে সেমাগা ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'স্তেনকা স্ট্রীটে।'

'তুমি কি সোজা ওখান থেকেই আসছো নাকি?'

'পাগল হয়েছেন! আমি আসছি উলটো দিক দিয়ে ঘুরে বাগানের বেড়া টপকিয়ে। একখুনি আবার বজরায় কেটে পড়বো। নাহলে আমার ধারণা, ব্যাটারা এখানেও খুঁজতে আসবে।'

'তাহলে সোজা পিট্টান দাও।'

চোখের নিমিষে ছেলেটা আবার সরাইয়ের বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ওর পেছনে দরজার কপাটটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরাইয়ের মালিক, চোখে চশমা, মাথায় কালো আঁট-টুপি, রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারার বুড়ো ইওনা পেত্রোভিচ চিলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এলো। 'এই, এই শয়তান! সেদিন রাক্ষসের মতো গিলে পয়সা দিসনি যে বড়! দাঁড়া, তোকে ধরতে পারি একবার—শুয়োরের শুকনো ঠ্যাং কোথাকার, ব্যাটা পাজী, নচ্ছার!'

দরজার দিকে এগোতে এগোতে সেমাগা জিগেস করলো, 'কেন, কি ব্যাপার?'

'আর বলবেন না। খাবার সময় ডিশ চেটেপুটে খাবে, তারপর পেছন ফিরলেই দেখবেন হাওয়া হয়ে গ্যাছে।'

'আচ্ছা বদমাস তো!' আর দেরি না করে সেমাগা দরজার দিকে পা বাড়ালো।

রাস্তায় এলোমেলো হিমেল ঝোড়ো হাওয়া বইছে। শোনা যাচ্ছে চাপা গোঙানির মতো সোঁ সোঁ একটা শব্দ। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে ঘন তুষারপাত। সেমাগা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলো। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে, বাড়ির ছাদে আছড়ে-পড়া তুষারপাত আর বাতাসের শন শন শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পেলো না।

সেমাগা এগিয়ে চললো। কয়েক কদম গিয়ে বেড়া টপকে ও যখন ওপারে পৌছলো, দেখলো কাদের যেন পেছনের বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো। তার প্রত্যুত্তরে শোনা গেলো হ্রেষাধ্বনি আর মেঝেতে পা-ঠোকার শব্দ। সেমাগা চকিতে বেড়া টপকে আবার রাস্তায় ফিরে এলো। তারপর শহরের দিকে দ্রুত পা চালালো।

কিন্তু দু-এক মিনিট পরেই সামনে গোলমালের শব্দ শুনে সেমাগা ঘুরে দাঁড়ালো এবং অন্য একটা বেড়া ডিঙিয়ে কাদের যেন সামনের উঠোনে প্রবেশ করলো। এবার আর কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না। উঠোনের খোলা ফটক দিয়ে সোজা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলো। তারপর অন্য বেড়া অন্য আর একটা বাগান পেরিয়ে একসময় যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, দেখলো ইওনা পেত্রোভিচের সরাইখানার ঠিক উলটো দিকে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতেই সেমাগা লুকনোর মতো নিরাপদ একটা আস্তানার কথা চিন্তা করতে লাগলো, কিন্তু তেমন মনের মতো কোন জায়গা ও ভেবে পেলো না। পুলিসি অবরোধের ফলে সব নিরাপদ আস্তানাই এখন বিপজ্জনক হয়ে

উঠেছে। তাছাড়া এমন ঝড়ের রাতে বাইরে কাটানোও সম্ভব নয়। তাতে পুলিস বা নৈশ-প্রহরীর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কাই সবচেয়ে বেশি।

ধীর মন্থর পায়ে ও হেঁটে চললো। তুষার-ঝড়ের মধ্যে দেখলো সামনের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, বাতিস্তম্ভ সব শুভ্র আস্তরণে ঢেকে গেছে। হঠাৎ তুষারঝড়ের চাপা গোঙানির মধ্যেই ও তার আশেপাশে কোথায় যেন বাচ্ছার কান্নার মতো ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পেলো। চকিতে থমকে দাঁড়িয়ে বিপদের-গন্ধ-পাওয়া পশুর মতো গলা বাড়িয়ে ও কান পেতে শুনলো।

কিন্তু শব্দটা তখন থেমে গেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সেমাগা টুপিটা চোখের আরও একটু কোল পর্যন্ত নামিয়ে দিলো। কাঁধ বেঁকিয়ে তুষার-কণাগুলো ঝেড়ে ফেললো ঘাড়ের পাশ থেকে। আর তখনই ও আবার শুনতে পেলো ককিয়ে-ওঠা সেই কান্নাটা। এবার শব্দটা এলো ঠিক যেন ওর পায়ের নিচে থেকে। চকিতে চারদিকে তাকিয়ে, নিচু হয়ে ও মাটি হাতড়ে হাতড়ে দেখলো। একটা পুঁটলি মতো কি যেন হাতে ঠেকতেই ওটাকে সে তুলে নিলো। তুষার-কণাগুলোকে ঝরিয়ে ফেললো পুঁটলির গা থেকে।

'আরে, এ তো একটা বাচ্ছা দেখছি! কি ব্যাপার! আমি যে এখনও ভাবতেই পারছি না! কোত্থেকে এলি রে তুই? বাঃ, বেড়ে মজার ব্যাপার তো!' বাচ্ছাটার মুখের দিকে তাকিয়ে সেমাগা আপন মনেই বিড়বিড় করে বললো।

ওপরের কাঁথাটা তুষারে ভিজে গেলেও, ভেতরটা কবোষ্ণ। সেমাগার হাতের মুঠোর মতো ছোট্ট লাল টুকটুকে একটা মুখ, চোখের পাতাদুটো বন্ধ, কপালটা কুঁচকে রয়েছে। একটা হাতের আঙুল মুখের মধ্যে পুরে চুষছে। মাথার চারপাশের কাঁথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তার মুখে। আর যখনই ফোঁটাটা ঝরে পড়ছে, প্রতিবারেই বাচ্ছাটা ককিয়ে উঠছে।

সেমাগা এতক্ষণ মূক-বিস্ময়ে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো, এবার সে ওপরের ভিজে কাঁথাটা ওর গা থেকে খুলে দিলো।

বাচ্ছাটা কেঁদে উঠলো।

'ন-ন! ন-ন!' আস্তে আস্তে দুলিয়ে সেমাগা ওকে ভোলাবার চেষ্টা করলো। 'ন-ন! কাঁদে না···কাঁদলে কিন্তু তোকে ফেলে দেবো! এখন এটাকে নিয়ে কি করি? আচ্ছা বোকা তো, ফের কাঁদছিস।'

সেমাগার ধমকে বাচ্ছা কানই দিলো না। কচি গলায় আস্তে আস্তে ডুগরে চললো। সেমাগা বেশ দমে গেলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ···বুঝতে পেরেছি। তোর ঠাণ্ডা লাগছে, তুই কাঁপছিস। কিন্তু তোকে নিয়ে এখন কোথায় যাই, কি করি বল্‌তো?'

বাচ্ছাটা তখনও কাঁদছে।

'কিন্তু আমার কোন উপায় নেই,' নিচের কাঁথাটা টেনেটুনে ভালো করে জড়িয়ে সেমাগা ওকে আবার মাটিতে শুইয়ে দিলো। 'কিচ্ছু না! তুই তো নিজেই দেখতে পাচ্ছিস, তোর জন্যে আমি সত্যিই কিছু করতে পারি না। আমি যখন নিজেই পালিয়ে বেড়াচ্ছি, তখন তোকে কোথায় নিয়ে যাবো বল্‌? সুতরাং তোকে বিদায় জানানো ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই!'

হাত নেড়ে সেমাগা এক পা দু পা করে এগিয়ে গেলো। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললো, 'পুলিস এ জায়গাটা ঘিরে না ফেললে, তোর কিছু একটা হিল্লে আমি করতে পারতুম। কিন্তু পুলিস যে ঘিরে রয়েছে। আমি আর কি করবো বল্‌? তুই আমাকে ক্ষমা করিস। আমি জানি তোর কোন দোষ নেই, দোষ তোর মার। শয়তানীটাকে যদি একবার ধরতে পারতুম, তোর চোখের সামনে ওর হাড়-পাঁজরা গুঁড়িয়ে একেবারে মসলা-ভাজা করে ছাড়তুম। চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনতুম, যাতে এমন কাজ আর কখনও না করতে পারে। উঃ, মা নয় তো, ডাইনি! ডাইনিও নয়, পশু! নইলে তুই কোন্‌ আক্কেলে কচি একটা দুধের বাচ্ছাকে এমন ঝড়ের রাতে বরফের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলি? কেননা ওরা অবোধ অসহায়, তুষার-ঝড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টুক করে মরে যাবে বলে! গ্রীষ্মের শুকনো কোন রাত্তিরে ফেলে যেতে পারলি না, রাক্ষসী? তবু অন্তত অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারতো, কান্নার শব্দে কেউ না কেউ ওকে তুলে নিয়ে যেতো। এমন তুষার-ঝড়ে কেউ বাইরে বেরুবে না বলেই তুই ওকে ফেলে গেছিস!'

কথাটা মনে হতেই সেমাগা থমকে দাঁড়ালো। এবং মায়ের সঙ্গে এই স্বগত সংলাপে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েও আবার পায়ে পায়ে ফিরে এলো। বাচ্ছটাকে তুলে কোটের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো বুকের কাছে। ওর অদৃশ্য মায়ের প্রতি চরম কুৎসিত একটা মন্তব্য করে সেমাগা আবার ভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। বাচ্ছাটার জন্যে সত্যিই ওর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে!

সেমাগার বিশাল থাবার মধ্যে বাচ্ছাটা মৃদু নড়াচড়া করছে, ভারি কোটের ভেতরে ওর বুকে মুখ ঘষছে। সেমাগার কোটের নিচে ছেঁড়া কামিজ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশুর দেহের কবোষ্ণতায় ও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

'আচ্ছা দুষ্টু তো তুই!' তুষার-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সেমাগা আদর করে বললো, 'আমাকে কি তোর মা ঠাউরেছিস? নাঃ, তোর ব্যাপার-স্যাপার আদৌ ভালো বলে মনে হচ্ছে না। উঁহু, ও-রকম করিস না, পড়ে যাবি কিন্তু বলে দিচ্ছি!'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বাচ্ছাটা তখন মরিয়া হয়ে ছেঁড়া কামিজের মধ্যে দিয়ে মুখ গলিয়ে ওর স্তনাগ্রে উষ্ণ ঠোঁট ঘষছে।

হঠাৎ পথের মাঝেই নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ে সেমাগা অসহ্য জোরে চিৎকার করে উঠলো, 'উঃ ভগবান, ও দুধ খুঁজছে! ওর মায়ের বুকের দুধ!'

হঠাৎ-উত্তেজনায় সেমাগা নিজেই চমকে উঠলো। কিছুটা ভয়, কিছুটা লজ্জা, কিছুটা বুক-ভাঙা অসহ্য করুণায় ও স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারপর একটু একটু করে ও আবার নিজেকে সামলে নিলো।

'কি বোকা রে তুই! আমি কি তোর মা? তাহলে অমন করছিস কেন? তুই তো জানিস আমি একজন চোর, বদমাস!'

রাত্রির নির্জনতায় প্রতিধ্বনি হলো ঝোড়ো বাতাসের আর্তনাদ।

'নে নে, এখন ঘুমো। ঘুমিয়ে পড়্। চুপ, চুপ···ঘুমিয়ে পড়্। দুষ্টু ছেলে কোথাকার, আমার কাছে এক ফোঁটাও পাবি না। ন-ন, কাঁদে না। আমি তোর মা নই রে বোকা, দাই! আমি বরং একটা ঘুমপাড়ানি গান গাই, তুই ঘুমিয়ে পড়্।'

সেমাগা নিচু গলায় গুনগুন করে খানিকক্ষণ সুর ভাঁজলো।

চারদিকে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ঘনঘোর। বাঁধানো সড়ক ধরে সেমাগা এগিয়ে চললো। গানের সুর আর হাতের দোলায় বাচ্ছাটা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে টুপির প্রান্ত থেকে তুষারকণা গলে গলে ঝরে পড়ছে সেমাগার চিবুকে। হিমেল হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে যাচ্ছে। গলার মধ্যে কি যেন দলা পাকিয়ে উঠছে, চেপে বসছে বুকের কাছে। ঝড়ের রাতে এমন নির্জন খাঁ খাঁ পথে বুকের মধ্যে এ-রকম নিঃসীম তিক্ততা এর আগে ও আর কখনও অনুভব করেনি।

তবু একইভাবে ও সামনে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ অদূরে শুনলো ঘোড়ার খুরের শব্দ, তার বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি। সেমাগা চমকে উঠলো। চকিতে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো অশ্বারূঢ় দুটো ছায়া-মূর্তি। দু'পাশ থেকে তাকে ঘিরে ফেললো।

একই সঙ্গে অশ্বারোহী-পুলিস দুজন ওকে জিগেস করলো :

'কে তুই ?'

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'কি নাম তোর ?'

একজন পুলিস ঘোড়াসমেত প্রায় হুড়মুড় করে এসে পড়লো ওর ঘাড়ের ওপরে। 'কি আছে ওতে ? বার কর্ শিগগির।'

'কোথায় ? এখানে ? একটা বাচ্ছা।'

'কি নাম তোর ?'

'সেমাগা।'

'ওঃ, আ-চ্ছা ! তাহলে তুই-ই সেই লোক যাকে আমরা সারাদিন ধরে খুঁজছি। নে, আমার ঘোড়ার সামনে উঠে পড়্।'

'খুব ছোট বাচ্ছা, ওকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়া যাবে না। চলুন, আমরা দুজনে বরং হেঁটেই যাচ্ছি। পথের মাঝে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো শীতেই জমে যাবো।'

ওরা আর বিশেষ জোর করলো না, কিন্তু সারাক্ষণ ওকে চোখে চোখে রেখে যতটা সম্ভব কাছাকাছি ঘোড়ায় চড়ে চললো। আর সেমাগা এইভাবে পুলিস-পাহারায় সারাটা পথ পায়ে হেঁটেই ফাঁড়িতে এসে পৌঁছলো।

পুলিস দুজনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে কর্তব্যরত অফিসারটি যেন খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। 'বাঃ, শেষ পর্যন্ত তোমরা তাহলে ওকে ধরতে পারলে ?'

'না, বাচ্ছাটা না থাকলে আমাকে ধরার মুরোদ ওদের হতো না।'

'বাচ্ছা ! কিসের বাচ্ছা ? কই, দেখি !'

'এই যে, একে আমি পথের মাঝখানে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

কোটের তলা থেকে সেমাগা সন্তর্পণে ওকে বার করলো।

পুলিস অফিসার অবাক হয়ে গেলো। 'কিন্তু এ তো মরা !'

'ম-রা !' সেমাগা স্তম্ভিত। বাচ্ছাটাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে রেখে সে

খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আশ্চর্য!' কাঁথাটা সে আবার বাচ্ছাটার গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিলো। 'তোকে ফেলে আমার সোজা অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত ছিলো। তাহলে হয়তো…কিন্তু পারলুম না।'

সেমাগার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো। 'তোকে আমি রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলুম, এখন আমিই আবার তোকে শুইয়ে রাখছি!'

'বিড়বিড় করে তুমি কি সব যাতা বকছো?' অফিসার খেঁকিয়ে উঠলো।

সেমাগা কোন কথা বললো না, কেবল ম্লান করুণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকালো।

এতক্ষণ নির্জন সারাটা পথে যেসব অনুভূতি উত্তেজনা সেমাগার বুকের মধ্যে আনাগোনা করছিলো. বাচ্ছাটার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও যেন নিঃশব্দে মরে গেলো। পুলিস-প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে সে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। বিচার আর কারাবাস ছাড়া এখন আর কোন দিকে তাকাবার কিছু নেই। সেমাগা আবার তার করুণ বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো বাচ্ছাটার মুখের ওপর। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আচ্ছা বিচ্ছু তো তুই! তোর জন্যে আমি নিজেকে ধরা পড়তে দিলুম, আর তার বদলে তুই কিনা আমাকে কিচ্ছু ফিরিয়ে দিলি না! তুই নিজে তো মরলি, আমাকেও মেরে গেলি! বাঃ, বেশ ছেলে যা হোক বাব্বা!'

হাত ছড়িয়ে পিঠ বেঁকিয়ে সেমাগা বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙলো।

পুলিস-অফিসার প্রহরী দুজনকে হুকুম দিলো, 'একে নিয়ে যাও।'

ওরা তাকে নিয়ে গেলো।

১৮৯৫

কবরখানার নির্জন এক প্রান্তে, পাতায়-ছাওয়া বৃষ্টি-ভেজা জীর্ণ একটা কবরের ওপর, শীর্ণ দুটি বার্চের নক্সাকাটা-ছায়ায় বসে রয়েছে একজন নারী। পরনে শতছিন্ন রঙিন সুতির পোশাক, মাথায় কালো একটা শাল।

একগুচ্ছ ধূসর কুন্তল দুলছে বিশীর্ণ চিবুকের এক পাশে। সুন্দর পাতলা ঠোঁটদুটো সুসংলগ্ন। সারা মুখে বিষাদের ম্লান একটা ছায়া, অশ্রুসজল চোখের পাতাদুটো আনত।

অদূরে ওঁকে দেখে আমি যে থমকে দাঁড়ালাম, উনি তা খেয়ালই করলেন না। এমনকি আমাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখেও একটুও নড়লেন না। কেবল বিষণ্ণ দীর্ঘল চোখের পাতাদুটো একবার আমার দিকে মেলে দিলেন, তারপর এতটুকু কৌতূহল বা আগ্রহ না দেখিয়ে আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। যেন আমার উপস্থিতিটা কোন ব্যাপারই নয়।

অভিবাদন জানিয়ে নম্র স্বরে আমি ওঁকে জিগেস করলাম, 'এখানে কি কাউকে কবর দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে?'

উদাস স্বরে উনি শুধু ছোট্ট করে বললেন, 'আমার ছেলেকে।'

'বড় ছেলে?'

'বছর বারো বয়েস।'

'অনেক দিন আগে মারা গ্যাছে?'

'চার বছর আগে।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি চুলের গুচ্ছটা চিবুকের পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। গ্রীষ্মের তপ্ত নিদাঘ। অনুর্বর এই মৃত্যুর আবাসভূমিতেও সূর্য নির্মম হাতে ঢেলে চলেছে তার জ্বলন্ত উত্তাপ। উত্তপ্ত ধুলো আর রৌদ্রের তেজে ঘাসগুলো ঝলসে গেছে। কবরের আশেপাশে ছড়ানো-ছিটোনো শীর্ণ ধূসর গাছগুলোও মনে হচ্ছে মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ নিথর।

ছোট কবরটার দিকে তাকিয়ে জিগেস করলাম, 'কি করে মারা গেলো?'

'ঘোড়ার পায়ের নিচে থেঁতলে গিয়ে।'

'সেকি! কেমন করে হলো?'

যদিও জানি অশোভন, তবু ওঁর এই উদাসীনতা আমাকে মনে মনে অস্থির করে তুললো। ওঁর উপেক্ষার ভঙ্গিতে এমন একটা অস্বাভাবিকতা ছিলো, যে আমি কুতূহলী না হয়ে পারলাম না।

আমার প্রশ্নে উনি চোখ তুলে তাকালেন, যেন নিঃশব্দে আমার সর্বাঙ্গ জরিপ করে নিলেন। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগেরই মতো মগ্ন ম্লান স্বরে তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

'কেমন করে হলো বলতে গেলে গোড়া থেকেই বলতে হয়। তহবিল তছরুপের অভিযোগে ওর বাবা তখন দেড় বছরের কয়েদ খাটছে। সে-সময়ে আমাদের হাতে যে কটা জমানো টাকা ছিলো সবই খরচ হয়ে গ্যাছে। টাকা বলতে অবশ্য খুব সামান্যই ছিলো। সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওর বাবা যখন কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এলো, আমি তখন জ্বালানির জন্যে অশ্ব-মূলা পোড়াচ্ছি। আমার পরিচিত একজন মালী আমাকে এক ঝুড়ি নষ্ট অশ্ব-মূলা দিয়েছিলো। প্রথমে ভালো করে শুকিয়ে নিলে ওগুলো বেশ ভালোই জ্বলে। অবশ্য রান্নায় বিশ্রী একটা ধোঁয়া গন্ধ হয়। কলুসা তখন পাঠশালায় গ্যাছে। ও যেমন চালাক-চতুর ছেলে, তেমনি হিসেবি। পাঠশালা থেকে ফেরার পথে প্রতিদিনই ডালপালা কাঠকুটো যা পেতো কুড়িয়ে নিয়ে আসতো। তখন বসন্তকাল, বরফ গলছে। পায়ে ওর জমানো-পশমের জুতো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কতদিন ও পাদুটো কেটেকুটে একশা করে নিয়ে এসেছে। ওর বাবা যখন কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেলো, ওরা তাকে ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলো। কেননা সে তখন অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে সে তো আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আর আমি মনে মনে ভাবছি তাকে এখন কি খাওয়াবো। এক-একবার ইচ্ছে হচ্ছিলো তাকে ধরে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু তাকে দেখেই কলুসা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। চোখ মুখ তখন সাদা হয়ে গ্যাছে, চিবুক বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

"বাবার কি হয়েছে, মামণি ?' ও জিগেস করলো।

'বললুম, 'কিছু না, উনি আজই কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেয়েছেন, তাই।'

'আর ঠিক তখন থেকেই সবকিছু কেমন যেন মন্দ থেকে আরও মন্দের দিকে এগিয়ে চললো। মন্দ বলতে, তখনকার অবস্থা যেন মৃত্যুর চেয়ে আরও ভয়াবহ, জঘন্য। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কুড়ি কোপেকও রোজগার করতে পারতুম না। কলুসা সবকিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো আর মুখ কালো

করে দূরে দূরে সরে থাকতো। এভাবে চলা অসম্ভব! একদিন রাগের মাথায় বলেই বসলুম 'উঃ, কি অভিশপ্ত জীবন! শুধু যদি মরতে পারতুম, কিংবা তোদের দুজনের কেউ, তাহলে হয়তো হাড় জুড়োতো!' এতে ওর বাবা বললো, 'কেন মিছিমিছি রাগ করছো, এই তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই কাজে বেরিয়ে পড়বো।' কলুসা কিন্তু আমার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ও চলে যেতেই আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গ্যাছে। ঘন্টাখানেক পরে একজন পুলিস অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আমাকে জিগেস করলো, 'আপনি কি গসপোঝা সিসেনিনা?'

'বুকের ভেতরটা আমার ধড়াস করে উঠলো। কোনরকমে মাথা নুইয়ে অস্ফুট স্বরে বললুম, 'হ্যাঁ।'

"আপনাকে একবার হাসপাতালে যেতে হবে। বণিক আনোকিনের ঘোড়া আপনার ছেলের বুকের ওপর দিয়ে চলে গ্যাছে।'

'কোনরকমে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে পড়ি কি মরি করে তো ছুটলুম হাসপাতালে। সারা পথ মনে হলো আসনের নিচে কে যেন জ্বলন্ত কয়লা বিছিয়ে রেখে দিয়েছে। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলুম—আমি ডাইনি, আমি রাক্ষসী! এ আমি কি করলুম!

'শেষ পর্যন্ত যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছলুম, দেখলুম সারা গায়ে পটি-বাঁধা অবস্থায় কলুসা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে ও ম্লান ঠোঁটে হাসলো, চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমার কানের কাছে ফিসফিস করে ও বললো, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, মামণি। পুলিসের সেই লোকটার কাছে আমার টাকাপয়সা আছে।'

'আমি অবাক হয়ে গেলুম, 'তুই কি টাকাপয়সার কথা বলছিস, কলুসা?'

"কেন, রাস্তার লোকেরা আমাকে যে টাকাপয়সা দিয়েছিলো! আনোকিনও আমাকে দিয়েছিলেন···'

"কিন্তু ওরা তোকে কেন টাকাপয়সা দিতে যাবে? আমি তো তোর কথার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

"এর জন্যে, মামণি।' আঙুল দিয়ে ও নিজের ছোট্ট বুকটা দেখিয়ে দিলো। তারপর অস্পষ্ট যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো।

"কলুসা,' আমি কেঁদে ফেললুম। 'ঘোড়াটা আসছে তুই দেখতে পাসনি?'

"পেয়েছিলুম, মামণি। কিন্তু আমি তখন পথ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইনি. অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও ওর কালো চোখের মণিদুটো তখন চিকচিক করছে। 'কেননা আমি ভেবেছিলুম ঘোড়াটা যদি আমার গায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়, লোকে আমাকে পয়সা দেবে। আর তারা তা দিয়েও ছিলো···' শুধু এই কটা কথা ও কোন রকমে বললো। আমি তখন সব বুঝলুম, যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম ছোট্ট সোনাটা আমার কি করেছে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গ্যাছে। পরের দিন ভোরে ও মারা গেলো। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিলো। তাই শেষ রাত্তিরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেও আমাকে বলেছিলো—বাপির জন্যে এটা কিনে দিও, ওটা কিনে দিও : তোমার নিজের জন্যেও কিছু কিনো। যেন ওর কত টাকা। আসলে ছিলো সাতচল্লিশ রুবল। বণিক আনোকিনের কাছেও আমি গিয়েছিলুম। উনি আমার হাতে পাঁচ রুবল গুঁজে দিয়ে খুব বকাঝকা করলেন, 'দোষ তোমার ছেলের। ও ইচ্ছে করেই আমার ঘোড়ার পায়ের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। রাস্তার আর পাঁচজনকে জিগেস করে দেখো, ওরাও তাই বলবে। মিছিমিছি এরকম আর কখনও হাত পাততে এসো না।' তার পর থেকে আমি ওঁর কাছে আর কখনও যাইনি। এখন শুনলে তো সব কেমন করে ও মারা গ্যাছে।"

কথা শেষ হবার পরেও উনি আগের মতো সেই একই নিশ্চল উদাস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন।

কবরখানাটা নিস্তব্ধ নিঝুম। সাদা সাদা ক্রুশ, রুগ্ন গাছ আর জীর্ণ কবরের ওপর এই বিষণ্ণ নারীমূর্তি—সব মিলিয়ে দৃশ্যটা এমন করুণ, যা মানুষের দুঃখ বেদনা মৃত্যু সম্পর্কে আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেলো।

নির্মেঘ সারা আকাশ পৃথিবীর বুকে ঢেলে চলেছে তার জ্বলন্ত উত্তাপ।

পকেট থেকে সামান্য কটা টাকা বের করে আমি মেলে ধরলাম সেই মায়ের দিকে, দুর্ভাগ্যের হাতের শিকার হয়ে যিনি আজও বেঁচে রয়েছেন।

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে আশ্চর্য শান্ত স্বরে উনি বললেন, 'না, ভাই। মনে মনে তুমি কষ্ট পেও না। আজ আমার অনেক রয়েছে। এসব কিছুই চাই না। তাছাড়া এ পৃথিবীতে আজ আমি সম্পূর্ণ একা!'

বুক খালি করে উনি গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর হাত দুটো আবার শক্ত করে চেপে ধরলেন যন্ত্রণায় ম্লান হয়ে ওঠা পাতলা ঠোঁটের সঙ্গে।

১৮৯৫

একটি মেয়ের অবদান

'সত্যিই, ও ছিলো ভারি চমৎকার মেয়ে, আগন্তুক !'

কথাটা যখনই আমার মনে পড়ে, ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে ওঠে দুটো চোখ, কোমল ভালোবাসা আর সহানুভূতিতে মেশা সুন্দর মিষ্টি একটা হাসি। আর তখনই যেন বুকের মধ্যে শুনতে পাই আন্তরিকতায় ভারি হয়ে ওঠা ভাঙা ভাঙা দুটো কণ্ঠস্বর, 'সত্যিই ভারি চমৎকার মেয়ে !'

বিস্তীর্ণ করুণ স্বদেশভূমির নানান পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো ভবঘুরে জীবনের দশটা মাসের অজস্র স্মৃতির মধ্যে এ ঘটনাটা আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

জেদোন্স্ক থেকে ভরোনেজ যাবার পথে দুজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। একজন বৃদ্ধ, অন্যজন বৃদ্ধা। দুজনেই অশীতিপর। মন্থর পায়ে, মাঝে মাঝে থেমে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে, আগুনের মতো উত্তপ্ত ধুলোর মধ্যে পা টেনে টেনে ওঁরা যখন পথ হাঁটছিলেন, দেখলে সত্যিই মায়া হয়। অথচ সহজেই বোঝা যায় ওঁদের বেশভূষা, ওঁদের সারা মুখে এমন একটা অলৌকিক কিছু রয়েছে, যার টানে এই সুদীর্ঘ পথ ওঁরা অতিক্রম করে আসতে পেরেছেন।

আমার অনুমান লক্ষ্য করে বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, ঈশ্বরের কৃপায় তবোলস্কায়া গুবেরনিয়া থেকে সারাটা পথ আমরা পায়ে হেঁটেই এসেছি।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বৃদ্ধা স্নেহ-মাখা ধূসর চোখে আমার দিকে তাকালেন। একদিন হয়তো ওঁর কৌতুক-চাপা চোখের মণিদুটো সত্যিই নীল ছিলো, আজ তাতে বয়সের ছাপ পড়েছে। 'সেই লিসায়া গ্রাম থেকে এই বুড়ো-বুড়ি দুজন সমানে পায়ে হেঁটে আসছি।'

'আপনাদের ক্লান্তি লাগছে না ?'

'না, তেমন কিছু নয়। মনে হচ্ছে এখনও আমরা অনকেটা পথ হেঁটে যেতে পারবো।' বৃদ্ধা হাসলেন। 'আর কিছু না হোক, ঈশ্বরের কৃপায় বুকে হেঁটে তো যেতে পারবো।'

'কোন ব্রত আছে, নাকি এমনিই বৃদ্ধ বয়সে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন ?'

'ব্রতও বলতে পারো। কিয়েভের সন্ন্যাসীদের নামে আমরা একটা মানৎ করেছিলাম।' বৃদ্ধ এবার তাঁর সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এসো, আমরা ওই গাছের ছায়ায় বসে হাত-পাগুলো একটু ছাড়িয়ে নিই।'

'চলো।'

সুতরাং আমরা সবাই পথের ধারে ঝাঁকড়া একটা উইলোর ছায়ায় এসে বসলাম। আকাশে একটাও মেঘ নেই, গনগনে রোদে খাঁ খাঁ করছে চারদিক। নিচু পথের দু ধারে আদিগন্তবিশারী রুগ্ন রাইক্ষেত। দূরে আগুনের হলকা ছুটছে।

বৃদ্ধ কয়েকটা রাইয়ের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে দিলেন। 'ছ্যাখো, জলের অভাবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গ্যাছে।'

প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস, চাষীদের দুর্ভাগ্য নিয়ে আমরা নানান আলোচনা করলাম। বৃদ্ধা সারাক্ষণ আমাদের কথা কান পেতে শুনলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙা ভাঙা গলায় দু-চারটে মন্তব্যও করলেন। হঠাৎ এক-সময় কুঁকড়ে শুকিয়ে প্রায় ফাঁকা হয়ে যাওয়া রাইক্ষেতের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, 'অথচ ও বেঁচে থাকলে, তার ছোট ছোট হাতে নিজেই ক্ষেতের কাজে লেগে পড়তো।'

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, হয়তো সারাদিন নিজের কথা ওর খেয়ালই থাকতো না।'

দুজনের কাউকে আর কোন কথা বলতে না দেখে জিগেস করলাম, 'আপনারা কার কথা বলছেন?'

'ছোট্ট একটা মেয়ের কথা।'

বৃদ্ধা করুণ চোখে তাকালেন। 'আমাদের বাড়িতে থাকতো। এক ভদ্র-লোকের মেয়ে।'

'সত্যিই, ভারি চমৎকার মেয়ে!'

ওঁরা দুজনেই ধীরে ধীরে এমন কাতর স্বরে কথাগুলো বললেন, যেন আমার বুকের মধ্যে গেঁথে গেলো আর ওঁদের ভাঙা ভাঙা কণ্ঠের প্রতিটা শব্দ আমার কানে মন্ত্র উচ্চারণের মতো মনে হলো। তারপর ওঁরা এমন সুন্দর-ভাবে সমস্ত কাহিনীটি বলে চললেন, যেন একজনের মুখ থেকে অন্যজন কথাটা কেড়ে নিচ্ছেন। আর আমি দুজনের মাঝখানে বসে অবাক বিস্ময়ে একবার এঁর মুখের দিকে একবার ওঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছি।

'একবার এক ভদ্রলোক একটি মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আমাদের গ্রামে এলো। এসে গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে বললো, 'আপনারা কেউ দয়া করে এই মেয়েটিকে রাখুন।'

'অর্থাৎ, আপনারা কেউ মেয়েটিকে মানুষ করুন।' বৃদ্ধ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

'তারপর ওরা মেয়েটিকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলো।'

'তুমিই প্রথম দেখলে ঠাণ্ডায় মেয়েটা হিহি করে কাঁপছে।'

'সত্যি, এতটুকুন একটা মেয়ে, এমন চমৎকার···ভাবাই যায় না!'

'ওকে দেখে আমাদের তো তখন কান্না পাবার যোগাড়।'

'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, উনি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!'

'কেননা মেয়েটি যে-জায়গা থেকে এসেছে···'

'সেটা তো পশ্চিম, তাই না?'

'হ্যাঁ। প্রথমেই আমরা করলাম কি, তাপচুল্লীর ধারে উঁচু পাটাতনটায় ওকে নিয়ে এসে বসালাম।'

বৃদ্ধা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমাদের তাপচুল্লীটা ছিলো যেমন বড় আর তেমনি গরম।'

'তারপর আমরা ওকে খেতে দিলাম।'

'আর ও তখন কেমন হাসছিলো?'

'হ্যাঁ, ইঁদুরের মতো কুচকুচে কালো চোখের মণি থেকে চাপা হাসি যেন ঠিকরে পড়ছিলো।'

'আর ও নিজেও ছিলো ঠিক বাচ্ছা একটা খরগোসের মতন—যেমন চঞ্চল তেমনি মসৃণ।'

'একটু সামলে নেওয়ার পরেই মেয়েটার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো। ও বললো, 'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ!'

'তার কয়েকদিন পরেই মেয়েটা কি সুন্দর নিজেকে মানিয়ে নিলো?' বৃদ্ধা উজ্জ্বল চোখে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালেন।

'খুব সুন্দর!'

'রঙিন প্রজাপতির মতো এখানে ওখানে সেখানে, আমাদের সারা ঘরে যেন নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা গুছোচ্ছে, ওটা ঠিক করে রাখছে। জলের পাত্রগুলো নিজের হাতে বয়ে নিয়ে গিয়ে শুয়োরছানাদের খেতে দিচ্ছে। ওদের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আদর করছে। উঃ, সে এক দেখার মতো দৃশ্য!'

হাসতে হাসতে দুজনেরই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

'আর শুয়োরের ছানাগুলো কেমন ওর হাতে নাক ঘষতো!'

'শুয়োরছানাগুলোকে ও প্রায়ই ছেড়ে দিতো। বলতো, 'সব সময় ওদের ঘরে আটকে রাখা ঠিক নয়।"

'এক সপ্তার মধ্যে ও বাগানের বেড়াটেড়া বেঁধে সব ঠিক করে ফেললো।'

'আমাদের দুজনের কাজও ও করে দিতো।'

'সব সময় হাসছে, খেলছে, ছোট ছোট পায়ে সারা উঠোন ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তারপর হঠাৎ একদিন সব চুপচাপ হয়ে গেলো!'

'যেন এক ফুঁয়ে সব আলো কে নিভিয়ে দিলো।'

'কাঁদছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, যেন ওর ছোট্ট বুকটা কেউ ভেঙে দুখানা করে দিয়েছে। আমি তো অবাক। কি হয়েছে, কি ব্যাপার—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমিও কেঁদে ফেললাম। অথচ কেন কাঁদছি আমি নিজেই জানি না। ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলাম। আমরা দুজনেই তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদছি···'

'সেইটেই স্বাভাবিক। হাজার হোক আমাদের কাছে ও ছিলো নিজের ছেলেমেয়েদের চাইতে অনেক বেশি।'

'আর আমরাও তখন নিঃসঙ্গ। বড় ছেলে রয়েছে সেনাবাহিনীতে, ছোট ছেলে কাজ করছে সোনার খনিতে···'

'আর ওর বয়েস তখন সবে সতেরো।'

'সতেরো, কিন্তু দেখলে মনে হবে ঠিক যেন বারো!'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন ছোট্ট পাকা ফলটি!'

'তারপর ওর কি হলো?' উদগ্রীব হয়ে আমি জিগেস করলাম। বুঝলাম মনে মনে আমি কুতূহলী হয়ে উঠেছি।

'তারপর?' বৃদ্ধ বুক খালি করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, যেন বাতাসে কে হাহাকার করে উঠলো।

বৃদ্ধারও কুঞ্চিত চিবুক বয়ে তখন ঝরছে জলের দুটি ধারা। 'তারপর ও মারা গেলো।'

'মারা গেলো!' আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ, আগন্তুক।'

'সেকি! কি করে মারা গেলো?'

'প্রদাহ জ্বরে।'

'মাত্র দু বছর ও আমাদের কাছে ছিলো। গ্রামের সবাই ওকে চিনতো। তাছাড়া ও লেখাপড়াও জানতো। বড়দের আলোচনা সভায় গিয়ে বসতো। মাঝে-মধ্যে দু-চারটে কড়া মন্তব্যও করতো। কিন্তু কেউ ওর কথায় কিছু মনে করতো না। কেননা ও ছিলো যেমন নরম, তেমনি বুদ্ধিমতী।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ছিলো ওর হৃদয়। দেবদূতের মতো সুন্দর একটা হৃদয়। সবার দুঃখ কষ্টে ও আঘাত পেতো, মনে করতো এ দুঃখ তার নিজের। শহরে ভদ্রঘরের মেয়েদের মতো ও যেমন ভেলভেটের ফ্রক পরতো, চুলে ফিতে বাঁধতো, জুতো পায়ে ঘুরতো, বই পড়তো, তেমনি আবার সবার দুঃখকষ্টও নিজের বুক পেতে নিতো। আমাদের দুজনের তো ওর কিছুই অজানা ছিলো না। আমরা যদি জিগেস করতাম, 'তুমি এসব কি করে জানলে, সোনা?' ও হেসে জবাব দিতো, 'বারে, এসব যে বয়েতে লেখা আছে।' ভাবো একবার, এ হেন একটা মেয়ে, দুদিন বাদেই যার বিয়ে-থা হবে, তাকে কি না ওরা এখানে পাঠালো মরবার জন্যে!'

'সবাইকে ও যেভাবে শিক্ষা দিতো, দেখলে তোমার হাসি পেতো। এতটুকুন একটা মেয়ে, ছোট বড় সবাইকে বলছে, 'এটা কোরো না, ওটা কোরো না, ওটা আপনার করা উচিত নয়…"

'উঃ, ওর জ্ঞানও ছিলো বলিহারি!'

'আর সবার সবকিছুর জন্যে ও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো। কারুর অসুখ হয়েছে, অমনি ছুটলো তার সেবা করতে। কেউ বিপদে পড়েছে…'

'মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও সবার জন্যে ওর প্রাণ ছটফট করতো। আমরা ওর জন্যে পুরুতের ব্যবস্থাও করেছিলাম, ভেবেছিলাম যদি ওকে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু ও ফিরলো না। আমাদের ছেড়ে চলে গেলো।'

বৃদ্ধের শেষ কথাগুলো আমার বুকে ছুরির ফলার মতো এসে বিঁধলো। ওঁর অশ্রুসজল অভিব্যক্তিতে আমার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলো।

'সারা গ্রাম ভিড় করে এলো আমাদের উঠোনে। সবাই বললো, 'কেমন করে হলো? এ অসম্ভব!' সত্যিই ওরা ওকে ভীষণ ভালবাসতো।'

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তাছাড়া এমন মেয়ে আর কোথায়ই বা খুঁজে পাওয়া যাবে!'

'গ্রামের সবাই মিলে ওকে কবর দিলো। পাপস্খলনের চল্লিশদিন পর

আমাদের মনে হলো, ওর আত্মার শান্তির জন্যে আমাদের তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়া উচিত। প্রতিবেশীরাও একমত হলো। ওরা বললো, 'আপনারা নির্দ্বিধায় চলে যান, কোন পিছু-টানই আর আপনাদের বাধা দিতে পারবে না। হয়তো আপনাদের প্রার্থনায় ওর আত্মা শান্তিই পাবে।' তাই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।'

'তার মানে আপনারা ওই মেয়েটার জন্যেই বেরিয়ে পড়লেন?' স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে জিগেস করলাম।

'হ্যাঁ, নিষ্পাপ ওই মেয়েটির জন্যে। যত পাপীই আমরা হই না কেন, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন এবং ওর পাপ ক্ষমা করবেন। বাৎসরিক উপবাসের প্রথম সপ্তায়, মঙ্গলবারে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম।'

'শুধু সেই মেয়েটির জন্যে?' আমি পুনরাবৃত্তি করলাম।

বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ আগন্তুক, শুধু সেই ছোট্ট মেয়েটার জন্যে।'

আমি বারবার ওদের মুখ থেকেই শুনতে চাচ্ছিলাম এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ওঁরা চলেছেন শুধু সেই মেয়েটির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে। আমার কাছে এ যেন বিশ্বাসেরও অতীত বলে মনে হলো। কোন না কোনমতেই আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না—কালো চোখ, শুধু সেই মেয়েটির জন্যে এই কঠোর শ্রম কি করে সম্ভব! কিন্তু সম্ভাব্য সবরকম উদ্দেশ্যের কথা ভেবেও আমি এ ছাড়া আর অন্য কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না।

'এবং সত্যিই সারাটা পথ আপনারা পায়ে হেঁটে এসেছেন?'

'না, সারাটা পথ বললে হয়তো মিথ্যে বলা হবে। কখনও কখনও দু-চারটে গাড়িঘোড়া চড়েছি। হয়তো একদিন চড়েছি, পরের দিন আবার হেঁটেছি। একটু একটু করে পরিশ্রমের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি। এই বৃদ্ধ বয়েসে সারাটা পথ যে হাঁটা সম্ভব নয়, সে কথা ঈশ্বরও জানেন।'

'অথচ ও থাকলে···'

তারপরেই আবার শুরু হলো প্রদাহ-জ্বরে মৃত্যুলীন সেই মেয়েটি সম্পর্কে অসীম আগ্রহে ওঁদের পরস্পরের কথা কেড়ে নেওয়ার পালা।

*

ঘণ্টা দুই পরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। মেয়েটির জন্যে সারা মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে রইলো, অথচ হাজার চেষ্টা করেও মেয়েটির স্পষ্ট

কোন ছবি আমি ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না। আমার কল্পনাশক্তির এই অক্ষমতায় আমি নিজেরই বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

অবশ্য আকালের সেই দিনগুলোতে যে-কোন রাশিয়ানের পক্ষে ভালো এবং সুন্দর কিছু কল্পনা করা সত্যিই খুবই কঠিন···

অল্পক্ষণ পরেই আমাদের পেছনে দেখলাম ঘোড়ায় টানা একটা এক্কা। আমাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে ইউক্রেনিয়ান চালকটি মাথা থেকে টুপি খুলে ম্লান সমব্যাথীর চোখে তাকালো।

'আসুন, আপনাদের দুজনকে পরের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

ওঁরা ভেতরে প্রবেশ করলেন। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে গাড়ি ছুটে চললো। হাঁটতে হাঁটতে আমি সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম। দূরে একটু একটু করে গাড়িটা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরে রয়েছেন অশীতিপর দুজন বৃদ্ধ, যাঁরা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিষ্পাপ একটি মেয়ের ভালোবাসার অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে চলেছেন প্রার্থনা জানাতে।

১৮৯৫

গোলগাল বিষণ্ণ চেহারার একজন ইউক্রেনিয়ান সহকারী পুলিস অফিসার তাঁর অফিসঘরে বসে গোঁফে তা দিচ্ছেন আর জানলা দিয়ে উদাস চোখে বাইরে প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। গুমোট অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের ভেতরটা এমন নিস্তব্ধ নিঝুম যে ঘড়ির দোলকের মৃদু টিকটিক আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। অথচ বাইরের প্রাঙ্গণটা ভারি সুন্দর, যেমন উজ্জ্বল তেমনি খোলামেলা। মাঝখানে তিনটে বার্চ স্তব্ধ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার সেই নিটোল ছায়ায় কুখেরিন, যে একটু আগে পাহারার জন্যে এখানে বদলি হয়ে এসেছে, এখন ঘোড়ার জন্যে রাখা একগাদা শুকনো ঘাসের ওপর বসে ঝিমুচ্ছে। এই দৃশ্য সহকারী পুলিস অফিসার পদসিবলোকে ক্রুদ্ধ উত্তেজিত করে তুললো। কেননা ভ্যাপসা গরম আর চার দেওয়াল ঘেরা এই ছোট্ট খুপরির মধ্যে বেচারা ওপর-ওয়ালাকে যদি না ঠায় বসে থাকতে হতো, তাহলে না হয় ও ঘুমতে পারতো। ওঁর মনে পড়লো একসময়ে ঝোপ বুঝে উনিও বার্চের এই ছায়ায় সুগন্ধি ঘাসের গাদায় শুয়ে ঘুমিয়ে নিতেন। সেদিন সেই আরামের আমেজটুকু উপলব্ধি করতেই আড়মোড়া ভেঙে হাই তুললেন, মনে মনে আবার রুষ্টও হলেন। অদম্য ইচ্ছে হলো কুখেরিনকে জাগিয়ে দিতে।

'হেই! হেই কুখেরিন! এই শুয়োরের বাচ্ছা!' ঘরের ভেতর থেকেই উনি চাপা গর্জন করে উঠলেন।

ওঁর পেছনের দরজা ঠেলে কে যেন ভেতরে প্রবেশ করলো। কোনদিকে খেয়াল না করে উনি অপলক চোখে জানলা দিয়ে সোজা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ফলে কে ভেতরে প্রবেশ করলো, কে ওঁর পাশে এসে দাঁড়ালো, কার পায়ের চাপে কাঠের মেঝেটা দুলে উঠলো, এসব উনি কিছুই লক্ষ্য করলেন না। ওদিকে কুখেরিনেরও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথার নিচে হাত রেখে ও নিঃসাড়ে ঘুমচ্ছে। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে দাড়িটা উঁচিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। পুলিস অফিসারের মনে হলো এমন সুন্দর ছন্দিল সুরে ওকে নাক ডাকতে শুনছেন যে নিজেরই একটু গড়িয়ে নেবার বাসনা হচ্ছে। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়। প্রবল ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ওর ভুঁড়িতে প্রচণ্ড জোরে লাথি কষিয়ে দাড়ি ধরে হিড়হিড় করে ছায়া থেকে রোদ্দুরে টেনে আনে।

'হেই, হেই ব্যাটা কুম্ভকর্ণের বাচ্ছা, শুনতে পাচ্ছিস না ?'

'এখন আমার ডিউটি, স্যার।' পেছন থেকে কে যেন আস্তে আস্তে কথাটা বললো। ঘাড় ঘুরিয়ে পদসিবলো পুলিস-প্রহরীটির দিকে তাকালেন। সপ্রশ্ন চোখে ও এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন আদেশ পেলেই বেরিয়ে যাবে।

'আমি কি তোমাকে ডেকেছি ?'

'না, স্যার।'

'আমি কি তোমাকে কিছু জিগেস করেছি?' পদসিবলোর গলা চড়ে উঠলো। এবার উনি চেয়ারে ঘুরে বসলেন।

'না, স্যার।'

'তাহলে মাথায় কিছু ছুঁড়ে মারার আগে সোজা এখান থেকে দূর হয়ে যাও।' ডান হাতে চেয়ারের পেছনটা আঁকড়ে ধরে বাঁ হাত দিয়ে উনি সত্যিই তখন টেবিলের ওপর কিছু খোঁজার জন্যে হাতড়াচ্ছেন। প্রহরী ততক্ষণে মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছে। চোরের মতো এই ধরনের নিঃশব্দ প্রস্থান সহকারী একজন পুলিস কর্মচারীর কাছে কাম্য নয়, তাই মনে মনে তিনি অপমানিত বোধ করলেন। তাছাড়া মাথামোটা কুঁড়ের বাদশাটাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াও দরকার। আসন্ন মেলার জন্যে বহু কাজ, এমনকি অপ্রীতিকর অনেক ব্যাপার তখন তাঁর মাথায় গিজগিজ করছে।

'এই যে, শোন!' উনি আবার ডাকলেন।

প্রহরী দরজার সামনে থেকে ফিরে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। চোখের দৃষ্টি এখন ওর বদলে গেছে।

'এই যে, হেঁড়ে মাথা! যাও, উঠোনে গিয়ে কুখেরিন গাধাটাকে শিগগির জাগিয়ে দাও। দিয়ে বলো যে এটা নাক ডেকে ঘুমবার জায়গা নয়, বুঝেছো ?'

'হ্যাঁ, স্যার। একজন মহিলা আপনাকে…'

'কি বললে ?'

'একজন মহিলা!'

'মূর্খ! কি চায় ও ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, স্যার।'

'যাও, গিয়ে জিগেস করে এসো—কি জন্যে ও দেখা করতে চায়।'

'আমি জিগেস করেছিলুম, স্যার। আমাকে বললেন না, বললেন আপনার সঙ্গেই উনি কথা বলতে চান।'

'নিকুচি করেছে তোর মেয়েমানুষের ! ওকে আসতে বলো। কি, কম বয়েস তো ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ঠিক আছে। নিয়ে এসো।'

প্রহরী বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি চেয়ারে ঘুরে বসলেন। টেবিল থেকে তুলে নিলেন কয়েকটা কাগজ। এখন ওঁর কপালের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে কঠিন কর্তব্যের মগ্ন কয়েকটি রেখা।

পেছনে শুনলেন ঘাঘরার মৃদু খসখস শব্দ।

'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি ?' সামান্য একটু ঘুরে উৎসুক চোখে উনি তাকালেন। তরুণী নিঃশব্দে অভিবাদন জানিয়ে মন্থর পায়ে ওঁর দিকে এগিয়ে এলো। টানা ভ্রূর নিচে সমুদ্র-নীল আয়ত দুটো চোখ। চোখের পাতাদুটো ঈষৎ নামানো। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের মতো নিতান্তই সাধারণ পোশাক। মাথার ওপর দিয়ে একটা শাল জড়ানো। গলার কাছে শালের কিনার দুটো সুন্দর হাতের দীর্ঘ পেলব আঙুল দিয়ে চেপে রয়েছে। দীর্ঘ নিটোল শরীর, পীনোন্নত পরিপূর্ণ বুক, উঁচু কপাল। অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি চাপা আর গম্ভীর। বছর সাতাশ বয়েস। ধীর শান্ত পায়ে ও এগিয়ে এলো। ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো যেন বলতে চাইছে ফিরে যাওয়াই ভালো ছিলো।

চোখে চোখ রাখতেই পদসিবলোর মনে হলো—মন্দ নয় !

'দেখুন, আমি···মানে আমার শুধু একটা···' প্রতিধ্বনিত হলো গভীর অথচ মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর। কিন্তু শেষ হবার আগেই তরুণীর কণ্ঠ যেন বুজে এলো। আনত হলো ওর সমুদ্র-নীল আয়ত চোখের দৃষ্টি।

'বসুন।' পুলিসি ভঙ্গিতে পদসিবলো চিবিয়ে চিবিয়ে জিগেস করলেন, 'হ্যাঁ, এবার বলুন। আপনার শুধু···কি যেন একটা জিগেস করছিলেন ?' মনে মনে তারিফ করলেন—শুধু রূপসীই নয়, রসালোও বটে !

'আমার···মানে আমি শুধু একটা···'

'থামলেন কেন, বলুন ?'

'না, মানে···আমি শুধু একটা কার্ডের জন্যে এসেছি।'

'কার্ড !' পদসিবলো যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'কিসের কার্ড ?'

'আপনারা এখান থেকে যে কার্ড দেন···'

'বাসাবাড়ির' জন্যে ?'

'না না, ওসব নয়।'

'তাহলে ?'

'আপনারা যে কার্ড মেয়েদের দেন···' তরুণীর জিভ বেঁধে গেলো। যেন এক ঝলক রক্ত চলকে উঠলো ওর সারা মুখে।

পদসিবলো ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। অদ্ভুত একটা হাসি খেলে বেড়াচ্ছে ওঁর দু চোখে। 'মেয়েদের ! কোন্ ধরনের মেয়েদের বলুন তো ?'

'অন্য ধরনের মেয়েদের···মানে রাত্তিরে যেসব মেয়েরা রাস্তায় ঘোরে।'

'ওঃ হো-হো। বুঝেছি বুঝেছি, বেশ্যা তো ?'

'হ্যাঁ, আমি ওদের কথাই বলছিলাম।' তরুণী দম বন্ধ করে এমনভাবে হাসলো, যে কথাটা এতক্ষণ ও উচ্চারণ করতে পারছিলো না, দ্বিধাবোধ করছিলো, তা যেন এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

'ও, এই কথা !' এতক্ষণে মনের মতো খোরাক পেয়ে পদসিবলো যেন সজাব হয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, আমি ওই কার্ডের জন্যেই এসেছি।' ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরুণী সামনের চেয়ারে আলতো করে বসলো।

'তার মানে আপনি একটা বেশ্যালয় খোলার কথা ভাবছেন, এই তো ?'

'না না, আমি আমার নিজের জন্যেই চাইছি।'

'আ-চ্ছা !' দরজার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে উনি তরুণীর দিকে ঝুঁকে এলেন। 'তা আপনার পুরনো কার্ডটা কোথায় ?'

'পুরনো কার্ড ! আমার তো কোন পুরনো কার্ড নেই।'

'তার মানে পুলিসকে না জানিয়ে আপনি বুঝি এতদিন গোপনেই কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন ?' স্থির চোখে উনি তরুণীর মুখের দিকে তাকালেন। কুতকুতে চোখের মণিদুটো এখন তিরতির করে কাঁপছে। একটা হাত এসে পৌঁচেছে তরুণীর হাতের ওপর। 'অনেকেই অবশ্য তা করে। এখন আপনি নিরাপত্তার জন্যে পুলিসের খাতায় নাম লেখাতে চান, কি তাই তো ?'

'না, দেখুন,' তরুণী নামিয়ে নিলো তার নীল চোখের পাতাদুটো। 'আমি এর আগে এ কাজ কখনও করিনি।'

'তাই নাকি ! সত্যি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চোখের পাতা তুলে তরুণী অস্ফুটস্বরে বললো, 'মেলার জন্যে এখানে এই প্রথম এসেছি। এর আগে এ কথা আমি কখনও ভাবিওনি।'

'তাই বুঝি!' হাতটা সরিয়ে নিয়ে পদসিবলো চেয়ারের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

দুজনেই কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চুপ। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম।

'হুঁ, তাহলে এই জন্যে আপনি এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনার কথাটা যদি সত্যি বলেও ধরে নিই, তাহলে সত্যিই দুঃখজনক···মানে, আমি বুঝতেই পারছি না আপনার পক্ষে কেমন করে তা সম্ভব। আর যদি সত্যি না হয়···'

অভিজ্ঞ ঝানু পুলিস কর্মচারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া অত সহজ নয়। মুখে স্বীকার না করলেও উনি জানেন মেয়েটির প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। যদিও এই ধরনের ব্যবসার পক্ষে মেয়েটি এককথায় অনন্যা, তবু ওর চোখে মুখে বেশ্যাদের পরিচিতি অভিব্যক্তির কোন চিহ্নই তিনি খুঁজে পেলেন না।

'বিশ্বাস করুন, আমি একটুও মিথ্যে বলছি না!' মৃদুস্বরে কথাটা বললেও তরুণীর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রত্যয়। 'তাছাড়া এমন জঘন্য কাজে যখন একবার নামবার মনস্থ করেছি, তখন আর মিথ্যে বলে কি লাভ বলুন? সত্যি, বিশ্বাস করুন—শুধু অর্থ উপার্জনের জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমার স্বামী ছিলেন স্টীমার-চালক, গত শীতের শেষে তুষার-ভাঙনের সময় ডুবে মারা যান। আমার দুটো বাচ্ছা। একটা ন বছরের ছেলে, ছোট মেয়েটার বয়েস সাত বছর। হাতে একটাও পয়সা নেই, না কোন আত্মীয়স্বজন। ছেলেবেলায় আমি মানুষ হয়েছি একটা অনাথ-আশ্রমে। স্বামীর আত্মীয়স্বজনরা থাকেন অনেক দূরে। তাছাড়া ওঁরা সবাই অবস্থাপন্ন, আমাকে তেমন পছন্দও করেন না। কার ওপর নির্ভর করবো বলুন? কাজ করে অবশ্য রোজগার করতে পারি। কিন্তু যা রোজগার করি তার চাইতে আমার অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন। ছেলেটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে। লেখালেখি করলে হয়তো ওর মাইনেটা মুকুব করতে পারে, কিন্তু আমার মতো গরিব বিধবার দিকে নজর দেবার ওঁদের সময় কোথায়? অথচ এত সুন্দর মাথা, স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে মন সরে না। ছোট মেয়েটাও পড়াশোনা করে। ওর আবার যা দেখবে তাই কিনে দিতে হবে। কাজ করে আর কত রোজগার হবে বলুন? সারা মাস কারুর বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করলে হয়তো পাঁচ রুবল পাবো। ওতে আমার কিছুই হবে না। অথচ এ কাজে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কোন মেয়ে এক রাত্তিরেই সারা বছরের সংসার খরচের টাকা উপার্জন করতে পারে। আমার পরিচিত একটি মেয়ে তো গত বারের মেলায় চারশো রুবল

রোজগার করেছিলো। ওই টাকা দিয়ে ও একজন বনরক্ষককে বিয়েই করে ফেললো। এখন ও পুরোদস্তুর ভদ্রমহিলার মতো জীবন যাপন করছে। আপনি হয়তো বলবেন এ কাজ জঘন্য। কিন্তু আপনিই বলুন, না খেতে পেয়ে মরাটা কি এর চাইতেও জঘন্য নয়?'

পদসিবলো তরুণীর প্রতিটা শব্দ এতক্ষণ হাঁ করে গিলছিলেন, এবার মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করলেন। 'দেখুন, এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না বলে সত্যিই দুঃখিত। আপনি বরং স্বাস্থ্য-দপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং পুলিস-প্রধানকে লিখুন, ওঁরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।'

তরুণী আর অপেক্ষা করলো না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। তারপর ছোট্ট একটা অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। পদসিবলো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভ্রূ কুঁচকে একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন একটা ওঁর মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছিলো।

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে তরুণী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। সমুদ্র-নীল আয়ত চোখদুটো স্থির মেলে দিয়ে শান্তস্বরে জিগেস করলো, 'প্রথমে তাহলে কি পুলিস-প্রধানের সঙ্গেই দেখা করবো?'

'করুন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। বিদায়। তরুণী চলে গেলো।

টেবিলের ওপর কনুই রেখে পদসিবলো গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'নাঃ, মেয়েটা ভারি অদ্ভুত তো!'

'আমাকে ডাকছেন, স্যার?' আগের প্রহরীটিকে আবার দরজার সামনে দেখা গেলো।

'উঁ?'

'আমাকে কি আপনি ডাকলেন, স্যার?'

'বেরিয়ে যাও!'

'যাচ্ছি স্যার।'

'গর্দভ!' পদসিবলো জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন কুখেরিন তখনও অকাতরে ঘুমচ্ছে। সম্ভবত প্রহরী ওকে জাগিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু এখন ওঁর রাগ জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। নিদ্রালস মানুষের দৃশ্যটা ওঁকে

আর উত্ত্যক্ত করতে পারলো না। উনি এখন মানসচক্ষে দেখছেন মেয়েটার সমুদ্র-নীল আয়ত দুটো চোখ, অপলক স্থিরদৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে, আর উনি মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছেন।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই উনি লাফিয়ে উঠলেন। কোমরবন্ধটা শক্ত করে এঁটে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি জানি, ওর সঙ্গে কোথাও না কোথাও দেখা আমার হবেই।'

দুই

এবং হলোও তাই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মেলার প্রধান-দপ্তরের সামনে উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, দেখলেন মেয়েটি ধীর পায়ে পার্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নীল চোখের পাতা-দুটো স্থির, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। অনন্য দীর্ঘল ওর নিটোল দেহ-ভঙ্গিমায়, ওর ছন্দিল হাঁটায়, ওর তন্ময় চোখের অভিব্যক্তিতে কি যেন একটা আভিজাত্য, একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় ক্ষমতা রয়েছে। কেবল দু ভ্রূর মাঝে, সুন্দর রাশিয়ান মুখখানা ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে ম্লান একটা বিষণ্ণতা, যা প্রথম দিনে উনি দেখেননি।

পদসিবলো ধীরে ধীরে গোঁফের প্রান্তে মোচড় দিলেন, মনে মনে ভাবলেন ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে।

'এই যে, শুনছেন,' পেছন থেকে উনি ডাকলেন। 'হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি।'

মিনিট পাঁচেক পরে দুজনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা গেলো পার্কের নির্জন একটা বেঞ্চিতে।

মুচকি হেসে পদসিবলো জিগেস করলেন, 'কি, চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।' তরুণী ম্লান চোখের পাতা তুলে তাকালো। 'তারপর, কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি? কার্ড পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' তরুণী পকেট থেকে কার্ড বের করে দেখালো। 'এই যে।'

পদসিবলো মনে মনে বিব্রত বোধ করলেন। 'না না, দেখুন···আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিনি। এমনি জিগেস করছিলাম। তারপর রোজগার-

পাতি কেমন হচ্ছে ?' প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন বুকের ভেতর থেকে ওঁকে সতর্ক করে দিলো—কি দরকার পদসিবলো, মিছিমিছি পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ !

'রোজগারপাতি ?' চেরি ফলের মতো রাঙা হয়ে উঠলো তরুণীর দু চিবুক। 'মন্দ নয়।'

'বাঃ, শুনে খুব খুশি হলাম। নিশ্চয়ই দুর্দিনে কিছুটা সুরাহা হবে, তাই কি না বলুন ?'

তরুণী ওঁর দিকে ঝুঁকে এলো। মুখখানা বিবর্ণ সংকুচিত, যেন এখনই অঝর কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু চকিতে ও আবার নিজেকে সরিয়ে নিলো। তারপর আগের সেই ঋজু ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলো। 'হ্যাঁ, কিছুটা হবে বৈকি।'

ওর সান্নিধ্য, ওর নিশ্চল উপস্থিতি, ওর স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর, ওর অপলক নীল চোখের দৃষ্টিতে পদসিবলোর গাটা হঠাৎ কেমন যেন গুলিয়ে উঠলো। প্রচণ্ড বিরক্তিতে ফেটে পড়ার আগেই উনি উঠে পড়লেন। তারপর নিঃশব্দে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

তরুণী অস্ফুটস্বরে বললো, 'বিদায়।'

সামান্য একটু মাথা হেলিয়ে বলিষ্ঠ পায়ে উনি এগিয়ে গেলেন। নিজেকে এখন ওঁর কেমন যেন বোকা বোকা মনে হচ্ছে, আর তার জন্যে উনি মনে মনে নিজেকেই অভিসম্পাত দিলেন। 'ঠিক আছে, সুন্দরী ! আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো, তখন বুঝতে পারবে আমি একটা কি চিজ্ ! তখন আর তোমার উঁচু ঘোড়া থেকে নেমে আসতে তর সইবে না !' আপন মনে বিড়বিড় করলেও, উনি ভালো ভাবেই জানেন ওকে গ্রেফতার করার মতো এখনও পর্যন্ত কোন অন্যায় ও করেনি।

এবং সম্ভবত সেইজন্যেই মনে মনে উনি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

তিন

সেই সপ্তারই কয়েকদিন পরে সন্ধ্যেবেলায় পদসিবলো মরু-পান্থশালা থেকে বেরিয়ে সাইবেরিয়ান জেটিঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। মেয়েলি কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর অশ্রাব্য গালাগালি ভেসে আসছে পান্থশালার ভেতর থেকে।

'বাঁচাও! বাঁচাও! পুলিস!' আতঙ্কিত একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর। তার সঙ্গে উনি শুনলেন ধস্তাধস্তি আর চেয়ার টেবিল উলটানোর আওয়াজ। অন্য শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছে ভারি একটি পুরুষ কণ্ঠস্বর। অসীম উৎসাহে গলাটা চড়ে উঠলো। 'লাগাও, লাগাও! আচ্ছাসে লাগাও ওর নাকে!'

সহকারী পুলিস অফিসার পড়ি-কি-মরি করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন, দরজার সামনে দাঁড়ানো কুতূহলী জনতার ভিড় ঠেলে কোনরকমে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন তাঁর পরিচিত সেই নীল-চোখ তরুণী টেবিলের সামনে ঝুঁকে বাঁ হাতে অন্য একটা মেয়ের চুলের মুঠি ধরে ডান হাতে ওর মুখে নির্মমভাবে ঘুঁষি মারছে।

তরুণীর নীল চোখদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে, ঠোঁটদুটো সুসংলগ্ন। গাঢ় রক্তের দুটি ধারা ঠোঁটের কোল থেকে নেমে এসেছে চিবুক বেয়ে, আর ওর সুন্দর মুখখানা হিংস্র পশুর ক্রুদ্ধতায় এখন দেখাচ্ছে নির্মম, নিষ্ঠুর।

অন্য মেয়েটি প্রতিবারে আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে অস্ফুট একটা শব্দ করছে আর শূন্যে দু হাত তুলে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এই দেখে পদসিবলোর মাথায় রক্ত চড়ে উঠলো, অদম্য ইচ্ছে হলো কারুর ওপর প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিতে। দ্রুত ছুটে এসে উনি তরুণীর কোমর জড়িয়ে টেনে সরিয়ে আনলেন।

আঁকড়ে ধরতে গিয়ে টেবিলটা উলটে গেলো। চীনামাটির পাত্রগুলো মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেলো। ভিড় করে দাঁড়ানো জনতা উল্লসিত হাসিতে ফেটে পড়ছে।

উন্মত্ত ক্রোধে উনি হাসিতে-বিকৃত লাল মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। 'বাঃ, এখানে নাটক তো বেশ জমে উঠেছে দেখছি!'

নীল-চোখ তরুণীর হাতের শিকার তখন ভাঙা কাঁচের টুকরোর মধ্যে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছে আর মৃগীরোগীর মতো বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

লম্বা নীল কোট-পরা বেঁটে গুড়গুড়ে একটা লোক পদসিবলোকে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বললো, 'ওই মেয়েটা একে বললো—তুই ছেনাল, তুই একটা বেশ্যা। এ তখন ওকে প্রথম চড় মারলো। আর ওই মেয়েটা এর গায়ে এক গেলাস চা ঢেলে দিলো। তারপরেই এ ওর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে ঘুঁষির পর ঘুঁষি লাগালো। গায়ের জোরে এর সঙ্গে ও পারবে কেন···'

'হুঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' চাপা গর্জন করে উঠলেন পদসিবলো। দু

হাতের মধ্যে প্রচণ্ড রাগে ফুলে ফুলে ওঠা তরুণীর বাহুদুটো শক্ত করে চেপে ধরলেন। এমন সময় লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ একজন পুলিস-প্রহরীকে প্রবেশ করতে দেখে ওকে বললেন, 'একে থানায় নিয়ে যাও, ইভোচিক। এদের দুজনকেই নিয়ে যাও।'

ওদের দুজনকে নিয়ে যাবার পর পদসিবলো পরিচারককে হুকুম দিলেন, 'শিগগির এক বোতল কোনিয়াক আর সোডা নিয়ে এসো।' তারপর উনি জানলার ধারের একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। এখন ওঁর নিজেকে কেমন যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

পরের দিন ভোরে প্রথম দিনের মতো শান্ত ঋজু ভঙ্গিতে তরুণী পদসিবলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। অতল নীল চোখদুটো মেলে দিয়ে ও অপেক্ষা করে রইলো। মনে মনে চাইলো সহকারী পুলিস কর্মচারীই প্রথম কথা বলুক।

রাত্তিরে যথেষ্ট ভালো ঘুম না হওয়ায় পদসিবলোর মেজাজটা এমনিতেই আগে থেকে বিগড়ে ছিলো, এখন রাগে রাগে টেবিলের কাগজপত্তর সব একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তবু কি বলবেন কিছু ভেবে পেলেন না। আসলে বিশেষণমূলক বেশ কিছু কড়া কড়া কথা শোনাবার ইচ্ছে ছিলো।

'অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, কথা বলুন। প্রথম কি করে শুরু হলো?'

'ও আমাকে অপমান করেছিলো।'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো পদসিবলোর কণ্ঠস্বর।

'নিশ্চয়ই। আমাকে এভাবে অপমান করার ওর কোন অধিকারই নেই। আমি ওর সমতুল্য নই।'

'তা কিসের তুল্য আপনি নিজেকে ভাবেন?'

'প্রয়োজনের জন্যে আমি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। অথচ ও···'

'অথচ ও নিজের দেহের প্রয়োজনে এ কাজ করছে, কি, তাই তো?'

'আপনি কি ওর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি।'

'ও তো একটা বাঁজা মেয়েমানুষ, ওর কোন বাচ্চাই নেই।'

'থাক থাক, খুব হয়েছে। এবার চুপ করুন। আপনি কি ভাবেন আপনার বাচ্চাদের ধুয়ে আমি জল খাবো? শুনুন, এবারের মতো আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু এর পরে ফের যদি আর কখনও কোন গণ্ডগোল করেন,

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি আপনাকে শহর থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে বাধ্য হবো। তখন আর মেলায় রোজগার করে খেতে হবে না। আমি আপনার মতো নোংরা চরিত্রের মেয়েদের চিনি, বুঝলেন?'

কুৎসিত অপমানকর শব্দগুলো এখন অনায়াসে ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। আর তরুণীর সারা মুখ বিবর্ণ পাংশুল হয়ে উঠলো। গত রাত্রের মতো নীল চোখদুটো ওর কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে।

'বেরিয়ে যান এখান থেকে।' টেবিলের ওপর প্রচণ্ড জোরে ঘুঁষি মেরে পদসিবলো চিৎকার করে উঠলেন।

'ঠিক আছে, ভগবান একদিন আপনার বিচার করবেন।' শুকনো গলায় কথাটা বলে তরুণী দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

'দেখবো কে কার বিচার করে।' চিৎকার করে পদসিবলো জবাবটা ছুঁড়ে দিলেন। ওকে অপমান করতে পেরে এখন মনে মনে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছেন। ওর প্রশান্ত মুখ, আয়ত নীল চোখের স্থির দৃষ্টি ওঁকে কেমন যেন ক্ষিপ্ত করে তোলে। নিজেকে ও কি ভাবে কি? মনিব? দুর্বিনীত? নিজের বাচ্ছা আছে বলে? ভারি বয়েই গেলো। সাধারণ একটা রাস্তার মেয়েমানুষ, ভবঘুরে···চাল নেই চুলো নেই, মেলায় এসেছে দুটো পয়সা রোজগার করতে ···আসল উদ্দেশ্য কি কে জানে। কৃচ্ছ্রসাধন···বাচ্ছাদের মানুষ করবে, না কারুর ঘাড় ভাঙবে? বেশ্যাকে বেশ্যা বলে স্বীকার করার যার সাহস নেই, কেবল অন্যকে দোষ দেয়···যত্ত সব!

চার

স্কুলের জীর্ণ পোশাক-পরা দুটো বাচ্ছা বসে রয়েছে কাসিন জেটিঘাটের একটা বেঞ্চিতে। শরতের হিমেল হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছে। ছেলেটার মাথায় কালো রুমাল বাঁধা, মেয়েটার গায়ে পশমের কোট। কোটটা ওর ছোট্ট শরীরের তুলনায় অনেক বড় আর ঢলঢলে। দুজন পাশাপাশি বসে নিচু গলায় কি যেন গল্প করছে। মা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের ঠিক পাশে থাক-থাক-করে-রাখা একরাশ বস্তার গায়ে হেলান দিয়ে। স্নেহমাখা তন্ময় নীল চোখদুটো অপলক তাকিয়ে রয়েছে বাচ্ছাদুটোর দিকে।

ছোট ছেলেটাকে দেখতে ঠিক ওর মার মতো। নীল চোখদুটো মেলে

দিয়ে মৃদু হেসে হেসে তার ছোট বোনকে কি যেন বলছে। বাচ্ছা মেয়েটার মুখে বসন্তের দাগ, ছোট্ট তীক্ষ্ণ নাক, হালকা-ধূসর দীঘল চোখদুটো আশ্চর্য উজ্জ্বল আর জীবন্ত। ওদের আশেপাশে তক্তার ওপর রাখা স্তূপাকৃত মালপত্তর।

শরতের শেষ। সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। ভলগার কানায় কানায় বহে চলেছে ঘোলা জলের স্রোত, ক্রুদ্ধ আক্রোশে আছড়ে পড়ছে তীরে। স্যাঁতসেঁতে ভিজে হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাদের চাপা গর্জন। নানান ধরনের মানুষ ত্রস্ত যাওয়া আসা করছে, চোখে মুখে উদ্বিগ্নের ছাপ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টীমারটা কাসিন জেটিঘাট ছেড়ে ভলগায় পাড়ি দেবে।

দূর থেকে ওদের তিনজনকে দেখে পদসিবলো প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, এবার ভালো করে লক্ষ্য করার জন্যে সামনে এগিয়ে এলেন। কেন জানি মনে মনে উনি কিছুটা লজ্জিতও হলেন।

স্টীমার ঘাটে এসে লাগার আগেই লোকজন জেটির ওপর ভিড় করতে শুরু করছে।

তরুণী তার তল্পিতল্পা তুলে নিলো। বাচ্ছাদুটোও তাদের পিঠে ছোট দুটো পুঁটলি নিয়ে মার পেছন পেছন টিকিট-ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো।

পদসিবলোর ইচ্ছে ছিলো জেটির ওপর গিয়ে দাঁড়ায়, তাছাড়া ভিড় সামলানোর প্রয়োজনও ছিলো। কিন্তু পারলেন না। টিকিট-ঘরের অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন।

তরুণী টিকিট-ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতে ওর টাকাপয়সা রাখার ছোট একটা ব্যাগ, একগাদা পাকানো নোটে ঠাসা। 'এই বাচ্ছাদুটোর জন্যে কস্ত্রোমার দুটো দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দিন না, আর আমার জন্যে একটা তৃতীয় শ্রেণীর। কিন্তু অনুগ্রহ করে বাচ্ছাদুটোর জন্যে একটা টিকিটের দাম নেবেন। কি বললেন? ব্যতিক্রম? হ্যাঁ, তা তো বটেই। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

তরুণীর সারা মুখ খুশিতে ঝলমল করছে। তল্পিতল্পা তুলে নিয়ে ও ফেরি-ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলো। বাচ্ছাদুটো এবার দু পাশ থেকে মার ঘাঘরার প্রান্ত শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে হাঁটছে। ছোট্ট মেয়েটা মুখ উঁচু করে মাকে কি যেন বললো। শুনে মা ঠোঁট টিপে হাসলো। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কিনে দেবো বলেছি তো, বলিনি? না কি যা চেয়েছো কখনও কিনে দিইনি? দুজনকেই দিতে হবে? ঠিক আছে। এখানে চুপটি করে দাঁড়াও, আমি একখুনি আসছি।'

ফেরিঘাটার মুখে সারি সারি দোকানগুলোর দিকে ও এগিয়ে গেলো।

একটু পরেই ও আবার ফিরে এলো। 'এই নাও, তোমার জন্যে গায়ে মাখার সাবান। কি সুন্দর গন্ধ একবার শুঁকে ছাখো! আর তোমার জন্যে এই পেনসিল কাটার ছুরি। ছাখো, আমি কিচ্ছু ভুলিনি। আর তোমাদের জন্যে এই এক ডজন কমলা। দেখো, যেন আবার একবারেই খেয়ে ফেলো না।'

এবার স্টীমার এসে জেটির গায়ে লাগলো। হঠাৎ ধাক্কায় অনেকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। মা বাচ্ছাচুটোকে আঁকড়ে ধরে বিস্ফারিত চোখে চারপাশে দৃষ্টি বোলালো। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ না দেখে হেসে ফেললেন। বাচ্ছারাও খিলখিল করে হেসে উঠলো। সিঁড়িটা নামিয়ে দেওয়া হলো, যাত্রীরা পিলপিল করে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

'আস্তে আস্তে উঠুন, আস্তে আস্তে! এত ঠেলাঠেলি করবেন না!' জেটির মুখে দাঁড়িয়ে পদসিবলো তখন ভিড় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। 'এই যে মাথা-মোটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে বলছি···' পিঠে ঝোলানো করাত, বাটালি, তুরপুন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সমেত একজন ছুতোর মিস্ত্রির দিকে তাকিয়ে পদসিবলো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'চোখে দেখতে পাও না? সরো সরো, বাচ্ছা আর মেয়েদের আগে যেতে যাও। আর এইসব ধারালো যন্ত্রপাতি নিয়ে একটু সাবধানে চলাফেরা করবে তো!'

পরিচিত মহিলা আর বাচ্ছাচুটোকে জেটির মুখ অতিক্রম করতে দেখে পদসিবলোর গলার স্বর নিচু খাদে নেমে গেলো। তরুণী আয়ত নীল চোখচুটো মেলে দিয়ে মিষ্টি করে হাসলো।

তৃতীয় বাঁশি পড়লো।

সারেং সিঁড়ি তুলে নেওয়ার আদেশ দিলো।

স্টীমার এবার একটু একটু করে জেটি ছাড়তে শুরু করছে। রেলিংএর সামনে দাঁড়ানো ভিড়ের মধ্যে পদসিবলো পরিচিত মুখটাকে খোঁজার চেষ্টা করলেন। যখন খুঁজে পেলেন, মাথা থেকে টুপি খুলে হাত নাড়লেন। তরুণী বুকের ওপর আাড়াআড়ি হাত রেখে সামান্য একটু ঝুঁকে অভিবাদন জানালো।

মা আর বাচ্ছাচুটোকে এভাবে কস্ত্রোমার পথে পাড়ি দিতে দেখে সহকারী পুলিস কর্মচারী, পদসিবলো হঠাৎ কেন জানি গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ফিরে আসার পথে নিজেকে ওঁর বিষণ্ণ আর ভীষণ অসুখী মনে হলো।

১৮৯৫

কবি

স্কুল থেকে ফিরে এসে সুরা কোটটা খুলে ফেললো। রান্নাঘরে প্রবেশ করে মামণিকে খাবার টেবিলের সামনে বসে মুচকি মুচকি হাসতে দেখে ও কেমন যেন কুতূহলী হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রশ্ন করে কুতূহল নিবৃত্তি করাটাকে ওর অশোভন মনে হলো, কেননা ও এখন বড় হয়ে গেছে। তাই মামণির কপালে নিঃশব্দে একটা চুমু দিয়ে আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিলো। তারপর চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। কিন্তু আর একবার কৌতূহলী না হয়ে পারলো না। দেখলো টেবিলটা পাঁচজনের জন্যে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে নৈশ-ভোজের জন্যে কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সুরা হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বাপি, মামণি আর জিনা-জেঠির উপস্থিতি ও অনুমান করতে পারলো। কিন্তু এদের তিনজনের মধ্যে কারুর সঙ্গেই তেমন জমিয়ে গল্প করা যায় না। ভীষণ একঘেয়ে! তাই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে স্বাভাবিক স্বরে ও জিগেস করলো, 'কে আসছে, মামণি?'

উত্তর দেবার আগে মামণি ওর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তারপর আবার খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন। শেষে ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসলেন। 'আন্দাজ কর্।'

'ঠাট্টা করছো তো?' সুরা অনুমান করতে পারলো ওর কৌতূহল এখন তীব্র হয়ে উঠছে। মনে পড়লো রান্নাঘরে আসার আগে বাড়ির পরিচারিকা লিউবা দরজার সামনে ওকে বলেছিলো, 'ওমা, আপনি এসে পড়েছেন, দিদিমণি!' এর আগে স্কুল থেকে ফিরে আসতে দেখে লিউবা কোনদিন এত খুশি বা অবাক কোনটাই হয়নি। এখন ও স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ছকে-বাঁধা একঘেঁয়ে পরিবারের জীবন-তরঙ্গে কোথায় যেন একটা নতুনত্বের সুর বাজছে। কিন্তু আসল রহস্যটা ওর ছোট্ট মাথায় কিছুতেই প্রবেশ করলো না।

'ও মা, ঠাট্টা করবো কেন?' মামণি আবার মুচকি মুচকি হাসলেন। 'তুই নিজে থেকে একটু আন্দাজ করার চেষ্টা কর্।'

সুরা স্বাভাবিক হবার ভান করলো। 'নিশ্চয়ই কোথা থেকে কেউ আসছেন!'

'সে তো বটেই। কিন্তু কে?'

চিবুকের পাশদুটো সুরার রক্তিম হয়ে উঠলো। 'নিশ্চয়ই ঝেনা-কাকু।'

'না না, আত্মীয়স্বজনদের কেউ নয়। কিন্তু এমন কেউ, যাকে দেখার জন্যে তুই পাগল।'

সুরা চোখ বড় বড় করে তাকালো। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মামণিকে জড়িয়ে ধরলো। 'সত্যি, মামণি?'

'থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না! খুব হয়েছে!' মামণি হাসতে হাসতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। 'দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! দাঁড়া না, উনি আগে আসুন, আমি ঠিক বলে দেবো।'

'সত্যি মামণি, ক্রিমস্কি কি আসছেন? বাপি ওঁকে আনতে গ্যাছেন? আর জিনা-জ্যেঠি? ওঁরা তো তাহলে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন! আমি তাহলে সবচেয়ে ভালো ফ্রকটা পরে আসি। ওঁরা আসছেন···ইস্, কি মজা!'

আনন্দ-উত্তেজনার চোটে সুরা মামণির চেয়ারের চারপাশে এক চক্কোর ঘুরেই নিলো। তারপর ছুটে এসে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। যখন পোশাক পালটাবার জন্যে ও বেরিয়ে যাচ্ছিলো, সিঁড়ির নিচে থেকে শুনলো সদর-দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। সুরা আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে চুলটা ঠিক করে নিলো। তারপর চেয়ারে ফিরে এসে চোখের পাতা বন্ধ করে শক্ত হয়ে বসে রইলো, যাতে ভেতরের চাপা উত্তেজনাটাকে ও কোন রকমে সামলে নিতে পারে। যখন চোখের পাতা মেলবে, দেখবে ক্রিমস্কি ঠিক তার সামনে একটা মাত্র চেয়ারের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন! ক্রিমস্কির কবিতা ও বহুবার পড়েছে এবং স্কুলের সবার কাছে উনি সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি। উনি এমন সুন্দর, এমন করুণ, এমন আশ্চর্য ধ্বনি-মধুর মিষ্টি কবিতা লেখেন, উঃ ভাবতেও অবাক লাগে! সেই তিনি সশরীরে এখানে আসবেন, তার সামনে দাঁড়াবেন, তার সঙ্গে কথা বলবেন, নতুন নতুন কবিতা পড়ে শোনাবেন! সত্যি, ভাবতেও গায়ের মধ্যে শিরশির করে! কাল বেশ স্কুলের মেয়েদের কাছে ও বলতে পারবে, 'ক্রিমস্কি নতুন কি কবিতা লিখেছেন জানিস্?' 'এই, কি লিখেছেন, বল্ না রে!' মেয়েরা সব্বাই ওকে ছেঁকে ধরবে, আর ও নতুন একটা কবিতা আবৃত্তি করে ওদের শুনিয়ে দেবে। সবাই ওকে জিগেস করবে, 'এই সুরা, 'কবিতাটা কোথায় পেলি রে?' ও তখন উদাস স্বরে ঠোঁট উলটে বলবে, 'কবিতাটা এখনও ছাপাই হয়নি। কাল আমাদের নৈশভোজের আসরে ক্রিমস্কি ওটা নিজে পড়ে শুনিয়েছেন।'

সবাই তখন ওকে যা হিংসে করবে না! বিশেষ করে কিকিনা কুটনীটা, ও

তো হিংসেতেই জ্বলে-পুড়ে মরে যাবে! বিখ্যাত কোন কবির পরিচিতা, চাট্টি-খানিক কথা! 'এই সুরা, দে না আমাদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে!' আচ্ছা, উনি যদি হঠাৎ ওর প্রেমে পড়ে যান, তাহলে কি হবে? আদৌ অসম্ভব নয়! কেননা উনি তো কবি। কবিরা যখন-তখন প্রেমে পড়েন। আচ্ছা, ওঁর গোঁফ-জোড়াটা কেমন দেখতে হবে? আর চোখদুটো? নিশ্চয়ই খুব বড় বড় আর করুণ, মণিদুটো কুচকুচে কালো। বাঁকানো নাক। গোঁফজোড়াটা নিশ্চয় কালোই হবে। শান্ত স্বরে উনি বলবেন, 'সুরা! সুরা তোমাকে দেখার পর থেকেই "জীবনের নব নিশাস্তিকা আমার উচ্ছল আবিল হলো, প্রকম্পিত হয়ে উঠলো হৃদয়, আশায়···তুমি অনন্যা, প্রতিমা আমার, ধমনীর প্রতিটি রক্তস্রোতে তোমাতে আমাতে চেনা।" কিন্তু এ তো উনি আগেই কবিতাতে লিখেছেন! তাহলে···

'আর বলবেন না, যেমন ধুলো তেমনি গুমোট। বিশ্রী দুর্গন্ধে রাত্তিরে ঘুমতে পারি না।'

খিটখিটে রুক্ষ স্বভাবের ভরাট একটা কণ্ঠস্বরে সুরা যেন তার ছন্দিল রঙিন স্বপ্নলোক থেকে ফিরে এলো বাস্তবে। চোখ মেলে দেখলো কালো মখমলের বহির্বাস, ধূসর রঙের পায়জামা-পরা লম্বা রোগা মতন এক ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

'শুভদিন, তরুণী। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভুলে গ্যাছো। কি, তাই না?'

'আমি?' হঠাৎ সুরা সবকিছু কেমন গুলিয়ে ফেললো। 'না না, আমি সব সময় আপনার কবিতা পড়ি। তবে শেষবার আপনি যখন এখানে এসেছিলেন, আমি তখন খুব ছোট ছিলাম।'

চোখের দৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ জরিপ করে নিয়ে কবি মুচকি মুচকি হাসলেন। 'আর এখন তো তুমি রীতিমতো মহিলা হয়ে গ্যাছো।' আর কি যেন বলতে গিয়েও বললেন না। বুড়োদের মতো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। তারপর বাপির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের এ জায়গাটা কিন্তু ভারি চমৎকার, মিখাইল।'

সুরা তার চোখের পাতা নামিয়ে নিলো টেবিলের উপর। ওঁর ধূসর রঙের পায়জামা, কদম-ছাঁট চুল, ওঁর পাতলা লালচে গোঁফজোড়াটা সুরার পছন্দ হলো না, মনে হলো ওঁর সবকিছুই কেমন যেন নিছক গন্ধময়! এমন কি সদ্য-কামানো ওঁর নীলচে চিবুক, সরু থুতনি, ঠোঁট চাপার ভঙ্গিটাও। বিবর্ণ স্বচ্ছ

চোখ, পাতার নিচে মাংসল কয়েকটা ভাঁজ, কপালে বলিরেখা। ঠিক যেন ডাকঘরে দেখা কোন কেরানির মতো। ওঁর উপস্থিতিতে কোথাও কোন কাব্যময়তার চিহ্ন নেই। সুরা আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো ওঁর শীর্ণ আঙুলে একটা পোখরাজের আংটি। বুকের অতল থেকে ওর বেরিয়ে এলো করুণ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস।

'তাহলে তুমি আমার কবিতা পড়ো ?'

গোলাপের ঝরা পাপড়ির মতো রাঙা হয়ে উঠলো সুরার চিবুকদুটো। সুরা নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

'বাঃ! একটা কথা জিগেস করবো ? আচ্ছা, আমার কবিতা তোমার কেমন লাগে ?'

'আর বলবেন না,' মামণিই জবাব দিলেন। 'আপনার কবিতা নিয়ে ওরা সব্বাই পাগল।'

'এটা কিন্তু অতিরেক।' কবি মুচকি মুচকি হাসলেন।

'না, মোটেই তা নয়।' সুরা চাপা স্বরে মামণির কথার প্রতিবাদ করলো, কিন্তু তাকবির কান এড়িয়ে গেলো না।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো মেয়ের সারা মুখ। বাপি, মামণি, উনি—সবাই হেসে উঠলেন। বাঁকানো ভ্রূ, হাসিতে বিকৃত ওঁর মুখটা এখন বিদূষকের মতো মনে হচ্ছে। কেন উনি ভ্রূদুটো অমন বেঁকিয়ে তুলেছেন ? কেন উনি আর সবাইয়ের সঙ্গে এমন বোকার মতো হাসছেন ? উনি তো কবি, ওঁনার আরও বেশি শোভন, আরও বেশি সংবেদনশীল হওয়া উচিত ছিলো। তাহলে উনি আর পাঁচজনের মতো এমন করছেন কেন ? হয়তো উনি শোভন হবার চেষ্টা করছেন, হয়তো আর একটু পরে উনি ওঁর কবিসত্তায় ফিরে যাবেন।

'তুমি কোন্ শ্রেণীতে পড়ো সুরা ?'

'এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবো।'

কেন উনি জানতে চাইলেন ? কেন ওকে সুরা বলে ডাকলেন ?

'কোন্ শিক্ষককে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে ? নিশ্চয় ছবি আঁকার ?'

'না, সাহিত্যের।'

'ও, সাহিত্যের শিক্ষককে তাহলে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে!' কেমন যেন আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে উনি হাসলেন, টেনে টেনে কথাটা উচ্চারণ করলেন।

সুরার মনে হলো দু-হাতে কে যেন ওঁকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো, সারা শরীরে

অজস্র কাঁটার আঘাত। একখুনি যেন দু-চোখ ফেটে জল আসবে। কেন উনি এমন বিদ্রূপ করলেন? নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে প্রকম্পিত ক্রোধে ও কবির মুখের দিকে তাকালো। আর্দ্র চোখদুটো তখন ওর জ্বলজ্বল করছে। প্রথমে ভেবেছিলো কথা বলতে গেলেই বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেবিলের নিচে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে ও বললো, 'কেন, আপনার অবাক লাগছে? উনি কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভালো শিক্ষক। আমরা সবাই ওঁকে দারুণ ভালোবাসি। যেমন মিষ্টি কথা বলেন, তেমনি চমৎকার পড়ান···আধুনিক সাহিত্যের ওপর ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্য···সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ হিসেবে উনি ভারি সুন্দর। হাসছেন কেন? আমাদের ক্লাসে যাকে জিগেস করবেন সবাই বলবে···'

বাপি অবাক হলেন। 'সুরা, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো সোনা!'

'সম্ভবত আমরা ওকে আঘাত করেছি।' চাপা সুরে ক্রিমস্কি বললেন, 'আমি কিন্তু ক্ষমা চাইছি।'

ওঁর কণ্ঠস্বর সুরার কাছে আন্তরিকতাবিহীন, কেমন যেন কৃত্রিম বলে মনে হলো। মনে হলো এখানে ও অপাংক্তেয়, ওকে কেউই চায় না। নিজের জন্যে ওর নিজেরই কষ্ট হলো। অনুভব করলো বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা জমে উঠছে, নিঃশব্দ অথচ যন্ত্রণাহত তীক্ষ্ণ একটা বিষণ্ণতা।

তাহলে কবিরাও আর পাঁচজনের মতো অতি সাধারণ! খাওয়া-দাওয়ার পর সুরা তার ঘরে জানলার ধারে বসে বাগানে অতি প্রিয় লাইলাক ঝোপটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলো। এমন নিমেষহারা চোখে ও তাকিয়েছিলো যেন ঝোপটাকে এই প্রথম দেখছে।

উনি যদি আর পাঁচজনের মতোই হন, তাহলে বাপি কবিতা লেখেন না কেন? বাপি কি কবির চেয়ে কোন অংশে কম? ঠিক তখনই ওর মনে পড়লো কবির লেখা বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পংক্তি—যেমন আশ্চর্য গভীর, তেমনি কোমল আর ছন্দময়। খাবার সময় উনি আর একটিও কথা বলেননি। হয়তো নতুন কিছু লেখার কথা ভাবছিলেন। অনেকটা সোনিয়া সাঝিকোভার মতো। ওকে আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর সব কাগজের ফুল তৈরি করতে দেখলে অনেকেই ঈর্ষায় জ্বলতো। জিগেস করলে ও শুধু হাসতে হাসতে বলতো, 'কেন, খুব সোজা!'

বাগান থেকে সুরা শুনতে পেলো বাপি আর ক্রিমস্কির স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

'আপনার শেষ কবিতার বইটা কেমন বিক্রি হচ্ছে?'

'মন্দ নয়। দ্বিতীয় সংস্করণের কথা ভাবছি। কিন্তু লোকে কবিতা যত না ভালোবেসে কেনে, তার চাইতে বেশি কেনে কৌতূহলের মোহে পড়ে। কোন বই বেরুতে না বেরুতেই জঘন্য সমালোচকগুলো চেঁচাতে শুরু করে দিলো অবক্ষয়ী বলে। আর লোকেও অমনি কিনতে শুরু করে দিলো অবক্ষয়ী কি জিনিস জানার জন্যে। এতে অবশ্য আমাদেরই লাভ।'

ক্রিমস্কির কণ্ঠস্বর উপহাসের মতো শোনালেও, বাতায়নবর্তী তরুণীর বুকের মধ্যে তা অপমানকর শব্দপুঞ্জের মতোই প্রতিধ্বনিত হলো।

'হ্যাঁ,' বাপি বললেন, 'আপনাদের মতো লেখকদেরও সমালোচকরা রেহাই দেয় না।'

'ওদের ধারণা নিভৃত নিকুঞ্জে আমরা কেবল নগরবাসীর বিলাপ-সংগীতই শোনাই। কি হাস্যকর ব্যাপার একবার, ভেবে দেখুন! সত্যি বলতে কি জানেন, আমাদের জীবনে নগরাবাসী বলতে কিছু নেই। ওরা কেবল অতৃপ্ত, আত্মতৃপ্ত, নির্বোধ, নিঃস্ব জনতা, যাদের বাস্তব পারিপার্শ্বিকতার খবর আমাদের মহামান্য সমালোচকদের কাছে অজানা। ওদের সম্পর্ক কেবল বয়ের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে নয়। নবোন্মেষণার কোন খবরই ওরা রাখে না। আজকের দিনের তরুণ যুবসমাজ আমাদের কবিতায় পুরনো হয়ে গ্যাছে। থাকগে এসব বাজে কথা···আপানার মেয়েটি কিন্তু ভারি চমৎকার!'

'আজন্ম কবি! আপনিও হয়তো সেটা লক্ষ্য করেছেন।'

'আঃ বাপি, বাবামণি আমার!' উচ্ছল আবেগে একঝলক উষ্ণ রক্ত যেন চলকে উঠলো সুরার সারা বুকে। এবার উনি সত্যি সত্যিই ওর চোখে কবি হয়ে উঠলেন এবং তখন ওঁকে বুঝতে না পারার জন্যে ওর নিজেরই খারাপ লাগলো।

'ভালো কথা,' সুরা শুনতে পেলো বাপির কোমল কণ্ঠস্বর। 'যদি আমার অদূরদর্শিতা মার্জনা করেন, আপনার স্ত্রী···'

'ও এখন কোথায় আছে আমি ঠিক জানি না। বছর দুই আগে একবার শুনেছিলাম ককেশাসের কোথায় যেন মাস্টারি করছে। উঃ, ওর কথা ভাবলে এখনও আমার গায়ে জ্বর আসে। কিছু কিছু নারী আছে, যাদের সততা, সরল মাধুর্য বলতে কিছু নেই—কেবল মনের মধ্যে ভয়, বিশুদ্ধ একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। আমার মহিলাটিও ঠিক সেই ধরনের। এটা আবিষ্কারের পর থেকে ওর জন্যে আমার বুকের মধ্যে আর কখনও কষ্ট হয়নি। তবে

কি জানেন, মাঝে মাঝে ভীষণ একঘেয়ে, কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগে। আচ্ছা, আমাদের চা দেবে না ?'

'নিশ্চয়ই, একখুনি দেবে। কিন্তু আমি যে-কথাটা জানতে চাইছিলাম··· আপনি কি আবার বিয়ে করেছেন, না একাই আছেন ?'

'এখন একাই আছি। গত শীতটা আমি ডানা-কাটা একটা পরীর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। সে যে কি অবর্ণনীয় রূপ, তুমি কল্পনাই করতে পারবে না! ও ছিলো আমার প্রতিভার অকৃত্রিম গুণগ্রাহী। কিন্তু পেটে বিদ্যে না থাকলে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হলো। বনভোজনের উৎসবে হঠাৎ করেই ওর সঙ্গে আমার দেখা, তখন একটু মাতাল হয়ে পড়েছিলাম—কেমন করে ও যেন আমার বাসাবাড়িতে উঠে এলো আমি নিজেই টের পেলাম না। অথচ পূর্বপরিকল্পনা বলতে আমার কিছুই ছিলো না। তবু সকালে ঘুম থেকে জেগে আমি চোখ রগড়ালাম, আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। নিজেই নিজেকে অভিনন্দন জানালাম, ভালো করে সাজগোজ করলাম, তারপরে কি ঘটবে তার জন্যে প্রতীক্ষা করে রইলাম।'

বাতাসে ঢেউ তুলে বাপি হাঃ হাঃ করে হাসলেন। সুরার মনে হলো সে হাসিতে ওর বুকের মধ্যে কি যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেলো।

'ঠিক রূপকথার মতো শোনাচ্ছে। তারপর কি হলো ?'

'তারপর আর কি ? জেগে উঠে প্রথমে একপ্রস্থ চোখের জল, তারপরেই সহস্র চুম্বন। আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটা সপ্তা বেহেড মাতালের মতো টলতে টলতে কেটে গেলো।'

'আর ওর বাবা মা ?'

'প্রথমে ওঁদের কাছে ব্যাপারটা ও সম্পূর্ণ গোপনই রেখেছিলো। তারপর একটু একটু করে জীবন তার চিরাচরিত পথে পা বাড়ালো, শুরু হয়ে গেলো যা হবার। প্রথমে ও আপ্রাণ প্রমাণ করার চেষ্টা করলো আমার ভালোবাসা, আমার আশ্চর্য সুন্দর কবিতার সঙ্গে আমার ঘরে-পরার পোশাক-আশাক ঠিক খাপ খাচ্ছে না। তার জন্যে পঁয়ষট্টি রুবল খরচা করতে হলো। প্রতিবাদ করলাম, কেঁদেকেটে ও বুক ভাসিয়ে দিলো। সে এক দেখার মতো দৃশ্য! তারপরেই ওর ধারণা হলো কবিরা নাকি স্বপ্নচারী জীব, সারাদিন ঘরকুনো হয়ে বসে না থেকে ওদের মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত। ওর স্থূল বুদ্ধিতে কোথা থেকে এই নির্বোধ ভাবনাগুলো এসে জুটলো সে ও-ই

জানে। তার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, চোখের জল, মাতৃত্বের জন্যে পরোক্ষ উল্লেখ, এটা চাই ওটা চাই। ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম, কঠিন গদ্যে ওকে চিঠিতে জানালাম—'সবার আগে চাই কবির স্বাধীনতা।'

শান্ত স্বরে বাপি জিগেস করলেন, 'তারপর?'

'এখন মাসে মাসে ওকে পঁচিশ রুবল করে পাঠাতে হচ্ছে।'

সুরার স্নায়ুতন্ত্রীর ভেতর দিয়ে যেন হিমেল একটা স্রোত বহে যাচ্ছিলো, তবু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে জানলা দিয়ে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তাই বুঝি আপনার শেষের দিকের কবিতায় হতাশার ছাপ এত সুস্পষ্ট?'

"স্মৃতির বহুবর্ণ ভিড় ভাঙে রাত্রির অন্ধকারে' কবিতার বইটা পড়েছো নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

'এই কাব্যগ্রন্থে আমি সেই নির্বোধ কাহিনীর অনুভূতিগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।'

'খুব ভালোভাবেই ধরে রাখতে পেরেছেন।' সম্ভবত বাপি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'সত্যি, 'হৃদয়াবেগের অদৃশ্য কারুকার্য'এর ছবি আঁকায় আপনার কোন তুলনাই হয় না।'

'নাঃ, তুমি দেখছি আমার কবিতার একজন সত্যিকারের পাঠক।'

'অবশ্যই। স্তুতির প্রশ্ন বাদ দিয়েও বলতে পারি, আপনার কবিতা আমাকে রীতিমতো আনন্দ দেয়।'

'ধন্যবাদ। এ ধরনের প্রশংসা সচরাচর কানে আসে না। সত্যি বলতে কি জানো, প্রশংসা না পাবার মতো একেবারে অযোগ্য আমি নই।'

'নিঃসন্দেহে! চলুন, এবার চা পান করা যাক।'

'আজকের দিনে যারা লিখছে, তাদের দিকে একবার তাকিয়ে ছাখো—আহা, কি লেখার ছিরি! কবি তো নয়, যেন সব শকুন। ভাষার একেবারে আগুশ্রাদ্ধ করে ছাড়ছে।'

সুরা ওঁদের দুজনকে পাশাপাশি বাগানের ওদিকে এগিয়ে যেতে দেখলো। ওঁদের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হতে হতে একসময়ে মিলিয়ে গেলো।

সুরা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলো। ওর বুকের মধ্যে ভারি মতন কি যেন একটা চেপে রয়েছে, যাকে ও কিছুতেই সরাতে পারছে না।

মামণি ডাকলেন, 'সুরা এসো, চা দেওয়া হয়েছে।'

শ্লথ পায়ে ও দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। আয়নায় দেখলো ওর বিবর্ণ ম্লান মুখ, চোখদুটো যেন হালকা কুয়াশায় ঢাকা। ও যখন খাবার ঘরে এসে প্রবেশ করলো পরিচিত মুখগুলো মনে হলো কেমন যেন অবয়বহীন, ধূসর।

'আশা করি তন্বী এখনও নিশ্চয়ই আমার ওপর ক্রুদ্ধা নন?' প্রতিধ্বনিত হলো কবির কণ্ঠস্বর।

সুরা কিছু বললো না। শুধু ওর কদম-ছাঁট মাথার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করলো যখন ওঁকে দেখেনি, যখন ওঁকে ও চিনতো না, তখন ওঁর কবিতা পড়ার সময় কবির কোন্ ছবিটা তার মনের মধ্যে ভেসে উঠতো!

'ছিঃ সুরা!' বাপি অবাক হলেন। 'কেউ কিছু জিগেস করলে জবাব না দেওয়াটা অশোভন!'

'কি চান আপনারা?' হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সুরা আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো। 'আমাকে একটু একা থাকতে দিন। মিথ্যুক! মিথ্যুক সব!' দু হাতে মুখ ঢেকে ও সোজা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

সারা ঘরে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর কণ্ঠস্বর—মিথ্যুক! মিথ্যুক সব!

দীর্ঘক্ষণের জন্যে চারজন টেবিলে নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন, অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। তারপর মামণি আর জিনা-জ্যেঠি উঠে গেলেন।

বাপি কবিকে জিগেস করলেন, 'ও কি আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনেছিলো বলে আপনার মনে হয়?'

'কি জানি, আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

মামণি ফিরে এলেন।

ওঁদের দুজনের বিহ্বল উদগ্রীব চোখের দিকে তাকিয়ে উনি হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ও এখন কাঁদছে!'

১৮৯৬

টেরেসা

আমি তখন পড়াশোনার জন্যে মস্কোয় এসেছি, আশ্রয় নিয়েছি এক পোলিশ ভদ্রমহিলার বাড়ির চিলেকোঠায়। নাম টেরেসা। শ্যামাঙ্গী, রীতিমত লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গড়ন, কুচকুচে কালো টানা দুটো ভ্রূ, ছেনি দিয়ে কুঁদে-তোলা লম্বাটে রুক্ষ মুখ, তীক্ষ্ণ কালো চোখ, ভরাট কণ্ঠস্বর, কুলিকামিনদের মতো পেশীবহুল দীর্ঘল বাহু। সব মিলিয়ে এমন তেজদীপ্ত উগ্র একটা নারীমূর্তি, যা দেখে অনেক দুঃসাহসী পুরুষমানুষের বুকও ভয়ে দুরদুর করে কেঁপে ওঠে। আমি থাকতাম ওপরের চিলেকোঠায়, উনি থাকতেন আমার ঠিক নিচের তলায়। উনি ঘরে আছেন জানতে পারলে আমি পারতপক্ষে দরজা খুলে কখনও বাইরে বেরুতাম না। তবু মাঝেমধ্যে কখনো-সখনো সিঁড়ির মুখে কিংবা নিচের উঠোনে দেখা হয়ে যেতো। দেখা হলেই উনি ঠোঁট টিপে এমনভাবে হাসতেন, আমি বুঝতে পারতাম না উনি লজ্জা পেয়েছেন, না আমাকে বিদ্রূপ করছেন। মদ খেয়ে মাতলামি করতে আমি ওঁকে খুব কমই দেখেছি। তবু কখনও মদ খেলে স্বচ্ছ কালো চোখের মণিদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতো, কাকের বাসার মতো এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলো উড়তো, আর সারাক্ষণ হিহি করে হাসতেন। তেমন কোন মুহূর্তে দেখা হলেই উনি আমাকে বলতেন, 'এই যে, ছাত্রমশাই, কেমন আছেন?'

তখন ওঁর প্রতি আমার ঘৃণাটা কেমন যেন বেড়ে যেতো। আর প্রতিবারেই মনে হতো—না, ঘরটা এবার না পালটালেই নয়। কিন্তু আমার ঘরটা এমন নির্জন, খোলামেলা আর ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্যালী এমন সুন্দর দেখা যায় যে ঘরটা ছেড়ে দেবার কথা ভাবতেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

একদিন সকালবেলায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভাবছি কি করে আজকের দিনটা ক্লাস ফাঁকি দেওয়া যায়, এমন সময় দেখলাম দড়াম করে দরজার কপাট-দুটো হাট হয়ে খুলে গেলো আর টেরেসার ভরাট কর্কশ কণ্ঠস্বরে আমার পিলে পর্যন্ত চমকে উঠলো।

'এই যে ছাত্রমশাই, কেমন আছেন?'

চকিতে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ওঁর স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো ঝকঝক করছে। আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম। 'কি চান আপনি?'

'আমার একটা ছোট্ট উপকার করে দিতে হবে।'

'উপকার!' মনে মনে আমার তখন নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম।

'হ্যাঁ, বাড়িতে আমার একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।'

ওঁর কণ্ঠস্বর কিছুটা নরম মনে হলেও, মনে মনে ভাবলাম—শয়তানী করার আর জায়গা পাওনি! তবু তখনই কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বললাম, 'কি লিখতে হবে বলুন? না, তার আগে বলুন কোথায় কাকে লিখতে হবে?'

'লিখবেন বোলেস্লাভ কাসপুটকে। ঠিকানা—ওয়ারস রোড, ভেপেৎসিয়ানা।'

'ঠিক আছে, এবার বলুন।'

'প্রিয়তম বোলেস···বিশ্বস্ত প্রেমিক আমার, অনেকদিন তোমার কোন মিষ্টি চিঠি পাইনি। তুমি কি তোমার প্রিয়তমা ছোট্ট নরম সোনাটাকে ভুলে গ্যাছো, টেরেসা।'

হাসিতে পেট আমার তখন ফেটে যাবার যোগাড়। প্রিয়তমা ছোট্ট নরম সোনা! বাঁদরামি আর কাকে বলে! সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপর লম্বা, পাথরের মতো শক্ত শরীর—সে কিনা হলো ছোট্ট নরম সোনা! একেই তো পেত্নীর মতো কালো, তার ওপর সাতজন্মেও স্নান করে না। তবু কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জিগেস করলাম, 'বোলেস কে?'

'বোলেসকে চেনেন না?' যেন উনি গাছ থেকে পড়লেন। 'আমার প্রেমিক বন্ধু।'

'আপনার বন্ধু!'

'কেন, মেয়েদের পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে না বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা থাকতে পারে! কিন্তু, আপনার মতো মহিলা···মানে···'

'আপনি কিন্তু বড্ড বোকা। জানেন, ও আমার ছ' বছরের পুরনো বন্ধু।'

'তাই বুঝি!' আমি গম্ভীর হবার ভান করলাম। 'আচ্ছা, এ চিঠিতে আর কিছু লিখতে হবে না তো?'

'না। আপনার এই উপকারের জন্যে আমি কিন্তু সত্যিই কৃতজ্ঞ। দরকার হলে আমিও আপনার জন্যে কিছু করেও দিতে পারি···এই ধরুন জামা-কাপড় কেচে দেওয়া, কিংবা কিছু সেলাই-ফোঁড়াই···'

'না না, আমার ওসব কিছু লাগবে না। আপনি যে মুখে বলছেন, তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মনে মনে আমি তখন ওঁর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছটফট করছিলাম।

উনি চলে গেলেন।

সপ্তা দুয়েক পরে, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় জানলার ধারে চুপচাপ বসে ভাবছি। বিশ্রী আবহাওয়ার জন্যে বাইরে কোথাও বেরুতে পারছি না, আবার ঘরেও কিছু করতে ভালো লাগছে না। এমন সময় দরজাটা খুলে গেলো। 'এই যে ছাত্রমশাই, একা একা বসে কি ভাবছেন?'

মুখ না দেখেও আমি কণ্ঠস্বরে টেরেসাকে চিনতে পারলাম। 'না, এই এমনি বসে আছি।'

'আমাকে কিন্তু আর একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। বোলেসকে তো?'

'না, এবার আর তাকে নয়।'

'তাহলে?'

'আমি কিন্তু আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এ চিঠিটা আমার নিজের জন্যে নয়, আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের জন্যে। আমার মতো তার একজন প্রেমিকা আছে, তারও নাম টেরেসা। এই চিঠিটা সেই টেরেসার জন্যে।'

আমার সঙ্গে এভাবে ন্যাকামি করার জন্যে মনে মনে ভীষণ রাগ হলো। আমি সোজা ওঁর মুখের ওপরেই বলে দিলাম, 'দেখুন, আপনার বোলেস বলে কেউ নেই, টেরেসা বলেও কেউ নেই। আপনি মিছিমিছি আমাকে দিয়ে শুধু খাটিয়ে নিচ্ছেন।'

আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে দেখলাম ওঁর মুখ চোখের চেহারা হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে, হাতের আঙুলগুলো মৃদু কাঁপছে। ওঁর মুখ দেখে মনে হলো উনি যেন কিছু বলতে চাইছেন, অথচ পারছেন না। মনে মনে ভাবলাম আমি ভুল করিনি তো! স্থির চোখে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অপেক্ষা করে রইলাম। উনি কিন্তু কোন কথা না বলে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে হঠাৎ ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন। দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে আমি চমকে উঠলাম। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম উনি দারুণ রেগে গেছেন, ভাবলাম ওঁর ঘরে গিয়ে ওঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

সেই প্রথম আমি ওঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। দেখলাম টেবিলে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে উনি বসে রয়েছেন। আমার খুব খারাপ লাগলো। গুটিগুটি পায়ে টেবিলের কাছে গিয়ে যতটা সম্ভব মোলায়েম স্বরে ডাকলাম, 'এই যে মাদাম, শুনছেন!'

আমার ডাক শুনেই চকিতে উনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, উত্তেজনায়

স্বচ্ছ চোখের মণিদুটো ঝকঝক করছে। ভয়ে তখন আমার বুক দুরদুর করছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলাম উনি আমার গলাটা দু হাতে মালার মতো জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ধরা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি মেনে নিচ্ছি—বোলেস বলে কেউ নেই, টেরেসা বলেও কেউ নেই। কিন্তু তাতে আপনার কি? দু লাইন লিখতে কি আপনার এমন একটা কষ্ট হতো? কাগজ কলম নিয়ে একটু বসা বই তো নয়!'

ওঁর অপ্রত্যাশিত এই অভ্যর্থনায়, ওঁর কান্না-ভেজা কণ্ঠস্বরে আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কোনরকমে ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললাম, 'আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, মাদাম!'

'যদি দু লাইন লিখতে আপনার এতই কষ্ট হয়,' হঠাৎ উনি আমার গলাটা ছেড়ে দিয়ে ড্রয়ার হাতড়ে একটা কাগজ এনে আমার হাতে দিলেন। 'নিন, এটা আপনি ফিরোত নিন।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি কাগজটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম এটা বোলেসকে লেখা সেই চিঠি। আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই বেশ অবাক হয়েই জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার, চিঠিটা এখনও পাঠাননি?'

'পাঠাবো? কোথায় পাঠাবো?'

'কেন, বোলেসের ঠিকানায়!'

'বোলেস বলে কেউ নেই।'

'আর টেরেসা?'

'বললাম তো, আমি ছাড়া অন্য আর কোন টেরেসাকে আমি চিনি না।'

'তাহলে?'

'এই সহজ কথাটা আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, আমি তো আর পাঁচ-জনেরই মতো একটা মানুষ, কিনা নয়? আমারও ইচ্ছে করতে পারে তাকে চিঠি লিখতে…'

'কাকে?'

'বোলেসকে।'

'উনি তো নেই!'

'নেই, কিন্তু ওর মতো কেউ একজন তো থাকতেও পারে, যাকে আমি আমার মনের কথা জানাতে চাই, যে আমাকে আবার তার মনের কথা জানাবে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম। আমার থেকে কয়েক হাত তফাতে এমন একজন মানুষ বাস করে—এ পৃথিবীতে বন্ধু বলতে যার কেউ নেই, যাকে কেউ ভালোবাসে না, যে নিজেই নিজের বন্ধুকে আবিষ্কার করেছে, তার জন্যে বুকের মধ্যে আমার সত্যিই কষ্ট হলো। না জেনে ওঁকে আঘাত করার জন্যে মনে মনে লজ্জাও পেলাম।

'আর টেরেসাকে লেখা চিঠিটা ?'

'ওটাও আমি অন্য কাউকে দিয়ে পড়াই। আমি তো পড়তে পারি না। কেউ যখন পড়ে আমি শুনি, আর মনে মনে কল্পনা করে নিই বোলেস বলে সত্যিই কেউ একজন আছে যে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। আর সেই রঙিন কল্পনার মধ্যেই আমার বিচ্ছিরি একঘেয়ে জীবনের কুৎসিত দিনগুলো বেশ সুন্দর কেটে যায়।'

এরপর থেকে আমি সপ্তায় একটা কি দুটো করে চিঠি ওঁকে লিখে দিতাম, এবং স্বভাবতই টেরেসাকে লেখা বোলেসের জবাবগুলো এমন সুন্দর আর করুণ করে লিখতাম, যা পড়ে উনি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিতেন। আর তার বদলে উনিও আমার ছেঁড়া মোজা রিপু করে দেওয়া, জামা-কাপড় কেচে দেওয়া প্রভৃতি টুকিটাকি নানান কিছু করে দিতেন। এমনি ভাবে মাস তিনেক কাটার পর হঠাৎ কেন জানি ওরা ওঁকে জেলখানায় নিয়ে গেলো। এতদিনে উনি নিশ্চয়ই মারা গ্যাছেন।

হ্যাঁ, গল্পটা আমার এক পরিচিত বন্ধুর মুখ থেকে শোনা।

১৮৯৬

দু পাশ থেকে চাপা লম্বা মতন হেঁড়ে মাথা, বড় বড় চেটালো কান, নির্বিকার ফ্যাকাসে মুখ, ধারালো চিবুক, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে ঠেলে বেরিয়ে আসা নিশ্চল বিবর্ণ দুটো চোখ, দীর্ঘল নাক, নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, দড়ি-পাকানো শীর্ণ গলা, ঢালু কাঁধ, টোল-খাওয়া বুক, গর্ভবতী মহিলার মতো উঁচু পেট। বাঁ হাতটা ডান হাতের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে ছোট, পাদুটো ধনুকের মতো বাঁকা, মাথায় কালো তাপ্পি লাগানো জীর্ণ একটা টুপি, মাপে এত বড় যে চোখের ওপর পর্যন্ত নেমে এসে বাঁ কানের কাছে আটকে গেছে, আর তার নিচে দেখা যাচ্ছে ময়লায় জট-পাকানো পীতাভ চুলের গুচ্ছ। সারা জায়গায় সেলাই করা তালি-লাগানো রাশিয়ান বহির্বাসটা বেখাপ্পা শরীরে একটুও মানায়নি, সরু সরু বাঁকানো ঠ্যাংএ পাজামাটা ঢলঢল করছে, মোজাদুটো ছেঁড়া, জুতোজোড়াটার অবস্থা কাহিল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ভিয়াতকার ছুতোর ভাংকা মাজিনের হুবহু প্রতিকৃতি। প্রকৃতি ওকে আপন খেয়ালখুশিতে গড়ে স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছে, যাতে সবাই ওকে দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

হ্যাঁ, শেষের উদ্দেশ্যটা ভাংকা মাজিন স্বাতন্ত্রের সঙ্গে বজায় রেখেছে। যখনই ওর কোন সহকর্মী ওকে দেখতে পেয়েছে, সউল্লাসে চিৎকার করে উঠেছে :

'এই যে, শয়তানের কামরা আসছে!'

শয়তানের কামরা কি জিনিস আমি কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু যখনই মাজিনকে এগিয়ে আসতে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে ওর শরীরে অস্থি-মজ্জা বলতে কিছু নেই। তাই ডাইনে বাঁয়ে ও এমন টলমল করছে, যেন সহজভাবে হাঁটার জন্যে পায়ের নিচে সমান্তরাল মাটি খুঁজছে। শিথিল হয়ে নুয়ে আসা দেহের দু-পাশে হাতদুটো কোনরকমে ঝুলছে, চোখের ওপর পর্যন্ত নেমে-আসা টুপি সমেত মাথাটা নড়বড় করছে, সশব্দে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, যন্ত্রপাতির থলেটা পিঠ থেকে ঘুরে নেমে এসেছে বগলের নিচে, আর ওর বিষণ্ণ চোখদুটো সুদূরে এমন নির্নিমেষ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে যেন ও-দুটো ওর বিশৃঙ্খল দেহের কোন অংশই নয়।

ওর আর একটা স্বভাব আছে, হাস্যকর ভঙ্গিতে আপন মনে গানের সুর ভাঁজা। গানের মধ্যে কোন কলি বা শব্দ নেই, কেবল সুর—তাও আবার তার না আছে শুরু, না আছে শেষ। গানের গুনগুন শব্দ, নিশ্বাসের ফোঁসফাঁস

আওয়াজ করতে করতে ও যখন এগিয়ে আসে, সত্যিই দেখলে মনে হবে নাট-বল্টু খুলে-আসা পুরনো একটা কামরা যেন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

এই যে, 'মশা' কিংবা 'নোংরা আঁস্তাকুড়' যখন যে নাম ওদের মাথায় আসতো, সেই নামেই ওকে ডাকতো। প্রতিটা গুণবাচক আখ্যাই ওকে বেশ সুন্দর মানাতো। ও কিন্তু কোন-কিছুতে রাগতো না। খুব বেশি হলে ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় জিগেস করতো, 'তোমরা কি চাওটা শুনি?'

ছাড়পত্রে উল্লেখ আছে ওর বয়েস সাতচল্লিশ বছর, কিন্তু ফচকে ছোঁড়ারাও ওকে ডাকে ভাংকা বলে। এমন কি ওর শেষ নাম ধরেও কেউ ডাকে না। তাতে ও কিছু মনে করে না, কেননা ডাকনাম কিংবা বানানো নামের চাইতে এ অনেক ভালো। ভাংকা তার অন্যান্য সহকর্মীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ও নির্জনতা ভালোবাসে, এমন কি অজস্র ভিড়ের মধ্যেও ও একা থাকতে পারে। রোববার কিংবা ছুটির দিনে সঙ্গীসাথীরা ডাকলে ও পানশালায় যায়, কিন্তু ভদকা কিংবা চায়ের পেয়ালা নিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সারাক্ষণ শুধু চুপচাপ বসে থাকে। তা বলে ওকে অসামাজিক বলা যায় না। নানান জটিল সমস্যাবলী নিয়ে ও গভীরভাবে চিন্তা করে। ও যখন প্রথম এই ছুতোরদের দলে যোগ দেয়, এমনভাবে লোকজনদের দিকে তাকিয়ে থাকতো মনে হতো যেন ও দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে। দলের পরামর্শদাতা, ঠাকুরদার বয়সী প্রধান ছুতোর বুড়ো ওসিপ ওকে দেখিয়ে বলতো, 'ভিয়াতকার এই লোকটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য রয়েছে। চোখদুটো মরা, দীপ্তি নেই, মনকে কেবল আলতো করে স্পর্শ করে। ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা ভ্রান্তি রয়েছে। হয় জীবনে তিতি-বিরক্ত হয়ে গ্যাছে, না হয় তো ওর মনের মধ্যে কিছু একটা আছে যা তার বিবেক-বুদ্ধি-চেতনাকে ভোঁতা করে দিয়েছে। হয়তো নক্কারজনক কোন স্মৃতি। মনের মধ্যে থেকে যার ছায়া ভেসে উঠে ওর দীপ্তিহীন চোখের মণিতে। তার মানে লোকটা অতৃপ্ত, সব সময় মনে মনে কি যেন ভাবে। নাঃ, ওর মরা চোখের দৃষ্টিটা ভালো নয়। কোন মানুষের মন যদি পরিষ্কার আর ঋজু হয়, চোখের দৃষ্টি তার স্বচ্ছ হবেই। কোন কিছুর দিকে সে যখন তাকাবে সোজা-সুজি ঋজু ভঙ্গিতে উজ্জ্বল চোখেই তাকাবে। অথচ ভিয়াতকার এই লোকটার দিকে তাকিয়ে ছাখো, ও যেন এখনও আমাদের চেনেই না।'

সেইদিন থেকে দলের সবাই মরা-চোখ লোকটার হাবভাব লক্ষ্য করতে

শুরু করলো। প্রথমেই ওরা যা আবিষ্কার করলো, লোকটা আদৌ প্রথম শ্রেণীর কারিগর নয়। লোকটা যে কাজ বোঝে না তা নয়, কিন্তু করাত হাতুড়ি বাটালি রেঁদা যেন ওর হাতে ঠিক বশ মানে না, কাঁপে। কখনও কখনও মাজিন হঠাৎ করেই মাঝপথে তার কাজ থামিয়ে যন্ত্রপাতির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকতো, নিঃসন্দেহে ওর মনে তখন ভেসে উঠতো নানান প্রতিচ্ছবি।

'হেই, মাছি-ধরা! ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' সর্দার চিৎকার করে বলতো। কোন কথা না বলে মাজিন আবার তার কাজে মন দিতো।

অন্যরা হাসাহাসি করতো। 'ব্যাটা একেবারে নিড়বিড়ে।'

মাজিন সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে জিগেস করতো, 'কেন, এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে?' অন্যরা জবাব দিতো না, কেবল হেসে হেসে ওকে ঠাট্টা করতো। ওদের তীব্র উপহাস ঘৃণা বিদ্রূপ কিন্তু মাজিনকে আঘাত করতে পারতো না, উপেক্ষার ভঙ্গিতে ও এড়িয়ে যেতো।

মাজিনকে ওরা পছন্দ করতো না। কেননা এখানকার ছুতোরদের মধ্যে ও-ই এসেছে কেবল ভিয়াতকা থেকে, বাকি সবাই নিঝনি নভগ্রোদের লোক। তাছাড়া ও গরীব, জড়বুদ্ধি আর অলস প্রকৃতির। তবে ওকে নিয়ে ওরা যখন ঠাট্টা তামাসা করতো একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যেতো না, কেননা ওরা জানতো লোকটা অস্থিমজ্জাহীন, অসহায়।

একদিন ছজন ছুতোর ভারি একটা কাঠের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মাজিন রয়েছে তার শেষ প্রান্তে। সামনের একজন ওকে চেঁচিয়ে বললো, 'এই, ঠিক করে পা ফ্যালো।' কিন্তু মাজিন তার বাঁকানো-ধনুকের মতো পা সমান তালে ফেলতে পারলো না, ফলে কাঠের গুঁড়িটা দুম করে মাটিতে পড়ে গেলো।

'এই ব্যাটা ক্যাঙ্গারু, ঠিক করে পাও ফেলতে জানিস না!' দৈত্যের মতো বিশাল শরীর নিয়ে ইয়াকভ ল্যাপটেভ হুঙ্কার ছেড়ে ওর দিকে তেড়ে এলো, এবং মাজিনের পিঠে এক ঘা লাঠির বাড়ি কষিয়ে দিলো। মাজিন যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, কিন্তু একটা কথাও না বলে নিঃশব্দে চলে গেলো। তারপর ওরা যখন কাঠের গুঁড়িটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে কাজকর্ম করছে, মাজিন ইয়াকভের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'তুমি আমাকে তখন মারলে কেন?' শান্ত স্বরে ও জিগেস করলো।

'ভাগো হিঁয়াসে!' ইয়াকভ চেঁচিয়ে উঠলো।

'কেন, তুমি কি মনিব নাকি যে যখন খুশি লোককে ধরে মারবে?'

'ভাগ্, ভাগ্ বলছি এখান থেকে। নইলে তোকে সোজা যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, উকুনের ডিম কোথাকার!'

'কেন, কিসের জন্যে?'

'দাও না ইয়াকভ ওর চোয়ালে একটা। ওই জন্যে ও এখানে ঘুরঘুর করছে।' কে যেন কথাটা বললো। ইয়াকভেরও উপদেশটা পছন্দ হলো। মাটিতে এবার ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সবাই নির্বাক। কেননা শক্তির সম্মানকে সবাই প্রশংসার চোখে দেখে। আর ইয়াকভও ভিয়াতকার এই লোকটার কাছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার হার কিউলেসের সম্মানকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়। তাই জামার আস্তিন গুটিয়ে ও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

'আয়, বেড়ে আয় ব্যাটা, তোর কয়েকটা পাঁজরা আমি ভেঙে দিই।'

মাজিন দ্বিধা-জড়ানো স্বরে বললো 'বেশ…'

'সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও সব। কেউ এদের দুজনের লড়ায়ের মধ্যে নাক গলাবে না।' বুড়ো ওসিপ আদেশ দিলো। 'উঁহু, তোমরা দুজনে মাচার ওদিক থেকে সরে এসো। নাও, এবার শুরু করো। কেউ কিন্তু চালাকি করবে না। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। নাও! চালাও!'

মাজিনের বাঁ কোমরে কোঁক করে একটা শব্দ হলো, কিন্তু চোখের পলক পড়ার আগেই ইয়াকভের বিশাল শরীরটা মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চোখে ও বিরুদ্ধ পক্ষের দিকে তাকালো। আহত জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে মাজিন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলো। উন্মাদের মতো ক্ষিপ্রবেগে ইয়াকভ ওর দিকে ধেয়ে এলো। ধীর স্থির মস্তিষ্কে মাজিন ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে ওর মাথায় আঘাত করলো। চারদিকে ভিড়-করে-দাঁড়ানো দর্শকরা দেখলো ইয়াকভ ঘুরপাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ে গেলো।

'বুনো মোষ কোথাকার! কেন তুই আমার মাথায় আঘাত করলি? দেহের আর কোথাও জায়গা পেলি না, ব্যাটা রামগরুড়ের ছানা? ব্যাটা গেঁয়ো ভূত কোথাকার, মানুষের মতো লড়তে পারিস না!'

সবাই স্বীকার করলো মাজিন লড়তে না জানলেও শক্তি ওর বেশি। 'তুমি যদি আগে আমাকে না মারতে, আমি তোমার সঙ্গে লড়তে যেতুম না।' মাজিন হাত পা নেড়ে তড়পালো। 'এখন বুঝলে তো? তাও তো দয়া করে জোরে মারিনি। যাও, এবার গিয়ে মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল চাপড়িয়ে এসো। দেখবে সব ঠিক হয়ে গ্যাছে।' তারপর নড়বড়ে পায়ে টলতে টলতে ও চলে গেলো।

'ব্যাটা আচ্ছা শয়তান তো!' ছুতোরদের চোখ থেকে তখনও মুছে যায়নি বিস্ময়ের ঘোর। কেমন করে পঙ্গু একটা লোকের পক্ষে ইয়াকভের মতো বুনো-মোষকে কুপোকাত করা সম্ভব কিছুতেই ওদের মাথায় ঢুকছে না।

'বাঃ, ভিয়াতকার লোকটা আজ আমাদের বড় ভালো শিক্ষা দিলে।' বুড়ো ওসিপ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো। 'নাঃ, লোকটার দিল আছে। আর ইয়াকভকে ও উচিত কথাই বলেছে। ওর যখন-তখন হাত চালানো উচিত নয়। আমরা সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টি। যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা একে অপরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে যাবো? আর জেতার পরে ইয়াকভকে ও কি বললো, না—যাও, এবার গিয়ে মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল চাপড়িয়ে এসো! খুব ঠিক কথা। ওর যখন-তখন এ রকম মাথা গরম করা উচিত নয়।'

'তার আগে আমাদের উচিত বরং ওটাকেই দূর করে দেওয়া।' পাশ থেকে কে যেন কথাটা বললো।

'না, ও যে আমাদের মতো নয় এ কথা সত্যি। কিন্তু ও তো কোন অন্যায় করেনি।' বুড়ো ওসিপ ভেবেচিন্তে বললো। 'দূর করে দেওয়ার সময় এখনও হয়নি। আর একটু অপেক্ষা করে ছাখো। হয়তো ও বদলে যেতে পারে, হয়তো আমাদের সঙ্গে মিশ খেতে পারে।'

'ও আমাদের কোন্ কামেটা লাগবে শুনি?'

'সন্দেহ নেই যে ও কুঁড়ে, তড়িঘড়ি কিছু করতে পারে না। কিন্তু ও-ও তো মানুষ। আমাদের আর পাঁচজনেরই মতো খায়দায়, কর দেয়, ঠিক কি না? শুধু-মুধু কি করে আমরা ওকে দূর করে দিই? আমরা যদি ওকে দূর করে দিই, অন্যেরাও দেবে। তখন ও কি করে রোজগার করে খাবে?'

যেহেতু আর কেউ প্রতিবাদ করেনি, ভাংকা মাজিন রয়ে গেলো ওদের সঙ্গে। প্রথমে ওরা অপেক্ষা করলো মাজিন নিজে ওদের সঙ্গে মিলমিশ করে নেবে, শেষ পর্যন্ত ওরা নিজেরাই ওর সঙ্গে মিলমিশ করে নিলো। এবং ধরে নিলো ও-ই ওদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ফলে ওকে নিয়ে আবার সবাই হাসি-তামাসা জুড়ে দিলো। কখনও কখনও নির্মমতা চরমে উঠতো, কিন্তু কেউ কখনও ওকে দূর করে দেবার কথা ভাবেনি ওর এই রয়েসয়ে কাজ করাটাকে সবাই মেনে নিলো, এবং সেই কাজের জন্যে ও সপ্তায় দু রুবল করে মজুরি আর বিনিমাগনায় খাওয়া পেতো।

সেদিন স্মুরভ নামে একজন বৃত্তবান ধনী বণিকের পাঁচতলা বাড়ির সবচেয়ে

ওপরতলায় ওরা ভারা বাঁধাবাঁধির কাজ করছিলো। দুপুরের দিকে ঠিকেদার জাকার ইভানোভিচ কলোবভ নিজে কাজ দেখাশোনা করতে এলেন। কুমড়ো-পটাসের মতো গোলগাল চেহারা, লাল মুখ, গালভর্তি লম্বা লালচে দাড়ি। ধূসর বর্ণের ঝকঝকে তীক্ষ্ণ চোখ, যা কিছু দেখার এক ঝলকেই দেখে নেন। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই উনি বলে দিতে পারেন কোথায় কত লোক কাজ করছে, কার কি অভাব। লক্ষ্য করলেন ভাংকা মাজিন একবার কোন কাঠের তক্তা মাচায় বয়ে আনতে অনেক সময় নিচ্ছে।

'এই, ব্যাটা ছারপোকা!' ক্রুদ্ধ স্বরে উনি চিৎকার করে উঠলেন। 'তাড়াতাড়ি হাঁট্, তাড়াতাড়ি!'

মনিবের মেজাজ বিগড়ে থাকতে দেখে সবাই দ্রুত হাত চালালো। কিন্তু মাজিনের হাবভাবের কোন তারতম্য ঘটলো না।

'আচ্ছা, তোমরা সব কোথাকার মাথামোটা বলো তো? তোমাদের আমি পইপই করে বলিনি নতুন তক্তা ব্যবহার না করে ভারার জন্যে সব পুরনো তক্তা ব্যবহার করবে?'

'পুরনো তক্তাগুলো বড্ড অপলকা হয়ে গ্যাছে, জাকার ইভানোভিচ।' লেজ নাড়া সুর গাঁইগুঁই করতে করতে ইয়াকভ ল্যাপটেভ বলেই ফেললো।

কলোবভ গর্জন করে উঠলেন। 'তক্তার তোমরা কি বোঝ হে, সেদিনের ছোকরা?'

আধ ঘণ্টার জন্যে সবার বুক তিনি বাঁশ পাতার মতো কাঁপিয়ে ছাড়লেন। শেষে বিরতির অবকাশে সবাই যখন খেতে বসলো, উনি নিঃশব্দ পায়ে ভারা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন।

'ব্যাটা যেন ডালকুত্তা!' বুড়ো ওসিপ বিড়বিড় করে বললো।

'শুঁটকো বেজন্মা একটা!' ইয়াকভ মনের সুখে ঝাল মেটালো।

অন্য ছুতোররাও নানা মন্তব্য করলো। কেবল ভাংকা মাজিন একটাও কথা বললো না।

ইতিমধ্যে কলোবভ চারতলার ভারায় উঠে গেছেন, পায়ের চাপে তক্তাগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন। এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে ওঁর জুতোর মচমচ শব্দ। হঠাৎ চিড়-খাওয়ার একটা আওয়াজ কানে এলো—অনেকটা তক্তা থেকে পেরেক খুলে আসা শব্দের মতো, আর ঠিক তখনই হুড়মুড় করে ভারার কয়েকটা তক্তা ভেঙে পড়লো।

বুড়ো ওসিপ চমকে ঘুরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে ও লাফিয়ে উঠলো। সেই মুহূর্তে শোনা গেলো ভয়ার্ত একটা চিৎকার, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

ছুতোরদের গায়ের রক্ত তখন গলে জল। ওপর থেকে বাঁশ সমেত মাচানটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে মাটিতে খসে খসে পড়ছে তক্তা, কাঠের চোকলা, ভাঙা ইঁট। আর তার মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে কলোবভের অস্পষ্ট বিহ্বল আর্তচিৎকার: 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

যে যেখানে ছিলো স্তব্ধ বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। বুড়ো ওসিপের শত অনুরোধ সত্ত্বেও কেউ এক পাও নড়লো না। 'তখন না আমি তোমাদের পইপই করে বলেছিলুম তক্তাগুলোর গায়ে কয়েকটা পেরেক ঠুকে দাও, আমার কথা তোমরা কানেই নিলে না। আর এখন তোমাদের ভুলের জন্যে একটা মানুষ মরতে বসেছে! হাঁ করে দেখছো কি? যাও, গিয়ে ওকে টেনে তোলার চেষ্টা করো।'

'এত চেল্লাবার কি আছে?' ইয়াকভ বললো। 'ভুল আমাদের নয়, ভুলটা ওঁর নিজের। উনিই আমাদের নতুন তক্তা নিতে বারণ করেছিলেন।'

কে যেন ওসিপকে বললো, 'তুমি পেরেকের কথা বলছো, কিন্তু উনিই তো আমাদের কম পেরেক দিয়েছেন, যাতে না বাজে খরচ করি।'

অন্য আর একজন ফোঁস করে উঠলো। 'তার জন্যে কি আমরা দায়ী?'

বুড়ো ওসিপের লাল মুখটা তখন উত্তেজনায় থমথম করছে। কাঁপা কাঁপা হাতে বুড়বাকগুলোকে ঠেলতে ঠেলতে ও বললো, 'তা বলে আমরা তো আর মানুষটাকে এভাবে মরতে দিতে পারি না!'

একের পর এক ভারার বিভিন্ন অংশ তখনও ভেঙে ভেঙে পড়ছে। শুকনো চুন-সুরকির একটা বালতি সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়লো। ধুলোর মেঘে ঢেকে গেলো সামনের দৃশ্যালী। এখন আর শোনা যাচ্ছে না কলোবভের আর্তস্বর।

'দাঁড়াও, আমি গিয়ে দেখে আসছি।' মাজিন ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো।

'মারা পড়বে। যেও না, যেও না···শোন···' কয়েকজন তারস্বরে চিৎকার করলো।

'কেন ওর পেছনে ডাকছো? কোন ভয় নেই ভাংকা, ঈশ্বরের নাম নিয়ে এগিয়ে যাও।'

কারুর নাম না নিয়েই মাজিন নিঃশব্দে বরাবরের মতো বাঁকা পায়ে টলমল করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ধুলোর মেঘ সরে যেতে বিধ্বস্ত ভারার খানিকটা অংশ চোখে পড়লো। কয়েকটা বাঁশ, কাঠের টুকরো এমনভাবে ঝুলছে যেন পড়বে কি পড়বে না এখনও ঠিক করে উঠতে পারছে না। জানলার কাঠামো থেকে একটা ভারি তক্তা ভীষণভাবে দুলছে, কেননা তার এক প্রান্তে কলোবভ চার হাত পা ছড়িয়ে গজকচ্ছপের মতো লেপ্টে জড়িয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু দশাসই একটা মানুষের ভারে ওটা যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে কিংবা কাঠামোর মাথা থেকে খুলে যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই চারতলার ওপর থেকে পড়ে ছাতু হয়ে যেতে এক মিনিটও সময় লাগবে না। তাই এই মুহূর্তে উনি আর নাড়াচাড়া করছেন না বা চেঁচাচ্ছেন না, যেন তক্তার সঙ্গে জমে গেছেন।

ওঁর ওই দৃশ্য দেখে সবাই স্তম্ভিত। অথচ একটু পরেই ভয় কেটে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে জনতার উপদেশবাণী শোনা গেলো।

'শিগগির নিচে একটা ত্রিপল ধরো, তার ওপর উনি লাফিয়ে পড়বেন।'

'যদি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকেন?'

'ওপরে গিয়ে বরং তক্তাটা ধরে টানো।'

'ভেঙে যেতে পারে।'

'বাঁশ দিয়ে ঠেকো দিলেই হবে।'

'আচ্ছা বুদ্ধু তো! অত বড় বাঁশ কোথায় পাবে?'

'এই, ছাখো ছাখো!'

সবাই দেখলো মোটা একটা কাছি হাতে মাজিন জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও যেন কি বলছে, কেননা ওর ঠোঁট নড়ছে। সবাই নিষ্পলক, নিশ্চুপ।

'জাকার ইভানোভিচ, এই যে শুনছেন? আমি দড়িটা ছুঁড়ে দিচ্ছি, আপনি ফাঁসটা তক্তার মাথায় লাগিয়ে দিন। শুনতে পাচ্ছেন? এই যে, নিন।'

কাছির একটা প্রান্ত মাজিন শূন্যে দিলো এবং সেটা পড়লো কলোবভের গায়ের ওপর। ধীরে ধীরে খুব সন্তর্পণে উনি নড়লেন। তক্তাটা দুলে উঠলো। শোনা গেলো অস্ফুট আর্তনাদ।

'ভয় পাবেন না, ইভানোভিচ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, আর মাজিন যা বলছে তাই করুন।' নিচে থেকে বুড়ো ওসিপ চিৎকার করে বললো।

অন্যরাও নানা উৎসাহ দিলো। অত্যন্ত সন্তর্পণে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে কলোবভ কোনরকমে ফাঁসটা তক্তার প্রান্তে পরিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ, এবার চুপটি করে শুয়ে থাকুন।' কথাটা বলে মাজিন পিছিয়ে গেলো, তারপর কাছিটা ধরে টানতে শুরু করলো। তক্তার শেষ প্রান্তটা এবার ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো।

'সাব্বাস ভাংকা, সাব্বাস!' ওর কাণ্ড দেখে বুড়ো নিচে থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো। 'যাও যাও, বোকা হাঁদাগুলো। শিগগির গিয়ে ওকে সাহায্য করো।'

কয়েকজন দ্রুত বাড়িটার দিকে ছুটে গেলো। তক্তার ফাঁস-বাঁধা প্রান্তটা এত ওপরে উঠে গেছে যে তক্তাটা জানলার দিকে হড়কে এলো। 'এবার কাঁকড়ার মতো হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসুন, জাকার ইভানোভিচ! খুব সহজ। না না, ভয় নেই, তক্তাটা ভাঙবে না।'

বিপদ তখনও কাটেনি, কেননা তক্তাটা যে-কোন মুহূর্তে সরে যেতে পারে, তবু নিচের সবাই হাসাহাসি করছে। কলোবভের সারা দেহ ধুলোয় ঢাকা, বিবর্ণ মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সে এক দেখার মতো দৃশ্য—যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি করুণ! সাবধানে মাথাটা একটু তুলে বিশাল ভারি দেহটা শুশুকের মতো বেঁকিয়ে উনি যত জানলার দিকে এগিয়ে আসছেন, জনতা ততই উৎচকিত হাসিতে ফেটে পড়ছে।

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওঁর পেটে নিশ্চয়ই কোন গোঁজ ঢুকেছে।' দেওয়াল রং করার মজুর ঠাট্টা করে বললো।

'আজ ওঁর যা ভালো খিদে হবে না!'

'আমাদের খেয়ে খেয়ে বাছাধনের অনেক দিন থেকেই পেটটা মোটা হয়ে আছে।' ইয়াকভকে আজ সবচেয়ে খুশি মনে হলো।

গুঁড়ি মেরে কলোবভ জানলার কাছে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন, এবার দুজন মজুরের কাঁধে ভর দিয়ে মেঝেতে নামলেন। খানিকটা পরে ওঁকে দেখা গেলো ভিড়ের দিকে এগিয়ে আসতে। ভূতের মতো নোংরা, ঘামে ভেজা সারা শরীর, কোনরকমে একটা পা টেনে টেনে হাঁটছেন। ধরাধরি করে ছ্যাকড়া গাড়িতে বসিয়ে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। ভিড় ভেঙে যার পরেও কয়েকজন মাজিনকে ছেঁকে ধরলো। উৎসুক হয়ে ওরা জিগেস করলো কি করে মনিবকে উদ্ধার করার বুদ্ধিটা তার মাথায় এলো।

দড়িটা হাতে নিয়ে মাজিন এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। এবার সেটা

সে ফেলে দিলো। 'জানি না। তক্তাটার জন্যেই উনি বেঁচে গেলেন। আমার খিদে পেয়ে গ্যাছে, আমি খেতে চল্লুম।'

'কিন্তু তুমি নিজেও তো মারা পড়তে পারতে? তখন কি হতো?'

'না, মারা পড়তুম না।'

'মাজিন, তুমি এখানে! আর আমরা সারা জায়গায় তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই তো বলি ও কোথায় থাকতে পারে, না, এসে দেখি বাবু এখানে!' বুড়ো ওসিপ ঠিকেদারকে পৌঁছে ফিরে আসতে না আসতেই গড়-গড় করে কথাগুলো বলে গেলো। 'চলো, আমাদের সঙ্গে খাবে চলো। ঈশ্বর তোমার সহায় হয়েছেন, মাজিন। না হলে তক্তাটার দিকে তাকিয়ে ছাখো, ওটা এমন একটা কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু উনি চাননি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ মারা যাক। তুমি অবশ্য তোমার কর্তব্য নিশ্চয়ই পালন করেছো।'

বুড়োর পাশাপাশি হেঁটে গেলেও, ওর আবেগ-নির্ঝরে মাজিন খুব একটা কানই দিলো না।

'তোমার কোথাও আঘাত লাগেনি তো?'

'না। পায়ে এই সামান্য একটু…'

'খুব ব্যথা করছে?'

'না না, ও কিচ্ছু নয়। আপনিই সেরে যাবে।'

'ভদকা দিয়ে খানিকটা ঘষে দিও, দেখবে ঠিক হয়ে গ্যাছে।'

'তার চাইতে বরং খেলে কাজ হবে।' একটু নিস্তব্ধতার পর মাজিন বললো, 'অবশ্য যদি জোটে।'

বাচ্ছাদের মতো খুশিতে বুড়ো চলকে উঠলো। 'অবশ্যই, আমি তোমাকে জুটিয়ে দেবো।'

খানাপিনার পর ছুতোররা সবাই পানশালায় বসে জটলা করছে। আসলে ঠিকেদারের ফিরে আসা এবং ভারা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর পরবর্তী হুকুমের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে।

'দেখো, উনি খুব শিগগিরই ফিরে আসবেন।' ইয়াকভ বললো।

'নিশ্চয়ই,' তরুণ আফোনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ স্বরে বললো, 'না হলে কে আমাদের ছিঁড়ে খাবেন, কে বলবেন ওঁর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমরা ইচ্ছে করে এই সব কাণ্ড করেছি!'

'কেন আমাদের ছিঁড়ে খাবে না?' বুড়ো জিগেস করলো। 'এর জন্য তো

আমরাই দায়ী। এটা অবশ্য ঠিক যে তক্তাগুলো হয়তো পুরনো ছিলো, কিন্তু আমাদেরও তো চোখ হাত পা ছিলো, নাকি ছিলো না?'

তর্ক জুড়ে দিলেও বুড়োর সঙ্গে কেউ যুক্তিতে পেরে উঠলো না। তক্তা-গুলো যথেষ্ট মজবুত কিংবা পেরেকের সরবরাহ সুপ্রচুর না থাকলেও, ওদের সতর্কতার অভাবও কোন অংশে কম ছিলো না। এবং তার জন্যে ওদের ওপর ক্রুদ্ধ হবার অধিকার কলোবভের আছে।

'এখন এসব কথা বলার কোন মানেই হয় না।' ইয়াকভ রীতিমত অধৈর্য হয়ে উঠলো। 'অধিকারের কথা যদি বলো, আমাদের ওপর আলতু-ফালতু ঘেউ ঘেউ করারও কোন অধিকার ওঁর নেই।'

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু সবাই কেমন যেন মনমরা হয়ে রইলো। কিন্তু জাকার ইভানোভিচ যখন নিঃশব্দে পানশালার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং কারুর ওপর হম্বিতম্বি করলেন না, তখন সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

উনি জিগেস করলেন, 'ভাংকা কোথায়?'

ছুতোরদের মধ্যে তিনজন ভাংকা ছিলো। ওদের দুজন বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সপ্রশ্ন চোখে ঠিকেদারের দিকে তাকালো।

কলোবভ ভ্রূ নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আর একজন কোথায়?'

'কে, ভিয়াতকার ভাংকা? ও তক্তার গাদার ওপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ভাংকা! হেই ভাংকা! মনিব তোকে ডাকছেন!'

মাজিন আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলতে তুলতে পানশালায় প্রবেশ করলো। কলোবভ এমন গভীরভাবে একটা শ্বাস নিলেন যে ওঁর ভুঁড়িটা নেচে উঠলো, চিবুকের দু পাশে ঢেউ খেলে গেলো।

'এসো মাজিন,' ধীরে ধীরে উনি শুরু করলেন। 'তোমাকে আমি সামান্য কিছু বলতে চাই। এটা প্রমাণ হয়ে গ্যাছে যে এইসব শিমপঞ্জীগুলোর মধ্যে তুমিই সবচেয়ে চটপটে আর বুদ্ধিমান। তুমি না থাকলে হয়তো আমার আজ মৃত্যুই হতো। কেননা এগুলো কেউ মানুষ নয়, বিবেক-বুদ্ধিহীন স্রেফ কাঠের গুঁড়ি। সে যাই হোক, আমার জীবন রক্ষা করার জন্যে আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

ভর্ৎসনা-কঠিন চোখে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কলোবভ প্রতীক্ষা-উৎকণ্ঠিত প্রতিটা কৌতূহলী মুখের ভাষা পড়ে নিলেন।

'তোমরা কি ভাবছো আমি জানি। ভাবছো ভাংকাকে দেওয়া পুরস্কারের

টাকায় তোমরা সব মদ গিলবে? উঁহু, ওটি হবে না। ভাংকা, এই টাকাটা দিয়ে তুমি যা খুশি কোরো, কিন্তু ওদের একটা ছিটেফোঁটাও দিও না।'

মাজিন অবাক হয়ে গেলো। 'কিসের টাকা?'

'দাঁড়াও দিচ্ছি। এই নাও।' ঠিকেদার তিন রুবলের একটা নোট মাজিনের হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর উজ্জ্বল গর্বিত চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, ভাংকা।'

মাজিন কিন্তু অপলক চোখে হাতে-ধরা নোটটার দিকে তাকিয়ে রইলো। 'তার মানে এটা কি আমার জন্যে?' শান্ত স্বরে ও জিগেস করলো।

'আচ্ছা বোকা তো তুমি! নিশ্চয়ই, নইলে আবার কার জন্যে?'

'হুঁ। তার মানে, অন্যভাবে বলতে গেলে···দড়ি নিয়ে ওঠার জন্যে···'

'ঠিক তাই!' মাজিনের নির্বোধ বিষণ্ণ ভঙ্গি দেখে কলোবভ হেসে উঠলেন।

'আপনি কি মনে করেন তিন রুবলের জন্যে আমি এ কাজ করেছি?' ওঁর চোখের থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে মাজিন জিগেস করলো। তখনও ও বিহ্বল চোখে নোটটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'কেন, তোমার কি খুব কম বলে মনে হচ্ছে?' শুকনো গলায় বিড়বিড় করে কলোবভ আবার প্যান্টের পকেটে হাত পুরলেন। মাজিন আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো, তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে মাথা তুললো। পচা বাঁধাকপি খাওয়ার মতো মুখটা ওর আপনা থেকেই বিকৃত হয়ে গেছে। 'তাহলে আপনি ধরেই নিয়েছেন যে তিন রুবলের জন্যে আমি এ কাজ করেছি, কি তাই তো? নিন, ধরুন। সত্যিই আপনি একটা নির্বোধ, জাকার ইভানোভিচ। মনে রাখবেন আপনার দুর্লভ জীবন বাঁচাবার জন্যে আমি ওপরে উঠেছিলাম, আপনার এই তিন রুবল পুরস্কারের লোভে নয়! নিন, আপনার পুরস্কারের টাকাটা নিয়ে সোজা এখান থেকে কেটে পড়ুন। যান, বেরিয়ে যান! আপনাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'কি বল্লি? আমাকে সহ্য করতে পারছিস না? আমাকে···আমাকে তুই বেরিয়ে যেতে বল্লি?' রাগে অপমানে ঘৃণায় গলার স্বর তখন ওঁর বুজে এলো। 'আর তোমরা, তোমরা সব দাঁত বার করে হাসছো?'

'বেরিয়ে যান, জাকার ইভানোভিচ!' মাজিনের গলার স্বর চড়ে উঠলো। 'আর আমার টাকা পয়সা মিটিয়ে দিন, আমি চলে যাচ্ছি।'

'সাব্বাস!' বুড়ো ওসিপ চেঁচিয়ে উঠলো। 'এই তো মরদের বাচ্ছা!'

ঠিকাদারের অবস্থা তখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষের মতো। প্রতিটা শ্রমিকের বিজাতীয় হিমেল দৃষ্টি এসে পড়েছে ওঁর মুখের ওপর। উনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলেন এতদিন তিল তিল করে মনিবের যে মান-সম্ভ্রম তিনি গড়ে তুলেছিলেন, এই মুহূর্তে তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তবু উনি চলে যেতে পারলেন না, কি যেন তাঁকে পেছনে ধরে রাখলো। সবার দৃষ্টির সামনেই উনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো ক্রূর বাঁকা হাসি। 'বেশ, আর কি বলবার আছে বলে ফ্যালো ?'

'নাঃ, সত্যিই তোমার সাহস আছে, ভাংকা।' আনন্দের আতিশয্যে বুড়ো ওসিপের চোখদুটো চকচক করে উঠলো।

'ওঃ, বুড়ো শয়তান, তুমিও এর মধ্যে রয়েছো ! বেশ, ঠিক আছে। আমিও তোমাদের মজা দেখাচ্ছি !'

অথচ উনি খুব ভালো করেই জানেন ওদের কিছু দেখাতে বা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই আর কোন কথা না বলে গটমট করে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'বাঃ, খুব ভালো বলেছো, ভাংকা ! ঠিক বলেছো !' বুড়ো ওসিপ্ আনন্দের চোটে মাজিনের চারপাশে কয়েক পাক ঘুরেই নিলো। 'ওরা ভাবে টাকা দিয়ে বুঝি সব কৃতজ্ঞতা সব আন্তরিকতা কিনে নেওয়া যায়। তুমি ঠিক করেছো, ভাংকা ! মুখের মতো জবাব দিয়েছো।'

সবাই বুঝতে পারলো অদ্ভুত স্বভাবের ভাংকা মাজিন আজ মনিবের ওপর যে ব্যবহার করলো তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাই কৌতূহল মিশ্রিত ভয়ে বিস্ময়ে ওরা মাজিনের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন লুকনো বন্দুক থেকে মাজিন একখুনি ওদের ওপর গুলি চালাবে। অথচ পরমুহূর্তেই মাজিনের সেই বোকা বোকা চেহারাটা আবার ওদের চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠলো—অন্য আর পাঁচজনের চাইতে যে ভিন্ন, বিষণ্ণ আর অস্থিমজ্জাহীন।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় মাজিন আর বুড়ো ওসিপ একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলো। ওদের দুজনকেই ঠিকেদার কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন। মাজিন নিঃশব্দে রুটি চিবুচ্ছে আর বুড়ো ওসিপ দুপুরের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে।

'বুঝতে পেরেছি তিন রুবলের ব্যাপারটা তোমাকে মর্মাহত করেছে। খুব স্বাভাবিক। নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি যে ওপরে উঠে গেলে, সেটা

কিসের জন্যে ? যেহেতু তোমার মায়া হয়েছিলো। হাজার হোক, আমাদের মতো উনিও তো মানুষ। আর আমাদের সবায়েরই হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে। তার বদলে উনি কিনা তিন রুবল দিয়ে দায় সারতে চাইলেন ! অথচ অর্থের কোন প্রয়োজন ছিলো না। মন প্রাণ ঢেলে তুমি যে কাজ করলে, তার মূল্য ওঁর কাছে তিন রুবল ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। নিশ্চয়ই, এটা রীতিমতো অপমানকর বইকি।'

কোন রকমে রুটিটা গিলে মাজিন চায়ের গেলাসটা তুলে নিলো। তারপর ধীরে ধীরে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বললো, 'এত সহজে ওঁকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আমার উচিত ছিলো ওঁর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনা। কিন্তু পারিনি। ওঁর জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছিলো, দেখলুম যে নিতান্ত একটা মুখ্যু ছাড়া উনি আর কিছুই নন। ওঁর মতো একটা মানুষের কাছ থেকে এ ছাড়া তুমি আর কিবা আশা করতে পারো, বলো ?'

হাতের ভঙ্গিতে ও বুড়ো ওসিপকে ব্যাপারটা ছেড়ে দেবার জন্যে ইঙ্গিত করলো। তারপর সশব্দে গেলাসে চুমুক দিলো। আর প্রতিটা চুমুকে চায়ের আস্বাদটুকু ও যেন জিব দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে গ্রহণ করতে লাগলো পরম তৃপ্তিতে।

১৮৯৭

স্বপ্ন নিয়ে

বিরাট অজগরের মতো যাত্রিবাহী ট্রেনটা ধোঁয়ার মেঘ ওড়াতে ওড়াতে অন্তহীন স্তেপের মধ্যে ফসলের হলুদ সমুদ্রে মিলিয়ে গেলো। ঝোড়ো হাওয়ায় ধোঁয়া যেমন মিলিয়ে যায়, মানুষের ক্ষণিক কোলাহলও তেমনি চকিতে হারিয়ে গেলো তেপান্তরের অসীম শূন্যতায়। এক-বুক করুণ নির্জনতা নিয়ে পড়ে রইলো কেবল ছোট্ট স্টেশনটা।

তবু যতক্ষণ ট্রেনের উৎকট শব্দটা ছিলো স্টেশনটাকে জীবন্ত মনে হচ্ছিলো, কিন্তু সে-শব্দ আকাশের নীলিম শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে না যেতেই নেমে এলো দুঃসহ নিস্তব্ধতা।

সোনালী স্তেপ, আর গাঢ় নীল আকাশ—দুটোই সীমাহীন। অপার এই বিস্তীর্ণতার মধ্যে লাল রঙের ছোট্ট স্টেশন-ভবনটাকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন তুলির আঁচড়ে আঁকা খেয়ালী কোন শিল্পীর বিষণ্ণ করুণ একটা ছবি।

প্রতিদিন বেলা বারোটা আর বিকেল চারটেয় স্তেপের দিক থেকে ট্রেন এসে স্টেশনটায় দু মিনিটের জন্যে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে এই চার মিনিটই এখানে কর্মরত মানুষের মনে এনে দেয় চাঞ্চল্য, বৈচিত্র্যের একটা নতুন অনুভূতি।

প্রতিটা রেল-কামরায় নানা শ্রেণীর মানুষ, নানা ধরনের পোশাক। মুহূর্তের জন্যে জানলা থেকে দেখা যায় ওদের ক্লান্ত-শ্রান্ত উদাসীন মুখগুলো। তারপরই আবার ঘন্টাধ্বনি, বাঁশির আওয়াজ আর কোলাহল স্তেপের বুক থেকে মিলিয়ে যায় ব্যস্ত কর্মমুখর শহরের দিকে।

স্টেশনের কর্মীরা এইসব মুখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে থাকে, ট্রেন চলে গেলে ওরা পরস্পরে নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে। ওদের চারপাশে স্তেপের নির্জনতা, মাথার ওপরে ঢালু আকাশ, আর বুকের মধ্যে সেইসব মানুষদের জন্যে একটা বিদ্বেষ, যারা প্রতিদিন তাদেরকে এই নির্জন প্রান্তরে অবরুদ্ধ রেখে পাড়ি দিচ্ছে অজানা দূরত্বে।

প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা ফসলের হলুদ সমুদ্রে কালো ফিতের মতো অপসৃয়মান ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনের ক্ষণিক চঞ্চলতায় ওরা এমনই মগ্ন যেন মূক হয়ে গেছে।

রেল কর্মচারীদের প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত রয়েছে। সুন্দর চুল, এলোমেলো পেল্লাই গোঁফ, লম্বা-চওড়া মানুষ, স্টেশন-মাস্টার। বাদামী চুল,

ছাগলের মতো ছোট্ট একটু দাড়ি, স্টেশন-মাস্টারের তরুণ সহকারী। বেঁটে, চটপটে আর চালাক-চতুর স্টেশন-গার্ড, লুকা। ঘন দাড়ি, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার সুইচম্যান, গোমোজভ। স্টেশন-মাস্টারের বউ বসে রয়েছে অফিসঘরের সামনে একটা বেঞ্চিতে। ছোটখাটো আর গোলগাল দেখতে। কোলে ঘুমোচ্ছে ছোট্ট একটা বাচ্ছা, মুখটা ঠিক মায়ের মতো গোল আর টুকটুকে লাল।

ট্রেনটা ফসলের সমুদ্রে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবার পর স্টেশন-মাস্টার বউয়ের দিকে ফিরে তাকালেন। 'চায়ের সরঞ্জাম সব তৈরি আছে তো, সোনিয়া?'

'হ্যাঁ।' কোমল অথচ ম্লান স্বরে সোনিয়া ছোট্ট করে জবাব দিলো।

'লুকা, জিনিসপত্তর সব গোছগাছ করে ফ্যালো। প্লাটফর্মটা ঝাঁট দিয়ে নাও। ছাখো, হতভাগাগুলো কত নোংরা ফেলে গ্যাছে।'

'দেখেছি, মাতভেই ইয়েগোরোভিচ।'

'নিকোলাই পেত্রোভিচ, চল হে, এবার একটু চা পান করা যাক।'

সহকারী ছোট্ট করে জবাব দিলো, 'চলুন।'

প্লাটফর্ম ছেড়ে ওরা খাবার ঘরে প্রবেশ করলো। আসবাবপত্রের বাহুল্যবিহীন সাদামাঠা একটা ঘর। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বাসন্তী রঙের পোশাকপরা কালো চুল শ্যামলা মেয়েটাকে তুমি লক্ষ্য করেছো, পেত্রোভিচ? আমি তো বলবো রীতিমত আকর্ষণীয়।'

'যদিও পোশাকে তেমন কোন রুচি নেই তবু মন্দ নয়।' সহকারী জবাব দিলো।

নিকোলাই পেত্রোভিচ সব সময়েই খুব আস্থাভরে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়। কেননা রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত লোক হিসেবে নিজের মনে ওর প্রচ্ছন্ন একটা অহংকার আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। ওর ছোট কালো একটা বাঁধানো খাতা আছে, তাতে বিখ্যাত সব মনীষীদের উদ্ধৃতি টুকে রাখে। নিজের কাজ ছাড়া আর সব ব্যাপারেই স্টেশন-মাস্টার ওর কর্তৃত্বকে মেনে নেন এবং ওর মন্তব্যগুলোকে মন দিয়ে শোনেন, বিশেষ করে খাতায় টুকে-রাখা উদ্ধৃতিগুলো তো বটেই। কিন্তু শ্যামলা মেয়েটির পোশাক সম্পর্কে সহকারীর মন্তব্যে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা খটকা লাগায় স্টেশন-মাস্টার জিগেস করলেন, 'কেন? শ্যামলা মেয়েদের কি বাসন্তী রঙের পোশাক মানায় না?'

কাচের ডিস থেকে নিজের প্লেটে শোভন ভঙ্গিতে খানিকটা জ্যাম ঢেলে নিয়ে সহকারী বললো, 'রঙের কথা আমি ভাবিনি, বলছি ছাঁটের কথা।'

'ও, ছাঁট ! সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার।'

ওদের এই আলোচনায় সোনিয়াও যোগ দিলো, কেননা এটা তার মনোমত বিষয়। কিন্তু কিছুটা মার্জিত রুচিসম্পন্ন এই দুটি মানুষের সঙ্গে আলাপ তেমন জমে উঠলো না, কেননা আবেগসহকারে ও বিশেষ কিছুই বলতে পারলো না। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সীমাহীন নিস্তব্ধ স্তেপ আর সুন্দর একফালি আকাশ। একঘন্টা যেতে না যেতেই একটা মালগাড়ি এসে পড়লো। কর্মীরা সবাই পুরনো, পরিচিত। গার্ডেরা নিদ্রাতুর, যেন অন্তহীন তেপান্তর পাড়ি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কখনও কখনও ওরা পথ-দুর্ঘটনার পুরনো গল্পেরই পুনরাবৃত্তি করেঃ ওখানে একটা লোক কাটা পড়েছে। নিজেদের কাজ সম্পর্কেও গল্পগুজব করে ঃ অমুকের জরিমানা হয়েছে, অমুককে অমুক জায়গা থেকে বদলি করা হয়েছে। এদের কাছে এই সব মুখোরোচক খবর নিতান্ত হেলাফেলার নয়, যত তুচ্ছই হোক না কেন, সবাই তা হাঁ করে গেলে।

ধীরে ধীরে স্তেপের ওপারে সূর্য অস্ত গেলো, আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিলো খানিকটা গোলাপী রঙের আবির। অস্পষ্ট কামনার মতো সে আভায় রঙিন হয়ে উঠলো সবকিছু। তারপর মৃদু সুরমূর্ছনার মতো সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও যখন মিলিয়ে গেলো পশ্চিম দিগন্তে, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামলো। আকাশে ফুটে উঠলো টিপ টিপ কয়েকটা তারা, যেন দুঃসহ নির্জনতার ভয়ে শিউরে উঠছে।

সারা স্তেপ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। রাত্রির ছায়াগুলো চারদিক থেকে ছোট্ট স্টেশনটাকে নিঃশব্দে ঘিরে ধরেছে। তারপর অতর্কিতে নিঃশব্দ রাত্রি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লো প্লাটফর্মের বুকে।

স্টেশনে আলো জ্বালানো হয়েছে। অন্ধকারে, উঁচুতে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে আলোটা সবার আগে চোখে পড়ে তা হলো সিগন্যালের ছোট্ট সবুজ বাতিটা। মাঝে মাঝে ঘন্টা বাজছে, ট্রেন আসার সংকেত দিচ্ছে। তার অল্পক্ষণ পরেই স্তেপের নির্জন অন্ধকার চিরে ধেয়ে আসে লাল একটা আলো, ট্রেনের গর্জন। তারপরেই ছোট্ট স্টেশনটা আবার অন্ধকারে ঢেকে যায়।

স্টেশনের তথাকথিত এই ছোট্ট অভিজাত সম্প্রদায় থেকে নিচু শ্রেণীর জীবন কিছুটা ভিন্ন। স্টেশন-গার্ড লুকা থাকে মাইল পাঁচেক দূরের একটা গ্রামে। সেখানে তার স্ত্রী পরিবারের কাছে ছুটে যাওয়ার জন্যে ওর মন সব সময় পালাই পালাই করে। তাই ও প্রায়ই স্বল্পবাক সুইচম্যান গোমোজভকে তার 'কাজ'টা করে দেবার জন্যে অনুরোধ করে।

'পরিবার' শব্দটা শুনলেই গোমোজভ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ঠিক আছে, যাও। নিশ্চয়ই, পরিবার থাকলে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে বইকি।'

অন্য সুইচম্যান, লাল মুখ, একগাল পাকা দাড়ি, বুড়ো সৈনিক আফানাসি ইয়াগোদকা কিন্তু লুকাকে বিশ্বাস করে না, বরং বিদ্রূপই করে। 'পরিবার! তবু বউ বললে না হয় বুঝতুম। আর তোমার বউ বলতে তো সেই বিধবাটা…'

ঘৃণায় নাক সিঁটকে লুকা চেঁচায়, 'তুমি চুপ করো, পাখি-ধরা ধেড়ে বুড়ো কোথাকার!'

লুকা রেগে গেলে তাকে ধেড়ে বুড়ো বলে ডাকতো, কেননা পাখির ওপর বুড়োর দারুণ ঝোঁক। তার ছোট্ট বাড়ির ভেতরে বাইরে নানান ধরনের পাখির খাঁচা আর দাঁড়ে ঠাসা। সারাদিনই ওরা কিচিরমিচির করে ডাকছে, মিষ্টি শিস দিচ্ছে, বুড়োর নিঃসঙ্গ জীবনকে ভরিয়ে দিচ্ছে মুখর কলকাকলিতে। বুড়ো তার সমস্ত অবসর সময়টা ব্যয় করে এদের পেছনে। ফলে সহকর্মীদের ওপর তার কোন আকর্ষণ নেই বললেই চলে। লুকাকে সে সাপ আর গোমোজভকে পাতসাপ বলে ডাকে, এবং মেয়েদের পেছনে লাগার জন্যে ওদের দায়ী করে।

লুকা সাধারণত বুড়োর বিদ্রূপে কানই দিতো না, কিন্তু বেশি দূর গড়ালে তুই-তোকারি করে গালমন্দ করতো। 'তুই তো একটা গর্তের ধেড়ে ইঁদুর, কর্ণেলের ছাগল চরাতিস! এতদিন শুধু বন্দুক নিয়ে ব্যাঙ তাড়িয়েছিস আর সৈন্যবাহিনীর বাঁধাকপি পাহারা দিয়েছিস। অন্যদের পেছনে লাগার অধিকার তোকে কে দিলো? যা যা, তোর পাখির ছানাদের খাওয়াগে যা!'

এই ধরনের তিরস্কার খানিকক্ষণ শান্ত হয়ে শোনার পর ইয়াগোদকা সোজা স্টেশন-মাস্টারের কাছে গিয়ে নালিশ করতো। অনেক জটিল সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত স্টেশন-মাস্টার চিৎকার করে ওকে তাড়িয়ে দিতেন। ইয়াগোদকা তখন স্টেশনের বাইরে এসে অশ্লীলতম ভাষায় গালমন্দ করতো, আর লুকা কানে আঙুল দিয়ে চোঁচাঁ দৌড়ে পালাত।

সোনিয়া ছাড়া স্টেশনে আর একটি মহিলা আছে রাঁধুনি এরিনা। বয়স প্রায় চল্লিশ, হত-কুৎসিত দেখতে, বেঢপ চেহারা, ঝুলে-আসা ভারি বুক। যেমন অগোছালো, তেমনি নোংরা, সারা মুখে বসন্তের দাগ। তার কুৎসিত চেহারায় কেমন যেন ক্রীতদাসসুলভ একটা বিনীত ভাব রয়েছে। যেন সব সময় ঝুলন্ত পুরু ঠোঁটে সকলের সামনে নতজানু হয়ে দয়া ভিক্ষে চাইছে, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। প্রায় বছরখানেক গোমোজভ ওর দিকে বিশেষ

কোন নজরই দেয়নি। কিন্তু একদিন গোমোজভ স্টেশন-মস্টারের রান্নাঘরে এসে এরিনাকে কয়েকটা সার্ট বানিয়ে দিতে দিলো। এরিনা রাজি হলো, এবং সার্ট-গুলো হয়ে যাবার পর ও নিজেই গোমোজভের কাছে নিয়ে গেলো।

'ধন্যবাদ।' গোমোজভ হাসলো। 'তিনটে সার্ট দশ কোপেক করে, তার মানে তিরিশ কোপেক আমার কাছে তোমার পাওনা রইলো, কেমন তো?'

এরিনা ছোট্ট করে শুধু বললো, 'ঠিক আছে।'

একটু চুপ করে থাকার পর গোমোজভ জিগেস করলো, 'কোন্ প্রদেশের মেয়ে তুমি?'

এরিনা এতক্ষণ ঠায় গোমোজভের দাড়ির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলো, এবার বললো, 'রিয়াজান।'

'সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এখানে এলে কেমন করে?'

'জানি না। আমি তো একা, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই···'

'তা বটে,' গোমোজভ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এমন অবস্থায় মানুষ অনেক দূরে গিয়ে পড়তে পারে!'

দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ নীরব হয়ে রইলো। শেষে গোমোজভই প্রথম নীরবতা ভাঙলো। 'এই আমার কথাই ধরো না কেন। আমিও একা, তিন কূলে কেউ নেই। অথচ একসময়ে নিঝনি নোভগোরদে আমার ঘর-বাড়ি, বউ-ছেলেমেয়ে সব ছিলো। বউ মরলো কলেরায়, ছোট্ট বাচ্ছাদুটোও মরে গেলো রোগভোগে। আর আমি, আমিই শুধু একা বেঁচে রইলুম দুখ্যু নিয়ে। যেখানে কাজ করতুম, সেই কারখানাটা একদিন বন্ধ হয়ে গেলো, আর আমিও বেরিয়ে পড়লুম। তারপর দু বছর হয়ে গেলো এখানে এইভাবে কাটাচ্ছি।'

মৃদু নম্রস্বরে এরিনা বললো, 'নিজের বলে কিছু না থাকাটা একটা শাস্তি।'

'নিশ্চয়ই, খুব খারাপ। তুমি কি বিধবা?'

'না, কুমারী।'

নিজের সন্দিগ্ধ অভিব্যক্তিটুকুকে চাপা দেবার চেষ্টা না করেই গোমোজভ জিগেস করলো, 'এভাবে আর কতদিন চালাবে শুনি?'

'তাছাড়া আর উপায় কি।'

'তুমি বিয়ে করোনি কেন?'

'কে আমাকে বিয়ে করবে? আমার তো কিচ্ছু নেই। তার ওপর যা বিচ্ছিরি দেখতে।'

'হুঁ, তা বটে!' দাড়ি চুমরতে চুমরতে গোমোজভ সকৌতুকে ওর মুখের দিকে তাকালো। 'এখানে কত মাইনে পাও?'

'আড়াই রুবল।'

'তা বেশ। আচ্ছা, রাত্তিরে এসে তোমার পাওনাটা নিয়ে যেও। দশটা নাগাদ এসো। আমি তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেবো, আর কিছু করার না থাকলে দুজনে মিলে চা খাবো। আমরা দুজনেই তো নিঃসঙ্গ। এসো, কেমন?'

'আচ্ছা।' শুধু এইটুকু বলে ও চলে গেলো।

সেদিন ঠিক রাত দশটায় এরিনা এলো, আবার ভোরবেলায় চলে গেলো।

এর পর থেকে গোমোজভ ওকে আর কোনদিন আমন্ত্রণ জানায়নি বা ওর ত্রিশ কোপেকও ফেরোত দেয়নি। এরিনা আসতো নিজেরই গরজে। এসে নীরব নম্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতো তার সামনে। আর গোমোজভ বিছানা থেকে উঠে বসে ওকে বলতো, 'বসো।'

এরিনা বসলে গোমোজভ বলতো, 'দেখো, কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়, তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বো। আমাদের তো আর সে-বয়স নেই, বুঝলে?'

এরিনা কেবল ঘাড় নেড়ে ছোট্ট করে সায় দিতো।

আর ও যখন চলে যেতো, রিপু করার জন্যে কিছু কাপড় গছিয়ে দিয়ে গোমোজভ আবার সাবধান করে দিতো। 'দেখো, কেউ যেন না টের পায়।'

এইভাবে অন্যের চোখ এড়িয়ে ওরা পরস্পরে বাস করতে লাগলো।

প্রায় প্রতিদিনই রাত্তিরে এরিনা লুকিয়ে লুকিয়ে যেতো তার ঘরে, আর গোমোজভ ওকে অবজ্ঞাভরে গ্রহণ করতো প্রভুর মতো। মাঝে মাঝে সে বলতো, 'আহা, কি মুখের ছিরি!'

লজ্জা পেয়ে এরিনা শুধু নম্রভাবে হাসতো।

দিনের বেলায় ওদের দু' জনের দেখা প্রায় হতোই না। হঠাৎ করে কখনও সখনও দেখা হয়ে গেলে গোমোজভ ফিসফিস করে জিগেস করতো, 'আজ রাত্তিরে আসছো তো?'

ঘাড় নেড়ে এরিনা সম্মতি জানাতো।

সম্মতি না জানালেও ও যেতো একান্ত অনুগতভাবে। বসন্তের দাগভরা মুখে ফুটিয়ে তুলতো একটা গাম্ভীর্য, যেন পবিত্র এই কর্তব্য সম্পর্কে ও সচেতন। অথচ বাড়ি ফেরার সময় ওর মন ভরে উঠতো অপরাধা-সুলভ একটা আশঙ্কায়। মাঝে মাঝে ও প্রায়ই নির্জন কোন একটা কোণে বসে স্তেপের দিকে অপলক

চোখে তাকিয়েথাকতো, রাত্রির নিতল অন্ধকার আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে দিতো ওর সারা মন।

একদিন বিকেলের ট্রেন চলে যাওয়ার পর, স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে পপলার গাছগুলোর ছায়ায় বসে তিনজনে চা পান করছে। একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে গরমের দিনে ওরা প্রায়ই এখানে বসে চা পান করে।

শূন্য পেয়ালাটা স্ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে স্টেশন-মাস্টার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'কালকের চাইতে আজ বেশি গরম পড়েছে।'

'তাস খেলতে পারলে মন্দ হতো না।'

'কিন্তু আমরা তো মাত্র তিনজন রয়েছি।'

'সোপেনহাওয়ার কি বলেছেন জানেন তো?' সহকারী ভারিক্কা চালে জিগেস করলো। 'তাস খেলা নাকি মানুষের মনের রিক্ততাকেই প্রকাশ করে।'

'মনের রিক্ততা! বাঃ, কথাটা ভারি সুন্দর তো!' স্টেশন-মাস্টার নিকোলাই পেত্রোভিচের দিকে তাকালেন। 'কে বলেছেন বললে?'

'সোপেনহাওয়ার। একজন জার্মান দার্শনিক।'

'ও, দার্শনিক!'

'দার্শনিকরা কি করে?' সোনিয়া প্রশ্ন করলো। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে?

'স্পষ্ট করে বোঝানো মুস্কিল। দার্শনিকরা কোন চাকরি করেন না, এটা স্বভাবদত্ত। সত্যি বলতে কি, যে কেউ দার্শনিক হতে পারেন। যিনি চিন্তা করার প্রতিভা নিয়ে জন্মান, যাঁর সমস্ত ব্যাপারে কার্যকারণ খোঁজার প্রবণতা আছে, তিনিই দার্শনিক। বিশ্ববিদ্যালয়েও দার্শনিক থাকতে পারেন, সত্যি বলতে কি, দার্শনিক সব জায়গাতেই থাকতে পারেন, এমন কি এই রেলের চাকরিতেও।'

'আচ্ছা, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অনেক টাকা মাইনে পান?'

'সেটা নির্ভর করে তাঁদের যোগ্যতার ওপর।'

স্টেশন-মাস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'নাঃ, আর একজন সঙ্গী থাকলে কয়েক ঘণ্টা দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যেতো।'

এরপর ও-আলোচনা আর জমলো না।

নীল আকাশের অনেক উঁচুতে, পাপলারের শাখায় শোনা যাচ্ছে পাখি-পাখালির গান। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এলো শিশুর কান্না।

স্টেশন-মাস্টার স্ত্রীকে জিগেস করলেন, 'ওর কাছে এরিনা আছে তো ?'

সোনিয়া জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

'মেয়েটার মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তুমি সেটা লক্ষ্য করেছো, পেত্রোভিচ ?'

সহকারী বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললো, 'বৈশিষ্ট্য তুচ্ছতারই নামান্তর।'

স্টেশন-মাস্টার খুশিতে চলকে উঠলেন। 'তার মানে, তার মানে ?'

কথাটা যখন ব্যাখ্যা করে বোঝানো হলো যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অভ্যেস, তখন মিষ্টি একটা আমেজে মুদে এলো ওঁর দু চোখের পাতা। আর সোনিয়া মিষ্টি করে হাসলো। 'এত সব তুমি কি করে মনে রাখো বলো তো ?'

'আচ্ছা, তুচ্ছতার কথাটা কে যেন বলেছেন বললে ?'

'বারিয়াতিনস্কি, একজন বিখ্যাত কবি।'

'ও, কবি ! সত্যি, এঁরা সব চমৎকার লোক।' স্টেশন-মাস্টারের মুখে ফুটে উঠলো আত্মপ্রসাদের হাসি। 'কিন্তু হ্যাঁ, এরিনা সম্পর্কে আমি যা বলছিলাম— ওটা একটা অদ্ভুত জীব। আমি ওর সম্পর্কে বিস্মিত না হয়ে পারি না। মনে হয় কিসের আঘাতে ওর বুকের ভেতরটা যেন চুরমার হয়ে গ্যাছে—কখনও হাসে না, গান গায় না, এমন কি কথা পর্যন্ত বলে না। যেন মাটিতে দাঁড়-করানো কাঠের একটা গুঁড়ি। অথচ কাজের বেলায় তুখোড়। লেলিয়াকে ও এমন ভাবে ছাখে যে শিশুর জন্যে আমাদের কোন চিন্তাই করতে হয় না।'

'খুব হয়েছে, থাক।' যদিও উনি জানেন সামনাসামনি ভৃত্যদের কখনও প্রশংসা করতে নেই এবং সেই জন্যেই কথাটা চাপা স্বরে বলেছিলেন, তবু গোপন ভ্রূকুটিতে সোনিয়া ওঁকে থামিয়ে দিলো। 'ওঁর সম্পর্কে অনেক ব্যাপারই আছে যা তোমরা জানো না।'

পোত্রোভিচ দুষ্টুমি করে টেবিলে চামচে ঠুকে মৃদু স্বরে ছড়া কাটলো :

দাসী রে দাসী, কেমনে তোরে ভালোবাসি বল,
তোরে নিয়ে যে পালিয়ে যাবো, নাই কো সম্বল।

'তার মানে, তার মানে ?' স্টেশন-মাস্টার চমকে উঠলো। 'ওকে নিয়ে তোমরা ব্যঙ্গ করছো ?'

সহকারী জোরে হেসে উঠলো, কপাল থেকে ঝরে পড়লো দুফোঁটা ঘাম।

'মোটেই ব্যঙ্গ নয়।' সোনিয়া প্রতিবাদ করলো। 'রুটির দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে। পোড়া আর তেতো। কিন্তু কেন ?'

'তা অবশ্য ঠিক, রুটিটা যেমন হওয়া উচিত ছিলো তেমন হয়নি। হ্যাঁ, এর জন্যে ওকে তোমায় বকতে হবে। কিন্তু হা ভগবান, আমি এতটা আশা করিনি! ওটা তো একটা ময়দার তাল! আর লোকটাই বা কে? লুকা? আমার তা মনে হয় না, ওটা তো একটা পাজির পাঝাড়া! নাকি সেই বুড়ো বদমাইসটা?'

নিকোলাই পেত্রোভিচ সংক্ষেপে বললো, 'গোমোজভ।'

'গোমোজভ! ওটা তো নিতান্তই নিরীহ গো-বেচরা। তুমি বানিয়ে বলছো না তো?'

এই আবিষ্কারে স্টেশন-মাস্টার সত্যিই খুব খুশি হলেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে গেলো। ভাবলেন প্রেমিক-প্রেমিকাকে খানিকটা ধমকে দিতে হবে। তারপর ওদের প্রেমালাপের দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে উঠতেই উনি আবার হাসতে শুরু করলেন। শেষে উনি সবিস্তারে সব জানতে চাইলেন। নিকোলাই পেত্রোভিচ গম্ভীর হবার ভান করলো, সোনিয়া তাঁকে থামিয়ে দিলো। তবু অদম্য স্টেশন-মাস্টার বললেন, দাঁড়াও বেবুন দুটোকে নিয়ে আমি একটা মজা করবো। এমন মজা করবো যে···

এমন সময় লুকা এসে জানালো, 'টেলিগ্রাফ টরে টক্কা করছে।'

'যাচ্ছি। বিয়াল্লিশ নম্বরে সংকেত দাও।'

তারপর উনি আর সহকারী অফিস ঘরে চলে এলেন। প্ল্যাটফর্মে লুকা ট্রেন আসার সংকেতসূচক ঘন্টা বাজাচ্ছে। পেত্রোভিচ পরবর্তী স্টেশনে বিয়াল্লিশ নম্বর ট্রেনটাকে পাঠানোর জন্যে বেতার-সংকেত পাঠাতে বসলো। আর স্টেশন-মাস্টার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে নিজের মনে হেসে বললেন, 'তোমাতে আমাতে মিলে ওদের নিয়ে একটা দারুণ মজা করবো, কি বলো পেত্রোভিচ? আর কিছু না-হোক অন্তত প্রাণ খুলে একটু হাসা যাবে।'

বেতারে সংকেত পাঠাতে পাঠাতেই সহকারী দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললো, 'তা অবশ্য মন্দ নয়।'

এর কয়েক দিন পরেই ওদের সেই প্রাণ খুলে হাসার সুযোগটা এলো।

সেদিন রাত্রিতে এরিনা এলো গোমোজভের শেডে, এবং গোমোজভের পরামর্শেই এরিনা নানা রকম ভাঙা কাঠের টুকরোর মধ্যে শয্যা পাতলো। মেঝেটা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাতে। ভাঙা চেয়ার, ফেলে-দেওয়া টব, কাঠের

তক্তা আর নানা রকম আজেবাজে জিনিসে গুদামঘরটা ঠাসা। অন্ধকারে সে-গুলো ভয়াবহ দেখাচ্ছে। অনেক্ষকণ ধরে সোহাগ আদর করার পর গোমোজভ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। এরিনা কিন্তু ভয়ে ঘুমতে পারলো না, খড়ের ওপর শুয়ে আতঙ্কিত চোখে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে গোমোজভকে জাগিয়ে দিয়ে ও ফিসফিস করে বললো, 'এই, শুনছো।'

অর্ধনির্মীলিত চোখে গোমোজভ জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার ?'

'ওরা আমাদের আটকে দিয়েছে।'

ঘুম-জড়ানো চোখে গোমোজভ লাফিয়ে উঠলো। 'তার মানে ?'

'ওরা এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে।'

আতঙ্কে ক্রোধে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গোমোজভ অস্ফুট স্বরে বললো, 'পাগল হলে না কি !'

'নিজেই গিয়ে দ্যাখো না।'

গোমোজভ দরজার কাছে গিয়ে কয়েকবার পাগলের মতো ধাক্কা মারলো। তারপর বিষণ্ণ ম্লান স্বরে বললো, 'নিঘ্যাত এসব ওই সৈনিক-ব্যাটার কাজ !'

দরজার ওপার থেকে চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এলো।

গোমোজভ চিৎকার করে উঠলো, 'আমাকে বেরুতে দাও।'

ওপার থেকে বুড়ো সুইচম্যান ইয়াগোদকার গলা শোনা গেলো, 'কি ব্যাপার ?'

গোমোজভ আবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠলো, 'আমাকে বেরুতে দাও বলছি।

'কাল সকালে।'

'কি হচ্ছে এসব, আমাকে ডিউটিতে যেতে হবে।

'তেমার হয়ে আমি ডিউটি করে দেবো, এখন যেখানে আছো সেখানেই থাকো।'

সৈনিক চলে গেলো।

'নেড়ি কুত্তা কোথাকার !' চাপা বিষণ্ণ স্বরে সুইচম্যান গর্জে উঠলো। 'তুমি এভাবে আমাকে কিছুতেই বন্ধ করে রাখতে পারো না। স্টেশন-মাস্টার যখন জিগেস করবেন গোমোজভ কোথায়, তখন তুমি কি বলবে শুনি ?'

ওপার থেকে কিন্তু কোন সাড়া এলো না। এরিনা হতাশ ভঙ্গিতে বললো, 'আমার ভয় হচ্ছে স্টেশন-মাস্টারই হয়তো ওকে দিয়ে এইসব করিয়েছেন।'

'স্টেশন-মাস্টার!' গোমোজভের দুচোখে ফুটে উঠলো স্তব্ধ বিস্ময়। 'তিনি এসব করতে যাবেন কেন? তুমি মিথ্যে বলছো!'

জবাবের পরিবর্তে এরিনা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'হা ভগবান, এখন যে কি হবে।' দরজার পাশে ওলটানো একটা টবের ওপর গোমোজভ এসে বসলো। 'এসব তোরই দোষ, শুয়োর-মুখো মাগী!'

এরিনা কোন জবাব দিলো না। কেবল ওর বুক খালি করে বেরিয়ে এলো করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস।

ছায়াঢাকা কদর্য অন্ধকারে ধুলো আর নোংরার দুর্গন্ধে নাক ভারি হয়ে ওঠে। দরজার ফাঁক দিয়ে একফালি ম্লান জ্যোৎস্না চুঁইয়ে এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। বাইরে স্টেশনের দিক থেকে ভেসে আসছে মালগাড়ি যাওয়ার গমগমে আওয়াজ।

'কিরে, কিছু বলছিস না যে?' চাপা ক্রোধে গোমোজভ গুমরে উঠলো। 'এখন আমি কি করবো? আমাকে এমন বিপদের মধ্যে ফেলে হাঁ-করে ভাবছিস কি? একটা উপায় বার কর না, হতভাগী! এ অপমান নিয়ে আমি এখন কি করে মুখ দেখাবো? হা ভগবান, কেন তুমি আমাকে এমন একটা জন্তুর সঙ্গে জড়ালে!'

নম্র স্বরে এরিনা বললো, 'আমি ওদের আমাকে ক্ষমা করতে বলবো।'

'তারপর?'

'হয়তো ওরা তা করবে।'

'তাতে আমার কি? ওরা নাহয় তোকে ক্ষমা করলো। কিন্তু আমার তো অপমান হলো, নাকি হয়নি? আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ওরা করবেই।'

একটু নিস্তব্ধতার পরেই গোমোজভ আবার ওকে গালাগালি দিতে শুরু করলো। দুঃসহ কিছুটা সময় কেটে যাবার পর এরিনা প্রকম্পিত স্বরে বললো, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, তিমোফেই পেত্রোভিচ।'

গোমোজভ গর্জে উঠলো। 'কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে তোকে ক্ষমা করবো।'

আবার নেমে এলো নিটোল নিস্তব্ধতার ভারি বোঝা। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো অন্ধকারে বন্দী দুটি মানুষ। এরিনা ককিয়ে উঠলো, 'উঃ, যদি একটু আলো থাকতো।'

গোমোজভ তেড়ে উঠলো। 'থাম মাগী! আমিই তোকে আলো দেখাচ্ছি!'

এরিনা আর কোন কথা বললো না। তড়পাতে তড়পাতে গোমোজভ

ভোরের দিকে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলো মোরগের ডাকে। চোখ কচলে ফিসফিস করে বললো, 'কিরে শুয়োর-মুখী, ঘুমিয়ে পড়েছিস ?'

এরিনা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'না।'

'কেন ?' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো গোমোজভের কণ্ঠস্বর।

বিলাপের মতো করুণ স্বরে এরিনা বললো,'আমার ওপর রাগ কোরো না, তিমোফেই পেত্রোভিচ। দোহাই তোমার, আমাকে তুমি করুণা করো। আমি নিঃসঙ্গ। তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।'

'চুপ কর! আর লোক হাসাস্ না।'

একটু পরে দরজার ফাঁক দিয়ে ঝলমলে এক ফালি ভোরের আলো এসে পড়লো ঘরের ভেতর। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেলো, কেউ যেন চোরা পায়ে দরজার সামনেএসে দাঁড়ালো। তারপর তালা খোলার শব্দ এবং স্টেশন-মাস্টারের ভারি গলার স্বর শোনা গেলো।

'গোমোজভ, এরিনার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসো।'

গোমোজভ অস্ফুট স্বরে বললো, 'চলো।'

এরিনা মাথা নত করে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে যেতে দেখা গেলো স্টেশন-মাস্টার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এরিনাকে উনি অভিবাদন জানালেন। 'নব-দম্পতিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই, ব্যাণ্ড বাজাও।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেইকান-ফাটানো আওয়াজে দুজনে থমকে দাঁড়ালো। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লুকা ভাঙা একটা ক্যানসতারার টিন পেটাচ্ছে আর বুড়ো সৈনিক ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিঙা ফুঁকছে। নিকোলাই পেত্রোভিচ গাল ফুলিয়ে মাথা দুলিয়ে এমনভাবে ঠোঁট দিয়ে শব্দ করছে মনে হচ্ছে যেন ও সত্যিই ভেরী বাজাচ্ছে: পম! পম! পম-পম-পম-পম!

সমবেত উৎকট এই ঐকতানে স্টেশন-মাস্টার হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন। গোমোজভের বিব্রত বিবর্ণ মুখের অবস্থা দেখে সহকারীও হাসি চাপতে পারলো না। তার পেছনে মাথা নিচু করে এরিনা পাথরের প্রতিমূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

গোমোজফের দিকে তাকিয়ে লুকা ভয়ঙ্কর মুখ-ভঙ্গি করে গেয়ে উঠলো:

এরিনা যা বলছে তার কানে কানে
যে-কোন প্রেমিকই তা শুনতে ভালবাসে।

বুড়ো সৈনিক তার শিঙাটা গোমোজভের কানের কাছে এনে আরও জোরে বাজিয়ে দিলো, হাসতে হাসতে স্টেশন-মাস্টার চিৎকার করে উঠলেন, 'চলে এসো, ওর হাত ধরে চলে এসো।'

প্ল্যাটফর্মের সামনের একটা বেঞ্চিতে বসে সোনিয়া হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলো। এবার সেও চিৎকার করে উঠলো, 'ওঃ! থামাও, থামাও! নাহলে আমি কিন্তু নিঘ্যাত মরে যাবো!'

ভেরী বাজানো থামিয়ে নিকোলাই পেত্রোভিচ এবার গান ধরলো :

ক্ষণিকের তরে সবই দুঃখ আমি সইবো গো হাসি মুখে।

গোমোজভ সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই স্টেশন-মাস্টার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নবদম্পত্তির নামে হুররে!' চারজনেই তখন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হুররে।'

নত চোখের পাতায় এরিনা চলেছে গোমোজভের পেছন পেছন।

বুড়ো সৈনিক পাগলের মতো হেসে উঠলো। 'চুমু খেতে দাও কর্তা, ওদের চুমু দাও।

'নব-বিবাহিতরা চুমু খাও!' সৈনিকি ভঙ্গিতে নিকোলাই পেত্রোভিচ আদেশ করলো। আর তাই শুনে স্টেশন-মাস্টার হাসতে হাসতে টাল সামলাতে না পেরে একটা গুঁড়ির গায়ে ধাক্কা খেলেন।

শিঙা-ধ্বনির তালে টিন পিটিয়ে নাচতে নাচতে লুকা গান ধরলো :

এরিনা রেঁধে রেখেছে বাঁধাকপির ঝোল
এমনই ঘন, গলা তা দিয়ে নামবে কিনা সন্দেহ।

নিকোলাই পেত্রোভিচ আবার সুর ধরলো : পম! পম! পম-পম-পম-পম!

ছাউনির কাছাকাছি পৌঁছতেই গোমোজভ অদৃশ্য হয়ে গেলো। আঙিনায় এরিনা শুধু মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। ওর চারদিক ঘিরে সবাই তখন হাসছে, চেঁচাচ্ছে, শিস দিচ্ছে আর উন্মাদের মতো নাচছে।

আঙুল দিয়ে এরিনাকে দেখিয়ে স্টেশন-মাস্টার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'বউকে ফেলে বর পালিয়েছে!' কথাটা বলেই উনি আবার বেদম হাসতে লাগলেন।

সোনিয়া বললো, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এবার বেচারিকে ছেড়ে দাও। এখনও রান্নার সব কাজ বাকি।'

ছাড়া পেতেই এরিনা ধীর মন্থর পায়ে স্তেপের দিকে চলে গেলো। যেন ভাবনার গভীরে হারিয়ে গিয়ে স্বপ্নে-হাঁটা মানুষের মতো ধীরে ধীরে দিগন্তলীন ফসলের প্রান্তরে ও নিঃশব্দে মিলিয়ে গেলো।

হাসতে হাসতে স্টেশন-মাস্টার ছোট্ট এই মজার খেলায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে জিগেস করলেন, 'মজাটা কিন্তু মন্দ হলো না, কি বলো ?'

সেদিন স্টেশনে হাসাহাসির পালাটা জবর হলেও মধ্যাহ্ন-ভোজের আসর কিন্তু মোটেই জমলো না। কেননা এরিনা ফিরে না আসায় সোনিয়াকে রাঁধতে হয়েছিলো। অবশ্য খাওয়া-দাওয়া একটু-আধটু খারাপ হলেই যে লোকের মন দমে যাবে, এমন কোন কারণ নেই। কাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত গোমোজভ আর ছাউনি থেকে বেরুইনি। কিন্তু বার হতেই স্টেশন-মাস্টারের অফিস-ঘরে তার তলব পড়লো। সেখানে নিকোলাই পেত্রোভিচ, মাতভেই ইয়েগোরোভিচ আর লুকা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। এবার অধীর আগ্রহে তারা কি করে 'রূপসী'কে যে জয় করলো সে সম্পর্কে গোমোজভকে জেরা শুরু করলো। এ ব্যাপারে স্টেশন-মাস্টারের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

'সে এক বিশ্রী পতনও বলতে পারেন।' ম্লান হেসে গোমোজভ বললো। ও বুঝতে পারলো এরিনাকে যত হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারবে, উপহাসের হাত থেকে ও তত নিজেকে বাঁচাতে পারবে। তাই ও মুচকি মুচকি হাসলো। 'প্রথম প্রথম এরিনা আমাকে চোখ মারতো।'

'ও হো হো, চোখ মারতো ! নিকোলাই পেত্রোভিচ, একবার ভেবে ছাখো —এরিনা চোখ মারতো ! উঃ কি সাংঘাতিক ব্যাপার !'

'ও চোখ মারতো, আর আমি মনে মনে ভাবতুম তুমি বাছা ভালো মতলবে নেই।' তারপর একদিন বললো, 'যদি চাও তোমায় কটা সার্ট বানিয়ে দিই।'

নিকোলাই পেত্রোভিচ স্টেশন-মাস্টারকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝালো। 'নেক্রাসভের কবিতাটা জানেন তো ? ছুঁচটা আসল এখানে কোন ব্যাপারই নয়। তারপর গোমোজভ, বলে যাও।'

মিথ্যের সুযোগ নিয়ে গোমোজভ যখন একটু একটু করে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছেন, এরিনা তখন ফসলের সমুদ্রে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে রয়েছে। পিঠে রোদের তেজ যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, জলন্ত সূর্যের আলোয় ঝলসানো আকাশের দিকে আর তাকাতে পারলো না, তখন তুহাতে মুখ ঢেকে ও উপুড় হয়ে শুলো।

ওর চারপাশে হাওয়ায় মর্মরিত হচ্ছে ফসলের কানাকানি, যেন লজ্জায় আনত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে অগণন গঙ্গাফড়িংয়ের অশান্ত গুঞ্জরন। উত্তাপ আরও বাড়ছে। এরিনা প্রার্থনা করার চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রার্থনার একটি

শব্দও ওর মনে এলো না। কেবল বিদ্রূপাত্মক মুখগুলো নাচতে লাগলো ওর চোখের সামনে। তখনও ওর কানে বাজছে হাসির উতোরল, শিঙাধ্বনি আর লুকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। সব মিলিয়ে বুকের ভেতরটা ওর ভারি হয়ে উঠলো। ব্লাউজ খুলে খালি বুকে ও সূর্যের দিকে মুখ করে শুলো, ভাবলো এতে নিশ্বাস নিতে সহজ হবে। কিন্তু রোদের তেজ ওর সারা শরীর ঝলসে দিচ্ছে, যেন ওর বুকের মধ্যে গরম কি একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

মাঝে মাঝে ও অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠছে, 'প্রভু, দয়া করো…'

কিন্তু তার উত্তরে ফসলের মর্মর, গঙ্গাফড়িং-এর পাখার মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মাথার ওপরে সীমাহীন নিষ্করুণ আকাশ আর এই নির্জনতার পৃথিবীতে ও একা। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, একা। ওর এই নিঃসঙ্গতার বোঝা নামিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই…কেউ না…

সন্ধ্যের দিকে অনেক অনেক দূর থেকে ও চিৎকার শুনলো : 'এরিনা! এই এ-রি-না! আচ্ছা বোকা মেয়ে তো!'

একটা কণ্ঠস্বর লুকার, অন্যটা বুড়ো সৈনিকের। এরিনা ভেবেছিলো তৃতীয় আর একটা কণ্ঠস্বর তাকে ডাকবে। কিন্তু ডাকলো না। বুকের ভেতরটা ওর যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো। অঝর ধারায় চোখের জল বসন্তের চিহ্নভরা রুক্ষ চিবুক বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়লো ওর নগ্ন বুকে! আর কাঁদতে কাঁদতে এরিনা তপ্ত মাটিতে নরম বুক ঘষতে লাগলো, যাতে বুকের ভেতরের তীব্র দহনটাকে ও নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারে। সারাক্ষণ অঝর ধারায় ও কেবল কেঁদেই চললো। তারপর এক সময়ে কান্না থামিয়ে উঠে বসলো। যেন ভয় পেলো পাছে কেউ এসে ওকে কাঁদতে বারণ করে।

রাত্রি যখন গাঢ় হলো, নিঃশব্দ পায়ে ও স্টেশনের দিকে ফিরে চললো।

শেডের পেছনে অন্ধকার ছায়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে এরিনা অনেকক্ষণ স্তেপের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলো! একটা মালগাড়ি এলো আবার চলে গেলো। এরিনা শুনতে পেলো বুড়ো সৈনিক রেলকর্মীদের কাছে তার লজ্জার কাহিনী বলছে, আর তা শুনে ওরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ওদের সে হাসির গলিত তরঙ্গ হাওয়ায় ভেসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে স্তেপের দূর-দূরান্তে।

'প্রভু, দয়া করো!' দেওয়ালে পিঠ চেপে এরিনা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসে তার বুকের বোঝা এতটুকু হালকা হলো না।

শেষ রাতে স্টেশনের সবচেয়ে উঁচু চিলেকোঠায় উঠে ও গলায় দড়ি দিলো। দুদিন পরে লাসের দুর্গন্ধে এরিনাকে খুঁজে পাওয়া গেলো। প্রথমে সবাই ভয় পেয়েছিলো। পরে এ ঘটনার জন্যে কে দায়ী সে নিয়ে তারা আলোচনা শুরু করলো। নিকোলাই পেত্রোভিচ অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করলো যে এর জন্যে গোমোজভই দায়ী। প্রতিবাদ করার কোন রকম সুযোগ না দিয়ে স্টেশন-মাস্টার গোমেজভের চোয়ালে ঘুষি মেরে তাকে রা কড়াতে নিষেধ করলেন।

পুলিস এসে জোর তদন্ত করলো। জানা গেলো এরিনা বিষাদ-উন্মাদনায় ভুগছিলো। কয়েকজন রেলকর্মচারীকে লাস স্তেপে নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলার আদেশ দেওয়া হলো। এইসব ঝামেলা মেটার পর স্টেশনে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলো।

এরপর থেকে স্টেশনের বাসিন্দারা চারামনিট ছাড়া বাকি সারাটা দিন বিষণ্ণতায় অস্থির হয়ে ক্লান্ত বিমর্ষ চোখে ছুটে-যাওয়া ট্রেনটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতো। আর শীতকালে, স্তেপের নির্জন প্রান্ত থেকে বহে-আসা দুরন্ত তুষার-ঝড় যখন আছড়ে পড়তো ছোট্ট স্টেশনটার বুকে, জীবন তখন মনে হতো কি ভীষণ নিঃসঙ্গ হিমেল।

১৮৯৭

কেন্‌ ছোটখাটো চেহারার একজন ইহুদি। শীর্ণ শরীর, বিবর্ণ মুখ, থুতনির ওপর লালচে ছুঁচলো দাড়ি, মাথায় কপালের ওপর পর্যন্ত টানা নোংরা একটা টুপি। টুপির নিচে উজ্জ্বল ধূসর দুটো চোখ, লালচে সরু ভ্রূ, হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন তুলি দিয়ে আঁকা। চঞ্চল ভীরু চোখের মণিদুটো কোন সময়েই স্থির থাকে না, অনবরত এদিক ওদিক ঘুরছে, যেন কোনকিছুর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ও ভয় পায়। পাতলা ঠোঁটে সারাক্ষণই জড়িয়ে থাকে নিঃশব্দ বিনীত একটা হাসি।

তা বলে ও অলস বা বোকা নয়, বরং যেমন চালাক-চতুর তেমনি চটপটে। কিন্তু হলে কি হবে, ছোটখাটো এই ইহুদিটির প্রতি মানুষের নির্মম নিষ্ঠুর উপহাস বিদ্রূপকে ও সত্যিই ভয় পায়। তখন ওর শরীরের সীমানা ছাড়িয়ে ক্যাম্বিস-কাপড়ের তৈরি ঢিলে বহির্বাসের প্রতিটা ভাঁজে ভাঁজে পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়ে নিঃসীম একটা আতঙ্ক, মাথা থেকে পায়ের পাতা অব্দি থরথর করে কাঁপতে থাকে সারা শরীর।

ওর আসল নাম কেইম অ্যারন পারভিজ, কিন্তু সবাই ওকে ঠাট্টা করে ডাকে কেন্‌ বলে। অনেকের ধারণা এই নামটা ওর ছোটখাটো ভীরু ইহুদি-চরিত্রের সঙ্গে যেমন সুন্দর খাপ খায়, তেমনি অপমানের চূড়ান্ত।

ও বাস করে দুর্ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া সেই সব মানুষের সঙ্গে, যারা প্রতিবেশীদের ক্ষতিসাধন করে অনাবিল আনন্দ পায়, যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে, আর সবচেয়ে বড় কথা—ওরা জানেও তা কি করে করতে হয়। ওরা যখন ওকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কেন্‌ কিন্তু সারাক্ষণ ম্লান ঠোঁটে হাসে। কখনও কখনও ওদের সেই মজার খেলায় ও নিজেই অংশ গ্রহণ করে, যেন এ সবের জন্যে উৎপীড়কদের ও আগে থেকেই অনুমতি দিয়ে রেখেছে।

পেশায় ও ফেরিওয়ালা, গলায় কাঠের একটা বাক্স ঝুলিয়ে শহরতলির দরিদ্রতম অঞ্চলে নানান কিছু টুকিটাকি ফেরি করে বেড়ায়। সিকানের সংকীর্ণ ঘিঞ্জি গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও হাঁকে, 'জুতোর পালিস, দেশলাই, ছুচ-সুতো, চুলের ফিতে।কাঁটা চা-ই-ই।'

গলির দুপাশে জীর্ণ পুরনো জঘন্য সব উঁচু-উঁচু বাড়ি, সরাইখানা, রাত্তিরে

শোবার জন্যে ভাড়াটে-ঘর, রুটির কারখানা, পুরনো লোহালক্কড় বাসন-কসন কেনা-বেচার দোকান। সব সময় পকেটমার, চোর-বাটপাড়, মাতাল, নাবিক-ডক-শ্রমিক, চোরাই মালপত্র কেনা-বেচার ফোড়ে, পুরনো জামা-কাপড় বিক্রেতা আর বেশ্যাদের দালালদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। নানান সুরে ফেরিওয়ালাদের চিৎকার, নোংরা আবর্জনার দুর্গন্ধ, পিঁয়াজ-রশুনের চড়া ঝাঁজ আর মদের টকসা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে থাকে। এখানে ভোরের দিকে সামান্য একটুক্ষণের জন্যে যা সূর্যের মুখ দেখা যায়, তারপর তার আর কোন টিকিই দেখা যায় না, যেন গলির ভেতরে ঢুকতে ভয় পায়।

চিৎকার চেঁচামেচি, অশ্লীল খিস্তি আর নরকের পিণ্ডি-পাকানো এই ভিড়ের মধ্যেই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ছুটোছুটি করে, ভিক্ষে করে, হাতের কাছে যা পায় চুরি করে, রাত্তিরে যেখানে সেখানে শুয়ে ঘুমোয়। ওদের বাপ-মার কোন ঠিকানা নেই—যেমন অসম্ভব নোংরা, তেমনি রাম-বিচ্ছু। এই সব গলির মধ্যে দিয়েই হাঁকতে হাঁকতে কেন্ মেয়েদের কাছে তার সওদা ফেরি করে। কুড়ি কোপেকের জিনিস-পত্তর ধার দিলে বাইশ কোপেক ফেরোত পায়। না, মেয়েরা কখনও ওকে ঠেকায় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অন্যান্যদের তুলনায় কেনের ব্যবসা নিতান্ত ফেলনা নয়। কখনও কখনও মেয়েদের কাছ থেকে ও পুরনো ছেঁড়া সার্ট টুপি বুট শায়া সেমিজ অন্তর্বাস, সস্তা দামের ঝুটো গয়নাও কেনে। তার বদলে জিনিস দেয়। তারপর পুরনো কেনা সামগ্রীগুলো দশ কোপেক লাভে আবার দোকানে বিক্রি করে দেয়। এতকিছু সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ও লোকজনের হাতে মারধোর খায়, কখনও কখনও সবাই ওর জিনিসপত্তর ছিনিয়ে নেয়, তবু ও কখনও মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না, বরং করুণ ম্লান মুখে সারাক্ষণ কেবল মুচকি মুচকি হাসে।

হয়তো কখনও এমন হলো, শহরতলির নির্জন অন্ধকার কোন প্রান্তে দু-তিনজন ছোকরা এসে হঠাৎ ওকে ধরলো, ভয়ে হোক বা ঘুষিতেই হোক কেন্ সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যাবে, পড়ে গিয়ে পকেট দুটো চেপে ধরে মিনতির মতো করুণ স্বরে চিৎকার করবে, 'দোহাই ভাই তোমাদের, আমার সবকটা পয়সা নিয়ে নিও না, তাহলে আমি কেমন করে ব্যবসা করো বলো?'

করুণ মুখে ওর মিষ্টি হাসিটুকু দেখে কেউ হয়তো বলবে, 'ঠিক আছে, তিরিশটা কোপেক দাও, আমারা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি!' তারপরেই হয়তো

দেখা যাবে কেন্ ওদেরই সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটার পর ওকে যেন আরও বাচ্ছা দেখায়!

কখনও কখনও পুঁচকে ছোঁড়ারাও ওর পেছনে লাগে, ওকে রাগায়, পচা লেবু, তরমুজের খোলা ছুঁড়ে মারে। প্রথমে ও ভালো কথায় ওদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না, তখন প্রায়ই ওকে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে হয়।

সবাই ওকে চেনে, সবাই ওর ওপর অত্যাচার করে। এরই মধ্যে দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ও ফেরি করে বেড়ায়, অজস্র দুঃখের মধ্যেও মিষ্টি করে হাসে। এমনি ভাবে সিকানের এ প্রান্তে কেনের দিন কাটে।

সিকানের অন্য প্রান্তে বাস করে আর্তিয়ম। যেমন দৈত্যের মতো বিশাল চেহারা, তেমনি অপূর্ব সুন্দর দেখতে। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো কালো চুল, সুন্দর মসৃণ ভ্রূ, বাদামের মতো বড় কুচকুচে কালো চোখ। ঋজু খাড়া নাক, হালকা গোলাপী ঠোঁট, এক জোড়া পাকানো কালো গোঁফ। পাথরে-কোঁদা প্রতিমূর্তির মতো বিরাট দেহের সঙ্গে মানান-সই বাদামী রঙের অনন্য একটা মুখ, চওড়া বুক, ঠোঁটে সবসময়ই লেগে রয়েছে পরিতৃপ্ত অথচ কেমন যেন একটা অবজ্ঞার হাসি! সিকানের সবাই ওকে যেমন যমের মতো ভয় করে, মেয়েরা আবার তেমনি ওকে দারুণ পছন্দ করে। বছর পঁচিশ বয়েস, অথচ এমন অসম্ভব রকমের গায়ের জোর, এমন দুর্লভ পৌরুষ-দীপ্ত চেহারা যে সারা জীবন ওর কখনও খেটে খাবার দরকার হবে না। আর প্রকৃতপক্ষে তা হয়ও না। সিকানের মেয়ে-ফেরিওয়ালা, দোকানী আর বেশ্যারা ওকে ভালো ভালো খাবার, মদ আর তামাক জোগায় এতেই ওর চলে যায়, এর বেশি কিছু ও আর চায় না।

ওর জন্যে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, ওর অপকর্মের কাহিনী স্বামীদের কানে গিয়ে পৌঁছয়, স্বামীরা বউয়েদের ধরে নির্মমভাবে পেটায়। আর্তিয়ম এসব ব্যাপারে কখনও নাক গলায় না, পাহাড়ের খাঁজে নদীর ধারে রোদ্দুরে নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে ও চুপচাপ শুয়ে থাকে। নদীর ওপারে সীমাহীন সবুজ প্রান্তর, ঢালু হয়ে মিশে গেছে দিগন্তের গায়ে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দু-একটা গ্রাম। নিচে বিসর্পিল পাহাড়ী পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে সোজা নরককুণ্ডের দিকে। এখান থেকেই শহরতলির গুঞ্জন স্পষ্ট শোনা যায়। বড় বড় ঘাস, শীর্ণ কয়েকটা বার্চ আর এল্ডার ঝোপে জায়গাটা

তিন দিক থেকে এমন ভাবে ঢাকা আর নির্জন যে রাস্তা থেকে চট করে চোখে পড়ে না।

কখনও কখনও গুণ্ডা-বদমাইস বন্ধুরা এসে ওর এখানে আড্ডা জমায়, তাস পেটে, জুয়া খেলে, কম্বল বিছিয়ে ঘুমোয়। তা বলে ওরা যে আর্তিয়মকে খুব ভালোবাসে, তা নয়। অমিত শক্তির জন্যে ওরা যেমন আর্তিয়মকে হিংসে করে, আর্তিয়মও তেমনি ওদের ওপর দুর্ব্যবহার করে। ফলে মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া রুটি ও যেমন ওদের সঙ্গে ভাগ করে খায় না, তেমনি গলায় গলায় দোস্তি বলতে যা বোঝায় তাও কারুর সঙ্গে নেই। তবে কেউ যদি যেচে কথা বলতে চায় বলে, কেউ যদি মদ খাবার পয়সা চায় দেয়, কখনও ওদের সাথে এক সঙ্গে বসে মদ খেয়ে হৈহুল্লোড় করে না।

যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ এসে বিরক্ত করে, আর্তিয়ম ঝোপের আড়ালে চুপচাপ শুয়ে থাকে। কেউ বলতে নোংরা ছেঁড়া পোশাক-পরা সাত-আট বছরের ছোট বাচ্ছা, খুব বেশি হলে বছর দশেক বয়েস, সংবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত যাদের কোন চেতনা হয়নি, সন্তর্ক পায়ে গুটি গুটি এসে ওরা ফিসফিস করে বলে, 'আর্তিয়ম-খুড়ো, মারিয়া-খুড়ি আমাকে বলতে বলেছে ওর স্বামী বাইরে কোথায় বেরিয়ে গ্যাছে, তোমাকে আজ একটা নৌকো ভাড়া করে রাখতে হবে।'

'ও, তাই বুঝি!' ঘুম-জড়ানো দীঘল চোখের পাতাদুটো আর্তিয়ম কোন রকমে টেনে তোলে। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। না, তার আগে বল্‌ তো বিচ্ছু, তোর মারিয়া-খুড়িকে কেমন দেখতে, কোথায় থাকে?'

'বারে, ওই তো শহরে রাস্তার ধারে যার দোকান রয়েছে।'

'ও, বুঝেছি! পুরনো লোহালক্কড়ের পাশের দোকানটা তো?'

'না না, আনিসা নিকোলায়েভনার পাশের দোকানটা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া মারিয়াকে আমি খুব ভালো করেই চিনি, তোর সঙ্গে এমনি ঠাট্টা করছিলুম।'

তবু আর্তিয়মের মুখ দেখে সংবাদবাহক পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না, তাই বিশদ ব্যাখ্যা করে বলে, 'মারিয়া-খুড়ির দোকানটা মাছের দোকানের ঠিক পাশে, গোলগাল লাল মুখ, লম্বা মতন...'

'ঠিক ঠিক, মাছের দোকানের পাশেই তো! গোলগাল লাল মুখ...আরে, না না...তুই কি ভাবছিস আমি গুলিয়ে ফেলবো? কক্ষোনো না! যা, তোর মারিয়া-খুড়িকে বল্‌গে আমি একটু পরেই যাচ্ছি।'

'আমাকে একটা কোপেক দাও, আর্তিয়ম খুড়ো।'

'একটা কোপেক! দাঁড়া, দেখছি আছে কি না।' দুপকেট হাতড়ে ও কিছু না কিছু ঠিক বার করবে, আর বিচ্ছুটা তখন হাসতে হাসতে তীরের মতো ছুটে গিয়ে সোজা থামবে যকৃৎ-বিক্রেতা মারিয়া-খুড়ির দোকানের সামনে। যথাযথ খবরটা ওকে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে কিছু না কিছু বখশিস আদায় করে ছাড়বে। কেননা সিগারেট খাওয়া, ভদকা কেনা ছাড়াও ছোটখাট কিছু ভাবনা তখন তার ছোট্ট মাথার মধ্যে স্বপ্নের মতো ভেসে বেড়ায়।

আর এমনি কোন ঘটনা ঘটনার পর আর্তিয়ম যেন আরও বেশি নির্লিপ্ত, আরও দুরধিগম্য হয়ে ওঠে। তবু ওর চার পাশে নিঃশব্দে ঘনিয়ে ওঠে হিংসা আর বিদ্বেষের ঝোড়ো মেঘ, শত্রুতার কালো ছায়া। আর্তিয়ম কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করে না, নিজের প্রচণ্ড শক্তির জোরে ও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিসর্পিল পাহাড়ী পথ ধরে ও ধীরে ধীরে শহরতলির দিকে এগিয়ে আসে, মনে হয় ঠিক যেন ভয়ঙ্কর একটা মেঘ ধেয়ে আসছে! কলগুঞ্জন যত কাছে এগিয়ে আসে চোখের মণিদুটো ওর তত অস্থির হয়ে চারদিকে ঘোরে, নাসারন্ধ্র দুটো ঘন ঘন কেঁপে ওঠে। শহরতলির সবাই ওর মুখ দেখে বুঝতে পারে ও এখন কোন্ মেজাজে রয়েছে। ওর চোখের মণিদুটোকে ওই ভাবে ঘুরতে দেখলেই চাপা একটা সতর্ক কানাকানি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, 'এই, আর্তিয়ম আসছে!'

সবাই তখন তাড়াতাড়ি গলির দুধার থেকে তাদের বেচাকেনার জিনিস-পত্তর সব গুটিয়ে নেয়, নিয়ে সসম্ভ্রমে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে তাকে আদর অভ্যর্থনা জানায়। আর্তিয়ম কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব তার দুর্জয় শক্তিকে ভয়-পাওয়া এইসব মানুষের মুখের দিকে ফিরেও তাকায় না, নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে যায়। ও যেন অরণ্যের মধ্যে অমিত সৌন্দর্য নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কোন বন্য পশু।

পায়ের ধাক্কায় ঝুড়িতে রাখা অন্ত্র, ফুসফুস, যকৃতগুলো কাদামাখা রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে যদি ওকে জিগেস করা হয়, 'কেন তুমি এগুলো ফেলে দিলে?'

থমথমে গলায় ও তখন জিগেস করবে, 'আমার পায়ের সামনে এগুলো কেন রাখলে?'

'কেন, এটা তোমার একার পথ নাকি?'

'ধরো, এখান দিয়েই আমি হাঁটতে চাই।'

'হাঁটার জন্যে তো এই এত পথ পড়ে রয়েছে, তাতেও তোমার হয় না ?'

প্রচণ্ড রেগে যাওয়া সত্ত্বেও আর্তিয়মের চোখের মণিদুটোকে স্থির হয়ে আসতে দেখে ফেরিওয়ালা থমকে যায়। আর্তিয়ম আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। ফেরিওয়ালা তখন চায়ের দোকান থেকে গরম জল চেয়ে এনে তার জিনিসপত্তর ধুয়ে ঝুড়িতে সাজায়। দু-একমিনিট পরেই শোনা যায় পরিত্রাহি চিৎকার, 'যকৃত, ফুসফুস···যকৃত! চলে আসুন, চলে আসুন! মাত্র পাঁচ কোপেক! চলে আসুন!'

চিৎকার চেঁচামেচি হাসি-ঠাট্টায় সারা গলি তখন গমগম করছে। মাছ মদ মাংস ঘাম আলকাতরা আর পিঁয়াজে ঝাঁঝালো গন্ধ। মাথার ওপরে এক চিলতে ধূসর আকাশ।

'ছুঁচ সুতো চুলের ফিতে কাঁটা চাই!'

আর্তিয়মকে দেখে অন্যদের চাইতে বেশি কেঁপে ওঠে কেনের সরু গলা!

'নাশপাতির চাটনি! কিনুন! চাখুন! নাশপাতির চাটনি!'

'পিয়াজ, পিয়াজ, সবুজ পিয়াজ চাই!'

'কাভাস! কাভাস!' লাল-মুখ বেঁটে খাটো একজন বুড়ো পিপের ছায়ায় বসে রায়ের মদ বিক্রি করছে।

অন্য একজন, সবাই তাকে ল্যাংটো-বর বলে ডাকে, কাঁধের ওপর এক-গাদা পুরনো সার্ট ফেলে বিক্রি করছে। ডক-শ্রমিকরা তাকে ঘিরে ধরে দর-কষাকষি করছে। একজন শ্রমিক রেগেমেগে বলছে, 'কি হে ছোকরা, এই সার্টের দাম কুড়ি কোপেক! কুড়ি কোপেকের সার্ট পরে বড় লোকের বিধবা-বউকে বিয়ে করা যায়, বুঝলে হে!'

পরমুহূর্তেই শাশ্বত চিৎকারে কেঁপে উঠবে সারা গলি, 'একটা পয়সা দাওগো বাবু, আমরা অনাথ অন্ধ নাচার!'

'এই যে, আর্তিউশা!' রীতিমত স্বাস্থ্যল চেহারা, প্যাটিস বিক্রেতা, দারিয়া গ্রোমোভা আন্তরিক ভঙ্গিতে গাঢ়স্বরে জিগেস করে, 'কি ব্যাপার, এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে ? আমাদের তো তুমি একদম ভুলেই গ্যাছো দেখছি!'

'আরে না না, ভুলবো কেন ?' পা দিয়ে ওর প্যাটিসগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে আর্তিয়ম শান্ত স্বরে বলে, 'তারপর তোমার ব্যাবসাপাতি কেমন চলছে ?'

দারিয়া হাউমাউ করে ককিয়ে ওঠে, 'খুনে, নির্লোজ্জ্য বেহায়া কোথাকার! তোমার মতো আস্ত্রাকানের উটটাকে লোকে কি করে সহ্য করে!'

চারদিকে তখন হাসির রোল পড়ে যায়। সবাই জানে আর্তিয়ম যেমন দারিয়ার ক্ষমা চাইবে না, তেমনি ওকে আবার কিছু বলবেও না। মুচকি হেসে লোকের পা মাড়িয়ে সবাইকে কনুই দিয়ে গোঁতা দিতে দিতে আর্তিয়ম ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, আর ওর আগে আগে ছড়িয়ে পড়ে সেই মর্মরিত কানা-কানি। 'এই, আর্তিয়ম আসছে !'

এমনকি যারা কখনও আর্তিয়মের নাম পর্যন্ত শোনেনি তারাও পৌরুষদীপ্ত এই তরুণ দৈত্যটার জন্যে ভয়ে পথ ছেড়ে দেয়। আর্তিয়ম কোন আড্ডাখানায় প্রবেশ করে, ওর পরিচিত বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। আর্তিয়ম তখন এমনভাবে তার হাতটা চেপে ধরে যে বেচারি যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। ও যখন ব্রজ্রমুঠিতে কারুর কাঁধে হাত রাখে, তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে গুঙিয়ে ওঠে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি, জল্লাদ কোথাকার !'

জল্লাদ কিন্তু নির্বিকার।

এই ধরনের অমার্জনীয় দুর্ব্যবহারের জন্যে সিকানে আর্তিয়মের শত্রুসংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ওর প্রতিরোধের দুর্গকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেনি। সত্যিই ও যেন নিজেই নিজের অমিত শক্তির ক্রীতদাস। একবার কোন এক দোকানী স্ত্রীর ব্যাপারে নিদারুণ মর্মাহত হয়ে শহরের কুখ্যাত এক কসাই-গুণ্ডাকে ভাড়া করেছিলো। সুপ্রচুর পুরস্কারের বিনিময়ে কসাই একাই আর্তিয়মকে একটু সমঝে দেবার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা—অচিরেই দেখা গেলো আর্তিয়মের একটা ঘুঁষিতে বেচারি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে, একটা হাত তার দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এতে নিঃসন্দেহে শত্রু-শিবিরে আর্তিয়মের সম্মান বেড়ে গেলো বই কমলো না। পুলিস-ফাঁড়িতেও সবাই আর্তিয়মের অমানুষিক শক্তি দেখে চমকে উঠলো। ওরা আগেই আর্তিয়মের 'কাহিনী' কিছু কিছু শুনে ছিলো, ভালো করেই জানত আর্তিয়ম আর যাই হোক অন্তত চোর নয়। না, এত চালাক সে নয়, শুধু মেয়েদের প্রতি ওর যা একটু দুর্বলতা আছে ! না, এটাও সম্পূর্ণ সত্যি নয়, বরং মেয়েদেরই দুর্বলতা ওর ওপর তার চাইতে বেশি। বালজাকের গল্পে বর্ণিত কোন নায়িকার মতো শক্ত সবল মহিলারা ওকে পক্ষপুটে ঢেকে রাখে, নির্ভয়ে সেবাযত্ন করে, সোহাগ করে। আর তখন আর্তিয়ম কেমন যেন ছেলেমানুষ, বিষণ্ণ আর খেয়ালী হয়ে ওঠে। কেবল ওর

চোখদুটো তখন বন্য আর মুখটা কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়। কোন মহিলা যদি মিষ্টি করে হেসে বলে, 'তোমাকে আর দু-গেলাস বিয়ার দেবার কথা বলি, আর্তিউশা ? কিংবা কিছু খাবার ? তুমি তো আজ দেখছি কিছুই খেলে না ?'

আর্তিয়ম বিরক্ত হয়ে জবাব দেবে, 'দোহাই তোমার, আমাকে একটু একা থাকতে দাও !'

মুহূর্তের জন্যে অবাক চোখে তাকালেও, পর মুহূর্তেই মহিলাটি ব্যতিব্যাস্ত হয়ে উঠবে। কেননা আর্তিয়মের মেজাজ তার অজানা নয়, সম্পূর্ণ মাতাল না হয়ে পড়া পর্যন্ত চলবে মদের প্লাবন।

এমনই একটা বেসামাল মুহূর্তে সেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেলো।

ক্লান্ত ভারি পায়ে আর্তিয়ম যখন একা ফিরে যাচ্ছিলো, অন্ধকার গলি থেকে হঠাৎ বেশ কয়েকজন বেরিয়ে এসে অতর্কিতে ওকে আক্রমণ করলো। দীর্ঘদিন ধরে ওরা আর্তিয়মকে একা পাবার প্রতীক্ষায় ওত পেতে ছিলো, সেদিন ওকে আত্মরক্ষার কোন অবকাশই দিলো না। জায়গাটা যেমন গাঢ় অন্ধকার তেমনি নির্জন, খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ওরা আর্তিয়মের ওপর যথেচ্ছ নির্মম প্রতিশোধ নিলো। শেষ পর্যন্ত এক সময়ে ওরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তখন ঠিক করা হলো আর্তিয়মের মৃতদেহটাকে টেনে নদীর ধারে পুরনো ভাঙা একটা বজরার মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে।

কিন্তু চ্যাংদোলা করে ওকে বয়ে নিয়ে যাবার সময় আর্তিয়মের জ্ঞান ফিরে এলো, মনে মনে ভাবলো এক্ষেত্রে মরার ভান করে থাকাটাই সবচেয়ে শ্রেয়। অসহ্য যন্ত্রণায় বুক তখন ওর ফেটে যাচ্ছে, গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে ও কোন রকমে আর্তনাদ চেপে রাখলো। কণ্ঠস্বরে ও মিশকা ভাভিলভকে চিনতে পারলো। সে তখন তার বন্ধুদের রসিয়ে রসিয়ে বলছে কেমন করে আর্তিয়মের পিঠের পাখনার নিচে কয়েকটা মোক্ষম লাথি কষিয়েছে, হয়তো ওর ফুসফুস দুটোই ফেটে গেছে। সুখোপ্লুয়েভ বললো সে অত বোকা নয়, মানুষের আসল জায়গাটা হলো পেটে, পেটে ঠিকমতো ঘুষি চালাতে পারলে যত গায়ে জোর থাকুক না কেন, ব্যাটাকে আর ট্যাফোঁ করতে হবে না। লোমাকিনও তার কৃতিত্বের দাবী জানাতে ছাড়লো না। কথা বলতে বলতেই ওরা নদীর ধারে এসে পৌঁছে গেলো, তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে আর্তিয়মের রক্তাক্ত বিধ্বস্ত দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ভাঙা একটা

বজরার মধ্যে। আর্তিয়ম একটু একটু করে ওদের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনলো, তবু আপ্রাণ চেষ্টা করেও ও মাথা তুলতে পারলো না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার আর জোয়ারে ভেসে-আসা একরাশ নোংরা আবর্জনার মধ্যে আর্তিয়ম নিঃসঙ্গ একা চুপচাপ পড়ে রইলো। হিমেল বাতাসে অনেকটা স্বস্তি পেলেও তৃষ্ণায় বুকের ছাতি তখন ওর যেন ফেটে চৌচির যাচ্ছে। অথচ কাছেই শোনা যাচ্ছে নদীর মৃদু কলোচ্ছাস, যেন ওর দুর্ভাগ্যকে বিদ্রূপ করছে। বুকে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, মাথাটা একটু তোলার চেষ্টা করতেই অসহ্য যন্ত্রণায় গলার মধ্যে দিকে কেবল ঘড়ঘড় একটা জান্তব ধ্বনি বেরিয়ে এলো। এমনি ভাবে আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে সারাটা রাত ও চুপচাপ পড়ে রইলো, ভয়ে বেশি জোরে আর্তনাদ করতেও সাহস পেল না।

ভোরের দিকে, যদিও ওর চোখ মেলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে, ঠোঁট দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, তবু আগের চেয়ে যেন অনেক সহজ, কেমন যেন একটু ঝরঝরে মনে হচ্ছে। বজরার ফাটল চুঁইয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে ভেতরে, তরল আঁধারে মনে হচ্ছে ঠিক যেন গোধূলিবেলায় কনে-দেখা আলোর মতো। কোনরকমে একটা হাত তুলে সারা মুখে বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলো, অনুভব করলো কপালে বুকে পেটে ভিজে কাপড় চাপানো, ওর জামাকাপড়ও অনেকটা করে খুলে আলগা করে দেওয়া হয়েছে, ভোরের হিমেল হাওয়া কোমল একটা স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে।

'জল খাবে?'

স্পষ্ট করে কিছু বোঝার আগেই আর্তিয়ম দেখলো মুখের ওপর থেকে ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে কে যেন বোতলের একটা মুখ ওর ঠোঁটের সামনে এগিয়ে ধরেছে। আকণ্ঠ পান করার পর লোকটা কে জানার জন্যে আর্তিয়ম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো, কিন্তু কিছুতে মাথা ঘোরাতে পারলো না। তখন অদ্ভুত ভাঙা ভাঙা গলায় মিনতির মতো করুণ স্বরে বললো, 'আমাকে যদি এক গেলাস ব্রাণ্ডি খাওয়াতে পারো, আর ব্রাণ্ডি দিয়েই খানিকটা মালিশ করে দিতে পারো তাহলে হয়তো উঠতে পারবো।'

'পারবে না। সারা শরীর ফুলে কালশিরে পড়ে গ্যাছে। তবে এক বোতল ব্রাণ্ডি আমি আগে থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলুম।'

অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠস্বরে আর্তিয়ম বুঝতে পারলো না—সে নারী, না কিশোর। তবু বললো, 'বোতলটা আমাকে দাও।'

প্রায় এক-চতুর্থাংশ পান করার পর আর্তিয়ম গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। নটোল স্তব্ধতার মধ্যে অদূরে শোনা যাচ্ছে জল-ঢেউয়ের একটানা ছল-ছলাৎ আর্তনাদ, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ভাটিয়ালি মল্লার গান। সবুজ শ্যাওলা-পড়া হাড়-পাঁজরা বার করা বিশাল বজরার জীর্ণ কাঠামোটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আর্তিয়ম চুপচাপ শুয়ে রইলো। হঠাৎ ওর কেন জানি মনে হলো এই মুহূর্তে যদি ছাদটা হুড়মুড় করে ধসে পড়ে তার বুকের ওপর, যদি তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়! তখন নিজের ওপর ওর নিজেরই কেমন যেন করুণা হলো, পরমুহূর্তেই চাপা ক্রোধে শক্ত হয়ে উঠলো চোয়ালদুটো। যদি কোনদিন আবার নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি। রাগে দুঃখে সুন্দর আয়ত চোখদুটো ওর জলে ভরে উঠলো, বড় বড় উষ্ণ ফোঁটাগুলো চিবুক বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়লো মাটিতে। আর ঠিক তখনই ও শুনলো মাথার সামনে অস্ফুট চাপা গলায় কে যেন ডুগরে ডুগরে কাঁদছে, যেন কে ওকে বিদ্রূপ করছে।

'তুমি আবার কাঁদছো কেন?' চাপা বিরক্তিতে আর্তিয়ম ধমক দিলো, মনে মনে ও কেমন যেন ভয়ও পেলো। কিন্তু কেউ ওর প্রশ্নের জবাব দিলো না।

তখন শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে আর্তিয়ম কনুইয়ের ওপর ভর রেখে মাথা তুললো, আহত পশুর মতো অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো, তবু অস্পষ্ট আলো-আঁধারির মধ্যেই ও দেখলো বজরার এক কোণে তালগোল পাকিয়ে বসে রয়েছে ছোট-খাটো একটা মূর্তি। মূর্তিটা নিঃসন্দেহে একটা বালকের। শীর্ণ দু হাতে হাঁটু দুটো শক্ত করে জড়িয়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে ছোট্ট কাঁধ দুটো।

'এই যে, এদিকে শোন।'

কেউ সাড়া দিলো না। অসম্ভব বিরক্তিতে রাগে আর্তিয়ম চাপা গর্জন করে উঠলো। 'এসো বলছি।'

'কেন, আমি তোমার কি অসুবিধে করেছি?' এবার শোনা গেলো কাঁপা কাঁপা ভীরু একটা কণ্ঠস্বর। 'এত চেঁচাচ্ছো কেন? তোমাকে পরিষ্কার করে ধুইয়ে মুছিয়ে মুখে জল দিয়েছি, ব্রাণ্ডি দিয়েছি। সারারাত যখন যন্ত্রণায় ছটফট করেছো, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি, মনে মনে চোখের জল ফেলেছি। আর তার বদলে তুমি এখন আমাকে ধমকাচ্ছো?'

'একি! কেন্, তুমি?' আর্তিয়ম অবাক হয়ে গেলো।

'কেন, এতে এত অবাক হবার কি আছে?'

'তাহলে তুমিই এই সব করেছো? ভারি অদ্ভুত তো! ঠিক আছে, এখন আমার সামনে এসে বোসো।' মনে মনে আর্তিয়ম যেমন বিস্মিত হলো, খুশি হলো তার চাইতেও বেশি। ইহুদির অসহায় করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে ও হেসে ফেলে। 'ঠিক আছে, এখন আমাকে আর ভয় করতে হবে না।'

কেন্ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো, সতর্ক ভীরু চোখে এমন ভাবে ওর মুখের দিকে তাকালো যেন আর্তিয়ম এখুনি ওর ভারি ঠ্যাংটা চাপিয়ে দেবে তার কাঁধের ওপর।

'তাহলে তুমিই এসব করেছো! কে তোমাকে পাঠিয়েছে? আনফিসা?'

'কেউ আমাকে পাঠায়নি, আমি আমার নিজের গরজেই এসেছি।'

'নিজের গরজে? মিথ্যে কথা!'

'মিথ্যে নয়। কাল রাত্তিরে গ্রেবিলভকায় বসে যখন চা খাচ্ছিলুম, তোমার সম্পর্কে ওরা বলাবলি করছিলো। প্রথমে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি··· দৈত্যের মতো এরকম একটা চেহারা, কি করে সম্ভব বলো? তাই আমি মনে মনে হেসেছিলুম। কিন্তু পরে অনেককেই আলোচনা করতে শুনলুম ওরা নাকি তোমাকে জন্মের মতো সাবাড় করে দিয়েছে, দেখলুম সবাই খুব খুশি। শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে তোমাকে এখানে পেলুম। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটাকে এভাবে মাটিতে পড়ে গোঙাতে দেখে আমার চোখ ফেটে জল এলো। আমি তোমার সেবাযত্ন করলুম। অবশ্য আমি জানতুম এসব তুমি কোন দিনই বিশ্বাস করবে না, কেননা আমি ইহুদি···ইহুদিদের তুমি ঘৃণাই করো···'

'শোনো, কেন্,' আর্তিয়ম মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলো। তবু যতটা সম্ভব শোভন ভঙ্গিতে অথচ থমথমে গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কোনদিন তোমার গায়ে হাত দেবো না। আর কেউ যদি তোমাকে স্পর্শও করে, তাকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। বুঝলে?'

'আঃ, আমি জানতুম, আর্তিয়ম! তুমি অন্য আর পাঁচজনের মতো নোংরা নও। তুমি আমাকে মারতে আমি ইহুদি বলে নয়! আমি তোমার চেয়ে দুর্বল বলে! সত্যি বলছি আর্তিয়ম, তোমাকে যেমন ভয় করতুম, মনে মনে তেমনি ভালোও বাসতুম। তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম আর ভাবতুম আর্তিয়ম তো নয়, যেন স্যামসন, যেকোন মুহূর্তে তুমি সিংহের চোয়াল ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারো। তোমার তুলনায় আমি তো একটা মাছি, বলো?'

'হুঁ, তা বটে!' আর্তিয়ম গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলো মেয়েরা নয়, ওর কোন বন্ধুও নয়, খুব সাধারণ একজন ইহুদি, যাকে ও বহুবার নির্মমভাবে প্রহার করেছে, আজ সে-ই কিনা ওর জীবন ফিরিয়ে দিলো, সেবা-শুশ্রূষা করে ওকে বাঁচিয়ে তুললো!

চাপা উত্তেজনায় কেনের সারা শরীর শিরশির করে উঠলো, আড় চোখে আর্তিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাই তুমি যখন কাঁদছিলে আমিও কেঁদে ফেলছিলুম, আর্তিয়ম।'

'তখন আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, কেন্। ভেবেছিলুম আমাকে কেউ বুঝি ঠাট্টা করছে।'

'সারা রাত জেগে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে তোমার শক্তি আবার ফিরে আসে। দেখো, তুমি খুব শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে, আর্তিয়ম।'

'নিশ্চয়ই, এখনই বেশ সুস্থ বোধ করছি। আগে আমি ভালো করে সেরে উঠি, তারপর তোমার গায়ে কে হাত দেয় একবার দেখবো!' একটু নিস্তব্ধতার পর আর্তিয়ম ম্লান ঠোটে হাসলো। 'ভীষণ খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খাওয়াতে পারো, কেন্?'

কেন্ এমন দ্রুত লাফিয়ে উঠলো যে মাথাটা তার বজরার কড়িকাঠে জোরে ঠুকে গেলো। আর্তিয়ম মুখ ফেরালো। 'একটু দেখে উঠবে তো! এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে?'

'না, খাবার এখানেই আছে। তুমি বেঁচে আছো দেখে আমি ব্রাণ্ডি খাবার ভদকা সবই জোগাড় করে এনে রেখেছি। বলা যায় না কখন কোনটে কাজে লাগে ...'

'ভদকাও এনেছো! তাহলে আমার একটা উপকার করে দাও, কেন্। খাবার এখন চাই না, তুমি বরং আমাকে ভদকা দিয়ে একটু মালিশ করে দাও, আমি তোমাকে অনেক টাকা দেবো! পারবে তো, না কি রাগ করবে?'

'আরে না না, রাগ করবো কেন? তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি। তাছাড়া তোমাকে এমন আচ্ছাসে মালিশ করে দেবো, অনেক ভালো ভালো ডাক্তারেও তা পারবে না।'

'বাঃ, তাহলে পুরো এক বোতল ভদকা দিয়েই মালিশ করে দাও। দু এক ঘন্টার মধ্যে আমি আবার ঠিক হয়ে যাবো।'

'দু এক ঘন্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে! না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

'বেশ, তুমি নিজ চোখেই দেখো ! আগে একটু ভালো করে মালিশ করে দাও, তারপর পাহাড়তলির নিচে রুটিওয়ালী মোকেভনাকে গিয়ে বোলো আমি ওর ওখানে কয়েক দিন থাকবো, ও যেন সব ব্যবস্থা করে রাখে।'

দু হাতের চেটোয় খানিকটা ভদকা ঢেলে ওর বুকে ঘষতে ঘষতে কেন্ বললো, 'না, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি···'

'ঠিক আছে, আর একটু পরেই দেখো ! আরে না না, আমার লাগবে না, তুমি বরং আরও জোরে জোরে ঘষো···হ্যাঁ, এবার ঠিক হচ্ছে ! বুঝলে কেন্, এ পৃথিবীতে মেয়েরাই'হলো যত নষ্টের মূল।'

কেন্ হাসতে হাসতে বললো, 'অথচ আবার ওরা না হলেও চলে না।'

'হুঁ, তা বটে !' আর্তিয়ম হাসলো। টান টান করে মেলে-দেওয়া অর্ধ নগ্ন ফুলে-ওঠা দেহে ও এখন সত্যিই বিশাল একটা দৈত্যের মতো শুয়ে রয়েছে, আর কেন্ অদ্ভুত নিপুণতায় ওকে সমানে দলাই-মলাই করে চলেছে।

একটু পরে আর্তিয়ম জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, কথা বলছো না যে ?'

'ভাবছি ওরা যদি জানতে পারে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি, তাহলে কিন্তু আমাকে আর আস্তো রাখবে না।'

আর্তিয়ম হো হো করে হেসে উঠলো। 'ঠিক আছে, দেখবো কে কাকে আস্তো রাখে !'

আর্তিয়মের হেসে ওঠার ভঙ্গি, ওর কণ্ঠস্বর শুনে কেন্ অবাক হয়ে গেলো, যেন তার অবরুদ্ধ মনের ভয়টাকে কে নিঃসঙ্কোচে উড়িয়ে নিয়ে গেলো।

প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে।

একদিন দুপুরে, ডক-শ্রামক আর ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়ে সংকীর্ণ গলিটা তখন গিজগিজ করছে, হঠাৎ থমথমে চাপা একটা উত্তেজনায় সিকানের সবাই চমকে উঠলো। কে যেন চাপা গলায় ফিসফিস করে বললো, 'এই, আর্তিয়ম আসছে !'

গলির দুধার জুড়ে যেসব ফেরিওয়ালা খাবার নিয়ে বসেছিলো, চোখের নিমেষে তারা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলো। আর যারা পথ চলছিলো, তারা সবাই অবাক হয়ে মর্মরিত গুঞ্জনের দিকে ফিরে তাকালো। আর্তিয়ম কিন্তু আগের মতো সেই একই ভঙ্গিতে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেলে দুলে মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে। খালি বুক, হলদে কুর্তাটা চাপানো কাঁধের ওপর, মাথার খুপিটা এক পাশে হেলানো, কালো

চুলের কয়েকটা ঘূর্ণী এসে পড়েছে ঘামে-ভেজা শুভ্র কপালের ওপর। পরিবর্তনের মধ্যে কেবল ওর অনন্যসুন্দর মুখটা এখন যেন আরও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, আয়ত চোখের দৃষ্টিটা আরও বেশি শানিত আর প্রখর বলে মনে হচ্ছে।

রাস্তার সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর কেমন করে এমন সুন্দর শক্তিশালী একটা মানুষকে কেউ মারতে পারে সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। কেউ কেউ কল্পনায় ওর শত্রুপক্ষের লোকজনদের এবার কি হাল হবে ভাবতেই মনে মনে শিউরে উঠছে। অধিকাংশই আর্তিয়মের হঠাৎ এই আবির্ভাবে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলো।

আর্তিয়ম গ্রেবিলভকা পানশালায় এসে পৌঁছালো। নিচু ছাদওয়ালা লম্বা টানা ঘরের ভিতরে তখন মাত্র অল্প কয়েকজনই বসেছিলো, সারা দরজাজুড়ে আর্তিয়মকে প্রবেশ করতে দেখে দু একজন বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদই করে উঠলো। একজন তো চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভাঁড়ারঘরের এক কোণে গিয়ে লুকলো। বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়ে আর্তিয়ম ধীরে ধীরে সারা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। পানশালার মালিক সাভকা ক্লেবনিকভ দু-পা এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানালো।

আর্তিয়ম জিগেস করলো, 'কেন্ এখানে এসেছিলো ?'

'একখুনি আসবে। সাধারণত ও টিফিনের এই সময়েতেই আসে।'

জানলার ধারের একটা চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে আর্তিয়ম চায়ের ফরমাস দিলো।

সারা ঘরে জনা দশেক লোক, অধিকাংশই শ্রমিক, যারা এতক্ষণ আর্তিয়মের দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছিলো, একবার ওর চোখে পড়তেই এমনভাবে হাসলো, যেন ওর জন্যেই ওরা এতদিন উদ্বিগ্ন হয়েছিলো। কিন্তু আর্তিয়মকে কিছু বলতে না দেখে ওরা আর আগ-বাড়িয়ে কিছু জিগেস করতে সাহস পেলো না। বাইরের রাস্তা থেকে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি, অশ্লীল খিস্তি, ফেরিওয়ালাদের হাঁক শোনা যাচ্ছে। শান-বাঁধানো পাথরের কোথায় যেন একটা বোতল আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেলো। ভেতরের বদ্ধ বাতাসে নাটকীয় এই স্তব্ধতায় আর্তিয়ম হঠাৎ কেমন যেন ক্ষেপে গেলো। অসম্ভব চড়া গলায় ও চিৎকার করে উঠলো, 'এই নেকড়েমুখো ভেড়াগুলো, আমার দিকে সারাক্ষণ অমন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি ?'

'আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ছটফট করছি, আর্তিয়ম। ল্যাংটো-

বর তার চেয়ার ছেড়ে পায়ে পায়ে আর্তিয়মের দিকে এগিয়ে এলো। ছোট-খাটো মানুষ, থুতনির ওপর পাতলা একটু নুর, গায়ে ক্যাম্বিসের কামিজ, পরনে সেপাইদের পাতলুন। আর্তিয়মের উলটো দিকের চেয়ারে সে বসলো। 'তুমি অসুস্থ ছিলে শুনলুম?'

'তাতে কার কি?'

'না, কিছু নয়···এই এমনি, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, তাই শুধু···কি হয়েছিলো···'

'মিথ্যে কথা!' আর্তিয়ম গর্জে উঠলো। 'কি হয়েছিলো তুমি জানতে না?'

'হ্যাঁ, জানতুম।'

'ব্যাটা সানায়ের-পোঁ কোথাকার, তাহলে মিথ্যে কথা বলার দরকার কি ছিলো?'

'সত্যি বললে তুমি হয়তো রেগে যেতে, আর্তিয়ম।'

'হুঁ!'

আর কোন কথা না বলে আর্তিয়মকে গুম মেরে থাকতে দেখে ল্যাংটো-বরের সাহস বেড়ে গেলো। 'তোমার সেরে ওঠার জন্যে আমাদের এক বোতল ভদকা খাইয়ে দাও, আর্তিয়ম।'

'নাও।'

'ধন্যবাদ! সত্যিই তোমার মনটা খুব ভালো, আর্তিয়ম।'

'আর যাই হোক, তোমাদের মতো অত নোংরা নয়।'

এমন সময় দরজার সামনে কেন্‌কে দেখা গেলো, বুকের কাছে ঝোলানো কাঠের বাক্স। ভেতরে পা বাড়াবার আগে সারসের মতো গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকালো। ঠোঁটের কোণে সেই একই ম্লান চাপা হাসি। হঠাৎ আর্তিয়মের চোখে চোখ পড়তেই সারা মুখ তার অবাধ হাসিতে যেন ঝলমল করে উঠলো।

'আরে কেন্‌, তুমি! এসো এসো।' ল্যাংটো-বরের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পিলে-চমকানো গলায় বললো, 'এখন ভাগো এখান থেকে।'

ল্যাংটো-বর একবার আর্তিয়ম আর একবার নিঃশব্দে গুটিগুটি এগিয়ে-আসা কেনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো। তারপর মুখ কালো করে ধীরে ধীরে নিজের টেবিলে ফিরে গেলো। তার বন্ধুরা।বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো।

আর্তিয়মকে দেখে কেন্‌ যেমন খুশি হলো, ল্যাংটো-বরের বন্ধুদের ওইভাবে হাসতে দেখে ভয় পেলো তার চাইতে কম নয়। তাকে ওদের দিকে করুণ চোখে থাকতে দেখে আর্তিয়ম বললো, 'আরে বোসো। ওগুলো তো ভেড়ার বাচ্ছা, ওদের এমন ভয় পাবার কিছু নেই। তারপর কি খাবে বলো? নিশ্চয়ই তোমার খুব খিদে পেয়েছে?'

কেন্‌ বসলো বটে, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলো না। সে তখন রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। তাছাড়া ল্যাংটো-বর উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলছে।

আর্তিয়ম চেঁচিয়ে উঠলো, 'বিড়বিড় না করে মরদের বাচ্ছার মতো জোরে বলো।'

'হয় তোমরা থাকো আমরা যাই, না হয় আমরা থাকি তোমরা যাও।'

আর্তিয়মের চোখদুটো হিংস্র বাঘের মতো জ্বলে উঠলো। 'বুঝতে পেরেছি, ইহুদিটার সঙ্গে আমার দোস্তি দেখে তোমাদের গায়ে জ্বালা ধরেছে। তোমরা জাহান্নমেও যেতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তোমাদের একটা কথা আগে থেকে সাবধান করে রাখছি···গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, কেউ যদি একে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করো আমি কাউকে আস্তো রাখবো না, সোজা জ্যান্তো কবর দোবো, বুঝলে?'

আবেগে বিস্ময়ে কেনে্‌র ছোট্ট মুখখানা আরও বিবর্ণ হয়ে গেলো। কোন দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। আর্তিয়ামের ছোটখাটো নৌকার মতো বিশাল খালি বুকখানার দিকে সে নত চোখে তাকিয়ে রইলো।

ঘরের ওপার থেকে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেলো, তারপরেই ল্যাংটো-বর আর তার সঙ্গীরা এক এক করে বাইরে বেরিয়ে গেলো। আর্তিয়ম তাকিয়ে দেখলো ঘরের মধ্যে শুধু ওরা দুজন আর বিক্রেতার টেবিলে বসে রয়েছে সাভকা।

আর্তিয়মের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে সাভকা ধূর্ত চোখে হাসলো। 'তুমি ঠিক করেছো আর্তিয়ম, ওগুলো সবকটা মিটমিটে শয়তান।'

আর্তিয়ম যেন তার কথাগুলো শুনতে পেলো না, শুনলো তার প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনিত শব্দগুলো কেমন যেন উপহাসের মতো ওর কানে এসে বাজলো, ভারি হয়ে চেপে বসলো ওর বুকের ওপর। আর্তিয়ম মনে মনে ছটফট করে উঠলো। কেনের দিকে তাকিয়ে দেখলো পেয়ালা থেকে খানিকটা গরম চা পিরিচে ঢেলে সে নিবিষ্ট মনে ফুঁ দিচ্ছে, তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে পিরিচটা

মুখের সামনে তুলে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে। আর্তিয়ম যত তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে ততই হতাশ হয়ে যাচ্ছে—নাঃ, ওটা সত্যিই ভীরু! ওকে রক্ষা করা আর বনের আগাছা নিড়ানো, দুই সমান!

'তুমি কি এখনও আমাকে ভয় পাচ্ছো নাকি, কেন্?' কণ্ঠস্বরে ও বুঝি তার মনের বিরক্তকে ধরে রাখতে পারলো না। 'কি ব্যাপার, কথা বলছো না যে?'

'কি বলবো আর্তিয়ম?' কেন্ যখন মুখ তুললো, মনে হলো তার সারা মুখে কে যেন পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়ে দিয়েছে। 'বলা উচিত কিনা আমি সেইটাই বুঝতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি আমার পাশে বসতে তোমার লজ্জা করছে। সে তো স্বাভাবিক। কোথায় আমি আর কোথায় তুমি? সত্যি আর্তিয়ম, যখন তোমার কথা ভাবি আমার জুডাস ম্যাকাবিয়াসের কথা মনে পড়ে যায়। ঈশ্বর তোমাকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন কে বলতে পারে বলো? অথচ তোমার তুলনায় আমি কত কত তুচ্ছ! তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আর্তিয়ম, দিন রাত আমি কত ভেবেছি, তবু আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলুম না এ পৃথিবীতে আমার জীবনের মূল্য কতটুকু!'

কেনে্র কথাগুলো আর্তিয়ম স্পষ্ট ধরতে পারলো না, তবে এটুকু বুঝতে পারলো কোথায় যেন তার একটা অভিযোগ রয়েছে। আর কথাটা মনে হতেই ক্লান্ত একটা বিষণ্ণতায় সারা মন ওর ভরে উঠলো। 'দেখো কেন্, তোমাকে তো বলেছি—তোমার দেখা শোনার সমস্ত দায়িত্ব আমার, নাকি বলিনি?'

'হ্যাঁ, তা বলেছো,' কেন্ ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে কেমন করে বাঁচাবে, আর্তিয়ম?'

'না, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না।' ও খোলাখুলিই স্বীকার করলো। 'তা ছাড়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমি যেতেও চাই না।' কেনের নিশ্চুপ ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আর্তিয়ম কি যেন ভাবলো। 'তুমি বিয়ে করেছো?'

'হ্যাঁ, আমার বিরাট পরিবার।' কেন্ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'অন্তত আমার শক্তির তুলনায় বিরাট তো বটেই।'

'তাই নাকি!' আর্তিয়ম কল্পনাই করতে পারলো না এই রকম অদ্ভুত দুর্বল ভীরু ছোটখাটো একটা ইহুদিকে কোন মেয়ে ভালোবাসতে পারে।

'পাঁচটা ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা মারা গ্যাছে। বউটাও আবার যক্ষ্মায় ভুগছে...'

'তাহলে তো তোমার এখন খুব দুঃসময়!' আর্তিয়মের মনটা এবার সত্যিই

খারাপ হয়ে গেলো। কেনের আচ্ছন্ন ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে ও খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো।

এবার কয়েকজন পুরানো জামাকাপড় বিক্রেওয়ালা পানশালায় প্রবেশ করলো। ওরা সোজা সাভকার টেবিলের সামনে গিয়ে নিচু গলায় ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করছে আর মাঝে মাঝে ওদের দুজনের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর্তিয়ম ওদের দিকে কানই দিলো না, জানলা দিয়ে নদীর ওপারে ধু ধু মাঠের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো। কেন্ কিন্তু সতর্ক হয়ে উঠলো। আর্তিয়মের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললো, 'তুমি যদি এখানে থাকতে চাও থাকো, আমি যাই আর্তিয়ম। আমার জন্যেই সবাই তোমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।'

'কে হাসি-ঠাট্টা করছে?' যেন নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙে আর্তিয়ম গর্জন করে উঠলো। ঘরের চারদিকে চোখ বোলালো। কিন্তু সবাই তখন যে যার কাজে ব্যস্ত। আর্তিয়ম দেখলো একটা চোখও তাদের দিকে ফেরানো নেই। বিরক্ত হয়ে ও বললো, 'তুমি মিথ্যে বলছো।'

কেন্ কোন কথা বললো না, কেবল শীর্ণ ঠোঁটে করুণ করে হাসলো। একটু নিস্তব্ধতার পর সে উঠে পড়লো, গলায় কাঠের বাক্সটা ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। 'আমি যাই আর্তিয়ম।'

'কি ব্যাপার, চললে? যাও, তোমার আবার ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে…'

আর্তিয়মের বিশাল থাবাটা ছোট্ট দুট্টো হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে কেন্ আন্তরিক ভঙ্গিতে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিলো, তারপর দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেলো। রাস্তায় নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে কেন্ দূর থেকে পানশালার ওপর নজর রাখলো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটু পরেই সে আর্তিয়মকে বেরিয়ে আসতে দেখলো। ভ্রূদুটো কোঁচকানো, মসৃণ কপালের ওপর গভীর কয়েকটা ভাঁজ। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে রাস্তার চারদিকে ও একঝলক তীক্ষ্ণ নজর বুঝিয়ে নিলো, তারপর আগেরই মতো সেই শ্লথ মন্থর পায়ে ধীরে ধীরে পাহাড়তলির দিকে এগিয়ে চললো। কেন্ দূর থেকে নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলো।

আর্তিয়মের সেদিনের সেই ভয় দেখানোতেই যথেষ্ট কাজ হলো, এখন আর কেউ কেনের পেছনে লাগে না। নিতান্তই দু-একজন ছাড়া পথের-কাঁটা বলতে

এখন আর তার কেউ নেই, যেন তার অস্তিত্বকেই সবাই ভুলে গেছে। এখন আর যেমন কেউ তার পা মাড়িয়ে দেয় না, কিছু ছুঁড়ে মারে না, বাক্সে থুতু দেয় না, তেমনি আবার হাসিখুশি উচ্ছল আন্তরিক ভঙ্গিতে কেউ তাকে অভিনন্দন জানায় না, তেমন করে কেউ ফিরেও তাকায় না। অথচ আগে সবাই কেমন হেসে-হেসে তার সঙ্গে কথা বলতো, হাসি-ঠাট্টা করতো, আর আজ··· যত ভাবে, যত দেখে, কেন্ দিন দিন কেমন যেন মনমরা হয়ে যায়।

তাই চোখ-কান খোলা রেখে কেন্ সবকিছু দেখে, সবকিছু শোনার চেষ্টা করে। একদিন দেখলো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ল্যাংটো-বর দু আঙুলের মধ্যে কাঠের দুটো টুকরো গুঁজে বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইছে। মাঝে মাঝে পুরনো জামাকাপড় বিক্রি করলেও, ছড়া বেঁধে গেয়ে রোজগার করাটাই ওর আসল পেশা। গলা যে ওর আহা-মরি-মরি গোছের একটা কিছু তা নয়, তবে শহরতলির সবাই ওর ছড়ার গুণগত দিকটার তারিফ করে। ছোটখাটো মানুষটা কাঠের একটা বাক্সের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কবিয়ালের ঢঙে বক্তিমে দিচ্ছে আর সবাই চারদিক থেকে ওকে মাছির মতো ছেঁকে ধরেছে।

'এই যে মশাইরা, এবার শুনুন একটা নতুন গান। একেবারে টাটকা ভাজা!'

গানটা শুরু করার আগে আঙুলের ফাঁকে কাঠের টুকরোদুটো ও একবার প্রেমসে বাজিয়ে নিলো। 'হ্যাঁ, এবার শুনুন।'

বুনো ষাঁড় আর একটা মাকড়সার সঙ্গে হলো দোস্তি
নোংরা ইহুদির সঙ্গে বোকা গোঁয়াড়টার যত ফষ্টিনষ্টি।
মাকড়সাটাকে লেজে ঝুলিয়ে ষাঁড়টা দুলকি চালে হাঁটে
আনমনে
নোংরা ইহুদি বোকা গোঁয়াড়টার জন্যে মেয়ে ফুঁসলিয়ে আনে।
আহা, সে-সব মেয়েদের যে কি ছিরি! বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি!

'সাব্বাস ভাই, বহুত আচ্ছা! বাহবা, বাহবা!' জনতার সমবেত উল্লাসধ্বনি শোনা গেলো। কেন্ আস্তে আস্তে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চললো, বুকের অতল থেকে বেরিয়ে এলো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস। তখনও তার কানে এসে বাজছে জনতার উল্লসিত চিৎকার। অজানা একটা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা তার দুরদুর করে উঠলো।

প্রতিদিন ভোরে যখনই সে রাস্তায় পা দেয়, সে জানে কেউ তার জিনিস-

পত্তর ছিনিয়ে নেবে না, কেউ তার গায়ে হাত দেবে না…তবু তার বুকটা ভয়ে দুর দুর করে। প্রতিদিনই আর্তিয়ামের সঙ্গে দেখা হয়, যেচে কথা না বললে কেন্ ওর ধারে কাছেও ঘেঁষে না। আর্তিয়মও যেন তাকে লক্ষ্য করেও করে না, কিন্তু চোখাচুখি হলেই জিগেস করে, 'কি ব্যাপার, কেমন আছো ?'

কেন্ সব সময়ই হাসি-হাসি মুখে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, ভালোই আছি।'

'ওরা তোমাকে কেউ কিছু করেনি তো ?'

'তুমি আমার পেছনে আছো জেনে কারুর কিছু করার মতো বুকের পাটা আছে !'

'ঠিক আছে ! কেউ কিছু করলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা, চলি।'

শুধু আর্তিয়মই নয়, কেন্‌ও যেন পরস্পরের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিতে পারলে বাঁচে। কেন না সে ভালো করেই জানে আশেপাশের সবাই ওদের দিকে চোরা-চোখে নোংরা কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

এমনি ভাবে দেখতে দেখতে আরও একটা মাস কেটে গেলো। সেদিন পড়ন্ত-বেলায় কেন্ সবে ঘরে ফেরার তোড়জোড় করছে, হঠাৎ আর্তিয়মের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। অনিন্দ্য-সুন্দর দৈত্যটা ইঙ্গিতে তাকে হাত নেড়ে ডাকলো। কেন্ প্রায় ছুটেই ওর কাছে এসে পৌঁছলো, দেখলো বিষণ্ণ করুণ শ্রাবণের একটুকরো কালো মেঘেরই মতো সারা মুখ ওর থমথম করছে। কেন্ অবাক হয়ে গেলো। 'কি ব্যাপার আর্তিয়ম !'

'তোমার বেচাকেনার কাজ মিটি গ্যাছে ?'

'হ্যাঁ, এবার ফিরবো ভাবছি।'

'একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে। না চলো, বরং আমাকে একটু এগিয়ে দাও।' এত কোমল স্বরে আর্তিয়মকে কথা বলতে সে কোন দিন শোনেনি।

দুজনে পাহাড়তলির পথ ধরলো। একটু পরে ওরা এসে পৌঁছলো নির্জন নদীর ধারে।

আর্তিয়ম বললো, 'এসো, একটু বসা যাক।'

দুজনে বসলো। একটু অপেক্ষা করার পর কেন্ আড়চোখে তাকালো আর্তিয়মের দিকে, দেখলো চোখের পাতাদুটো নামিয়ে ও একমনে সিগারেট

পাকাচ্ছে। কেন্ আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। কনে-দেখা আলোয় নীলিম আকাশে ভেসে চলেছে পুঞ্জ পুঞ্জ স্বচ্ছ মেঘমালা। গোধূলির অতল নির্জনতার ঢেউগুলো মনে হচ্ছে যেন ভয়ে কেঁপে উঠছে। সারাক্ষণ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভেবেও কেন্ বুঝতে পারলো না আর্তিয়ম তাকে কি বলবে।

'হুঁ,' সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে আর্তিয়ম গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। 'তাহলে বেশ ভালোই আছো।'

'হ্যাঁ, আর্তিয়ম। এখন আর আমাকে কাউকে ভয় করতে হয় না। তার জন্যে আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'দাঁড়াও, এক মিনিট!'

এক মিনিটের বদলে অনেক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেলো, আর্তিয়ম কিন্তু কোন কথা বললো না। দূরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে ও যখন একমনে সিগারেট টানছে, কেন্ তখন বুকের মধ্যে অসম্ভব ভারি একটা বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে।

'তাহলে ওরা তোমাকে নিয়ে এখন আর হাসি-ঠাট্টা করে না?'

'না আর্তিয়ম। তুমি হলে সিংহ, ওরা তোমাকে দেখলেই ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালায়।' কেনে্র দু ঠোঁটে ফুটে উঠলো ম্লান হাসির রেখা। 'আমি তো এখন…'

'দাঁড়াও, এক মিনিট!'

'কি ব্যাপার! কি বলতে চাও, আর্তিয়ম?' কেন্ সতর্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো।

'যা বলতে চাই, বলা অত সহজ নয়, কেন্।'

'তাহলে?'

'অবশ্য বলতে যখন হবে, আমার মনে হয় খোলাখুলি বলাই ভালো।'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি বলতে চাই কেন্, এখন থেকে…'

'এখন থেকে কি, আর্তিয়ম?'

আর্তিয়ম গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তোমাকে দেখা শোনা করা আর সম্ভব নয়, কেন্…কেমন যেন বিরক্তিকর, মানে আমার ঠিক ভালো লাগে না।'

'ঠিক বুঝতে পারলুম না। কি তোমার ভালো লাগে না, আর্তিয়ম?'

'এই সবকিছু…মানে আমি আর তোমাকে আড়াল করে রাখতে চাই না।

কেউ যদি তোমাকে কিছু বলে, আমাকে আর নালিশ জানাতে এসো না। আমি পারবো না, কেন্! এসব আমার আর ভালো লাগছে না।'

কেনের মাথাটা ঝুলে এলো বুকের কাছে, যেন বলিষ্ঠ হাতে তার ঘাড়টা কে ভেঙে দিয়েছে। মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ নিথর হয়ে সে চুপচাপ বসে রইলো।

আর মনের অবরুদ্ধ দ্বার খুলে ছুটে-চলা মুক্তধারার মতো আর্তিয়ম অনর্গল কলকল করে চললো, 'তুমি আমাকে করুণা করেছো, তার জন্যে যত টাকা চাও আমি দিতে রাজী আছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আজ পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে সত্যিকারের কোন দুঃখ কোনোদিন অনুভব করতে পারিনি। চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেটা এক ধরনের ভান ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনি।'

'হয়তো আমি ইহুদী বলেই···'

'না।' আর্তিয়ম পাশ থেকে তার মুখের দিকে তাকালো। কণ্ঠস্বরে ওর কোথাও কোন আবিলতা নেই, না কোন উচ্ছ্বাস। 'শুধু আমি পারি না বলে। তুমি কেন, কারুর ওপরেই আমার দয়া-মায়া বলতে কিছু নেই, হয়তো আমার মধ্যে সে বোধই নেই···আর সেই জন্যেই হয়তো আমি সবায়ের ওপরে এমন অত্যাচার করি। আজ পর্যন্ত এ-কথা আমি কাউকে বলতে পারিনি, কেন্··· শুধু তোমাকেই বলছি···'

'কিন্তু বদমাসগুলোর হাত থেকে কে আমাকে বাঁচাবে, আর্তিয়ম?' কান্নার মতো করুণ স্বরে কেন্ ফিসফিস করে জিগেস করলো।

'অসম্ভব, কেন্! আমি পারবো না। ওরা হাসে বলে নয়, আমি তোমার জন্যে সত্যিকারের দুঃখিত হতে পারি না বলেই তা চাই না। নাহলে ওদের সবকটার নামই আমি পেয়ে গেছি···'

'পেয়ে গ্যাছো!' অবাক বিস্ময়ে আর্তিয়মের মুখের দিকে তাকাতেই কেন্ স্তব্ধ হয়ে গেলো। ভেতরের চাপা উত্তেজনায় ওর মুখটা এখন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, বালির ওপরে মুষ্টিবদ্ধ দুটো হাত, টানটান প্রসারিত, পাদুটো পৌঁচেছে জলের কাছে। নদীর স্রোতে কাঁপছে বেলাশেষের আলোয় রাঙা সূর্যাস্তের আভা, তার মৃদু ছায়া পড়ছে ওদের দুজনের মুখে। শোনা যাচ্ছে জল-ঢেউয়ের মর্মর।

একটু বিরতির পর আর্তিয়ম বললো, 'হ্যাঁ। ওদের পাওনাটা এবার চুকিয়ে ফেলতে হবে। তাই আমি চাই না তুমি আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াও।'

'কিন্তু আমার কি হবে, আর্তিয়ম? তোমাকে ছাড়া আমি কেমন করে বাঁচবো?'

'নাঃ, তুমি একটা সত্যিই অদ্ভুত!' মিনতির মতো তার করুণ আর্দ্র স্বরে আর্তিয়ম বিরক্ত হয়ে উঠলো। 'তুমি কেমন করে বাঁচবে সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে, অন্য কেউ আগে থেকে বলতে পারে না।' আর্তিয়ম এবার টানটান করে নিজেকে বালির ওপর মেলে দিলো।

'এমনটা যে হবে আমি জানতুম। তোমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখার পর থেকেই কেন জানি বারবার এ-কথা আমার মনে হচ্ছিলো।' সন্তর্পণে আর্তিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে কেন্ অস্ফুট স্বরে বললো, 'আমার জন্যে ওরা তোমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে বলেই তুমি তা চাও না!'

'ওরা? ওদের কথা কে ভাবে? যদি আমার ইচ্ছে হতো, সারাক্ষণ আমি তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম। ওরা যদি পেছন থেকে হাসে তো হাসুক, ভারি বয়েই গেলো। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে না…প্রত্যেকেরই তো নিজের মনের ইচ্ছে অনুসারে চলা উচিত, তাই কিনা বলো? আসলে ভাই, সত্যিই বলছি, তোমাকে আমার ভালো লাগে না।'

'বারে, এতক্ষণ সেই কথাটা বলবে তো! বেশ, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, কেন্! সন্ধ্যে হয়ে আসার আগেই বরং চলে যাও। আর কেউ যখন আমাদের কথা আড়ি-পেতে শোনেনি, এখনই নিশ্চয়ই তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।'

'হয়তো বলবে না, কিন্তু পরেও তুমি কাউকে যেন কিছু বলো না।'

'না না, আমি নিজে থেকে কিছু বলবো না। আর তুমিও আমার কাছে এসো না।'

'আচ্ছা!' ঝোড়ো-পাখির মতো বিধ্বস্ত পায়ে কেন্ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

শান্ত নির্লিপ্ত স্বরে আর্তিয়ম বললো, 'যদি আমার একটা উপদেশ নাও তো বলি. তুমি বরং অন্য কোথাও চলে যাও, সেখানে গিয়ে তোমার কেনা-বেচার কাজ করো। এখানকার জীবন বড় কষ্টের, এখানে সবাই সবার পেছনে লাগে।'

'কিন্তু এ ছাড়া আমি আর কোথায় যাবো, আর্তিয়ম?'

'সেটা তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।'

'আচ্ছা! বিদায়, আর্তিয়ম!'

'বিদায়।' না উঠে আর্তিয়ম ওখান থেকেই বিশাল একটা বাহু বাড়িয়ে

দিলো, কেনের দিকে, আলতো করে চেপে ধরলো ইহুদীর শীর্ণ আঙুলগুলো। 'তুমি কিন্তু আমার ওপর রাগ করো না, কেন্!'

'না না, রাগ করবো কেন?' মুখে স্বীকার না করলেও, হতাশায় করুণ হয়ে উঠলো কেনের গভীর দীর্ঘশ্বাস।

'ঠিক আছে, তাহলে এখন যাও। পরে অবসর সময়ে ভালো কোরে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, কেন আমি এসব কথা বলেছি। তুমি আমার সমকক্ষ নও, আমি তোমার সব সময়ের সঙ্গী হতে পারি না। তোমার জন্যেই শুধু আমাকে বাঁচতে হবে তা তো আর সম্ভব নয়!'

'তাহলে বিদায়, আর্তিয়ম।'

'বিদায়, কেন্।'

নদীর তীর ধরে কেন্ শ্রান্ত পায়ে ধীরে ধীরে ফিরে চললো। কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে, মাথাটা নোয়ানো, এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। আর্তিয়ম খানিকক্ষণ তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপর আবার আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। নদীর তীরে আছড়ে-পড়া জল-ঢেউয়ের মৃদু মর্মর ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। সান্ধ্য বাতাসে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে করুণ একটা বিষণ্নতা।

কেন্ পায়ে পায়ে আবার বালির ওপরে টানটান শুয়ে-থাকা নিশ্চল বিশাল মূর্তিটার পাশে এসে দাঁড়ালো। অস্ফুট কোমল স্বরে ডাকলো, 'আর্তিয়ম!'

আর্তিয়ম নিশ্চুপ।

একটু অপেক্ষা করার পর কেন্ আবার নম্র কোমল স্বরে জিগেস করলো, 'আর্তিয়ম, তুমি আমার সঙ্গে এমনি ঠাট্টা করোনি তো? মনে করে ছাখো, সেদিন রাত্তিরে মুমূর্ষু অবস্থায় তুমি যখন একা একা···আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে দেখতে আসেনি···'

জবাবের প্রত্যুত্তরে জল-ঢেউয়ের মৃদু মর্মর আর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কোথাও কিছু শোনা গেলো না। ঘুমের মতো মিষ্টি একটা আমেজ কোমল হয়ে ওঠা ওর দুর্লভ-সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে কেন্ দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। প্রতিটা স্পন্দনে নৌকার মতো বলিষ্ঠ চওড়া বুকটা উঠছে নামছে, কালো গোঁফ-জোড়াটা ছড়িয়ে পড়েছে গালের দুপাশে, আধফোটা ঠোঁটের আড়ালে সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করছে, গোধূলির ম্লান আলোয় মনে হচ্ছে ও যেন নিঃশব্দে হাসছে।

কেনের বুকের অতল গহন থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো মগ্ন করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। নির্জন নদীর পাড় ধরে শ্রান্ত পায়ে ধীরে ধীরে সে আবার শহরের দিকে ফিরে চললো। যত এগিয়ে চলেছে ছোট্ট ভীরু পশুর মতো কী যেন অজানা একটা আশঙ্কায় শিরশির করছে সারা শরীর। রাত্রির অতল নির্জনতায় বীভৎস সব ছায়া-ছায়া অন্ধকারে হঠাৎ তার গাটা কেমন যেন ছমছম করে উঠলো।

১৮৯৮

দুজনেই চোর। একজনের নাম নাচন-পা, অন্যজনের নাম প্রত্যাশা।

ওরা থাকতো শহরতলির একবারে শেষ প্রান্তে খাঁড়ির মুখে, মুখ-থুবড়ে-পড়া কয়েকটা কুঁড়ের একটাতে। আশেপাশের গ্রামগুলোতে চুরি করতো। কেননা শহরে চুরি করা খুব কঠিন, আর শহরতলির প্রতিবেশীদের চুরি করার মতো কিছু নেই বললেই চলে। ওরা দুজনেই যেমন সতর্ক, তেমনি শোভন। ছেঁড়া সার্ট কোট, কোদাল কুড়ুল, ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম, বা দু-একটা হাঁস মুরগী, হাতের কাছে এটা ওটা যখন যা পেতো চুরি করে গা-ঢাকা দিতো। ওদের এই দূর-দর্শিতার জন্যে শহরতলির সবাই ওদের চিনতো, কখনও কখনও মেরে হাড়-গোড় পর্যন্ত ভেঙে দিতো। তা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ ভাব, একটানা ছ বছর ওরা এইভাবে বাস করে আসছে।

নাচন-পার বয়েস বছর চল্লিশ। পেশীবহুল দীর্ঘ শরীর, যখন হাঁটে একটু ঝুঁকে বড় বড় পা ফেলে ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটে। রুক্ষ মুখ, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, পরিষ্কার কামানো চিবুক, সেপাইদের মতো পেল্লাই গোঁফ। ডান পার চেয়ে বাঁ পাটা বড়। সম্ভবত কোন এক সময়ে মেরে ওর ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হয়েছিলো। ফলে হাঁটার সময় ও ডান পাশে হেলে পড়ে আর যখন দ্রুত হাঁটে মনে হয় ঠিক যেন নাচছে। ওর এই অদ্ভুত হাঁটার ভঙ্গির জন্যে সবাই ওকে ওই নামে ডাকে।

প্রত্যাশা তার দোস্তের চাইতে বছর পাঁচেকের বড়। মাথায় খাটো, চওড়া কাঁধ, আব-ভর্তি মুখটা লম্বা কাঁচাপাকা দাড়িতে ভরা। বড় বড় কালো চোখের অতল দৃষ্টি মেলে যখন চারদিকে তাকায়, তখন তার মুখে ফুটে ওঠে সরল অথচ কেমন যেন একটা অপরাধীর ভাব। চলার সময় সারাক্ষণ খুক খুক কাশে আর ঠোঁট দুটো গোল করে আপন মনে বিষণ্ণ করুণ একটা গানের সুর ভাঁজে। আসলে সে ছিলো চাষী, পদাতিক বাহিনীতে কিছুদিন গোলা-বারুদ কুড়িয়ে আনার কাজ করেছে।

ওদের দুজনকে দেখলেই সবাই বলতো, 'এই রে দোস্ত বেরিয়েছে, নজর রাখিস!'

প্রত্যাশার গায়ে বহুবর্ণ কম্বলের তৈরী জামা, তার ওপর নাবিকদের নীল একটা কোর্তা চাপানো। নাচন-পার পরনে ছাই-ছাই রঙের লম্বা তুর্কী কোট।

দোস্ত দুজন যতটা সম্ভব লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ হাঁটে। তারপর যবের ক্ষেতে, বনের মধ্যে কিংবা খালের ধারে বসে আজ কোথায় কি ভাবে চুরি করবে কিংবা কি খাবে, সে সম্পর্কে দুজনে নিভৃতে আলোচনা করে।

শীতকালে যখন নেকড়েরাও গর্ত ছেড়ে বেরোয় না, ইয়ার দুজনকে তখন রোজগারের ধান্দায় বেরুতে হয়। খিদে-তেষ্টায় ম্লান হয়ে বেজার মন নিয়ে দুজনে পথে পথে ঘোরে, আর যে লোকগুলো ওদের দেখলে আঁতকে ওঠে, তাদেরই হাতে ধরা পড়ার ভয়ে থরথর করে কাঁপে। শেষের ভয়টাই ওদের সবচেয়ে বেশি। কেননা জীবনসংগ্রামের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে ওরা একটু ভালো করে বুঝে নিয়েছে—হয় সত্যিকারের সৎ হতে হবে, নয়তো নিজেদের কাজে ভালো করে হাত পাকাতে হবে।

শীতের মরশুমে ঘন তুষারপাতে পথঘাট যখন জমাট বেঁধে থাকে, ওরা গ্রামে চুরি করতে যায় না। তখন পুলিসের চোখ এড়িয়ে পথে পথে ওরা ভিক্ষে করে আর ঝোপ বুঝে হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে সটকে পড়ে। এমনি ভাবে নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে ওদের দিন কাটে। দেখতে দেখতে একদিন বসন্তকাল আসে। সূর্যের সোনালী রোদে চারদিক যখন ঝলমল করে, শরীর-টাকে একটু উত্তপ্ত করে নেয়ার আশায় জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন দেহে ওরা কুঁড়ের মধ্যে থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসে, আর মনে মনে ভাবে কবে পথঘাট শুকোবে! শেষ পর্যন্ত একদিন তাও সম্ভব হয়, রাত্তিরে ওদের 'খেপ' দেবার মতো অবস্থা ফিরে আসে। তখন প্রত্যাশা ইয়ারের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'এই, কাক ডাকছে।'

'কই, কোথায় ?'

'হ্যাঁ, আমি এইমাত্তর শুনলুম। কেন, তুমি শুনতে পাওনি ?'

সত্যিই তো তাই! এদিক ওদিক তাকিয়ে ছাখে বসন্তের কৃষ্ণ-দূত নেড়া গাছের মগডালে হয় নতুন বাসা বাঁধছে, নয়তো পুরনো বাসাগুলোকে তাপ্পি-তুপ্পি দিয়ে সারিয়ে নিচ্ছে। ওদের মুখর ব্যস্ততায় গমগম করছে সারাটা তল্লাট।

'দেখো, কয়েকদিন পরেই আবার কোকিল ডাকবে।'

বসন্তের দিনগুলো ওদের জীবনে প্রতিবারেই নতুন করে ধরা দেয়। তখন রোজগারের যা-কিছু পন্থা—কাঠকুটো, করমচা, ব্যাঙের-ছাতা, কিছুই ওদের চোখ এড়িয়ে যায় না। মাঠে মাঠে আঠা দিয়ে ফাঁদ পেতে পাখি ধরে। নিশানা ঠিক রাখার জন্যে রাইফেল ছোঁড়া শেষ করে সৈনিকরা ফিরে যাবার পর ওরা

মাটি খুঁড়ে খালি কার্তুজের খোলগুলো বার করে। তারপর পঁচিশ কোপেক সের-দরে ওগুলো বাজারে বিক্রি করে দেয়।

গাছে গাছে সবে যখন কুঁড়ি আসতে শুরু করেছে, বনে বনে লেগেছে সবুজের ছোঁয়া, বসন্তের এমনি একটা দিনে দুই ইয়ার পাশাপাশি হেঁটে চলছে। দুজনেই হাতে-পাকানো সিগারেট খাচ্ছে আর নিচু গলায় গল্প করছে।

নাচন-পা বললো, 'তোমার কাশিটা দেখছি আজকাল বড্ড জ্বালাচ্ছে।'

'না না, ও কিছু নয়। আর কয়েকদিন বাদে রোদের তেজ বাড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তবু আমার মনে হয় তোমার একবার হাসপাতালে দেখানো উচিত।'

'বোকার মতো বোলো না! হাসপাতালে কি করতে যাবো? যদি মরতেই হয়, অন্য কোথাও গিয়ে মরবো।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

বার্চের ঘন তরুবীথির মধ্যে দিয়ে ওরা হেঁটে চলেছে। পল্লবিত শাখার নানান কারুকার্য করা ছায়া পড়েছে নিচে। শোনা যাচ্ছে পাখিপাখালির মিষ্টি গান।

একটু বিরতির পর নাচন-পা বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। 'আজ তোমার হাঁটাটাও কেমন যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।'

'হুঁ, নিশ্বেস নিতে বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।' কথা বলতে বলতেই প্রত্যাশা পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে কাশতে শুরু করলো। কাশতে কাশতে চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠলো, গলার দুপাশের শিরাগুলো ফুলে গেলো। এক সময়ে কাশি থামিয়ে বুকে হাত ঘষতে ঘষতে সে বললো, 'চলো, এবার বুকটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গ্যাছে।'

দুজনে এগিয়ে চললো, আবার শোনা গেলো পাখিপাখালির সেই মিষ্টি গান।

'আমরা এখন সোজা মুকিনায় যাবো। সেখান থেকে সিভৎসভার বন পেরিয়ে যাবো কুঝনেচিকায়…' শেষ সুখ-টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নাচন-পা থুতু ফেললো। ওখানে থেকে আবার মারকোভকায় ফিরে আসবো, তারপর সেখান থেকে সোজা বাড়ি।'

'পাক্কা বিশ মাইল পথ।'

'কিন্তু এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু রোজগার করতে পারবো।'

পথের বাঁ দিকের একটা অরণ্য, নগ্ন শাখায় কোথাও সবুজের কোন চিহ্ন নেই। তার সামনে পাটকেল রঙের অসম্ভব জীর্ণ বুড়ো থুড়থড়ে একটা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। তার বুকের প্রতিটা পাঁজরা আলাদা আলাদা করে গোনা যায়। সঙ্গী দুজন থমকে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওটাকে লক্ষ্য করলো—এক-পা দু-পা করে হাঁটছে আর হলদে ছোপধরা দাঁতে শুকনো ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

'বড্ড রোগা।' প্রত্যাশা যেন হতাশ হয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

নাচন-পা হাত বাড়িয়ে মুখে অদ্ভুত শব্দ করে ডাকলো, 'আঃ-আঃ-আঃ।'

ঘোড়াটা শুধু একবার মুখ তুলে তাকালো, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দিলো। ওর মন্থর ভঙ্গি দেখে প্রত্যাশা ঠাট্টা করে বললো, 'নাঃ, তোমাকে ওর পছন্দ হয়নি দেখছি।'

'চলো, ঘোড়াটাকে তাতারদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যায় কিনা দেখি। বলা যায় না, হয়তো পাঁচ-সাত রুবল পেয়েও যেতে পারি।'

'ওরা নেবে না। ওরা এই বেতো ঘোড়াটাকে নিয়ে কি করবে?'

'কেন, চামড়া বানাবে।'

'ও, হ্যাঁ। চামড়া বানাবার জন্যে নিলে কিন্তু তিন রুবলের বেশি দেবে না।'

'তবু দরাদরি করে দেখতে দোষ কি?'

'না, দোষের কিছু নেই…' প্রত্যাশা বড় বড় বিষণ্ণ চোখ মেলে দোস্তের মুখের দিকে দিকে তাকালো। কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো প্রচ্ছন্ন একটা হতাশা। 'কিন্তু ঝামেলা হতে পারে।'

'ঝামেলা! কিসের ঝামেলা?'

'ভিজে মাটিতে পায়ের ছাপ দেখে লোকে ঠিক বুঝতে পারবে আমরা কোন্‌দিকে গেছি।'

'জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। তাছাড়া অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোন খানা-খন্দে লুকিয়ে অপেক্ষা করবো, তারপর রাত্তির হলে তাতারদের কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবো। খুব একটা দূরও নয়।'

'বেশ, চলো। আমি শুধু বলছিলুম সাবধানের জন্যে।'

'কিচ্ছু হবে না।'

দু জনে পথ ছেড়ে মাঠে নামলো, তারপর পায়ে পায়ে বনের দিকে এগিয়ে চললো। ওদের দুজনকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ঘোড়াটা ঘাড় ফিরিয়ে লেজ দুলিয়ে একবার চিঁ-হি-হি করে ডাকলো।

অরণ্যের মধ্যে গভীর গিরিখাদের নিচেটা যেমন ভিজে, তেমনি অন্ধকার আর নির্জন। গা-ছমছমে সেই নিটোল নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল জলস্রোতে এক-টানা মৃদু বিষণ্ণ একটা মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ঠিক যেন অস্পষ্ট গুমরে গুমরে কে বিলাপ করছে। খাদের দুধারে হিজলের ঝোপ, জলে-ধোয়া মাটি-খসা নগ্ন শেকড়গুলো বেরিয়ে রয়েছে। গোধূলির রাঙা আলোয় সমস্ত অরণ্যটাকে মনে হচ্ছে মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ নিথর। অন্ধকার নির্জন সেই গিরিখাদের মধ্যে দুই বন্ধু অনেকক্ষণ ধরে মাটির চাপড়ার মতো চুপ-চাপ বসে রয়েছে। সামনে বড় একটা নুড়ির ওপর আগুন জ্বালিয়ে হাত সেঁকছে আর মাঝে মাঝে তাকে শুকনো পাতা কাঠকুটো দিচ্ছে। আগুনটাকে বেশি জোরে জ্বালাতে সাহস পাচ্ছে না, পাছে দূর থেকে দেখা যায়। নাচন-পা তার কোমরের দড়ি দিয়ে ঘোড়াটাকে ওপরে একটা গাছের গায়ে বেঁধে রেখেছে।

প্রত্যাশা আগুনের পাশে গুটিসুটি হয়ে বসে অপলক করুণ চোখে তাকিয়ে মৃদু শিস দিচ্ছে, আর তার দোস্ত আপন মনে উইলোর কাটা-ডাল দিয়ে ঝুড়ি বুনছে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, আগুনে পাতা পোড়ার শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। আর সেই নিতল নিস্তব্ধতায় শোনা যাচ্ছে জলের মৃদু মর্মর, যেন অগ্নি-শিখায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা মৃত্যুর চেয়ে করুণ হতভাগ্য দুটি মানুষের জন্যে কেউ শোকগাথা গাইছে।

শিস থামিয়ে প্রত্যাশা এক সময়ে জিগেস করলো, 'এবার বেরিয়ে পড়লে হয় না?'

'না। আর একটু ভালো করে রাত হোক, তারপর যাবো।'

দু জনে আবার চুপচাপ। বেশ খানিকটা নিস্তব্ধতার পর প্রত্যাশা হঠাৎ কাশতে শুরু করলো। নাচন-পা জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, ঠাণ্ডা লাগছে?'

'না না, ঠিক আছি।'

'তাহলে?'

একটু চুপ করে থেকে প্রত্যাশা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'বুকটা বড্ড ব্যথা করছে।

'অসুস্থ লাগছে ?'

'হ্যাঁ, কেমন যেন···কি জানি, হয়তো অন্য কিছুও হতে পারে।'

'না না, কিচ্ছু ভেবো না। ছাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি নিজের জন্যে ভাবছি না। ভাবছি ওইটের কথা···' প্রত্যাশা আঙুল দিয়ে ঘোড়াটাকে দেখিয়ে দিলো। হঠাৎ অস্পষ্ট যন্ত্রণায় ম্লান হয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বর। 'ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বহুদিন পর আজ আমার বাড়ির কথা মনে পড়ে গেলো। একদিন আমারও ঠিক এই রকম···না, ঠিক এই রকম দেখতে নয়, এর চাইতেও সুন্দর দুটো ঘোড়া ছিলো। সে সময়ে ক্ষেতের কাজে আমি দিনরাত পরিশ্রম করতুম···'

'দেখ, এখন এসব কথা ভাবার কোন মানেই হয় না।' নাচন-পা প্রায় জোর করেই তাকে থামিয়ে দিলো। 'ভাবলে মিছিমিছি মনটাই খারাপ হয়ে যাবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। তাই প্রত্যাশা আর কিছু বললো না। কয়েকটা ডাল আগুনের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ঘোড়াটার দিকে ম্লান চোখে সে তাকিয়ে রইলো।

অদূরে ঘোড়াটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে।

'আমাদের সব কিছুকে খুব সহজ করে দেখা উচিত,' বন্ধুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে নাচন-পা চাপা অথচ রুক্ষ স্বরে বললো। 'গোটা একটা দিন একটা রাত, দেখতে দেখতে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলো! খাবার যদি জোটে তো ভালো, না জুটলে কারুর কাছে অভিযোগ করার কিছু নেই···আমাদের জীবনটাই এইরকম! কিন্তু তোমার কাশিটা তো দেখছি খুব জ্বালাচ্ছে। সেই যে সকাল থেকে শুরু করেছো, এখনও তো থামবার কোন লক্ষণ দেখছি না।'

'হ্যাঁ, অসুখটা এখন বেশ বাড়াবাড়িই বলে মনে হচ্ছে।'

কোথায় যেন ঝপাং করে মাটির একটা চাপড়া ভেঙে পড়লো। ক্ষণিকের জন্যে অরণ্যের নৈঃশব্দ্য ভেঙে সৃষ্টি হলো নতুন একটা শব্দের। সম্ভবত ভয় পেয়ে দুটো পাখি তারস্বরে চেঁচিয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেলো। সেই শব্দ অনুসরণ করে প্রত্যাশা স্বগত স্বরে বললো, 'কাদাখোঁচা বলে মনে হচ্ছে!'

'বোধহয় চকাচকী।'

'চকাচকীদের ফিরে আসার সময় এখনও হয়নি। তাছাড়া ঝিলের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক, এই নেড়া বনে ওরা কি করতে আসবে? এ দুটো নিশ্চয়ই কাদাখোঁচা।'

'কি জানি, হয়তো হবে!'

প্রত্যাশা হঠাৎ কেন জানি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। নাচন-পা আবার তার বোনাবুনির কাজে মন দিলো। ঝুড়ির তলাটা ও আগেই বুনে ফেলেছিলো. এবার পাশ তুলছে। মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে ডালের মুখগুলো সরু করছে, তার-পর দাঁত দিয়ে চিরে নিচ্ছে। নিপুণ হাতের তালে তালে ওর গোঁফটা নাচছে।

প্রত্যাশা একবার ইয়ারের মুখের দিকে, এক একবার ঘোড়াটার দিকে তাকাচ্ছে। জমাট অন্ধকারে ঘোড়াটাকে মনে হচ্ছে কুঁদে-তোলা পাথরের একটা প্রতিমূর্তির মতো। আকাশে একটাও তারা নেই। আগুনের দিকে খানিকক্ষণ উদাস চোখে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ প্রত্যাশা অদ্ভুত স্বরে জিগেস করলো, 'আচ্ছা, ঘোড়াটাকে খুঁজতে খুঁজতে চাষীরা যদি এখানে চলে আসে?'

নাচন-পা আড় চোখে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো, 'তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো?'

'একটা ঘটনা মনে পড়ছে···' প্রত্যাশা অপরাধীর ভঙ্গিতে বললো।

'কি?'

'একবার মিখাইলা নামে একজন প্রতিবেশীর একটা ঘোড়া চুরি যায়, মাঠে চরছিলো···ব্যাস্, তারপর আর সেটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। উঃ, পথের ওপর আছাড়-পাছাড় খেয়ে মিখাইলার সে কি কান্না···'

'তারপর?'

'অনেকক্ষণ ধরে পথের ওপর ওই ভাবে পড়ে ছেলেমানুষের মতো হাউ হাউ করে কাঁদলো।'

'তাতে তোমার কি?'

'না, কিছু নয়। এমনি মনে পড়লো···' বন্ধুর তীক্ষ্ণ স্বরে প্রত্যাশা থতমত খেয়ে গেলো।

'চুলোয় যাগ্‌গে, মিখাইলের কথা ভাবলে তোমার তো আর পেট ভরবে না!'

'তা অবশ্য ভরবে না। তবে ওর মুখটা মনে পড়লে সত্যিই খুব মায়া হয়।'

'মায়া! আমরা না খেয়ে মরলে কেউ মায়া দেখাতে আসবে?'

'না, তা আসবে না।'

'তাহলে চুপ করে থাকো। তাছাড়া আমাদের একটু পরেই উঠতে হবে।'

'একটু পরেই?'

'হ্যাঁ'। নাচন-পা আবার তার কাজে মন দিলো।

প্রত্যাশা আগুনটা খুঁচিয়ে দিলো। 'আচ্ছা, ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলে ভালো হতো না?'

'তুমি বড্ড ভীতু।'

'সত্যি, বিশ্বাস করো…' প্রত্যাশা কোমল স্বরে দোস্তকে বোঝাবার চেষ্টা করে। 'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এতটা পথ ওটাকে টেনে নিয়ে গেলে ঠিক ধরা পড়ে যাবো…আর তাতাররা যদি ওকে না নেয়…'

'সেটা আমার ব্যাপার, তার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'বেশ, যা ভালো বোঝো। কিন্তু ওটাকে ছেড়ে দিলেই ভালো হতো।' নাচন-পাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রত্যাশা আরও নরম গলায় আরও আগ্রহ নিয়ে বন্ধুর দিকে ঝুঁকে এলো। 'বড্ড বুড়ো। তাছাড়া কি হবে মিছি-মিছি এতটা টেনে নিয়ে গিয়ে। ওটাকে বরং এখানেই ছেড়ে দাও, সকালে ঠিক ফিরে যাবে। আমরা যদি খাঁড়ির ধার ধরে হাঁটতে শুরু করি খুব শীগগীরই দুবেনকায় পৌঁছে যাবো, ওখানে দু-একটা ভালো দাঁও হয়তো মিলেও যেতে পারে। রাত্তিরে মেয়েরা ভাঁটিতে কাপড় সেদ্ধ করে…'

তার সম্পর্কে যে কথা হচ্ছে সেটা যেন বুঝতে পেরে ঘোড়াটা অস্থির হয়ে মাটিতে পা ঠুকলো। দাঁত দিয়ে উইলোর ডাল চিরতে চিরতে নাচন-পা ভীষণ চোখে ঘোড়াটার দিকে তাকালো, তারপর আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে মাটিতে থুতু ফেললো।

'তা ছাড়া ওখানে বড় বড় কয়েকটা মুরগী-পালনের খামারও আছে…'

'আর কতক্ষণে তোমার বকবকানি থামবে, আমাকে বলতে পারো?'

'দোহাই স্তেফান, আমার ওপর তুমি রাগ করো না। আমি শুধু ঘোড়াটার জন্যে…'

'মনে হচ্ছে তোমার পেটটা আজ ভরে রয়েছে?'

দোস্তের রুক্ষ কঠিন কণ্ঠস্বরে প্রত্যাশা লজ্জা পেলো। 'না না, তা কেমন করে হবে!'

'তাহলে তুমি এখানে পড়ে পড়ে পচো, আমি চললুম।'

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় প্রত্যাশা দেখলো জিনিসপত্তর কুড়িয়ে নেবার সময় বন্ধুর মুখটা রাগে থমথম করছে, দীঘল গোঁফের ছায়া কাঁপছে চিবুকের দুপাশে।

চোখের দৃষ্টি নামিয়ে প্রত্যাশা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'এই আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিলুম,' ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে নাচন-পা গর্জন করে উঠলো। 'তুমি যদি এভাবে গোঁ ধরে বসে থাকো, আমি আর তোমার সঙ্গে নেই। সে তুমি যাই ভাবো না কেন।'

'সত্যিই তুমি ভারি অদ্ভুত···'

'ব্যাস ব্যাস, আর একটাও কথা নয়।'

প্রত্যাশা ভীষণভাবে কাশতে কাশতে কোন রকমে বললো, 'আমি কেন ও-কথা বললুম ? বললুম, কেননা বিপজ্জনক বলে।'

'থাক, ঠিক আছে !' ছুরিটা পকেটে রেখে, নাচন-পা অসমাপ্ত ঝুড়িটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর পায়ে পায়ে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে চললো। প্রত্যাশাও চকিতে লাফিয়ে উঠে দ্রুত পায়ে বন্ধুকে অনুসরণ করলো।

হাত বাড়িয়ে মুখে অস্ফুট শব্দ করে নাচন-পা ঘোড়াটাকে ডাকলো, 'আঃ-আঃ-আঃ !'

'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে নাচন-পা বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। 'চলো।'

খাদের ধার ধরে অরণ্যের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে দুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো। ঘোড়াটা চলেছে ওদের পেছন পেছন। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। অন্ধকার এখন অনেকটা ফিকে হয়ে এলেও খাদের নিচে জমাট বেঁধে রয়েছে চাপ চাপ অন্ধকার। অরণ্যের বুক ছাপিয়ে উঠছে নৈঃশব্দ্য। এখানে ওখানে কালো কালো ছায়াগুলো কাঁপছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় বার্চের রূপোলী গুঁড়িগুলো মনে হচ্ছে ঘষা মোমের মতো।

হঠাৎ ওদের পেছনে কি যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ হলো, তারপর গড়াতে গড়াতে নেমে গেলো গভীর গিরিখাদে। জলের বুকে শব্দ হলো—ঝপাং।

নাচন-পা চমকে উঠলো, 'কি ব্যাপার ?'

'কি আবার, ঘোড়াটা পড়ে গেলো !' প্রত্যাশা বুক খালি করে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

নাচন-পা কিছু বললো না, কেবল দাঁতে দাঁত ঘষার ক্রুদ্ধ বিচিত্র একটা শব্দ শোনা গেলো।

একটু পরে অরণ্যের বুক ভাসিয়ে চাঁদ উঠলো।

দুই ইয়ার আবার নিঃশব্দে হেঁটে চললো। কখনও নরম মাটিতে পা গিঁথে

যাচ্ছে, কখনও পিছলে পড়ছে। প্রত্যাশা খুব কষ্ট করে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে, বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় একটা শব্দ হচ্ছে। যেন কাশির দমকে তার বুকের ভেতরে একটা ভারি পাথর নড়াচড়া করছে। নাচন-পা আগে আগে হাঁটছে, তার দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়েছে প্রত্যাশার মুখে। ঘাড় ফিরিয়ে ঝাঁঝালো গলায় ও বন্ধুকে বললো, 'কি ব্যাপার, তাড়াতাড়ি পা চালাও। একেই পাখির ঠোঁটের মতো ছোট রাত, তার ওপর মেয়েদের মতো এরকম গুটিগুটি পায়ে হাঁটলে আকাশ তো ফরসা হয়ে যাবে···গ্রামে গিয়ে আর পৌঁছবো কখন?'

'রাগ কোরো না ভাই, বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হচ্ছে···'

'কষ্ট হচ্ছে!' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো নাচন-পার কণ্ঠস্বর। 'কেন?'

'নিশ্বাস নিতে পারছি না।' প্রত্যাশা বিব্রত বোধ করলো।

'ওঃ, নিশ্বাস নিতে পারছো না। তা নিশ্বাস নিতে বারণ করেছেটা কে, শুনি?'

'না, বারণ কেউ করেনি। আমি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'ভুল! ওটা তোমার মূর্খোমি!' থমকে দাঁড়িয়ে নাচন-পা হিংস্র চোখে দোস্তের মুখের দিকে তাকালো। 'তোমার মূর্খোমির জন্যেই তুমি নিশ্বাস নিতে পারছো না, বুকের কষ্ট হচ্ছে, বুঝলে? তুমি যদি বাড়ির কথা না ভাবতে, তাহলে হয়তো···'

প্রত্যাশা মুখ নিচু করে অপরাধীর মতো ম্লান স্বরে বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো!'

সে আর কিছু বলতে চাইলেও বলতে পারলো না, কাশির দমকে সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে কাশলো, মাথাটা ঝুলে এলো বুকের কাছে। প্লাবিত জ্যোৎস্নায় নাচন-পা ঠায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। শেষে রূঢ় স্বরে বললো, 'নাঃ, তুমি দেখছি সব্বাইকে না জাগিয়ে ছাড়বে না!'

'এসো, একটু বসি। তাহলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।'

ঝোপের আড়ালে ভিজে মাটির উপর গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দুজনে বসলো। নাচন-পা হাতে পাকিয়ে সিগারেট ধরালো। তারপর প্রদীপ্ত সেই ছোট্ট আভাটুকুর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো, 'আমাদের ঘরে যদি খাবার কিছু থাকতো, আমরা ফিরে যেতে পারতুম। কিন্তু তা যখন নেই, কোথাও না কোথাও যেতে হবে।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রত্যাশা বন্ধুর কথায় সায় দিলো, 'সে তো বটেই !'

নাচন-পা আড় চোখে তাকালো। 'খিদেয় নাড়ি আমার চোঁচোঁ করছে।'

প্রত্যাশা উঠে দাঁড়ালো।

নাচন-পা অবাক হয়ে গেলো। 'কি ব্যাপার, উঠে পড়লে যে ?'

'চলো, যাওয়া যাক !'

'এত তাড়াতাড়ি সব সেরে গেলো ?'

'চলো যাই !'

'বেশ, চলো।' নাচন-পাও উঠে পড়লো। 'যদিও খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না···'

'যা হবার তা হবেই।'

'বাঃ, এই তো মনের সাহস ফিরে এসেছে দেখছি !'

'আচ্ছা, আজ সারাদিন তুমি আমার পেছনে কেন এমন লেগেছো বলো তো ? খালি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো, বকছো ঝোকছো···'

'যেহেতু তুমি বোকার মতো ব্যবহার করছো।'

'আজ আমার মনটা ভালো নেই।'

'কেন ? কিসের জন্যে ?'

'ঠিক জানি না। হয়তো সেই চাষীটার জন্যে, যার ঘোড়াটাকে আমরা···'

'ও, সেই চাষীটা !' নাচন-পা আবার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে টেনে টেনে কথাটা উচ্চারণ করলো। 'ঘোড়াটাকে দেখার পর থেকেই দেখছি ওই ভাবনাটা তোমার মাথায় ঘুরঘুর করছে। তবে তোমায় একটা কথা সাফ বলে রাখি— মনটা তোমার যা-ই হোক না কেন, মাথায় তোমার ষাঁড়ের গোবোর আছে ! বুঝেছো ? কেন, চাষীটার জন্যে তোমার এত মন খারাপ করার কি আছে শুনি ? যাও না, ওকে গিয়ে বলো, দয়াপরবশ হয়ে ঘোড়াটাকে আমরা তোমায় ফিরোত দিলাম, দেখবে কেমন তোমায় জামাই-আদরটা করে। মারের চোটে তোমার শিরা ছিঁড়ে পেটের-নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকিয়ে দিতে এক ঘণ্টাও সময় লাগবে না···আর তুমি বলছো কিনা দয়ার কথা ! দয়া ! এক থাপ্পড়ে তোমার দয়া ওরা ঘুচিয়ে দেবে !'

বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলো নাচন-পার কণ্ঠস্বর। যেন সে-স্বরের রুক্ষতায় চমকে উঠলো অরণ্যের গাছেরাও, পাতায় পাতায় জাগলো মৃদু মর্মর। আর এই রূঢ় ভর্ৎসনায় প্রত্যাশা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলো।

হাতদুটো পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে প্রকম্পিত পায়ে ধীরে ধীরে সে হাঁটছে, আনত মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে।

শেষ পর্যন্ত কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, 'শোন, আমার ওপর তুমি রাগ কোরো না। হয়তো আমি ঠিক হয়ে যাবো। আমরা এখন গ্রামে যাবো···না, আমি একাই যাবো, তোমার আসার দরকার নেই···হাতের সামনে যা পাবো তাই নিয়ে চলে আসবো। তারপর আমরা ঘরে ফিরে যাবো। ঘরে গিয়ে আমাকে একটু শুতে হবে···শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।'

অবরুদ্ধ ঘড়ঘড়ে বুকের মধ্যে থেকে উঠে-আসা অস্ফুট শব্দগুলো শেষের দিকে প্রায় শোনাই গেলো না। অপলক বিস্ময়ে দোস্তের মুখের দিকে তাকিয়ে নাচন-পা স্তম্ভিত হয়ে গেলো, সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষাই খুঁজে পেলো না।

অনেকক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চললো।

কাছেই কোথাও যেন মোরগের ডাক শোনা গেলো, দূরে একটা কুকুর ডেকে উঠলো। তার একটু পরেই সুদূর গ্রামের গির্জা থেকে অস্পষ্ট ভেসে এলো শেষ প্রহরের বিষণ্ণ ঘণ্টাধ্বনি। পরমুহূর্তেই অরণ্যের নিঝুম নির্জনতা আবার ভরে উঠলো তার কানায় কানায়। খাদের নিচে থেকে একটা পাখি প্রচণ্ড ভুতুড়ে শব্দে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেলো, কাক-জ্যোৎস্নায় প্রতিধ্বনিত হলো তার তীক্ষ্ণ চিৎকার—কোঁয়াক-কোঁয়াক-কোঁয়াক!

বুক খালি করে নাচন-পা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এটা বোধহয় বন-মোরগ!'

'শোনো, আমি আর হাঁটতে পারছি না।' প্রত্যাশা থপ করে মাটিতে বসে পড়লো। 'মাথা ঝিমঝিম করছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বরং এখানে অপেক্ষা করছি···তুমি যাও···'

'বাঃ, চমৎকার!' বিদ্রূপে আবিল হয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর। 'সত্যিই কি তুমি হাঁটতে পারছো না?'

'না।'

'ধন্যবাদ। যত্ত সব···'

'তুমি বিশ্বাস করো, ভীষণ দুর্বল লাগছে।'

'সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। সেই সকাল থেকে খালি পেটে হাঁটলে···'

'না, সে জন্যে নয়। বুকের পাঁজরাগুলো যেন ফেটে যাচ্ছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।'

'বাঃ, এই তো সোনায় সোহাগা !' মুখে বললেও রক্ত-জমে শুকিয়ে কালচে হয়ে-থাকা প্রত্যাশার মেলে-দেওয়া হাতের তালুদুটোর দিকে তাকিয়ে নাচন-পার মুখ শুকিয়ে গেলো। তাই অনেকটা নরম সুরে ও জিগেস করলো, 'তা এখন কি করবে ঠিক করেছো ?'

'তুমি যাও, আমি বরং এখানে একটু বসি। হয়তো খানিকটা বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে···' পাঁজর-ফাটিয়ে কাশতে কাশতে আর এক দলা রক্ত উঠে এলো।

'এ্যাঃ, এখনও তো রক্ত উঠছে দেখছি !'

'হ্যাঁ, সমানে উঠছে···' কাশির দমকে সে আর কিছু বলতে পারলো না।

'কিন্তু এখন আমি কাকে ডাকি !' নাচন-পা মনে মনে বিব্রত বোধ করলো।

'এই বনের মধ্যে আবার কাকে ডাকতে যাবে ?' ঠেলে বেরিয়ে-আসা চোখদুটো কোন রকমে দোস্তের মুখের দিকে মেলে দিয়ে প্রত্যাশা ম্লান স্বরে জিগেস করলো।

'কেউ যদি একটু সাহায্য করতো, তাহলে হয়তো দুজনে মিলে তোমাকে ধরে···'

'অসম্ভব ! আমি আর এক পাও নড়তে পারবো না !'

নাচন-পা তার সামনে উঁচু হয়ে বসে ইয়ারের ঝুলে-পড়া মাথাটা দুহাতে তুলে ধরলো। প্রত্যাশার চওড়া বুকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে, বুকের মধ্যে থেকে ঘড়ঘড় একটা শব্দ হচ্ছে, পাঁজরগুলো দুপাশ থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বন্ধ চোখের পাতাদুটো এখন কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে, ঠোঁটদুটো দাঁতের সঙ্গে শক্ত করে চাপা। বাঁ কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালচে রঙের গাঢ় একটা রক্তের ধারা।

'খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

ব্যাকুল হয়ে নাচন-পা জিগেস করলো। যেন প্রচ্ছন্ন সম্ভ্রমে, হৃদয়ের অতল আন্তরিকতায় গলার স্বর ওর বুজে এলো। আর কান্নার মতো ব্যথিত ম্লান সে-কণ্ঠস্বরে প্রত্যাশার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো সারা শরীর। 'হ্যাঁ ভাই !'

আর তখনই আর এক ঝলক রক্ত গড়িয়ে এলো তাঁর বাঁ ঠোঁটের কোল বেয়ে।

নিচে গভীর গিরিখাদ, শোনা যাচ্ছে জলের মৃদু মর্মর। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে-যাওয়া খাদের অন্য পাড়ে বুনোগোলাপ, লতাগুল্মের ঝোপ, কালো কালো ছায়াগুলো লুকিয়ে রয়েছে তার আনাচে-কানাচে। তারও ওপারে সারি সারি বার্চের অরণ্য-প্রাচীর। রেখাহীন রঙহীন বিবর্ণ জীবনে দুঃসহ স্বপ্নের মতো ম্লান প্লাবিত জ্যোৎস্নায় বার্চের নগ্ন শাখায় শাখায় পাখির নীড়-গুলো স্পষ্ট চোখে পড়েছে। পাতার শিরশিরানি আর জলের মৃদু মর্মরে সারাটা অরণ্য শোকগাথার মতো স্তব্ধ করুণ।

'আমি মরতে চলেছি, স্তেফান,' বাতাসের মতো ফিসফিস করে প্রত্যাশা বললো। 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো!'

'না না, ও কিছু নয়···' যেন ভয় পেয়ে নাচন-পা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। 'আমি বলছি···দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।'

গভীর দীর্ঘশ্বাসটাও প্রত্যাশা সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারলো না, কাশির দমকে চোখের মণিদুটো আবার ঠেলে বেরিয়ে এলো। এবার বুকের মধ্যে থেকে নতুন একটা শব্দ বেরিয়ে এলো, যেন ভিজে কম্বল দিয়ে তার পাঁজরায় কে আছাড় মারছে। নাচন-পার রুক্ষ চোয়ালদুটো আপনা থেকেই কঠিন হয়ে উঠলো, দীঘল গোঁফের প্রান্তদুটো ঝুলে পড়েছে দুপাশে। বিষণ্ণ উদাস চোখে ও বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো প্রত্যাশার মুখের রেখাগুলো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে প্রচণ্ড কষ্ট করে শ্বাস নেবার পর কোনরকমে বিজড়িত স্বরে বললো, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, স্তেফান! ঘোড়াটার জন্যে যদি তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকি···'

'না না, তুমিই বরং আমাকে ক্ষমা করো ভাই!' দ্রুত তাকে বাধা দিয়ে নাচন-পা দু-হাতে মুখ ঢাকলো। কান্নায় ভিজে এলো ওর কণ্ঠস্বর। 'আঃ, আমি এখন কোথায় যাবো! কি যে করবো!'

'দুঃখ করো না ভা-ই···' চকিতে স্তব্ধ হয়ে গেলো তার কণ্ঠস্বর। সামনের দিকে টানটান করে মেলে দেওয়া প্রসারিত পাদুটো দু-এক বার মৃদু কেঁপে স্থির হয়ে গেলো, মাথাটা হেলে পড়লো একপাশে।

নাচন-পা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা মুহূর্ত মনে হলো যেন অনন্ত কাল। পরমুহূর্তেই অসহায় ব্যর্থ হাহাকারে ও আর্তনাদ করে উঠলো। 'এই, কি হয়েছে তোমার? কথা বলছো না কেন?'

স্তেফান তার কাঁধদুটো ধরে পাগলের মতো নাড়া দিলো।

কিন্তু প্রত্যাশা কোন জবাব দিলো না। তখন সে নিস্পন্দ, নিথর।

স্তেফান কিছুক্ষণ তার দোস্তের পাশে চুপচাপ ঠায় বসে রইলো। এক সময়ে পাখিপাখালির গানে হঠাৎ তার চমক ভাঙলো। মাটি থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে মন্থর পায়ে খাদের পাড় ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো। আনত মুখ, চোখের পাতাদুটো নামানো, গোঁফের প্রান্তদুটো ঝুলে পড়েছে দুপাশে। মন্থর অথচ বলিষ্ঠ পায়ে ও এমনভাবে হাঁটছে যে পায়ের পাতাদুটো মাটিতে গিঁথে যাচ্ছে, যেন ও পৃথিবীকে আঘাত করতে চাইছে।

পুবের আকাশে তখন গোলাপী রঙের ছোপ ধরতে শুরু করেছে। নিচের গভীর গিরিখাদ থেকে একটানা ভেসে আসছে বিষণ্ণ মর্মর। কাছেই কোথাও বনমোরগের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেলো, পর মুহূর্তেই কে যেন হঠাৎ ককিয়ে উঠলো—কোঁয়াক-কোঁয়াক-কোঁয়াক! উচ্চকিত তীক্ষ্ণ চিৎকারে কেঁপে উঠলো অরণ্যের হিমেল বাতাস, পরক্ষণেই নিচের গিরিখাদটা আবার ভরে উঠলো অতল নির্জনতায়।

১৮৯৮

ছাব্বিশজন পুরুষ ও একটি মেয়ে

আমরা ছাব্বিশজন। মাটির তলায় অন্ধকার একটা প্রকোষ্ঠে ছাব্বিশজন পুরুষ আমরা যন্ত্রের মতো কাজ করি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা সেখানে ময়দার তাল ঠাসি, নোনতা আর খাসতা বিস্কুট বানাই। আমাদের এই নিচের তলার প্রকোষ্ঠের জানলাগুলো সবুজ শ্যাওলাধরা ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা কানাগলির ওপর। জানলাগুলো বাইরে থেকে লোহার জাফরি দিয়ে শক্ত করে সাঁটা। ময়দার গুঁড়োয় জমাট-বাঁধা কাঁচের শার্সি ভেদ করে সূর্যের আলো এসে পড়তে পারে না ভেতরে। আমাদের মনিব জানলাগুলো এমন ভাবে বন্ধ করে রেখেছেন যাতে কোন ভিখিরি কিংবা আমাদেরই বেকার বন্ধু যারা খেতে পায় না, তাদের না রুটি পাচার করি। ওঁর ভাষায় আমরা হচ্ছি যত সব হাড়-হাভাতের দল, তাই রাত্তিরে মাংসের বদলে জোটে জঘন্য নাড়িভুঁড়ি।

ঝুল আর মাকড়সার জালে ভরা নিচু ছাদওয়ালা পাথরের এই খুপরিটায় জীবন একেবারে বদ্ধ। ময়লা আর ছাতাপড়া দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরটায় জীবন যেমন কঠোর, তেমনি অসহ্য। আমরা ভোর পাঁচটায় উঠি, ভালো করে ঘুম না হওয়ায় দেহগুলো ভার হয়ে থাকে। ছটায় বিস্কুট বানাতে বসি। তাল-তাল ময়দা আগের দিন রাত্রে ঘুমতে যাবার আগে বন্ধুরা ঠেসে রাখতো। সকাল থেকে রাত দশটা অব্দি সারাদিন ধরে আমরা টেবিলে বসে কেউ ময়দার শক্ত তাল নরম করি, ক্লান্তি দূর করার জন্যে আড়মোড়া ভাঙি, কেউ ময়দায় জল মেশাই, লেচি কাটি। সারাদিন কড়ায় জল ফুটতো আর নোনতা বিস্কুটগুলো তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হতো। কারিগর লম্বা ছাঁকনি দিয়ে খুব দ্রুত হাতে সেই পিচ্ছিল খণ্ডগুলোকে তুলে আবার গরম উনুনে চালান করে দিতো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাদিন উনুনে কাঠ পুড়তো আর তার শিখার লালচে আভা কাঁপতো প্রতিটা দেওয়ালে, মনে হতো যেন আমাদের বিদ্রূপ করছে। বিরাট উনুনটাকে মনে হতো কোন অদ্ভুত দৈত্য যেন মেঝে থেকে তার কুৎসিত মাথাটা তুলে রয়েছে। প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় হাঁ-হয়ে-থাকা তার চোয়াল দুটো আরক্ত, আমাদের দিকে অগ্নিশ্বাস ফেলছে আর কপালের গহ্বর-দুটো যেন দৈত্যের নির্মম নিষ্ঠুর দুটো চোখ—বিরামবিহীন কর্মশ্রান্ত আমাদের দেহগুলোর দিকে কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন ক্রীতদাসদের দিকে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখদুটো ক্লান্ত হয়ে গেছে, যাদের কাছ থেকে মানবিকতা বলতে আর কিছু আশা করা যায় না, প্রজ্ঞার হিমশীতল অবজ্ঞার কাছে যারা নিতান্তই তুচ্ছ।

দিন নেই রাত নেই, ময়দার গুঁড়ো আর পায়ে পায়ে উঠোন থেকে নিয়ে-আসা ধুলো-ময়লার দুর্গন্ধ ভরা ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বসে আমরা ময়দা ঠাসি, লেচি বেলি, বিস্কুট বানাই। আর তাতে ঝরে পড়ে আমাদের গায়ের ঘাম। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে আমরা আমাদের হাতের কাজ দেখি, নিজেদের তৈরি বিস্কুট কখনও ভুলেও মুখে দিই না। এর চাইতে বরং বেশি পছন্দ করি কালো যবের রুটি।

লম্বা একটা টেবিলে এক এক সারিতে নজন করে মুখোমুখি বসে আমরা কাজ করি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের আঙুলগুলো যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়! কাজের সঙ্গে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমরা হাতের দিকে ফিরেও তাকাই না। এমন কি পরস্পরের মুখের দিকে না তাকিয়েও আমরা সঙ্গীর মুখের প্রতিটা অভিব্যক্তি স্পষ্ট চিনতে পারতাম। আমাদের বেশি কিছু বলবার থাকতো না, ফলে অধিকাংশ সময়েই চুপ করে থাকতাম আর সেটা অভ্যেসও হয়ে গিয়েছিলো। মাঝে মধ্যে পরস্পরে ঠাট্টা-তামাসা করতাম, তাও খুব কম। আর সত্যই তো, কাদের সঙ্গেই বা ঠাট্টা-তামাশা করবো? এরা তো সবাই আধমরা পাথরের প্রতিমূর্তির মতো, প্রচণ্ড পরিশ্রমের ভারে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে! যাদের যাকিছু বলার ছিলো সব বলা গেছে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যাদের এখনও কিছু বলার আছে তাদের কাছে নিস্তব্ধতা যেমন ভয়াবহ তেমনিই যন্ত্রণাদায়ক। কখনও কখনও আমরা গান গাইতাম। শুরুটা হতো এইরকম ভাবে—কাজের মধ্যেই হয়তো কেউ ক্লান্ত ঘোড়ার মতো হঠাৎ গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, আর তার হৃদয়ের গুরুভার হালকা করে দেবার জন্যে বুকের অতল থেকে উঠে এলো বিষণ্ণ করুণ একটা গানের সুর। এমনিভাবে কেউ যখন শুরু করে, আমরা সবাই তখন চুপচাপ কান-পেতে শুনি। শরতের হিমেল রাতে স্তেপের বুকে ছাউনি-ফেলা কোন তাঁবুর সামনে নিভে-আসা অগ্নিশিখার মতো ওর সে-সুর যখন ঝিমিয়ে আসতো, তখন অন্য আর একজন খেই ধরতো। তারপর আরও দু-এক কণ্ঠ মিশে বিষণ্ণ সেই সুর সারা ঘরময় নম্র মন্থর গতিতে ঘুরে বেড়াতো। হঠাৎ এক সময়ে বহু কণ্ঠে উত্তাল তরঙ্গমালার মতো সে-গান হয়ে উঠতো

সোচ্চার, উদ্দাম—যেন আমাদের বন্দীকারার স্যাঁতস্যাঁতে ভারি দেওয়াল-গুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইতো।

উনুনের চারপাশ ঘিরে গনগনে আগুনের শিখাগুলো নাচছে, কারিগররা বেলচায় বিস্কুট সেঁকছে। কড়ায় টগবগ করে জল ফুটছে, দেওয়ালে নিঃশব্দে কাঁপছে আগুনের রক্তাভ শিখা, আর আমরা গান গাইছি। সে যেন আমাদের নিজেদের কথা নয়, সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত আমাদের দুঃসহ জীবনের যন্ত্রণা, যেন ক্রীতদাসের বুক-ফাটা হাহাকার। এমনিভাবে আমরা ছাব্বিশজন বাস করতাম নিচের পাথরের বড় একটা কুঠরিতে। আমাদের জীবনের বোঝা এমনই দুর্বিষহ ছিলো যে মনে হতো এই তিনতলা বাড়িটা বুঝি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদেরই কাঁধের ওপরে ভর রেখে।

গান ছাড়া আমরা আর একটা জিনিস ভালোবাসতাম, আর আমাদের কাছে তা ছিলো সূর্যের উপস্থিতিরই মতো আশ্চর্য উজ্জ্বল। বাড়িটার তিন-তলায় ছিলো সোনালী জরি দিয়ে নকশা-তোলার কারখানা। ওখানে যেসব মেয়েরা কাজ করতো, তাদের মধ্যে ছিলো বাড়ির পরিচারিকা, ষোল বছরের তন্বী, তানিয়া। প্রতিদিন ভোরে বারান্দার সামনে কাচের দরজার ছোট ফুটো দিয়ে দেখা যেতো ওর হালকা গোলাপী রঙের মুখ আর উচ্ছল নীল দুটো চোখ। মিষ্টি সুরে ঝঙ্কৃত হতো ওর কণ্ঠস্বর, 'এই যে জেলখানার বন্দী পাখিরা, আমাকে কয়েকটা নোনতা বিস্কুট দাও তো!'

চকিতে আমরা সবাই একসঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে মিষ্টি কণ্ঠস্বর আর নিষ্পাপ, সুন্দর সেই মেয়েটির মুখের দিকে ফিরে তাকাতাম। কাচের গায়ে থ্যাবড়ানো নাক, টুকটুকে দু ঠোঁটের ফাঁকে জুঁইফুলের মতো সাদা সাদা দাঁতের উজ্জ্বল হাসি দেখতে আমাদের ভীষণ ভালো লাগতো। একে অপরকে ঠেলে আমরা দরজা খোলার জন্যে ছুটে যেতাম। আর সুন্দর করে বাঁধা চুল, উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখে ফ্রকের প্রান্তটা বাড়িয়ে ধরে মেয়েটা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। বাদামী রঙের ঘন চুলের দীঘল বেণীটা কাঁধের পাশ দিয়ে এসে পড়েছে বুকের ওপরে। বিশ্রী রুক্ষ নোংরা মানুষগুলো আমরা মেয়েটার দিকে তাকাতাম, আর ও দাঁড়িয়ে থাকতো মেঝে থেকে চার-ধাপ উঁচু দরজার চৌকাঠের সামনে। মুখ তুলে আমরা ওকে সুপ্রভাত জানাতাম, যেন অভি-বাদনের সেই বিশেষ শব্দগুলো শুধু ওর জন্যেই রচিত। ওর সঙ্গে যখন কথা

বলতাম, আমাদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতো কোমল আর ঠাট্টাগুলো প্রতিধ্বনিত হতো হালকা সুরে। ওর জন্যে আমাদের সবকিছুই ছিলো আলাদা। প্রধান কারিগর উনুন থেকে সবচেয়ে তাজা বাদামী রঙের বিস্কুটগুলো বার করে ওর ফ্রকের ওপর ঢেলে দিতো।

'দেখো, কর্তা যেন টের না পান!' আমরা ওকে সতর্ক করে দিতাম।

হাসতে হাসতে ছোট্ট খরগোশের মতো মিলিয়ে যাবার আগে ও বলতো, 'বিদায়, জেলখানার বন্দী পাখিরা, বিদায়!'

ব্যাস্, ওই পর্যন্তই। ও চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা তানিয়ার সম্পর্কে বলাবলি করতাম। গতকাল কিংবা তারও আগে আমরা যে কথা বলেছিলাম সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতাম, কেননা আমাদের চারপাশে কিছুই বদলায়নি, অচলায়তনের মতো সবকিছু একই রয়ে গেছে। এই অপরিবর্তনীয় অবস্থার মধ্যে জীবন কাটানো সত্যিই যন্ত্রণাদায়ক। আর এতেও যদি মন দমে না যায়, তাহলে যতদিন সে বেঁচে থাকবে তার চারপাশের পারিপার্শ্বিকতা হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। মেয়েদের নিয়ে আমরা এমনভাবে আলোচনা করতাম যাতে অনেক সময় আমরা নিজেরাই লজ্জিত হতাম। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা আমরা যেসব মেয়েদের জানতাম তাতে অন্যভাবে তাদের নিয়ে আলোচনা করা যায় না। কিন্তু তানিয়ার সম্পর্কে আমরা কোনদিন একটিও খারাপ কথা বলিনি। তাকে কখনও আমরা কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করিনি বা নির্লজ্জ ঠাট্টা করিনি। তার কারণ হয়তো ও কোনদিন বেশিক্ষণ থাকেনি, স্খলিত নক্ষত্রের মতো চকিতে আমাদের সামনে ঝিলিক দিয়ে আবার মিলিয়ে যেতো। কিংবা হয়তো ও ছেলেমানুষ আর আশ্চর্য রূপসী ছিলো বলেই আমাদের শ্রদ্ধা কুড়োতো। কঠোর শ্রম আমাদের মূক বলদে পরিণত করলেও, অন্য আর পাঁচজন মানুষের মতো আমরাও সাধনার কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতাম। ওর চাইতে রূপসী আমাদের আশেপাশে আর কেউ ছিলো না, ও ছাড়া আমাদের আর কেউ খোঁজখবরও নিতো না। তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা, ওকে আমাদের একজন মনে করতাম। ওকে বিস্কুট দেওয়া মানে প্রতিমার পায়ে কোনকিছু উৎসর্গ করারই সামিল মনে করতাম, আর দিনের পর দিন আমাদের কাছে তা হয়ে উঠতো আরও রমণীয়। বিস্কুট দেওয়া ছাড়াও আমরা তানিয়াকে নানান পরামর্শ দিতাম— গরম জামাকাপড় পরতে, সিঁড়িতে দ্রুত ওঠা-নামা না করতে, জ্বালানি কাঠের

অত ভারি বোঝা না বইতে। চুপটি করে ও আমাদের পরামর্শ শুনতো, হেসে শোধ দিতো, আর কোনদিনই তা মানতো না। এতে আমরা কিন্তু মর্মাহত হতাম না, ওর প্রতি উদ্বিগ্নতা দেখাতে পেরে বরং নিজেরাই সান্ত্বনা পেতাম।

মাঝে মধ্যে ওর এটা ওটা কাজ আমাদের করে দিতে হতো, আর আমরা তা হাসিমুখে করতাম। কিন্তু আমাদের কেউ যদি বলতো ছেঁড়া শার্টটা সেলাই করে দিতে, অমনি নাক সিঁটকে ও বলতো, 'উঁহু, ওটি হবে না! ওরা তাহলে জানতে পারবে!'

সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে আমরা ওকে আর কিছু করে দিতে বলিনি। ওকে শুধু ভালোবাসতাম, এক কথায় বলতে গেলে সেইটাই সব। কেউ যখন তার ভালোবাসাকে গোপন করে, অনেক সময় তা হয়ে ওঠে যন্ত্রণাদায়ক, কখনও কলুষিত, কখনও বা তার সঙ্গীদের জীবন পর্যন্ত বিষাক্ত করে তুলতে পারে। কেননা তখন সে তার প্রেমকে শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু এখানে তানিয়া ছাড়া আর কেউ নেই যাকে আমরা ভালোবাসতে পারি।

মাঝেমাঝে আমাদের কেউ হঠাৎ তর্ক জুড়ে দিতো, 'আচ্ছা, ওই মেয়েটার মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে ওকে নিয়ে আমরা এত মাথা ঘামাই?'

এ কথা যে বলতো আমরা সরাসরি তাকে থামিয়ে দিতাম। আমরা কাউকে ভালোবাসতে চাই, তাকে খুঁজে পেয়েছি এবং ছাব্বিশজন একত্রে তাকে ভালোবেসেছি, আমাদের কাছে এ এক পবিত্রতম জিনিস। যে এর বিরুদ্ধে কিছু বলবে সে আমাদের শত্রু। আমরা যাকে ভালোবাসি হয়তো সে সত্যিই ভালো নয়, তবু আমরা ছাব্বিশজন যাকে একত্রে ভালোবাসি, আমরা চাই অপরেও তাকে শ্রদ্ধা করুক। অবশ্য তা বলে আমাদের প্রেম আমাদের ঘৃণার চাইতে কম দুর্বিষহ ছিলো না।

বিস্কুট তৈরির কারখানার ঠিক পাশে আমাদের মনিবের আর একটা কেক তৈরির কারখানা আছে। কারখানাটা একই বাড়িতে, কেবল একটা প্রাচীর দিয়ে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আড়াল করা। ওদের কারিগরের সংখ্যা মাত্র চারজন। আমাদের থেকে বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে বলে ওরা নিজেদের উঁচু-দরের লোক ভাবতো। কখনও আমাদের কারখানার ধারে কাছেও ঘেঁষতো না, কিংবা হঠাৎ করে উঠোনে দেখা হয়ে গেলে আমাদের ব্যঙ্গ করতো। আমরাও ওদের ওখানে কখনও যেতাম না। পাছে কেক চুরি

করি, সেই ভয়ে কর্তা আমাদের মানা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া কেক-কারিগরদের আমরা একটুও পছন্দ করতাম না, পারতপক্ষে বরং ওদের হিংসেই করতাম। কেননা ওদের কাজ ছিলো সহজ, মাইনে পেতো বেশি, ভালো খেতো, খোলামেলা ঘরে থাকতো, আর এত বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবান যে আমরা ওদের ঘেন্নাই করতাম। এদিকে আমরা সবাই হাড়-জিরজিরে ফ্যাকাশে। তিনজনে সিফিলিস রোগে ভুগছে, অনেকেরই গায়ে দাদ খোস-পাঁচড়া, একজন তো বাতে প্রায় পঙ্গু। বন্ধ আর ছুটিছাটার দিনে ওরা কোট-প্যান্ট, উঁচু বুট পরে পার্কে হাওয়া খেতে বেরোয়। ওদের মধ্যে দুজন আবার ভালো অ্যাকর্ডিয়ান বাজায়। আর আমরা নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে বেড়াতে বেরুলে পুলিস পার্কে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। এর পরেও কি আমরা ওদের ভালোবাসতে পারি ?

একদিন শুনলাম ওদের প্রধান কারিগর মদ খেয়ে মাতলামো করায় কর্তা ওকে তাড়িয়ে দিয়ে ওর জায়গায় নতুন একজন লোক নিয়েছেন। লোকটা প্রাক্তন সৈনিক, রেশমী ছোট-কোটের ওপর সোনার শেকল-দেওয়া ঘড়ি পরে। ফুলবাবুটিকে দেখার জন্যে আমরা সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম, উঠোন দিয়ে উঁকিঝুঁকিও মারতাম। কিন্তু সেদিন ও নিজেই আমাদের কারখানায় এলো। লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে জিগেস করলো, 'কি ভাইসব, কেমন আছো ?'

ভেতরের কুয়াশাভরা আর্দ্র বাতাস ধেয়ে গেলো দরজার দিকে, ঘুরতে লাগলো ওর পায়ের চারপাশে। আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। সুন্দর পাকানো গোঁফের নিচে ঝিকমিক করছে হলদে দাঁত। নীল রেশমী কোটটা সত্যিই সুন্দর, সোনালী জরি দিয়ে ফুল-তোলা, লাল পাথর-বসানো বোতাম। সোনার শিকলটাও দেখা যাচ্ছে।

চমৎকার দেখতে। সৈনিকেরই মতো ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা, টকটকে-লাল গাল, উজ্জ্বল আয়ত দুটো চোখ। তাকানোর ভঙ্গিটাও ভারি সুন্দর আর ঝকঝকে। মাথায় পশম-জমানো শক্ত টুপি, পায়ে মোম-পালিশ-করা ঝকঝকে ছুঁচলো জুতো।

আমাদের প্রধান কারিগর বিনীতভাবে ওকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বললো। ধীরে সুস্থে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কর্তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। আমরা বললাম, 'উনি বদমাস, শঠ, কৃপণ আর স্বেচ্ছাচারী।' আর

কর্তার সম্পর্কে ও যে সব কথা বললো তা এখানে লেখারও অযোগ্য। গোঁফে তা দিতে দিতে হঠাৎ এক সময়ে সৈনিকটি বললো, 'তোমাদের এখানে চারদিকে তো অনেক মেয়ে দেখছি!'

আমাদের কেউ মুচকি মুচকি হাসলো, কেউ সরস মন্তব্য করলো, কে যেন বললো, 'হ্যাঁ, এখানে গোটা কয়েক বেশ ভালো দেখতে মেয়ে আছে।'

চোখ মোটকে সৈনিকটি জিগেস করলো, 'তোমরা ওদের ব্যবহার করছো নাকি?'

আমাদের মধ্যে চাপা হাসির রোল পড়ে গেলো। অনেকে সৈনিকটিকে জানাবার চেষ্টা করলো তারা ওর মতোই ফুর্তিবাজ, কিন্তু তারা তা পারলো না। কে যেন স্বীকার করলো, 'ওরা আমাদের জন্যে নয়।'

'হুঁ, তা অবশ্য ঠিক।' সৈনিকটি আমাদের আগাপাশতলা জরিপ করে নিয়ে বললো, 'তোমরা ওদের থেকে অনেক দূরে। মানে, তোমরা ঠিক ওদের যোগ্য নও। চরিত্র বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ পৌরুষতা তোমাদের নেই। মেয়েরা আবার পৌরুষটাই পছন্দ করে বেশি। নিয়মিত দেহ দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গ্যাছে। অবশ্য দেহ বলতে এই রকম পেশীবহুল বাহু,' সৈনিক পকেট থেকে ডান হাতটা বার করে জামার আস্তিন গুটিয়ে আমাদের দেখালো। উজ্জ্বল সোনালী লোমে ঢাকা ওর ধবধবে সাদা বাহুটা নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ। 'হাত পা বুক, সবকিছু সুগঠিত হওয়া উচিত। আর পুরুষদের ঠিকমতো সাজতে হবে, যাকে বলে একদম ফিটফাট···যেমন আমি। আমাকে দেখলেই মেয়েরা প্রেমে পড়ে। তা বলে ভেবো না আমি ওদের প্রলুব্ধ করি, ওরা আপনা থেকেই এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।'

ময়দার একটা বস্তার ওপর বসে ও অনেকক্ষণ ধরে আমাদের বলে চললো কেমন করে মেয়েরা তার প্রেমে পড়ে, আর ও তাদের সঙ্গে কি রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। তারপর এক সময়ে ও চলে গেলো। ওর পেছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবার পরেও বহুক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে ওর আর ওর গল্পের কথা ভাবতে লাগলাম। তারপরে হঠাৎ করেই আমরা সবাই যেন একসঙ্গে কথা বলে উঠলাম, আর তখন দেখা গেলো আমরা সবাই কারিগরটাকে পছন্দ করে ফেলেছি। যেমন সরল তেমনি সুন্দর, কিরকম ভাবে এখানে এসে বসলো, কেমন সুন্দর গল্প করলো! আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের সঙ্গে এমনভাবে দেখা করতে আসেনি, এমন বন্ধুর মতো গল্প করেনি। উঠোনে দেখা হলে যেসব মেয়েরা

ঘৃণায় মুখভঙ্গি করে আমাদের এড়িয়ে চলে যেতো, সেইসব দরজি-মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে সৈনিকটির উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। শীতকালে সুন্দর ছোট টুপি, লোমের কোট পরে আর গ্রীষ্মকালে ফুলতোলা টুপি, উজ্জ্বল রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে মেয়েদের আমরা কেবল উঠোনটুকুই পেরিয়ে যেতে দেখছি। অথচ ওদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে যা আলোচনা করতাম, শুনতে পেলে ওরা হয়তো লজ্জায় অপমানে পাগলই হয়ে যেতো।

প্রধান কারিগর হঠাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ব্যাটা আবার তানিয়ার দিকে না হাত বাড়ায়!'

এই আশঙ্কার কথায় আমরা সবাই বোবা বনে গেলাম। তানিয়ার কথা আমরা একরকম ভুলে গিয়েছিলাম, সৈনিকের বিশাল সুন্দর মূর্তিটা যেন ওকে আড়াল করে দিয়েছিলো। তারপরে হঠাৎ করেই তর্ক বেধে উঠলো—কেউ বললো তানিয়া ওকে পাত্তাই দেবে না, কেউ বললো সৈনিকের আকর্ষণ তানিয়া এড়াতে পারবে না, কয়েকজন বললো ও যদি তানিয়ার সঙ্গে লটঘট করতে আসে তো মেরে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই সৈনিক আর তানিয়ার ওপর লক্ষ্য রাখা এবং তানিয়াকে সাবধান করে দেওয়া সাব্যস্ত করলাম। এমনিভাবে আমাদের তর্কের অবসান ঘটলো।

মাসখানেক কেটে গেলো। সৈনিক কেক স্যাঁকে, দরজি-মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করতে বেরোয়, মাঝেমধ্যে আমাদের এখানে দেখা করতে আসে। কিন্তু তার বিজয়ের কাহিনী আমাদের আর কোনদিন কিছু বলেনি, কেবল গোঁফে তা দিয়েছে আর চোয়াল চিবিয়েছে। তানিয়া রোজ বিস্কুট নিতে আসে। আগের মতো উচ্ছল, নম্র আর ভারি মিষ্টি। সৈনিকের ব্যাপারটা ওর কাছে আমরা যতবারই উত্থাপন করার চেষ্টা করতাম—ও, সেই 'চোখ-বড় ডামি' বলে ততবারই চলে যেতো। এমনি আরও অনেক মজার মজার নাম ও দিয়েছিলো। এতে আমরা মনে মনে তৃপ্তি পেতাম। অন্য দরজি-মেয়েরা যেভাবে সৈনিকের সঙ্গে লেপ্টে থাকতো, তাতে ছোট্ট মেয়েটার জন্যে আমরা গর্ব বোধ করতাম। সৈনিকের প্রতি তানিয়ার এই ব্যবহারে আমরা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠতাম, আর তারই প্রভাবে লোকটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করলাম। তানিয়াকে আমরা আগের চাইতে বেশি ভালোবাসতে লাগলাম। ফলে ভোরে এলে ওকে আরও কোমল স্বরে অভ্যর্থনা জানাতাম।

সেদিন সৈনিকটি অন্য দিনের চাইতে আরও বেশি মাতাল হয়ে আমাদের এখানে এলো। বসে পড়েই ও হাসতে লাগলো। আমরা যখন জিগেস করলাম কি ব্যাপার, ও বললো, 'আমাকে নিয়ে লিদা আর গ্রুশার মধ্যে আজ একটা লড়াই হয়ে গেলো··· সত্যি, সে এক দেখবার মতো দৃশ্য! রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ! হাঃ হাঃ! একজন অন্যজনকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বারান্দা পর্যন্ত নিয়ে গেলো, তারপর মেঝেয় ফেলে ওর বুকের ওপর চেপে বসলো··· ও হোঃ হোঃ! দুজন দুজনের গা খামচে দিলো, জামাকাপড় ছিঁড়ে দিলো···উঃ, সে যা মজার! এই মেয়েমানুষগুলো সরাসরি লড়াই না করে কেন যে খামচা-খামচি করে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

না থেমে আমাদের দিকে তাকিয়ে ও সমানে হাসতে লাগলো। 'মেয়েদের ব্যাপারে আমার ভাগ্য এত প্রসন্ন কেন বল তো? একবার চোখ টিপলেই দেখি সব কুপোকাত!'

হাঁটুতে চাপড় মেরে খুশির চোখে ও আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলো, যেন মেয়েদের ব্যাপারে নিজের সৌভাগ্যে ও নিজেই বিস্মিত। লালচে সারা মুখের ফুটে উঠলো উজ্জ্বল একটা প্রশান্তি, জিব দিয়ে ঘনঘন ঠোঁট চাটলো।

আমাদের প্রধান কারিগর রাগেরাগে বেলচাটা উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হঠাৎ বিদ্রূপ করে বললো, 'ছোট ছোট ফারের চারাকে কুপোকাত করে আর কি লাভ, যদি বড় দেবদারুটাকে ফেলতে পারতে তাহলে না হয় বুঝতুম!'

সৈনিক আবাক হলো। তার মানে? 'তুমি কি আমার কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই বলছি।'

'কি বললে?'

'কিছু না।'

'উঁহু, এসবের অর্থ কি? দেবদারু বলতে তুমি কাকে বোঝাতে চাইছো?'

আমাদের প্রধান কারিগর কোন জবাব দিলো না। উনুনের মধ্যে দ্রুত সেঁকনিটা চালিয়ে সেঁকা বিস্কুটগুলো উলটেপালটে আবার বাইরে বার করে আনলো। যেন সৈনিকটির কথা ও ভুলেই গেছে। সৈনিক কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। পায়ে পায়ে ও উনুনের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং গরম বেলচাটা যেন আচমকা ওর বুকে এসে না লাগে সে-ব্যাপারে সর্তক হলো।

'এই যে, শোন। আমার প্রতি তুমি যে ইঙ্গিত করলে, সেটা রীতিমত

অপমানকর। কেননা এমন কোন মেয়ে নেই যে আমার লোভ সামলাতে পারে।'

মনে মনে ও সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলো। কেননা মেয়েদের ভোগ-করার -ক্ষমতাই ছিলো আত্ম-অহমিকার মূল উৎস। সম্ভবত এই একমাত্র গর্ববোধেই ও নিজেকে মানুষ ভাবতো।

কিছু লোক আছে যাদের কাছে জীবন দৈহিক বা মানসিক অসুস্থতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর জন্যে সারা জীবন ওরা বাঁচে, যন্ত্রণা ভোগ করলেও তৃপ্তি পায়, জনগণের কাছে অভিযোগ করে, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করে নেয়। এইটেই ওদের জীবনের একমাত্র সম্বল। এই অসুস্থতা থেকে বঞ্চিত হলে ওরা আঘাত পায়, যেন জীবনের মূল লক্ষ্য হারিয়ে শূন্যগর্ভ হয়ে পড়ে। সময় সময় মানুষের জীবন এমন নিঃস্ব হয়ে পড়ে যে সে পাপ করতে বাধ্য হয়। অনেকে সচ্ছন্দে একে বলতে পারে মানুষ একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই এসব পাপ করে।

সৈনিক সচকিত হয়ে উঠলো। কারিগরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ও ঘ্যানঘ্যানি জুড়ে দিলে, 'না, তোমাকে বলতেই হবে। মেয়েটা কে।'

'বলতেই হবে?'

'বলোই না।'

'তানিয়াকে চেনো?'

'হুঁ।'

'তাহলে আর কি! দেখি তুমি ওর কি করতে পারো।'

'আমি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি।'

'ওকে? খুব সহজেই!'

'বেশ তো, দেখি না।'

'তুমি দেখবে! হাঃ হাঃ!'

'মানে, ও নিশ্চয়ই ···'

'এক মাসও লাগবে না।'

'অত সস্তা নয়, বুঝলেন মশাই?'

'তাহলে পনেরো দিন! আমি তোমাদের দেখিয়ে ছাড়বো। কি যেন নাম বললে? তানিয়া? আরে ছো!'

'যাও, এখন সোজা তোমার পথ ছ্যাখো তো !'

'পনেরো দিনের মধ্যে দেখবে তোমার দেবদারু কুপোকাত হয়ে গ্যাছে, বুঝলে ?'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে !'

কারিগর হঠাৎ রেগে গিয়ে বেলচা নিয়ে তেড়ে এলো। সৈনিক স্তব্ধ বিস্ময়ে আমাদের দিকে করুণ চোখে তাকালো। 'ঠিক আছে।'

ও বেরিয়ে গেলো।

এতক্ষণ আমরা সবাই অবাক হয়ে চুপচাপ শুনছিলাম। কিন্তু সৈনিক বেরিয়ে যেতেই আমরা উচ্চকিত হয়ে উঠলাম। কে যেন চেঁচিয়ে বললো, 'কাজটা তুমি কিন্তু ভাল করলে না পাভেল।'

কারিগর ধমকে উঠলো, 'থাম থাম, নিজের চরকায় তেল দে !'

আমরা বুঝতে পারলাম সৈনিকের আঁতে লেগেছে, সেই সঙ্গে তানিয়াও বিপন্ন। তবু মনে মনে চাপা উত্তেজনা বোধ করলাম। তানিয়া সৈনিকটির লোভ সামলাতে পারবে কিনা জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। যদিও মুখে ঐক্যমত প্রকাশ করলাম, 'দেখো তানিয়া ঠিক জিতে যাবে! এত সহজে হারবার মেয়ে ও নয়।'

আমাদের আদর্শকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। আমরা পরস্পরকে আপ্রাণ জানাবার চেষ্টা করলাম যে আমাদের আদর্শ একনিষ্ঠ এবং এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবোই। এমন কি আমরা এমনও সন্দেহ প্রকাশ করলাম যে সৈনিকটিকে বোধ হয় যথোপযুক্ত উত্তেজিত করতে পারিনি, বা ও যেন বাজির কথা না ভুলে যায়। এখন থেকে আমাদের জীবনে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। আমরা দিনের পর দিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। মনে হলো আমরা যেন আরও চালাক হয়ে উঠেছি, বেশ চাঁচা-ছোলা কথা বলছি। মনে হলো তানিয়াকে নিয়ে আমরা যেন শয়তানের সঙ্গে খেলা করছি। আর আমরা যখন কেক-কারিগরদের কাছে শুনলাম সৈনিকপ্রবরটি তানিয়ার জন্যে প্রাণপাত করতে শুরু করেছে, তখন আমাদের উত্তেজনা এমন চরমে উঠে গেলো যে আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে মনিব আরও দৈনিক চোদ্দো পুড ময়দার তাল কখন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন, আমরা টেরও পাইনি। এমনি কি কাজে কখনও ক্লান্তিও

বোধ করিনি। সারাক্ষণ তানিয়ার নাম ফিরছে আমাদের মুখে মুখে। প্রতিদিন ভোরে আশ্চর্য অস্থিরতা নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছি, ভাবছি ও যখন আসবে তখন এক ভিন্ন তানিয়াকে দেখবো, আগে যাকে চিনতাম এ তানিয়া সে নয়।

বাজির কথা ওকে আমরা কিছুই বলিনি বা কোন প্রশ্ন করিনি। একই সুমনোভাব নিয়ে ওকে গ্রহণ করতাম। তবু আমাদের আচরণে এমন একটা কিছু ছিলো, যা তানিয়ার প্রতি পূর্ব-মনোভাবের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তা হলো তীব্র কৌতূহল, ইস্পাতের ফলার মতো তীক্ষ্ণ হিমেল কৌতূহল।

একদিন ভোরে কাজ করতে করতে কারিগর বললো, 'আজই শেষ দিন!'

স্মরণ করিয়ে দেবার কোন দরকার ছিলো না, কেননা আমরা সবাই তা ভালো করেই জানতাম। তা সত্ত্বেও আমরা চমকে উঠলাম।

কারিগর বললো, 'ওকে ভালো করে লক্ষ্য কোরো, একখুনি আসবে।'

কে যেন অনুতপ্ত স্বরে বললো, 'চোখে দেখাও কঠিন!'

আবার তর্কের ঝড়ে সবকিছু মুখর হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত আজই জানতে পারবো যে-পাত্রে আমরা গচ্ছিত রেখেছিলাম আমাদের যাকিছু সম্পদ, তা কতটা পবিত্র আর অমলিন। আজ ভোরেই প্রথম উপলব্ধি করলাম কি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে আমরা এ জুয়ায় বাজি ধরেছি, যার ফলে আমাদের আদর্শ আমাদের সবাইকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে একটা মেয়ের নিষ্পাপ জীবন। এতদিন ধরে শুনেছি সৈনিকটি বেশ মনোযোগের সঙ্গে তানিয়ার পিছু নিয়েছে. কিন্তু এসম্পর্কে তানিয়ার কি মনোভাব তা কখনও ওকে জিগেস করতে পারিনি। প্রতিদিন বিস্কুট নিতে আসার সময় তাকে বেশ স্বাভাবিকই মনে হতো।

আজ একটু পরেই ওর গলা শুনতে পেলাম, 'এই যে জেলখানার বন্দী পাখিরা, আমি এসেছি…'

আমরা তাড়াতাড়ি ওকে ঘরে ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর যা কখনও করিনি, রীতিবিরুদ্ধভাবে এক টুকরো নিটোল নীরবতা দিয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানালাম। কঠিন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মুখের ভাষা আমরা হারিয়ে ফেললাম, কি জিগেস করবো কিছুই ভেবে পেলাম না। আর আমাদের অপ্রত্যাশিত এই অভ্যর্থনায় তানিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো, বিবর্ণ হয়ে গেলো ওর সারা মুখ। ও বিব্রত বোধ করলো। ধরা-ধরা গলায় জিগেস করলো, 'কেন তোমরা সবাই এমন… আশ্চর্য!'

তানিয়ার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে প্রধান কারিগর পাভেল রুক্ষ গলায় জিগেস করলো, 'তোমার ব্যাপারটা কি আগে তাই শুনি ?'

'আমার আবার কি ব্যাপার ?'

'কিছু না।'

'ঠিক আছে। আমাকে বিস্কুট দিয়ে দাও···তাড়াতাড়ি।'

'এত তাড়াতাড়ির কি আছে ?' কারিগরের চোখ তখনও নিবদ্ধ ওর মুখের ওপর।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ও দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলো।

কারিগর বেলচাটা তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে উনুনের দিকে এগিয়ে এলো। 'হুঁ, বুঝতে পেরেছি···ওর হয়ে গ্যাছে ! শয়তানটা কেল্লা ফতে করেছে !'

যূথবদ্ধ একপাল ভেড়ার মতো আমরা নীরবে টেবিলে ফিরে এলাম, উদাস মন নিয়ে আবার কাজ করতে বসলাম।

কে যেন বললো, 'ও হয়তো সত্যিই ধরা দেয়নি···'

'চুপ ! খুব হয়েছে !' কারিগর ধমকে উঠলো।

আমরা সবাই তাকে চালাক লোক বলে জানতাম, আমাদের মধ্যে সব চাইতে চালাক লোক। তার এই চিৎকারে আমরা বুঝতে পারলাম, সৈনিকের বিজয় সম্পর্কে সে সুনিশ্চিত। তাই সবাই বিষণ্ণ ও বিব্রত বোধ করলাম।

বারোটা নাগাদ মধ্যাহ্নভোজের সময় সৈনিক এলো। বরাবরেরই মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট। ও সোজা আমাদের মুখের দিকে তাকালো। আমরা ওর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি অনুভব করলাম।

'তারপর, ভাইসব, তোমরা দেখতে চাও নাকি সৈনিকটি কি করতে পারে ?' গর্বিত স্বরে মুখভঙ্গি করে ও বললো। 'তাহলে বারান্দা দিয়ে সোজা চলে গিয়ে ফাটলের মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে ছাখো।'

আমরা দল বেঁধে বারান্দায় ছুটে গেলাম। একে অপরকে ঠেলে উঠানের দিকের কাঠের দেওয়ালের ফাটলে চোখ রাখলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। শিগগিরই তানিয়া দ্রুত পায়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে তুষার-জমা কাদা জায়গাগুলো পেরিয়ে ছোট একটা কুঠরির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পরক্ষণেই মন্থর পায়ে শিস দিতে দিতে সৈনিক গিয়ে ঢুকলো সেই কুঠরিতে।

তখন বৃষ্টি পড়ছে। ছোট ছোট তরঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে উঠোনের তুষার-জমা

জলে। মেঘলা, বিষণ্ণ একটা দিন। ছাদের কিনারে তখনও তুষার জমে রয়েছে। এখানে ওখানে পাতলা কাদার ছোপ পড়েছে মাটিতে। ঠাণ্ডা আর অস্বস্তির মধ্যেই আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। কুঠরি থেকে প্রথমে সৈনিকটি বেরিয়ে এলো। অলস ভঙ্গিতে গোঁফে তা দিতে দিতে ও উঠোনটা পেরিয়ে গেলো। তারপর বেরিয়ে এলো তানিয়া। ওর চোখদুটো···আবিল সুখে ওর চোখদুটো যেন চিকচিক করছে। ঠোঁটে পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি। যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ও টলতে টলতে হাঁটছে, ঠিক তালে পা ফেলতে পারছে না।

আমরা আর পারলাম না। দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে উঠোনে ভিড় করে দাঁড়ালাম। ওর দিকে তাকিয়ে বন্য অসভ্যের মতো তীব্র চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম, শিস দিলাম। আমাদের দেখে তানিয়া চমকে উঠলো, ওর একটা পা গিয়ে পড়লো কাদার মধ্যে। আমরা ওকে ঘিরে ঈর্ষাজনিত কুৎসিত কদর্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলাম, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করলাম।

আমাদের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে ও পালাতে পারবে না দেখে ধীরে সুস্থে মনের সুখে আমরা ওকে বিদ্রূপ করলাম। সব চাইতে আশ্চর্য যে আমরা ওর গায়ে হাত তুলিনি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে নীরবে ও আমাদের অপমানগুলো সহ্য করছিলো। আর আমরা আরও তীব্র, আরও উন্মত্ত ভঙ্গিতে রাগের নোংরা বিষগুলো উগরে দিচ্ছিলাম ওর ওপর।

বিবর্ণ হয়ে গেলো ওর সারা মুখ। নীল চোখদুটো, একটু আগে যা খুশিতে ঝিকমিক করছিলো, এখন যেন আশ্চর্য নিভে গেলো। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে, পাতলা ঠোঁটদুটো মৃদু কাঁপছে।

আর আমরা ওকে ঘিরে ধরে ওর ওপর তীব্র প্রতিশোধ নিচ্ছি। কেননা ও কি আমাদের নিঃস্ব রিক্ত করে দেয়নি? ও ছিলো আমাদেরই একজন। যদিও ভিখিরিরই মতো অকিঞ্চন, তবু ওকে সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি আমাদের হৃদয়ের প্রীতি। আমরা ছাব্বিশজন আর ও একা, ওর অপরাধের উচিত শাস্তি নিতে আমরা কোন ত্রুটিই রাখলাম না। কি অপমানটাই না করলাম। ও কিন্তু একটা কথাও বলেনি। কেবল তীব্র আতঙ্কে আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আর কেঁপে কেঁপে উঠেছে ওর সারা শরীর।

আমরা হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলাম, গর্জন করলাম, ধিক্কার দিলাম। অন্য লোকজনেরাও এসে হাজির হলো। আমাদের একজন তানিয়ার জামার হাতা ধরে টান দিলো।

হঠাৎ ওর চোখদুটো তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠলো। দুহাত দিয়ে খোপাটা ঠিক করে নিয়ে, চাপা স্বরে বলে উঠলো, 'দূর হয়ে যা জেলখানার বাস্তু-ঘুঘুরা সব, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে!'

সোজা আমাদের দিকে ও এগিয়ে এলো, যেন আমরা এখানে কেউ নেই, আমরা ওর পথ আটকে রাখিনি। সত্যি বলতে কি আমরা সে জন্যে ওর পথ আটকে ছিলামও না।

বেষ্টনীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সদর্পে ঘৃণার সঙ্গে ও চেঁচিয়ে বললো, 'জানোয়ার, যত সব নোংরা বদমাস কোথাকার!'

তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে সুন্দর, গর্বিত সুঠাম ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেলো। আর আমরা উঠোনে বৃষ্টি আর জল-কাদার মধ্যে, সূর্যবিহীন ধূসর মেঘলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর এক এক করে আমরা আবার সেই পাথরের অন্ধকার স্যাঁত-স্যাঁতে কারাকুঠরিতে ফিরে এলাম। আগেরই মতো আমাদের জানলা দিয়ে আর কোন দিন সূর্যের আলো প্রবেশ করেনি ভেতরে, আর তানিয়ার ফুটফুটে মুখটাকেও কখনও দেখা যায়নি দরজার সামনে।

১৮৯৯

বেশি দিন আগেকার কথা নয়। লোকটার নাম ভাশকা, বছর চল্লিশ বয়েস। ভলগার তীরে বড় একটা শহরের বেশ্যা-পল্লীতে সে চাকরি করে। উজ্জ্বল লালচে চুল, কাঁচা মাংসের মতো টকটকে লাল ভরাট মুখের জন্যে সবাই তাকে ডাকে লালু বলে।

পুরু ঠোঁট, মাথার খুলি থেকে প্রকাণ্ড কান দুটো বেরিয়ে রয়েছে পাখনার মতো। ভয়ঙ্কর মারকুটে, যাকে তাকে মেরে বেড়ায়। হোঁতকা মতন চেহারা, কুতকুতে চোখদুটো দেখলে মনে হবে যেন একতাল মাংসপিণ্ডের মধ্যে দুটো মার্বেল বসানো। গায়ে আঁট-সাঁট খাটো নীল রঙের কশাক-কোট, পরনে ঢলঢলে পশমের পাজামা, পায়ে ঝকঝকে পালিশ-করা বুট, চমৎকার দু-একটা ভাঁজ পড়েছে তার গায়ে। মাথায় কোঁকড়ানো লালচে চুলের মাঝে সুন্দর একটা টুপি আঁটা।

দলের বন্ধুবান্ধবরা তাকে ডাকে লালু বলে, বেশ্যাপল্লীর মেয়েরা বলে জল্লাদ। কেননা মেয়েদের ওপর নির্যাতনে তার জুড়ি নেই।

শহরের স্কুল-কলেজ থেকে দূরে অন্য এক মহল্লায় সদর রাস্তা আর গলি-ঘুপচি জুড়ে গড়ে উঠেছে এই বেশ্যাপল্লী। এর প্রতিটা বাড়ির সঙ্গে ভাশকা পরিচিত। তার নাম শুনলেই সবার বুক ভয়ে দুরদুর করে কাঁপে। কোন বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে কিংবা বাড়িউলি-মাসির কথা না শুনলে ভাশকার ডাক পড়ে। বাড়িউলি-মাসি চোখ রাঙিয়ে বলে, ‘উঃ, তোদের জ্বালায় তো জ্বলেপুড়ে মলুম। দাঁড়া, ভাশকাকে ডাকচি!’

কখনও কখনও শুধু এই ভয় দেখানোতেই কাজ হয়। মেয়েরা ঝগড়া-ঝাঁটি থামিয়ে চুপ করে, দাবিদাওয়া নিয়ে চেঁচায় না। অবশ্য দাবিদাওয়া বলতে তেমন কিছুই নয়—হয়তো একটু ভালো খেতে চাওয়া কিংবা বদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে একটু ঘুরে আসার জন্যে আবদার ধরা। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে ভয় দেখানোতেও কাজ হয় না, বাড়িউলি-মাসি ভাশকাকে ডেকে আনে।

ভাশকা চুপচাপ বাড়িউলি-মাসির নালিশ শুনে শুধু বলে, ‘ঠিক আছে…’

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভাশকাকে দেখে মেয়েরা তখন ভয়ে একবারে গুটিসুটি। তখন তাদের দেখে কে বলবে এদের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়। খাবার ঘরে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে ভাশকা

এসে দাঁড়াবে সে-ঘরের দরজার সামনে, ওদের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দীর্ঘক্ষণ সে শুধু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। সে-মুহূর্তে মেয়েদের মনে হবে হাতে মারার চাইতে এ বুঝি আরও যন্ত্রণাদায়ক।

অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ভাশকা নির্লিপ্ত স্বরে ডাকবে, 'মাশকা, এদিকে শুনে যা…'

মাশকা মিনতিভরা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলবে, 'না না, ভাশিলি, আমার গায়ে দিস না। দিলে আমি কিন্তু সত্যি গলায় দড়ি দোবো!'

'আয়, দড়িটা আমিই তোর গলায় দিয়ে দিচ্চি।'

ভাশকা শুধু নির্লিপ্ত স্বরে হুকুম করবে, কারুর দিকে এগুবে না। সে চায় ওরাই এগিয়ে আসুক শাস্তি নিতে।

কেঁদে কেটে মেয়েরা যদি বলে, 'আমি কিন্তু চেঁচিয়ে রাস্তার লোক জড় কোরবো, জানলার শার্সি ভাঙবো…'

'শার্সি ভাঙবি! ভাঙ! সেই ভাঙা শার্সির কুচি তোকেই খাওয়াবো।'

যত জেদী মেয়েই হোক না কেন, রুখে সরে থাকতে পারে না। জল্লাদের হাতে তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। কেউ যদি স্বেচ্ছায় না আসে, ভাশকা যায় তার কাছে। চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে ছুঁড়ে দেয় মেঝেতে। যে মেয়ের সঙ্গে তার বেশি ভাব, তাকে দিয়েই ওর হাত পা বাঁধিয়ে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। তারপর তাদের সামনেই চলে শাস্তির পালা—কিল চড় ঘুঁষি, আর চাবকানো। যার সাজা হচ্ছে সে যদি তেজী হয়, যদি মনে হয় বেরিয়ে গিয়ে পুলিসে নালিশ করবে, তাহলে ভারি চামড়ার ফিতে দিয়ে তাকে মারে, যাতে কেটেকুটে না যায়। আর ওই রকম ভাবে মারার আগে তার গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে দেয়, কখনও বা লম্বা সরু থলের মধ্যে কাঁকর পুরে সেই থলে দিয়ে পাছায় মারে, যাতে গায়ে কোনরকম দাগ না পড়ে। অথচ ব্যথা থাকে অনেকদিন। ব্যথায় অন্তত তিন-চারদিন সে সোজা হয়ে চলতে পারবে না।

অপরাধের গুরুত্বের চাইতে অপরাধীর স্বভাবের ওপরেই শাস্তির নির্মমতা নির্ভর করে বেশি। কখনও খুব তেজী মেয়ে হলে সে কোনরকম হুঁশিয়ার না হয়েই বেদম মারে। সব সময়েই তার পকেটে মজুত থাকে, পালিশ-করা ওক কাঠের খাটো হাতলওয়ালা তে-মুখো চামড়ার একটা চাবুক। প্রতিটা চামড়ার মুখে আবার সরু তার জড়ানো থাকে। এই চাবুকের এক এক ঘায়ে গায়ের চামড়া কেটে সোজা হাড় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। তারপর সেই কাটা ঘায়ে

সরষে-বাটা বা নুনজলে-ভিজনো কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে অসম্ভব জ্বালা বাড়ে।

মারবার সময় ভাশকার মুখের ভাব থাকে নির্বিকার। সে মুখে না ক্রোধ, না মায়া-মমতার কোন চিহ্ন, কেবল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তখন তার চোখ-দুটো শুধু জ্বলে ওঠে। সাজার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে ভাশকার মাথা আবার ভারি চমৎকার।

একবার সাইবেরিয়ার এক ধনী সওদাগর এসেছিলো ভেরা কোপতেভার ঘরে। সেখানে তার পাঁচ হাজার রুবল চুরি যায়। স্বভাবতই সে পুলিসে গিয়ে নালিশ করে যে সেদিন ভেরার ঘরে সে রাত কাটিয়েছিলো, ঘরে সারা সেরমান নামে অন্য একটি মেয়েও ছিলো। ঘন্টাখানেক পরে সারা তার নিজের ঘরে চলে যায়। বাকি রাতটুকু সে ভেরার ঘরে কাটায় এবং যখন ফিরে আসে তখন রীতিমত মাতাল।

ফলে যা হয় তাই হলো। পুলিশ এলো তদন্ত করতে। ভেরা সারা দুজনেই বললে টাকার কথা জানে না, চুরি তারা করেনি। পুলিস দুজনকেই গ্রেফতার করলো, কিন্তু প্রমাণের অভাবে মাসখানেক পরে আবার ছেড়ে দিলো।

বাড়িতে তখন নতুন করে আর একপ্রস্থ তদন্ত-তদারক হলো। বাড়িউলি-মাসি বললে নিশ্চই তোরা চুরি করেচিস। সারা প্রমাণ দিলো সে চুরি করেনি। বাড়িউলি-মাসি তখন পড়লো ভেরা কোপতেভাকে নিয়ে। বেচারি কেঁদে কেটে জানালো সে চুরি করেনি। তবু তাকে স্নানঘরে বন্ধ করে রাখা হলো চাবি দিয়ে। খেতে দেওয়া হলো নোনা মাছ। তা সত্ত্বেও ভেরা স্বীকার করলো না চুরির টাকা সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তখন ডাক পড়লো লালুর। মাসি ভাশকাকে বললে, 'টাকাটা কোথায় আছে বার করে দিতে পারলে তোকে পাঁচ শো রুবল ভাগ দেবো।'

রাত্তিরে ভাশকা এলো চোরাই রুবল বার করতে। ভেরা পড়ে আছে স্নান ঘরে, খিদে তৃষ্ণায় বেচারির অবস্থা কাহিল। এমন সময় দরজাটা খুলে গেলো, চোখের বদলে অন্ধকারে দেখা গেলো কেবল দুটো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ভাশকা এসে দাঁড়ালো ভেরার সামনে, ভয়ঙ্কর গলায় শুধু বললে, 'টাকাটা কোথায়?'

ভেরা কোন কথা বলতে পারলো না, ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো।

পরের দিন ভোরে ভেরার ঘুম ভাঙলো। স্নানঘরের দরজা খোলা। তখন শীতকাল। ওর পরনে শুধু পাতলা সেমিজ, পায়ে জুতো নেই। ভেরা বেরুলো

স্নানের ঘর থেকে, হি হি করে হাসতে হাসতে বললো, 'কাল আমি মামণির সঙ্গে গির্জেয় যাবো !'

ভেরাকে পাগল হয়ে যেতে দেখে সারা কেঁদে উঠলো। বাড়িউলি-মাসিকে ডেকে বললো, 'ও কিচ্ছু জানে না, টাকা আমি চুরি করেচি।'

মেয়েরা ভাশকাকে ভয় করে, না ঘৃণা করে বলা মুস্কিল। তবে সবাই ওর অনুগ্রহ পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কারুর ঘরে ভাশকা রাত্রিবাস করলে ভাবে বরাত জোর। অন্য দিকে আবার চোর দালাল, বদমাস বা বাবু—যারাই আসুক না কেন, তাদের তোয়াজ করতে করতে মেয়েরা বলে, 'কি গো, পারো না লালুকে শায়েস্তা করতে ?' কিন্তু কে ওকে শায়েস্তা করবে ? ওর গায়ে যা অসম্ভব জোর ! মদ ও কখনও ছোঁয় না। খাবারের সঙ্গে বা চায়ে শেঁকো-বিষ মিশিয়ে দিলেও দেখা যাবে ও আবার সব বাধা কাটিয়ে ঠিক সুস্থ হয়ে উঠেছে। ও জানে সবাই ওকে এড়িয়ে থাকতে চায়, সবাই ওর শত্রু। তাই মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে ও বলে, 'আমি বুঝি রে, বাগে পেলে তোরা আমাকে আস্তো রাখবি না, দাঁতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবি। কিন্তু সে সুযোগ তোরা কোনদিন পাবিনে, আমি সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে থাকি, বুঝলি ?'

যত সব গুণ্ডা বদমাশ আর পুলিসের সঙ্গে তার ভাব। সব চাইতে বেশি দহরম-মহরম উচ্চপদস্থ গোয়েন্দাদের সঙ্গে। বিনাপয়সায় সে যে ওদেরকে মেয়ে যোগায়। এছাড়া ভাশকার আর কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। এদের সঙ্গেই সে শোয় বসে, খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব করে। সারা শহরের যত নোংরামি আর জ্ঞানী-গুণী মানুষের নাড়ী-নক্ষত্র তার নখদর্পণে।

চাঁদার মাইনে হলেও বাড়িউলি-মাসির ওখানে উপরি আরও কিছু বেশি পায়। বিনিমাগনায় থাকার ঘর আর দুবেলা পেট-পুরে খাওয়া। বাড়িউলি-মাসির সঙ্গে কারবার তার অনেক দিনের। দিনের বেলায় তার দর্শনী হলো তিন রুবল, রাত্তিরে পাঁচ রুবল। বাড়িউলি-মাসির নাম ফেকলা ইয়ারমলভনা। থলথলে মোটা শরীর, বছর পঞ্চাশ বয়েস, ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। ভাশকাকে আবার দারুণ ভয়ও করে, তাই মাসে মাসে চাঁদার ওপর নগদ পনেরো রুবল দেয়। দোতালায় বারান্দার গায়ে ছোট্ট একটা ঘরে ভাশকা থাকে। এবাড়িতে এগারোজন ছুঁড়ি আছে, অথচ নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বা চেঁচামেচি নেই। সকলেই বেশ শান্ত নিরীহ।

বাড়িউলি-মাসির মেজাজ ভালো থাকলে খদ্দের-বাবুদের সঙ্গে বসে সুখ-দুঃখের গল্প ফাঁদে, ছুঁড়িদের সুখ্যাতি করে। বলে, 'উঁহুঁ, এ রকম খাসা মেয়ে এ তল্লাটে আর কোথাও পাবেন না, যেমন দেখতে শুনতে তেমনি স্বাস্থ্য। সবচেয়ে যে ডাগর ডোগর তার বয়স ছাব্বিশ। ছুকরি নয় বটে, তবে যা আঁটসাট গড়ন, হ্যাঁ, চেয়ে থাকবার মতো স্বাস্থ্য! দেখবেন? দাঁড়ান, ডাকছি। কায়ুশকা...'

কায়ুশকা এলো, যেন নধর হাঁসটি। বাবুর দীপ্ত চোখের পাতাদুটো তখন অপলক। কায়ুশকা যে খুব দীর্ঘাঙ্গী তা নয়, কিন্তু দেহের বাঁধনটি ওর ভারি চমৎকার। মুখ বুক সুন্দর, পাতলা ঠোঁটদুটো যেন রসে টসটস করছে। কেবল চোখের দৃষ্টিতে কোন ভাব নেই, ঠিক যেন পটে-আঁকা পুতুলটি। সে চোখের দৃষ্টি কেবল একটাই ভাষা জানে—'এসো'।

তারপর ভারি পাছা দুলিয়ে ছন্দিল পায়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ও হেঁটে যাবে। 'খদ্দেরকে প্রলুব্ধ করা'র এই সব ছলাকলা ওর মাসির কাছ থেকে শেখা। সদর দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানোর সময়, তা সে একাই থাকুক বা মেয়েদের সঙ্গে গল্পই করুক, এই চোখের দৃষ্টিটাই হলো আসল।

ওর বিশ্রী একটা বদ স্বভাব আছে—রঙিন একটা রুমাল গলায় ফাঁসের মতো জড়িয়ে সারাক্ষণ রুমালের প্রান্তদুটো বাঁ হাতে ধরে থাকবে।

তার সম্পর্কে কেউ জিগেস করলে ও বলতো ওর আসল নাম হলো আক-সিনিয়া কালুজিনা, বাড়ি রিয়াজানে। মডকা বলে একটা ছেলে যেচে ওর সঙ্গে আলাপ করতো, এটা ওটা উপহার দিতো। শেষে ওর একটা ছেলে হয়ে পড়লো। বাচ্ছাটা বাঁচলো না। কিন্তু বাড়িতেও ওর ঠাঁই হলো না। শেষে এক আবগারী অফিসারের বাড়িতে চাকরি নিলো। অফিসারের বউয়ের একটা বাচ্ছা হয়েছিলো অথচ তার বুকের দুধ ছিলো না। তারা ওকে নিলো দুধ-মার চাকরিতে। তাদের সঙ্গেই ও প্রথম শহরে আসে। সেখানে মাস দুয়েক পরে তাদের সে বাচ্ছাটা মারা গেলো। তারা কিন্তু কায়ুশকাকে ছাড়লো না, বাড়ির কাজকর্ম করতো ঝিয়ের মতো। বছর চারেক ও সেখানে চাকরি করেছে।

তাকে যদি জিগেস করা হতো, 'এ কাজ তোমার কেমন লাগছে?'

'মন্দ কি! দুবেলা পেট পুরে খেতে পাচ্চি, পরতে পাচ্চি, পায়ে একজোড়া জুতোও জুটচে। তাছাড়া বিনিপয়সায় থাকবার ঘর...শুধু যা একটু শান্তি পাবার জো নেই। ওই জল্লাদ হতভাগাটা যে মার মারে!'

'কিন্তু, আমোদ-আহ্লাদ তো আছে?'

'আমোদ-আহ্লাদ! কোথায়? আমি তো কোনদিন চক্ষেও দেখতে পেলুম না!' ঘাড় ঘুরিয়ে কামুশকা জবাব দিতো, যেন আমোদ-আহ্লাদটা কোথায় ও চারদিকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করতো।

অন্য বাড়ির মেয়েদের মতো এ বাড়ির মেয়েরাও বাবু এলে তাদের সঙ্গে মদ খেয়ে মনের কপাট খুলে দেয়। ভাশকার কথা খুলে বলে—এমন বদমাস, যে মেরে গা-গতর ব্যাথা করে দেয়। কিন্তু বাবুরা আসে তাদের দেহের ক্ষুধা মেটাতে, নালিশের কথা তারা মোটে গায়েই মাখে না। মদের নেশায় মেয়েরা চেঁচায়, হৈ-হুল্লোড় করে, ভাশকাকে গাল দেয়। শুনে ভাশকা বারান্দার কোণের কামরা থেকে বেরিয়ে আসে, এসে তাদের ঘরের দরজা ঠেলে চোখ রাঙিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে, 'চুপ, চুপ কর বলচি, খবোদ্দার চেঁচাবিনে!'

'নাঃ, চেঁচাবে না,' মেয়েরা চিৎকার করে জবাব। 'রাক্ষস কোতাকার··· মেরে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিয়েচিস, তোকে গাল দেবে না, পুজো করবে!'

'ফের চেঁচাচ্চিস! শিগগির চুপ কর!'

কেউ যেমন কখনও ভাশকার মুখে ভালো কথা শোনেনি, তেমনি কোন-দিন ভাশকার সঙ্গে কারুর রাত্রিবাসও বাদ যায়নি। যখনই যার ওপর খেয়াল চেপেছে, ভাশকা এসে স্পষ্ট ভাষায় তাদের বলেছে, 'আজ রাত্তিরে তোর ঘরে শোবো।'

তারপর নিজের লালসা মিটলে ও নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মেয়েরা বলে, 'শয়তান আর কাকে বলে!'

এ বাড়ির সব মেয়ের সঙ্গে পালা করে তার রাত্রিবাস। আকসিনিয়াও বাদ যায়নি। একবার কি ঝোঁক হলো, পর পর পাঁচ রাত্রি কাটালো আকসিনিয়ার ঘরে। শেষ রাত্তিরে কি নিয়ে খিটিমিটি বাঁধলো। ভাশকা আকসিনিয়াকে ধরে এমন পিটলো যে যন্ত্রণায় বেচারি তিনদিন বিছনা ছেড়ে উঠতে পারলো না।

আকসিনিয়ার স্বাস্থ্য ভালো, মজবুত দেহ, কিন্তু ভারি কুঁড়ে। ঘুমতে পেলে আর কিছু চায় না। নাক ডাকে না তো, যেন সিংহনাদ! সন্ধ্যে হলেই মুখে রঙ মেখে, সেজে গুজে, বাবু-ধরার টোপ হয়ে সদরে গিয়ে বসতে হয়। এমনি বসে থাকতে থাকতে ও কত দিন ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের মেয়েরা প্রথমে হাসে, তারপর ধাক্কা দেয়। যদি ঘুম ভাঙে তো ভালোই, না হলে ওরা নাক ডাকার শব্দ থেকে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদের ঘরে বাবু আসে, আক-

সিনিয়া তখনও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে। ওদের তরল উতরোলেও আকসিনিয়ার ঘুম ভাঙে না।

এমনটি প্রায়ই হয় বাড়িউলি-মাসি গাল পাড়ে, বলে, 'সব্বনাশি, এমন করে নিজের আখেরটা নষ্ট করচিস! বলি কি কাল-ঘুম রে তোর!··· অ্যাঁ!'

বকাঝকাতে ঘুম না ভাঙলে পড়ে চড় কিল। কিল চড় খেয়ে আকসিনিয়ার ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে খানিকটা প্যানপ্যান করে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন ডাক পড়ে ভাশকার। ভাশকা এসে হাঁক মারে, 'আকসিনিয়া?'

ধড়ফড় করে আকসিনিয়া জেগে ওঠে, ভয়ে একেবারে শক্ত কাঠ। বলে, 'মারবি নাকি? মার!'

'না তোকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচবো!'

আকসিনিয়াকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে এসে খাবার ঘরের সামনে নামিয়ে দিয়ে ভাশকা বলে, 'কাপড় খোল।'

কাপড় খুলতে খুলতে আকসিনিয়া করুণ মিনতিভরা সুরে বলে, 'খুব জোরে মারিসনে রে লালু, মরে যাবো···'

'খোল, খোল!'

'সত্যিই তুই একটা রাক্ষোস!' বলতে বলতে ও সেমিজটাও খুলে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে চাবুক পড়ে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে আকসিনিয়া।

'এখানে নয়, উঠোনে চল।'

'আর মারিসনে রে···'

শীতকাল, কনকনে ঠাণ্ডা, বরফ পড়েছে। আকসিনিয়ার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এসে ফেলে উঠোনে, তারপর তাকে পা দিয়ে ঠেলে ভাশকা বলে, 'শো, শো ওখানে!'

আকসিনিয়া কাকুতিভরা করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। বরফের ওপর মুখগুঁজড়ে ফেলে ভাশকা তার সর্বাঙ্গে চাবুক চালায়। 'ঘুমো ঘুমো ঘুমো এবার, কত ঘুমোবি ঘুমো!'

ভাশকা যখন ছেড়ে দেয়, কেঁদে কেঁদে আকসিনিয়ার গলা তখন ভেঙে গেছে। ছাড়া পাবা মাত্র আকসিনিয়া উঠে দাঁড়ায়, বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে বলে, 'তোর হয়েচে কি! দেকিস না, তোকেও একদিন ঠিক এমনিধারা কাঁদতে হবে।'

'চেঁচা, যতখুশি চেঁচা,' ভাশকা তাচ্ছিল্য স্বরে জবাব দেয়। 'কিন্তু ফের যদি ঘুমোস তো তোকে উঠোনে ল্যাংটো করে ফেলে চাবকাবো।'

জীবনে মানুষ নানান ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঠেকে শেখে। সে শিক্ষায় মানুষ কখনও সুফল পায়, কখনও বা তাকে চরম পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়। যে সূর্য আলো দেয়, তার ছায়াও আমরা পাই। ভাল মন্দ নিয়ে মানুষের জীবন। মানুষ যে কাজ করুক না কেন, তার কর্মফল তাকে ভোগ করতে হবেই।

ভাশকাকেও একদিন তার অপকর্মের ফল ভোগ করতে হলো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় সবাই সাজগোজ করে এসে বসেছে খাবার ঘরে, একটু পরেই গিয়ে বসতে হবে সদরে। লিডা চেরনোগ্রোভা নামে একটি মেয়ে, সুন্দর বাদামী রঙের চুল, যেমন মুখরা তেমনি হিংসুক, ও দাঁড়িয়েছিলো জানলার ধারে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই যে, ভাশকা আসছে!'

মেয়েদের বুক ছাঁৎ করে উঠলো।

লিডা বললো, 'এই, দেখে যা···একেবারে বেহেড মাতাল, সঙ্গে পুলিসও রয়েছে!'

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালো জানলার ধারে।

'আরে, পুলিস ওকে গাড়ি থেকে ধরে নামাচ্চে, ইশ্‌, কি মজা···' লিডা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। 'নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেচে।'

কোচওয়ান আর পুলিস দুজনে ধরাধরি করে ভাশকাকে নিয়ে এলো নিচের বৈঠকখানায়। মেয়েরা সবাই ছুটলো দেখতে। একদিন ওরা ভাশকার হাতে নির্মমভাবে মার খেয়েছে, আজ ওরা সবাই খুশি।

ভাশকার লাল মুখখানা বিবর্ণ পাংশুল, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

মাসি ছুটে এলো, দু-চোখে তার স্তব্ধ বিস্ময়। 'কি ব্যাপার, ভাসিলি?'

ভাশকা অসহায়ের মতো মাথা নাড়লো। 'পড়ে গেচি।'

পুলিস বললো, 'ট্রলি থেকে পড়ে গ্যাছে। চাকায় পা আটকে গিয়েছিলো। হাড় ভেঙে গ্যাছে।'

মেয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো, কারো মুখে রা নেই। সবাই ধরাধরি করে ভাশকাকে দোতলায় তার ঘরে নিয়ে এলো, বিছানায় শুইয়ে দিলো। লোক ছুটলো ডাক্তার ডাকতে। মেয়েরা ভাশকার বিছনার পাশে নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

ওদের দেখে ভাশকা রেগে উঠলো। 'ভাগ সব এখান থেকে, ভাগ।'

কেউ নড়লো না।

'তোরা সব এখানে মজা দেখতে এসেচিস্, ন্যা ?'

লিডা বললে, 'বা রে, কান্না পাচ্চে না যে, কি করে কাঁদবো বল্ ?'

ভাশকা তাকালো বাড়িউলির দিকে। 'এরা সব মজা দেখতে এসেচে, তুমি এদের এখান থেকে তাড়াও মাসি।'

লিডা জিগেস করলো, 'কেন রে লালু, তোর ভয় করচে ?'

মাসি বললো, 'তোরা এখান থেকে সব যা তো দেকি।'

মেয়েরা চলে গেলো। যাবার আগে সবাই বিষ-চোখে তাকালো ভাশকার দিকে। লিডা শুধু বলে গেলো, 'আবার আসবো।'

কেবল আকসিনিয়া নড়েনি। ভাশকা তাকালো তার দিকে। আকসিনিয়া হাসলো। 'যেমন শয়তান, ঠিক হয়েচে। এবার চির-জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে ন্যাংচাবি।'

চিরদিনই ও ভাশকার ভয়ে কেঁপেছে, আজ আর তার কোন ভয় নেই।

নিচের তলায় মেয়েদের জটলা। সকলেরই পুঞ্জিত আক্রোশ বুকের মধ্যে জমা হয়েছিলো, শয়তানের শাস্তি ভগবান নিজে হাতে দিয়েছেন। এত আনন্দ জীবনে ওরা আর কখনও পায়নি। ভাশকা আর কোনদিন সাপ হয়ে ছোবল দিতে পারবে না, ও তো এখন নির্বিষ সাপের একটা খোলস মাত্র। বাড়িউলি-মাসিকেও সবাই দু-চার কথা শুনিয়ে দিলে। ওকেই বা আর কিসের ভয়।

বাড়িউলি-মাসিও যে খুশি হয়নি, এমন নয়। এতদিন মুখ বুজে ভাশকার সব জুলুম সহ্য করতে হয়েছে, কাঁড়িকাঁড়ি টাকা ঢালতে হয়েছে ওর পেছনে। ওকে না হলে যে মেয়েদের টিট্ করা যায় না। তবু বাড়িউলি-মাসিও মনে মনে কম ভয় করতো না ভাশকাকে।

ডাক্তার এসে ভাশকাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। ভাঙা পাটা টেনেটুনে কাঠ দিয়ে বেঁধে তার ওপর ব্যাণ্ডেজ জড়ালেন। ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা করে যাবার সময় মাসিকে বললেন, 'রুগীকে বাড়িতে রেখে দেখাশোনা করা খুব অসুবিধে, তাছাড়া চিকিৎসার খরচও অনেক। একে বরং হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।'

ডাক্তার চলে যাবার পর লিডা হাত পা নেড়ে যাত্রার ঢঙে বললো, 'কি গো সখীরা, আমাদের প্রাণের সখাকে একবার দেখতে যাবে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই !' সবাই সমস্বরে বলে উঠলো। তারপর হাসতে হাসতে দুড়দাড় করে দোতলায় ছুটলো মজা দেখতে। ভাশকা বিছনায় চোখ বুজিয়ে পড়ে

রয়েছে। মেয়েদের পায়ের শব্দে ও চোখ মেললো। বেশ শান্ত স্বরেই জিগেস করলো, 'কিরে, আবার তোরা এসেচিস্?'

'তোর জন্যে দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্চে রে লালু।'

'আমরা তোকে কত ভালবাসি বল্ তো।'

'মনে নেই, আমাদের তুই চিরদিন কি আদরটাই না করেচিস।'

তাদের স্বর বেশ সহজ, কথায় আন্তরিকতার ভঙ্গি। সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাশকার বিছনা ঘিরে। তারা তাকিয়ে আছে ভাশকার মুখের দিকে। আর ভাশকাও তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে। ওর সে করুণ দৃষ্টির আড়ালে জ্বলছে তীব্র চাপা ক্রোধের আগুন। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেও এই আক্রোশ ও চেপে রাখতে পারলো না। ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'ভাগ সব, নইলে কিন্তু একখুনি উঠবো বলচি।'

'আহা, তাই ওঠো গো!'

ভাশকা ঠোঁটে ঠোঁট চাপলো। মেয়েদের কে যেন বললো, 'কোন পাটাতে চোট লেগেছে, সখা?' মুখে বললেও চোখ তার আতঙ্কে নীল। কোনরকমে সে হাসলো, 'এই পায়ে?' কথাটা বলেই ব্যাণ্ডেজ জড়ানো পাটা সে নেড়ে দিলো।

'উঃ, মাগো!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ও আর্তনাদ করে উঠলো। বাঁ হাতেও বেশ জখম, নাড়তে পারলো না। ডান পাখানা সজোরে ছুড়লো মেয়েদের দিকে, কিন্তু কারুর গায়ে লাগলো না। রাগে ভাশকা নিজের চেয়ারে চড় মারলো।

মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়লো।

ভাশকা চেঁচিয়ে উঠলো। 'দূর হয়ে যা সব এখান থেকে। না গেলে আমি তোদের খুন করে ফেলবো!'

কে কার কথা শোনে। হাত ধরাধরি করে সবাই নাচতে শুরু করলো। নাচতে নাচতেই কেউ ভাশকার গায়ে চিমটি কাটে, কেউ ঠেলা মারে, থুতু ছিটোয়, কেউবা ওর ভাঙা পাখানা নেড়ে দেয়। হাসির দমকে তাদের দীপ্ত চোখগুলো যেন জ্বলছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে। অজানা অচেনা মানুষ দেখলে কুকুর যেমন চেঁচায় ঠিক তেমনি ভাবে। তারা যেন ক্ষেপে গেছে, এতদিনে ওদের গায়ের ঝাল মিটেছে।

ভাশকা চেঁচিয়ে উঠলো। বাড়িউলি-মাসি ছুটে এলো। এসে চিৎকার করে বললো, 'কি পেয়েচিস তোরা সব। যা যা, যা এখান থেকে। না হলে আমি পুলিস ডাকবো। জ্যান্তো মানুষটাকে তোরা কি মেরে ফেলবি নাকি?'

মেয়েদের ভারি বয়ে গেছে মাসির কথা শুনতে। এতদিন অনেক শুনেছে ভাশকার ভয়ে। আজ আর সে-ভয় নেই। কিন্তু মেয়েদের হৈ-হুল্লোড় থামলো একজনের করুণ মিনতিতে। কৃপা-প্রার্থিনীর মতো হাত জোড় করে আক-সিনিয়া বললে, 'আর কেন? ঢের হয়েছে। এবার তোরা দয়া করে সব চুপ কর্। বেচারি চোট পেয়েছে, ওর কতখানি ব্যাথা একবার বুঝে ছাখ···লক্ষীটি, তোরা আমার কথা শোন!'

মেয়েরা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

বিছনায় ভাশকা পড়ে রয়েছে নিথর নিস্পন্দ। গায়ের শার্টটা ফেঁশে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘন লোমশ বুকটা, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ঢেউয়ের মতো উঠছে নামছে। চোখ বন্ধ, গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। আকসিনিয়া এগিয়ে এলো বিছনার কাছে। জিগেস করলো, 'কি করবো বল তো ভাশকা? কিসে তুই একটু আরাম পাবি?'

ভাশকা কেবল চোখ মেলে তাকালো, কোন কথা বললো না।

'কথা ক। সকলকে তাড়িয়ে দিয়েচি। বড্ড ঘাম হচ্ছে, ধুলো নোংরা··· একটু কাৎ করে দোবো? আরাম হবে। কিন্তু তার আগে···তুই কি জল খাবি? দাঁড়া, আনচি।'

ভাশকা নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়লো, কোন কথা বলতে পারলো না।

আকসিনিয়া ওর ওপর ঝুঁকে এলো। 'বুঝেচি, কথা কইতে তোর কষ্ট হচ্ছে। ওদেরই দোষ। মানুষটার এমন বিপদ, তাকে নিয়ে হাসি তামাসা! কোথায় লেগেচে রে, বল না, একটু হাত বুলিয়ে দিই, কিংবা সেঁক তাপ···'

ভাশকার মুখে জবাব নেই। আকসিনিয়া বললে, 'সদ্য চোট, কষ্ট হবে খুব। সহ্য করা ছাড়া যখন উপায় নেই, সেঁক দিই···দেখবি, কোন কষ্ট থাকবে না।'

ভাশকা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তুই বরং একটু জল দে।'

আকসিনিয়া রয়ে গেলো দোতলায় ঘরে। শুধু যা খাওয়া-দাওয়ার সময় একটুখানির জন্যে নিচে নামে। অন্য মেয়েরা আকসিনিয়ার সঙ্গে কথা কয় না। মাসিও ওকে আর বারণ করে না—কেন তুই ওর জন্যে মিছিমিছি আখেরটা খোয়াচ্চিস। দিনরাত ও থাকে ভাশকার কাছে, তার সেবা-শুশ্রূষা করে।

সন্ধ্যের পর বাবুরা আসে, আকসিনিয়া তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। ভাশকা ঘুমোয়, আর ও বসে থাকে জানলার ধারে। বসে বসে বাইরে তাকিয়ে

দেখে পাশের বাড়ির ছাদে, গাছের মাথায় নিঃশব্দে বরফ জমছে। ছাদ ফুঁড়ে উঠছে কালো ধোঁয়া, সে-ধোঁয়ায় কদাকার হয়ে গেছে সারা আকাশ। বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন চোখ ব্যথা করে, সর্বাঙ্গ জুড়ে ক্লান্তি নামে, দু হাতে মাথা রেখে ও চেয়ারে বসে ঢোলে। রাত্তিরে ভাশকার খাটের পাশে খালি মেঝেতে শুয়ে ঘুমোয়।

ভাশকার সঙ্গে আকসিনিয়ার কথা হয় ক্বচিৎ কখনও। ভাশকা এটা ওটা চায়, আকসিনিয়া তখনই এগিয়ে দেয়। ভাশকার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার জানলার ধারে এসে বসে।

এমনি করে চারদিন কাটলো। ভাশকাকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে বাড়িউলি-মাসি ঘরবার করছে। 'কতকাল আর ভুগবে, হতভাগাটার জন্যে আমার একটা কামরা অনর্থক জোড়া রয়েছে।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে, ভাশকা মাথা তুলে ডাকলো, 'আকসিনিয়া ?'

আকসিনিয়া চেয়ারে বসে ঢুলছিলো, ভাশকার ডাকে চমক ভাঙলো, 'বল্।'

'চেয়ারটা আমার কাছে নিয়ে এসে বোস্।'

আকসিনিয়া চেয়ারটা কাছে টেনে আনলো। 'কি বলবি, বল।'

'কিছু না। এমনি···শুধু একটু কাছে বসে থাক।'

দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলছে ভাশকার রূপোর বড় ঘড়িটা, কাঁটাগুলো হু হু করে সময়কে দিচ্ছে এগিয়ে। চাকায় বিশ্রী আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে একখানা শ্লেজ চলে গেলো। নিচেরতলায় মেয়েরা হৈ-হুল্লোড় করছে, কে যেন চেঁচিয়ে গান ধরেছে।

ভাশকা ডাকলো, 'আকসিনিয়া···'

'বল্।'

'আর তোকে মারবো না রে। এবারে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো।'

'এক ঘরেই তো আমরা দুজনে রয়েচি।'

'ধ্যাৎ, এ রকমভাবে নয়। দাঁড়া না, আগে সেরে উঠি, তারপর বেশ মানুষের মতো···'

'আচ্ছা।'

'খুব ভালো হবো। দুজনে বেশ থাকবো।' ভাশকা চোখ বুজিয়ে অনেক-ক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, 'এ বাড়িতে নয়। এখান থেকে আমরা চলে যাবো। নতুন করে আমরা ঘর বাঁধবো, কেমন ?'

আকসিনিয়া চোখ বড় বড় করে তাকালো। 'কোথায় ?'

'অন্য কোনোখানে। আমার এই জখমের জন্যে ট্রলি কোম্পানির নামে আদালতে নালিশ করবো। ক্ষতিপূরণ দিতে ওরা বাধ্য। তাছাড়া আমি নিজেও কিছু টাকা জমিয়েছি—একশো রুবল।'

'কত ?' ভ্রূ কুঁচকে আকসিনিয়া জিগেস করলো।

'প্রায় একশো রুবল।'

'সত্যি !' আকসিনিয়ার চোখের মণিদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এলো।

'সত্যি রে। এ টাকায় তুই বেশ নিজের মতো একটা বাড়ি করতে পারবি। কোম্পানির কাছ থেকেও কম টাকার খেসারত পাবো না দেকিস্। আমরা বেশ সিমবির্সক কিংবা সামারায় চলে যাবো। সেখানে বাড়ি কিনবো, সবচেয়ে সেরা বাড়ি। ভালো ভালো ছুকরি জোগাড় করবো। পাঁচ রুবল করে নেবো তাদের কাছ থেকে। তুই হবি বাড়িউলি।'

'কি যে বলিস।' আকসিনিয়া হেসে ফেললো।

'কেন ? অসুবিদেটা কোথায় ? তুই দেকে নিস, আমি বাজে কথা বলি না।'

'আচ্ছা।'

'তোকে আমি বিয়ে করবো আকসিনিয়া।'

'কি বললি !' বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো আকসিনিয়া।

'আমি তোকে বিয়ে করবো।'

'তাই নাকি !' চলকে-ওঠা ঝরনার মতো চেয়ারে দুলতে দুলতে আকসিনিয়া খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসির দমকে ফুলে উঠছে সারা শরীর।

ভাশকা মৃদু ভৎর্সনা করলো। 'হাসচিস যে বড় ! এতে হাসির কি হলো ?'

'হাসচি তোর বিয়ের কথা শুনে। আমাদের নাকি আবার বিয়ে হয় ? তিন-তিনটে বছর গির্জের চৌকাঠ মাড়াইনি। আমি হবো তোর বিয়ে-করা বউ ? তোর ছেলেপুলে পেটে ধরবো ! পাগল হয়েচিস তুই !'

ছেলেপুলের কথা মনে হতেই আবার হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠলো আকসিনিয়ার সারা শরীর। ভাশকা নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আকসিনিয়া বললো, 'তুই কি ভাবিস একবার আতু করে ডাকলেই আমি তোর পায়ে লুটিয়ে পড়বো ? কি যে বলিস ! নিজের বাগে পেয়ে তুই কি আমাকে আস্তো রাকবি? তুই যে কি মানুষ, তা তো আর কারুর জানতে বাকি নেই।'

কথাটা ভাশকার ভালো লাগলো না। তাই বললো, 'তুই চুপ করবি ?'

কিন্তু সে কথা কে শোনে। আকসিনিয়ার মুখের আগল আজ খুলে গেছে, অনর্গল বকে চলেছে যত পুরনো কাহিনী। ভাশকা কড়া করে ধমক দিলো, 'চুপ করবি, না কি ?'

তবু আকসিনিয়া থামে না। ভাশকা মিনতি করে বললো, 'আমি হাত জোড় করছি, তুই একটু চুপ কর রে আকসিনিয়া।'

আকসিনিয়া চুপ করলো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কেউ আর কোন কথা বললো না। রাত্তিরে বিকারের ঘোরে ভাশকা ভুল বকতে লাগলো। দাঁতে দাঁত ঘসে হুঙ্কার ছাড়ে, ডান হাতের তর্জনি তুলে তড়পায়, নিজের বুকে চড় মারে।

আকসিনিয়ার ঘুম ভেঙে গেলো। ভয়-ভয় চোখে ও অনেকক্ষণ ভাশকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর ঠেলা দিলো। 'ভাশকা, এই ভাশকা, কি হয়েচে রে তোর ? ভয় পেয়েচিস ?'

'হ্যাঁ, খারাপ একটা স্বপ্ন দেখচিলুম। আমাকে একটু জল দে।'

আকসিনিয়া জল দিলে। জল খেয়ে ভাশকা খানিক্ষণ ঝিম মেরে রইলো। তারপর বললো, 'না রে, বাড়ি নিয়ে ছুঁড়ি পুষবো না। বাড়িতে আমি দোকান দেবো। তুই কি বলিস ?'

'দোকান ? হ্যাঁ, দোকানই ভালো।'

'তুই আসবি তো আমার সঙ্গে ?'

'সত্যিই তুই আমাকে চাস, ভাশকা ? চালাকি নয় তো ?'

'না রে, সত্যি। দিব্যি করে বলচি।'

আকসিনিয়া মাথা নাড়লো। 'আমি তোর সঙ্গে যাবো না, কোথাও না।'

'আমি যদি যাই, তোকেও আসতে হবে।'

'ইস্, আমি যাবোই না।'

'তুই যা ভাবচিস, তা নয়। আমি যদি…'

'না না, আমি কিছুতেই যাবো না।'

'যাবি না ?' রাগে ভাশকার সর্বাঙ্গ রিরি করে উঠলো। কিন্তু মনের রাগ সে মনেই চেপে রাখলো। 'তাহলে আমার জন্যে তোর এত মাথা ব্যাথা কিসের শুনি ? সব সময় আমার কাছে কাছে থাকিস, আমার সেবা-যত্নো করিস… আমার জন্যে যদি তোর এই দরদ…'

'আমার যা খুশি, তাই করচি। তা বোলে তোর সঙ্গে ঘর করবো? তোর কথা মনে পড়লেই গা আমার থর থর করে কাঁপে। তুই তো মানুষ নোস, তুই জন্তু, তুই একটা আস্তো শয়তান।'

'শয়তান! শয়তানের তুই কি বুজিস? তুই একটা নিরেট মুখ্যু। তোকে আমি মাথায় তুলে রাখবো। সত্যি বলছি রে আকসিনিয়া, তোর কোন ভয় নেই। বল, যাবি আমার সঙ্গে?'

'না, আমি যাব না। সোনার পালংকো দিলেও না।'

দু চোখে বিরক্ত নিয়ে আকসিনিয়া বেশ খানিকটা তফাতে গিয়ে বসলো।

দুজনে আবার চুপচাপ।

জানলা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। তার মৃদু আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ভাশকার সারা মুখ। চোখ বুজিয়ে ও পড়ে রয়েছে। নিচে থেকে ভেসে আসছে হাসি গান, মাতালের স্খলিত চিৎকার। একটু পরে আকসিনিয়া নাক ডাকতে শুরু করলো। এখন সে ঘুমিয়ে কাদা। ভাশকা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

দুদিন পরে হাসপাতালের সব ব্যবস্থা করে বাড়িউলি-মাসি বাড়ি ফিরে এলো। খুশিতে ডগমগ করছে। একটু পরে অ্যাম্বুলেন্স এলো ভাশকাকে নিতে। ধরাধরি করে ওকে নিচের তলায় খাবার ঘরে আনা হলো। ভাশকা দেখলো দরজার সামনে বাড়ির সব মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারো চোখে কৌতুক, কারো চোখে দুঃখ, কেউ বা খুশিতে ঝলমল করছে। নিঃশব্দে ও কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। কোন কথা বললো না।

আকসিনিয়া আর বাড়িউলি-মাসি দুজনে মিলে ভাশকাকে সাজিয়ে গুজিয়ে কোট পরিয়ে দিলো। কারো মুখে কথা নেই। এক টুকরো নিটোল নিস্তব্ধতায় সারা ঘর যেন থমথম করছে।

ভাশকা মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তারপর ছোট্ট করে বললো, 'আসি।'

মেয়েদের মধ্যে কে যেন মাথা নাড়লো। লিডা বললো, 'বিদায়, ভাসিলি।'

'বিদায়!' ভাশকা আর কিছুতেই দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারলো না।

অ্যাম্বুলেন্সের ছোকরা আর হাসপাতালের একজন সহকারী ডাক্তার, দুজনে মিলে ধরে ভাশকাকে বেঞ্চি থেকে তুলে দরজার দিকে নিয়ে গেলো।

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ভাশকা আর একবার বললে, 'বিদায়! তোদের উপর আমি অনেক অত্যাচার করিচি রে …'

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠলো, 'বিদায়, ভাসিলি, বিদায়।'

'তোরা সব্বাই আমায় ক্ষমা করিস। তোদের আমি অনেক গাল-মন্দো…'

হঠাৎ আকসিনিয়া পাগলের মত চিৎকার করে উঠলো। 'ওরা ওকে নিয়ে যাচ্চে…ও যে আমার সব গো! না না, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না…'

কাঁদতে কাঁদতে আকসিনিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ভাশকা চমকে উঠলো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। চোখে সব যেন ঝাপসা ঠেকছে। দুকান খাড়া করে ভাশকা শুনলো আকসিনিয়ার আর্ত চিৎকার। মনে মনে ভাবলো, আচ্ছা বোকা তো! মেয়েটা পাগল হয়ে গেলো নাকি!

সহকারী ডাক্তার তাড়া লাগালেন, 'নাও নাও, চটপট করো।'

ভাশকা ম্লান স্বরে বললো, 'কাঁদিস না রে আকসিনিয়া, বরং হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসিস।'

সে কথা আকসিনিয়ার কানে যায়নি, তখনও সে চিৎকার করে কাঁদছে, 'হেই গো, দোহাই তোমাদের, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না…আমাকে কে দেখবে গো-ও…'

মেয়েরা আকসিনিয়াকে ঘিরে দাঁড়ালো। বিস্ময়ে সবাই স্তম্ভিত। অঝরে আকসিনিয়ার দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা।

'এই আকসিনিয়া …' লিডা ওর ওপর ঝুঁকে, দু কাঁধ ধরে নাড়িয়ে ওকে সান্ত্বনা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। 'কি মিচিমিচি মড়াকান্না কাঁদচিস? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! ও তো এখনও মরেনি রে বাপু! ওকে না হয় হাসপাতালে গিয়ে দেখে এলেই পারিস, ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারিস…'

১৯০০

একদিন রাত্তিরে খাবার সময় ভানুশকা কুজিনের মা তার ছেলেকে বললেন, ‘ভান্না, তুই শহরে যাচ্ছিস না কেন ?’

ভান্না কিছু বললো না। ভ্রূ কুঁচকে সানাই বাজানোর মতো ঠু-ঠোঁটে ফুঁ দিতে দিতে ও গরম সেদ্ধ আলুর খোলা ছাড়াচ্ছিলো।

মা ওর বাচ্ছাদের মতো গোল মুখখানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর শান্ত স্বরে জিগেস করলেন, ‘সত্যি কেন যাচ্ছিস না বল তো ?’

ছাড়ানো একটা আলু এ হাত থেকে ও হাতে লোফালুফি করতে করতে ভান্না জিগেস করলো, ‘কেন, কিসের জন্যে ?’

‘দু পয়সা রোজগারের জন্যে।’

‘আমার মতো অনেক হাঘোরেই কুড়ুল নিয়ে শহরে গিয়ে হাজির হয়েছে।’

‘কুড়ুল না হয় কোদাল নিয়ে যা। শহরে শিগগিরই চোরা-কুঠরি খোঁড়া-খুঁড়ির কাজ শুরু হবে। তখন তোর নিজের রুটিটা অন্তত নিজে রোজগার করতে পারবি।’

শহরে ও নিজেই যেতে চাইছিলো, তবু বৃদ্ধা মাকে সেকথা কিছু বললো না। দিন পনেরো হলো বাবা মারা গেছে, এরই মধ্যে ও নিজেকে লায়েক ভাবতে শুরু করেছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজ-উৎসবের দিনে প্রথম নির্ভয়ে ভদকা পান করেছে, তারপর গম্ভীর চালে বুক ফুলিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেছে। মার সঙ্গে বাবার মতো ভঙ্গিতে রূঢ় ভাষায় কাটা কাটা জবাব দিয়েছে…

খাওয়াদাওয়ার পরে বৃদ্ধা মা তাঁর লোমের-কোটটা রিপু করতে বসলেন। ভান্না উঠে গেলো তাপচুল্লীর ধারে। প্রায় ঘন্টা আধেক মটকা মেরে পড়ে থাকার পর ও মাকে জিগেস করলো, ‘তোমার কাছে কত টাকা আছে ?’

‘এক রুবল আর তিনটে কুড়ি কোপেক।’

‘ওই কোপেক ষাটটা আমাকে দিয়ে দাও।’

‘কেন, কি হবে ?’

‘আমি নিয়ে শহরে যাবো।

‘তাহলে তুই সত্যিই শহরে যাচ্ছিস ?’

‘তাই তো মনে হচ্ছে।’

‘বাঃ, খুব ভালো কথা। কবে যাবি ?’

'কাল সকালে।'

পরের দিন খুব ভোরে তার মা সেন্ট নিকোলাসের তামার প্রতিমূর্তিটা ছেলের কপালে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ভান্না তার কোমরবন্ধনীটা শক্ত করে বেঁধে কুড়ুলটা তার মধ্যে গুঁজে নিলো। তারপর দস্তানাদুটো পরে টুপিটা কান পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বললো, 'চলি।'

'ঈশ্বর তোর সহায় হোন, ভান্না। শহরের লোকজনদের থেকে সাবধানে থাকিস। সাবধানে ওদের সঙ্গে ব্যবহার করিস···ওরা শঠ হয়। আর কখনও মদ খাওয়া ধরিস না, বুঝেছিস?'

'ঠিক আছে।' টুপিটা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে ভান্না পথে বেরিয়ে পড়লো।

তখনও অন্ধকার রয়েছে। কুটির থেকে দশ পাও এগোয়নি, মার গলা শুনে ভান্না ঘুরে দাঁড়ালো। ফটকের সামনে দাঁড়ানো মার মুখটা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও ভোরের নিস্তব্ধতায় স্বচ্ছ প্রতিধ্বনিত হলো মার ভাঙাভাঙা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। 'শহরের মেয়েরা ভালো নয়, খারাপ সব অসুখ থাকে···'

'ঠিক আছে। ওসব তুমি কিছু ভেবো না। বিদায়!' ভান্না ওখান থেকেই চিৎকার করে বললো। কয়েক পা এগোনোর পর হঠাৎ মায়ের জন্যে, তার গ্রাম, তার জীর্ণ কুটিরটার জন্যে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেলো। থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। কিন্তু না, পাখিপাখালির দু-একটা মিষ্টি শিস ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

নিশান্তিকায় তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফুটে ওঠেনি।

মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও ভাবলো শহরে গিয়ে অনেক টাকা রোজগার করবে, বসন্তকালে বাড়ি এসে ভাসিলিসা সামোভাকে বিয়ে করবে। ভাসিলিসার ছিমছাম সুন্দর ছবিখানাকে ভানুশকা মনে মনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। কিংবা ও যদি ধনী কোন বণিকের বাড়িতে দারোয়ানের কাজ পায়, তখন ভাসিলিসাকে বিয়ে না করে বরং রূপসী কোন শহুরে মেয়েকেই বিয়ে করবে।

আনমনে ভানুশকা হেঁটে চলেছে। পেছনে রাত্রির অদৃশ্য ছায়াগুলো মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে ভোর হচ্ছে। শীতের সূর্যের ম্লান হলুদ আলোর রেখা এসে পড়ছে তুষারের ওপর। পায়ের চাপে সশব্দে তুষার ভাঙার শব্দ উঠছে। ভান্না গান ধরলো। পাজামার পকেটে তিনটে কুড়ি কোপেক ঝুনঝুন শব্দ করছে। সেই সুরের সঙ্গে তাল রেখে ওর মাথার মধ্যে ঘুরছে ভবিষ্যতের যত রঙিন স্বপ্ন।

হাঁটতে ওর বেশ ভালোই লাগছে। তুষারে পা আটকে যাচ্ছে না। হিমেল বাতাসে ও বুকভরে নিশ্বাস নিলো। সুদূর দিগন্তে মেঘের নীল আভাটাকে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। শুভ্র তুষারকণায় ভান্নার সদ্য-ওঠা গোঁফজোড়াটা ফুলে উঠছে। ওপরের ঠোঁটটা বাড়িয়ে ও তার দিকে তাকাচ্ছে, গোঁফজোড়াটাকে এখন মনে হচ্ছে বড় আর ভারি সুন্দর। বড় একটা দাঁড়কাক, কাঠকয়লার মতো কুচকুচে কালো, পথের ধারে তুষারের ওপর থপথপ করে লাফিয়ে হাঁটছে। ভানুশকা শিস দিলো। কাকটা কিন্তু আরও কাছে সরে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে এক চোখে ওর দিকে তাকালো। ভানুশকা তখন দস্তানাদুটো দিয়ে বন্দুক-ছোঁড়ার মতো শব্দ করলো। কাকটা কিন্তু তাতেও ভয় পেলো না।

'আচ্ছা শয়তান তো!' আপন মনে বিড়বিড় করে ভানুশকা আবার দ্রুত পা চালালো। দুপুরের দিকে যখন ও আর্ধেকেরও বেশি পথ পার হয়ে এসেছে, হঠাৎ তুষার-ঝড় শুরু হলো। ঝিরঝিরে হালকা তুষারকণা বাতাসে উড়ে এসে পড়ছে ওর মুখে। মাঝে মাঝে পায়ের তলা থেকেও ছিটকে উঠছে তুষারকণা, যেন ওকে আটকে রাখতে চাইছে। ওদিকে আবার বাতাস ওর পেছন দিক থেকে ঠেলা দিচ্ছে, যেন ওকে দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কালো মেঘে ঢেকে গেছে সুদূর দিগন্ত। মাটির ওপর থেকে সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে একটানা বহে যাচ্ছে বাতাসের করুণ বিলাপ। জলে ঢিল ফেলার মতো চকিতে দূরে মানুষ আর ঘোড়ার চিহ্নগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের এই বিষণ্ণ করুণ বিলাপের মধ্যে দিয়েই ভানুশকা চোখ বন্ধ করে এগিয়ে চললো। ওর উরু ব্যথা করছে, পা দুটো ভারি হয়ে আসছে। মার ওপর ওর রাগ হলো। উনি তো বেশ দিব্যি বাড়িতে বসে মজা মারছেন, আর আমাকে এখন এই ঝড়ের মধ্যে দিয়ে একা একা হাঁটতে হচ্ছে!

এক সময়ে ও এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে আর কিছুই ভাবতে পারলো না। কেবল অদম্য ইচ্ছে হলো শহরে পৌঁছে কোন গরম পানশালায় বসে একটু চা পান করবে। পিঠটা বেঁকে গেছে, মাথাটা সামনে ঝুঁকে এসেছে, তবু কোন দিকে না তাকিয়ে ও সোজা সমানে এগিয়ে চললো। হঠাৎ ঝড়ের গর্জনের মধ্যেই শুনতে পেলো কোন কারখানার ভোঁ বাজার শব্দ। চকিতে থমকে দাঁড়িয়ে ভানুশকা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর কোপেক তিনটে পকেট থেকে বার করে মুখের মধ্যে পুরে গালের একপাশে গুঁজে রাখলো, যাতে ঝুনঝুন শব্দে সারা শহরের কেউ না আবার জেগে ওঠে।

তুষার-ঝালরের মধ্যে দিয়ে শহরটাকে দেখে মনে হলো ভারি একটা কালো মেঘ যেন আকাশ থেকে সোজা নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত। মাথা থেকে টুপিটা খুলে বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে ভানুশকা মনে মনে ভাবলো, 'যাক, তাহলে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলুম!'

দুই

চায়ের দোকানের ভেতরে ঢুকতেই ঘন ভিজে বাতাসের ঝাপটা লাগলো ওর চোখে মুখে। যেন গরম জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে ওর চিবুকের অসাড়তাকে মুছিয়ে দিলো। খুপরির মতো নিচু ছাদের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীলচে ঝাঁঝালো ধোঁয়া, তাতে চোখ জ্বালা করে। নাকে আসছে ভদকা, কড়া তামাক আর পোড়া-তেলের গন্ধ। ভেতরের একটানা চাপা গুঞ্জরণে ভানুশকার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ও একটু জায়গা খুঁজলো, কিন্তু কোথাও পেলো না। সবকটা আসনই লালচে-মুখ গাড়োয়ান আর তোবড়ান গাল, অর্ধনগ্ন কারিগরে ভর্তি। ছেঁড়া পোশাক-পরা রুক্ষ মূর্তি-গুলো চোরের মতো সতর্ক চোখে ওকে লক্ষ্য করছে। ওদেরই মধ্যে রোগা, লম্বা মতন দেখতে একজন লোক চোখ মটকে হঠাৎ একখানা হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'এই খোকা, এখানে এসো!'

ভানুশকা চট করে পেছিয়ে আসতেই গোলগাল একটা মেয়ের গায়ে ধাক্কা লাগলো। মেয়েটার মুখখানা টুকটুকে লাল আর টানা জোড়া ভ্রূদুটো কুচকুচে কালো। রুক্ষ স্বরে ও বললো, 'দেখে চলতে পারিস না, গেঁয়ো ভূত কোথাকার!'

ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে, প্রতিমূর্তির টিমটিমে আলোর নিচে একখানা টেবিলে শুধু একজন বসে রয়েছে। ভানুশকা তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'এখানে একটু বসতে পারি?'

'বসো।'

চেয়ারে বসে ভানুশকা জামার কলার-টলার ঠিক করে নিলো।

'এখানে তো দেখছি অনেক লোক।'

'এ রকম জায়গা কখনও খালি যায় না। তুমি কি গ্রাম থেকে আসছো?'

'হ্যাঁ।'

'কাজের জন্যে?'

'হুঁ। কেন বলুন তো?'

'এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। এখানে আমার তিন হপ্তা হয়ে গেলো…'

'কোন কাজ পাননি!'

'স্রেফ উপোস।'

একজন পরিচারক টেবিলের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিলো, ভানুশকা ওকে বললো, 'একটা চা চাই।' তারপর ওর সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকালো।

লোকটার বয়েস এই বছর পঁচিশ। গায়ে তেলচিটে-পড়া ছেঁড়া মেয়েদের মোটা একটা বহির্বাস। রোগা, লম্বাটে চেহারা। টেবিলের উপর এমনভাবে ঝুঁকে আছে, মনে হচ্ছে যেন তার বসন্তের দাগে ভরা, দাড়ি-বিরল মুখখানা লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। মাঝে মধ্যে ঘাড় নেড়ে কদম-ছাঁট মাথাটা তুলে বড় বড় ধূসর চোখ মেলে ও ভানুশকার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। যখন দেখলো ভানুশকা ওকে লক্ষ্য করছে, তখন মুচকি হেসে ফিসফিস করে বললো, 'একটা লম্বা কোট ছিলো, সেটা বেচে দিয়েছি, একটা টুপি ছিলো, সেটাকেও খেয়েছি। এখন বাকি আছে কেবল এই বুট জোড়াটা…' টেবিলের নিচে থেকে লম্বা একখানা ঠ্যাং বাড়িয়ে ও দেখালো। 'শিগগির এ দুটোকেও বেচতে হবে দেখছি।'

অপরিচিত লোকটাকে দেখে ভানুশকার মায়া হলো। ম্লান স্বরে সে বললো, 'বলা যায় না, হয়তো কাজকর্ম কিছু পেয়েও যেতে পারেন।'

'সে সম্ভাবনা খুবই কম। শরতে ঝরা হলদে পাতার মতো লোক এখানে গিজগিজ করছে। একবার তাকিয়ে ছাখো, কত লোক…সবাই খেতে চায়।'

'এসো, বরং দুজনে একসঙ্গে চা খাওয়া যাক।' ভানুশকা প্রস্তাব করলো।

'ধন্যবাদ। আমি একটু আগেই চা খেয়েছি।' লোকটা গভীর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেললো। 'যদি শুধু এক গেলাস কিছু পান করতে পারতুম…'

মুখের মধ্যে কোপেক তিনটিতে জিভ ঠেকিয়ে ভানুশকা কি যেন ভাবলো। তারপর ইঙ্গিতে পরিচারককে ডেকে ভারিক্কি চালে আধ বোতল ভদকা দিতে বললো। বসন্তের দাগে-ভরা-মুখ লোকটা খুশিতে চলকে উঠলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

ভানুশকা জিগেস করলো, 'আপনি কোথায় শোন?'

'বেশি দূরে নয়, খুব কাছেই। প্রতি রাতের জন্যে তিন কোপেক করে ভাড়া দিতে হয়। আর তুমি ?'

'আমি তো এই সবে আসছি।'

'তাহলে বেশ ভালোই হলো, দুজনে একসঙ্গে শুই না কেন ?'

'হুঁ, তাও হয় !'

'বাঃ, কি নাম তোমার ?'

'ইভান—ইভান ভানুশকা কুজিন।'

'আমার নাম ইয়েরমে সালাকিন।'

এরপর দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। পরিচারক ভদকা এনে দিলো। ভানুশকা সালাকিনের জন্যে এক গেলাস ঢালতেই, ও সামান্য একটু উঠে গেলাসটা তুলে ধরে বললো, 'এসো, আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাতের জন্যে পান করা যাক।'

ভানুশকার কথাগুলো বড় ভালো লাগলো। এক চুমুকে ও গেলাসটা খালি করে ফেললো। তারপর মুখে পরিতৃপ্তির একটা শব্দ করে বললো, 'এক্কেবারে একা থাকার চাইতে দুজনে থাকা অনেক ভালো, তাই কিনা বলো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কাজ করার জন্যে শহরে এই প্রথম এলুম।' ভানুশকা গেলাসদুটো আবার ভর্তি করলো। 'মাঝেমধ্যে কখনও শহরে এসেছি বটে, কিন্তু কখনও থাকিনি।'

'আমিও এখানে এই প্রথম এসেছি। আগে গাঁয়ে জমিদারের বাড়িতে কাজকর্ম করতুম। কিন্তু গতবার লাল-মাথা বেজন্মা একজন নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া হলো, ও আমাকে তাড়িয়ে দিলো।'

'কয়েকদিন আগে আমার বাবা মারা গ্যাছে। এখন আমিই বাড়ির কর্তা।'

ওদের কাছাকাছি টেবিলে দুজন লরিচালক বসে রয়েছে। দুজনেরই গা সাদা ধুলোয় ভরা। দুজনেই চড়া গলায় তর্ক করছে। ওদের মধ্যে বিশালকায় একজন বৃদ্ধ টেবিলে প্রচণ্ড ঘুষি মেরে হেড়ে গলায় বললো, 'ঠিক আছে।'

'কেন ?' অপর জন জিগেস করলো। ওর মুখে কালো দাড়ি, কপালের ওপর কাটা একটা দাগ।

'যেহেতু তার আক্কেল হওয়া উচিত ! বলি, কোন ধরনের শ্রমিক হে সে ! শ্রমিক, না হাতি ! ও ভাবে ও-ই শুধু ভালো, আর সবাই অকম্মার ধাড়ি ! ফু ! ওদের একমাত্র শাস্তি হচ্ছে শেয়াল-কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো।'

কালো-দাড়ি লরিচালক বললো, 'সবাইকেই সমান ভাবে দয়া করা উচিত।'

সালাকিন এতক্ষণ ওদের কথাগুলো কানপেতে শুনছিলো, এবার বললো, 'কথাটা ঠিক নয়।'

'কি?'

'দয়া সম্পর্কে। এই আমার কথাই ধরো না কেন, মাৎভে ইভানোভিচ, লাল-মাথা সেই নায়েবটা আমার শত্রু। কেন ও আমাকে ছাড়িয়ে দিলো? দু বছর আমি ওদের বাড়িতে কাজ করেছি, কোথাও কোন ত্রুটি করিনি। হঠাৎ ও আমার ওপর রেগে উঠলো, বলে বসলো রাঁধুনি মারিয়া আর আমি নাকি···চিরদিনই যা হয়ে থাকে। তারপর সেই লাগামগুলো···তাও নাকি আমার দোষ। ওগুলো হারিয়ে গ্যাছে। তবু আমাকে বললো কোথায় আছে শিগগির খুঁজে বার কর্। যখন পাওয়া গেলো না, আমাকে বললো—চলে যা! এ কি-রকম কথা! আমাকে ওর প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আমার নিজের কাছে তো আমার প্রয়োজন আছে! আমাকে বাঁচতে হবে। এ ক্ষেত্রে নায়েবটাকে আমি কিছুতেই দয়া করতে পারি না, পারি কি?' একটু নিস্তব্ধতার পর সালাকিন গাঢ় স্বরে বললো, 'বড়ো জোর আমি নিজেকে দয়া করতে পারি, আর কাউকে নয়!'

ভানুশকা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'আলবত!'

তৃতীয় গেলাসের পর ওরা উত্তেজিত হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলো। অসংলগ্ন ভাবে টেনে টেনে সালাকিন বলে চললো তার জীবন-কাহিনী।

'···আমি অনাথ···মায়ের পাপের জন্যেই আজ আমার নিজের জীবনটা হয়ে উঠেছে বোঝার মতন···'

বসন্তের-দাগে-ভরা বন্ধুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভানুশকা এমন ঘন ঘন মাথা নাড়লো যে ওর মাথা ঘুরতে শুরু করলো।

সালাকিন হতাশভাবে হাত নেড়ে বললো, 'ভানুশকা, আর আধ-বোতল ভদকা আনতে বলো না মাইরি!'

ভানুশকা বিজড়িত স্বরে জবাব দিলো, 'বহুত আচ্ছা!'

তিন

ভানুশকার যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলো অন্ধকার ঘরে একটা তক্তার ওপর ও শুয়ে রয়েছে। ওপরে খিলান-দেওয়া একটা ছাদ, তাতে সালাকিনের মুখের

মতো অসংখ্য ফুটো। মুখের মধ্যে ও জিব নেড়ে দেখলো একটাও পয়সা নেই, তার বদলে রয়েছে কেবল একদলা তেতো গরম থুথু। ভানুশকা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারদিকে তাকালো।

সমস্ত কুঠরিটাতেই নিচু নিচু তক্তা পাতা। তার ওপর কাদার তালের মতো শুয়ে রয়েছে নোংরা ছেঁড়া-পোশাক-পরা যত মানুষ। কেউ কেউ বা মাটিতে গড়িয়ে এসেও অকাতরে ঘুমচ্ছে। জাগ্রতদের চাপা কণ্ঠস্বর নিদ্রাতুর মানুষের বেপরোয়া নাক-ডাকার শব্দে হারিয়ে যাচ্ছে। বাইরে কোথা থেকে যেন জল ছিটোনোর শব্দ ভেসে আসছে। নিশান্তিকার অস্পষ্ট ধূসর অন্ধকারে মানুষের বিশৃঙ্খল মূর্তিগুলোকে দেখাচ্ছে শরতের ছেঁড়া মেঘের মতন।

'কি, ঘুম ভাঙলো?'

ভানুশকার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সালাকিন। ঠাণ্ডা জলে সদ্য-ধোয়া ওর মুখটাকে দেখাচ্ছে আরও লাল। ওর হাতে রয়েছে একটা তামার বাক্স, তাতে গোল গোল কয়েকটা চাকতি। এক চোখ দিয়ে ও চাকতিগুলোকে পরীক্ষা করছে, অন্য চোখে ভানুশকার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

বন্ধুর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি হেনে ভানুশকা বললো, 'কাল রাত্তিরে কিন্তু আমরা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলুম।'

'হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে আমাদের দুঃখের বাঁশিগুলোকে উচ্ছাসে ভিজিয়ে নিয়েছিলুম।'

'তারপর ফুঁ দিয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছি।'

'ও কিছু নয়। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, তোমার পক্ষে বলা খুব সহজ, কিন্তু…'

'কিৎসু ঘাবড়িও না বন্ধু। আমার কাছে এখনও নগদ সতেরোটা কোপেক আছে। তারপর বুটজোড়াটা বেচবো। কোনরকমে চলে যাবে।'

'বেশ, তা যদি হয়…' ভান্না অবিশ্বাসের চোখে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। 'এখন আমাকে কিন্তু তোমার সাহায্য করতে হবে। কাল তোমার সঙ্গে মদ খেয়ে আমি সব টাকা উড়িয়েছি। কাজেই…'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ও কথা না বললেও চলতো। হাসবো এক সঙ্গে, কাঁদবো এক সঙ্গে, এ তো জানা কথা। আমরা তো আর বড়লোক নই। কাজেই কে কি পাবে ও নিয়ে যেমন ঝগড়া করার কিছু নেই, তেমনি ভাগ বাঁটোয়ারা করার ঝামেলাও পোহাতে হবে না।'

ওর স্বচ্ছ চোখের ভাষা আর স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে ভানুশকা আশ্বস্ত হলো। সে জিগেস করলো, 'তোমার হাতে ওটা কি?'

'অনুমান করো দেখি।'

ভানুশকা একঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'অ্যাঁ, এটা পয়সা-জাল-করার কল?

'আচ্ছা মাথা মোটা তো!' সালাকিন খেপে উঠলো। 'পয়সা-জাল-করায় তুমি কি বোঝো হে?'

'আমি জানি। আমাদের পাশের গাঁয়ে একজন চাষী ওই কাজ করতো। সে এখন সাইবেরিয়ায় রয়েছে।'

সালাকিন চুপ করে কি যেন ভাবলো, তারপর বাক্সটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'হ্যাঁ, শাস্তির জন্যে ওরা সাইবেরিয়াতেই নির্বাসনে পাঠায়।'

বাক্সটার দিকে তাকিয়ে ভানুশকা ফিসফিস করে জিগেস করলো, 'এটা কি তাহলে তাই?'

'আরে না না, এটা ঘড়ির ভেতরের কলকব্জা! চলো, চা খাওয়া যাক।'

ভানুশকা বিছানা থেকে নেমে হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিলো। তারপর সালাকিনকে তামার বাক্সটা বুকের ভেতরে পুরতে দেখে ভয়ে ভয়ে জিগেস করলো, 'এটা তুমি কোথায় পেলে?'

'বাজার থেকে কিনেছি। আমার ওভারকোটটা বিক্রি করে দিয়ে এটাকে আমি সত্তর কোপেকে কিনেছি।'

'কিন্তু এটা তোমার কি কাজে লাগবে?'

'জানো', ওর কানের কাছে ঝুঁকে সালাকিন হেঁয়ালির ভঙ্গিতে বললো, 'আমি অনেকদিন থেকে বোঝবার চেষ্টা করছি—ঘড়ি কি করে জানতে পারে এখন সময় কত। দুপুর, অমনি ঘড়িতে বারোটা বাজলো। কি অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো? সাধারণ কয়েকটা তামার চাকতি, অথচ এমনভাবে তৈরি যে ঠিক জানে এখন কোন সময়। মানুষ হচ্ছে জীবন্ত জীব, সূর্য দেখে সময় অনুমান করতে পারে। কিন্তু এগুলো কেবল তামার কয়েকটা চাকতি।'

ভানুশকার মাথা টিপটিপ করছিলো। বন্ধুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওর রহস্যময় কথাগুলো শুনছিলো আর মনে মনে কল্পনা করছিলো সালাকিন তার বুটজোড়াটা বেচার পর কি করবে। আচ্ছা, যে টাকাটা মদ খেয়ে

উড়িয়েছি, তার অর্ধেকটা ও দেবে তো, না কি দেবে না? সালাকিনের মুখের দিকে তাকিয়ে ও জিগেস করলো, 'তোমার বুটজোড়াটা কখন বেচবে?'

'চা খাবার পরেই।' একটু নিস্তব্ধতার পর ও বললো, 'অনেক দিন ধরেই আমি ঘড়ির কথাটা ভাবছি, বুঝলে। অনেককে আমি জিগেসও করেছি, মানে বুদ্ধিমান সব লোকদের। একজন বলে এ-কথা, অন্যজন বলে আর এক কথা··· তার মধ্যে থেকে আসল কথাটাই বোঝা দায়।'

ভান্না উৎসুক হয়ে জিগেস করলো, 'কিন্তু কেন তুমি এসব জানতে চাও?'

'মজার বলে। কেমন করে এটা সম্ভব? যেমন মানুষের কথাই ধরো। ওরা চলে ফেরে, যেহেতু সে জীবন্ত। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই।'

সালাকিন এতক্ষণ ধরে ঘড়ির রহস্যের কথা বললো যে বন্ধুর উৎসাহে সে নিজেই উৎসাহিত হয়ে উঠলো এবং ভাবতে শুরু করলো, তাই তো, ঘড়ি কি করে সঠিক সময়ের খবরটা জানতে পারে। তারপর দুজনে চা খেতে খেতে সারাক্ষণ ঘড়ি নিয়েই আলোচনা করলো।

একসময়ে বাজারে গিয়ে ওরা বুটজোড়াটা দু রুবল চল্লিশ কোপেকে বিক্রি করে ফেললো, এত কম দাম পেয়ে সালাকিন মর্মাহত হলো। বাজারের চত্তরের মধ্যেই ও ভানুশকাকে নিমন্ত্রণ জানালো একটা রেঁস্তোরায়, হতাশায় পুরো একটা রুবলই খরচ করে ফেললো। শেষে গভীর রাত্রে চড়াগলায় দুজনে টলতে টলতে যখন ভাড়াটে-শোবার ঘরের পথ ধরলো, সালাকিনের পকেটে তখন ঝুনঝুন করছে মাত্র চারটে পাঁচ-কোপেক।

ভানুশকা উল্লাসে বন্ধুর কাঁধে ঠেলা দিলো। 'মাইরি বলছি, তোমাকে আমি নিজের লোকের মতো ভালবাসি, ভাই···সত্যি, বিশ্বাস করো। তুমি আমার দোস্ত! আমার যা আছে তুমি সব নিয়ে নাও, আমি কিৎসু বলবো না। চাইকি তুমি আমার কাঁধে চড়ো, আমি তোমাকে ঠিক বয়ে নিয়ে যাবো।'

'কিৎসু ঘাবড়িও না, দোস্ত, কিৎসু ঘাবড়িও না। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল আমরা ঘড়ির কলকব্জাগুলো বেচে ফেলবো। তাতেই আমাদের কয়েকদিন চলে যাবে। জাহান্নমে যাক ব্যাটা শয়তান ঘড়ি!'

'চুলোয় যাগ্‌গে!' জোরে চেঁচিয়ে উঠে ভানুশকা সরু গলায় গান ধরলো।

সালাকিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সেও বন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরলো। তারপর দুজনে পরস্পরকে জাপটে ধরে, গালাগালি দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করতে করতে টলমলে পায়ে হেঁটে চললো।

হঠাৎ একসময়ে গান থামিয়ে ভীষণভাবে শূন্যে ঘুষি পাকিয়ে সালাকিন বললো, 'দাঁড়া না ব্যাটা মাৎভে, তোর আমি মজা দেখাচ্ছি!'

চার

এক সপ্তা কেটে গেলো।

একদিন রাত্তিতে দুই বন্ধু সেই ভাড়াটে-শোবার ঘরে ক্ষুধার্ত অপ্রসন্ন মনে পাশাপাশি তক্তার ওপর শুয়ে রয়েছে। ভানুশকা চাপা স্বরে সালাকিনকে তিরস্কার করছে। 'সব দোষ তোমার। তুমি না থাকলে আমি এতদিনে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই কোন কাজ জোগাড় করতে পারতুম।'

'উচ্ছন্নে যাও।' সালাকিন তার বন্ধুকে রুক্ষস্বরে উপদেশ দিলো।

'চুপ করো। যা সত্যি, আমি শুধু তাই বলছি। এবার কি হবে শুনি? নিশ্চয়ই উপোস…'

'যা না, কোন সওদাগরের বিধবা-মেয়েকে বিয়ে কর না। দেখবি পেট ভর্তি দানা গজগজ করছে।'

'চুপ কর্, গর্তমুখো…সেলাই-নেকো…'

এমনি ভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন করাটা এই ওদের প্রথম নয়।

সারাটা দিন অর্ধনগ্ন দেহে ঠাণ্ডায় নীল হয়ে ওরা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বিশেষ কিছুই রোজগার করতে পারে না। অন্যের হয়ে কাঠ কাটে, উঠোনের নোংরা বরফ সাফ করে দেয়, তার বদলে পায় কুড়ি কোপেক করে। তকখুনি খাবার কিনে খরচ করে ফেলে। কখনও হয়তো বাজারে কোন মহিলা মাংস আর তরিতরকারির ভারি ঝুড়িটা ভানুশকার কাঁধে চাপিয়ে দেন, ঘন্টাখানেক ওকে নিয়ে পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ার পর ওর হাতে পাঁচ কোপেক গুঁজে দেন। তখন ভানুশকার এত খিদে পায় যে পেটের ভেতরটা মোচড়ায়, আর মহিলাটির প্রতি রাগে ঘেন্নায় সারা শরীর ওর রিরি করে। কিন্তু পাছে মনের ভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়ে ও মহিলাটির প্রতি সম্ভ্রম দেখাবার ভান করে এবং ঝুড়িতে যেগুলো ওর খিদের উদ্রেক করছে সেগুলোর দিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

কখনও কখনও পুলিসের চোখ এড়িয়ে ভানুশকা ভিক্ষে করে। আর সালাকিন তখন এক টুকরো মাংস, এক পাত মাখন, একটা বাঁধাকপি কিংবা

পাল্লার একটা বাটখারা চুরি করে। এসব ওর খুব ভালোই আসে। ভানুশকা কিন্তু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বন্ধুকে বলে, 'নাঃ, তুমি দেখছি আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না! ওরা আমাদের একদিন ঠিক জেলে পুরবে দেখো।'

'জেলখানায় আমরা খেতে পাবো পরতে পাবো।' সালাকিন বিজ্ঞের মতো জবাব দেয়। 'কাজ খুঁজে পাওয়ার চাইতে চুরি করা করা অনেক সহজ।'

সেদিন ভাড়াটে-শোবার ঘরের জন্যে তুজনে কোন রকমে ছটা কোপেক বাঁচাতে পেরেছিলো। সালাকিন একখানা রুটি আর একটা গাজর চুরি করে-ছিলো। এ ছাড়া সেদিন ওদের আর কিছু খাবার জোটেনি। খিদেয় নাড়ি জ্বলছে, ঘুম আসছে না, তুজনেই তুজনের ওপর ক্রুদ্ধ।

সালাকিন ভানুশকাকে তিরস্কার করে বললো, 'আর আমি তোমার জন্যে কত খরচ করেছি? তোমার বলতে তো ছিলো শুধু একখানা কুড়ুল।'

'আর সেই ষাট কোপেকের কি হলো? এর মধ্যে ভুলে গ্যালে বুঝি!'

একগুঁয়ে তুটো কুকুরের মতো তুজনে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ করলো। হঠাৎ করেই ভানুশকা সালাকিনকে বার কয়েক ধাক্কা দিলো। যদিও প্রকাশ্যে সে কোনদিনই সালাকিনের সঙ্গে ঝগড়া করেনি। কেননা এ কদিনে ওর সঙ্গে থাকা তার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো, এবং সে জানতো সালাকিন ছাড়া তার এক পাও চলবে না। শহরে একা থাকতে তার ভয় করে। আবার গ্রামে সবার সামনে অর্ধনগ্ন দেহে ছেঁড়া জামাকাপড় পরে ফিরে যাওয়াটাও লজ্জা-কর। তাছাড়া গ্রামে ফিরে যাবার কথা বললেই সালাকিন ওকে বিদ্রূপ করতো, 'যা যা, তোর মাকে গিয়ে বোলগে যা—আমি একগাদা টাকা রোজ-গার করে এনেছি, ভদ্রলোকের মতো পোশাক পরেছি। তাতে তোর মা একেবারে আহ্লাদে গোলে যাবে।'

এ ছাড়াও প্রচ্ছন্ন একটা আশায় ভানুশকা শহরে রয়ে গিয়েছিলো—যদি বরাত ফেরে। মাঝে মাঝে ভাবতো হয়তো কোনো বড়লোক তার ওপর সদয় হয়ে তাকে কোন কাজ দেবে। কখনও কল্পনা করতো এই তুঃসহ খিদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সালাকিন নিশ্চয়ই কোন পথ বাতলাতে পারবে। কেননা ওর বুদ্ধির ওপর তার যথেষ্ট আস্থা আছে। মাঝে মাঝে ও বলতো, 'এখনই এত ঘাবড়িও না। একটু সবুর করো, দেখবে সব ঠিক হয়ে গ্যাছে…'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে ভানুশকার দিকে তাকিয়ে ও এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলতো, ভানুশকার মনে হতো সত্যিই ও বুঝি কোন পথের সন্ধান জানে।

এতকিছু সত্ত্বেও, সেদিন রাত্তিরে বন্ধুর পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো যদি ছাদের ওপর থেকে একটা ইঁট খুলে পড়ে ওর মাথায়, তাহলে বেশ হয়। তখনই তার মনে পড়লো, এই কয়েকদিন আগে গভীর রাতে হঠাৎ একটা অসহ্যতীক্ষ্ণ আর্তনাদে সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো, আর সে দেখেছিলো রক্তমাখা থ্যাঁতলানো একটা মুখ। ছাদ থেকে একটা থান ইঁট খুলে পড়েছিলো লোকটার মাথায়।

সালাকিন বিড়বিড় করে বললো, 'তোমার তো ছিলো মাত্র সেই তিনটে কুড়ি কোপেকই সম্বল। কিন্তু, এখন যদি তুমি···মানে তোমার···'

'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'না, মানে···এই ধরো যদি তোমার আর কিছু টাকা থাকতো···'

'তা হলে?'

'নাঃ, কিছু নয়।'

ভানুশকা একটু চুপ করে কি যেন ভাবলো। 'আমার যদি আর কিছু টাকা থাকতো, তাহলেও তুমি কিছু করতে পারতে না। তুমি কেবল বড বড বাত ঝাড়তেই পারো।'

'কে আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলবো?'

'কি?'

'ধরো আমি কোন কিছু করার জন্যে প্রস্তুত হলুম, তাহলে?'

'তাহলে কি?'

'সেইটেই তো আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইছি।'

'আমি আর কি বলবো?' ভানুশকা অস্বস্তি বোধ করলো।

সালাকিন বিছনায় নড়েচড়ে শুলো। ভানুশকা পেছন ফিরে হতাশায় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বললো, 'যদি শুধু একটুকরো রুটি পেতুম!'

মুহূর্তের জন্যে দুজনে নিশ্চুপ। তারপর সালাকিন মাথাটা সামান্য একটু তুলে ভানুশকার ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কানের কাছে ঠোঁট রেখে প্রায় শোনাই যায় না এমন ভাবে ফিসফিস করে বললো, 'শোন ভান্না, আমার সঙ্গে তুমিও বরং চলো।'

ভানুশকাও ফিসফিস করে জিগেস করলো, 'কোথায়?'

'বরিসভোয়।'

'কেন?'

'সে আমি তোমায় রাস্তায় গিয়ে বলবো।'

'না, এখনই বলো।'

'বলছি তো তোমাকে সব বলবো। চলো, দুজনে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা মাৎভে ইভানোভিচের বাড়িতে চুরি করবো। সত্যি, বিশ্বাস করো…'

'চুলোর দোরে যাও!' ভয়ে বিরক্তিতে ভানুশকা অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো।

সালাকিন তবু ওর কাঁধে চাপ দিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, 'শোন, কাজটা খুব সহজ। যা-কিছু করার কেল্লা ফতে করে আমরা আবার এখানে ফিরে আসবো। কেউ সন্দেহ করবে না। ওখানকার সব আটঘাট আমি জানি। কোথায় টাকাকড়ি আছে, রূপোর চামচেগুলো কোথায় রাখা হয়, আয়না-বসানো আলমারিতে সাজানো বড় বড় পানপাত্র, সব আমার জানা।'

সালাকিনের উষ্ণ নিঃশ্বাসে ভানুশকার গাল দুখানা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। আর সেই উষ্ণতায় তার সব আশঙ্কা যেন একটু একটু করে গলে যাচ্ছিলো। তবু সে শান্ত চাপা স্বরে বললো, 'আচ্ছা শয়তান তো তুমি!'

'কেন?'

'সে তুমি ভালো করেই জানো।'

'না, শোন…তখন আমাদের জীবনটা কি রকম হবে একবার ভেবে ছাখো। প্রথমে আমরা পেট পুরে খাবো। তারপর জামাকাপড় কিনবো, জুতো কিনবো, গরমের পোশাক…'

ভানুশকা চুপটি করে শুয়ে রইলো। আর সালাকিন তার কানের কাছে বাজিয়ে চললো অবিরাম রিমঝিম বৃষ্টির মতো আশার মিষ্টি শব্দগুলো।

একসময়ে ভানুশকা জিগেস করলো, 'ওদের অনেক টাকা আছে?'

'অনেক। অঢেল।'

পাঁচ

দু দিন পরে পাকা সড়ক দিয়ে দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটে চললো। সালাকিন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত স্বরে অনর্গল বকবক করছে।

'বুঝলে? ওখানে গিয়েই আমাদের প্রথম কাজ হবে গোয়ালঘরটায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া। আগুন লাগছে সবাই সেদিকে ছুটে যাবে, এমনকি মাৎভেও তখন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে। সেই ফাঁকে আমরা সুট করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়বো। তারপর ঝোপ বুঝে সব ফাঁকা করো দেবো।'

ভানুশকা চিন্তাচ্ছন্ন স্বরে জিগেস করলো, 'আর যদি ধরে ফ্যালে?'

'ধরবে না। কি করে ধরবে? লোকে আগে আগুন সামলাবে, না চোর ধরবে? এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারছো না?'

ভানুশকা ঘাড় নাড়লো।

ভরা শীত। আকাশ থেকে একরাশ পেঁজা তুলোর মতো তুষার ঝরছে। ডালপালা-ভাঙা প্রাচীন দু সারি বার্চ-বীথির মধ্যে দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। নিমেষে মুছে যাচ্ছে বরফের ওপর ওদের ভারি পায়ের চিহ্ন।

ভানুশকা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'নাঃ, কাজটা এখন ভালোয় ভালোয় মিটলে হয়!'

'তুমি দেখো, কোন অসুবিধে হবে না।' সালাকিনের কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো আত্মপ্রত্যয়ের একটা সুর।

'ঈশ্বর যেন তাই করেন। মানে···শুধু এইবারের জন্যে যদি একবার সফল হই, জীবনে একাজ আর কখনও করবো না।'

সঙ্গী দুজন যতটা সম্ভব দ্রুত হেঁটে চলেছে, কেননা ওদের গায়ে পোশাক বলতে খুব সামান্যই রয়েছে। সালাকিনের গায়ে রয়েছে মেয়েদের সেই মোটা বহির্বাস, তাতে অসংখ্য ছিদ্র। ফেঁসে-যাওয়া জায়গাগুলোর মধ্যে দিয়ে নোংরা তুলো বেরিয়ে এসেছে। পায়ে কম্বলের জুতো, মাথায় জীর্ণ একটা টুপি। আর ভানুশকা পরেছে বাদামী রঙের পশমের জ্যাকেট, একটা হাতার রঙ আবার কালো। পায়ে বাকলের জুতো, মাথায় সামনের দিকের কানা-ভাঙা একটা টুপি, পাজামাটা কোমরবন্ধের বদলে দড়ি দিয়ে বাঁধা। চাষীর মতো না দেখিয়ে ওকে দেখাচ্ছে ঠিক মদ খেয়ে সর্বস্ব-ওড়ানো একজন কারিগরের মতো।

আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় সালাকিন তামার একখানা পাত্র আর একটা ইস্ত্রি চুরি করে পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকানে আশি কোপেকে বিক্রি করে দিয়েছিলো। তার পঞ্চাশ কোপেক এখনও ওর পকেটে মজুত রয়েছে। তাই ও বললো, 'ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে এমন কারুর সঙ্গে দেখা হলে ভালো হতো, আমাদের বেশ নিয়ে যেতে পারতো। নাহলে সন্ধ্যের আগে সেখানে পৌঁছতে

পারবো না, এখনও প্রায় পঁচিশ মাইল পথ ঠ্যাঙাতে হবে। অবশ্য তার জন্যে আমরা ওকে পাঁচ কোপেক করে দিতুম…'

মাথার ওপরে তুষার ঝরছে। তুষারের সূক্ষ্ম কণাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে ওদের চিবুকে, চোখের পাতায়, কাঁধে। পায়ে পায়ে আটকে যাচ্ছে। ময়দার গুড়োর মতো শুভ্র তুষার আবরণ ভেদ করে সামনে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ঘোড়ার মতো ভানুশকা নীরবে হেঁটে চলেছে। আর স্ফূর্তিতে উপচে-ওঠা সালাকিন অনর্গল বকবক করছে।

'কদ্দূর এলুম কিছু বুঝতে পারছি না। সামনে কি আছে তাও শালার দেখার জো নেই। উঃ, কি তুষারপাত রে বাব্বা! এতে অবশ্য একটা সুবিধে হবে আমাদের অপকর্মের কোন চিহ্ন থাকবে না। অবশ্য তখনও যদি তুষার পড়ে। কিন্তু আবার অসুবিধেও হবে, আগুন জ্বালিয়ে রাখাটাই হবে সবচেয়ে মুস্কিল। কি আর করা যাবে, সব সুবিধে তো আর একসঙ্গে পাওয়া যায় না…'

তুষারকণাগুলোকে এখন আরও ঘন আরও সূক্ষ্ম মনে হচ্ছে। ওগুলো ধীরে ধীরে সোজা মাটিতে পড়ছে না, উত্তাল ঢেউয়ের মতো বাতাসে ঘুরছে। হঠাৎ সামনে হাড়জিরজিরে একটা বাড়ি চোখে পড়লো, দেখে মনে হলো তুষারের চাপে মাটিতে বসে-যাওয়া যেন একটা জমাট কালো মেঘ।

সালাকিন বললো, 'ওটা পানশালা। চলো, ওখানে গিয়ে এক গেলাস টেনে আসি।'

ভানুশকা কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'চলো। নাহলে হয়তো পথেই শীতে জমে যাবো।'

পানশালার সামনের এসে দেখলো শ্লেজে বাঁধা দুটো ঘোড়া নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছোট ছোট লোমশ দুটো ঘোড়া। মাঝে মাঝে মাটিতে পা ঠুকছে আর চোখের পাতার ওপর থেকে তুষারকণাগুলোকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ওদের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে ঘোড়াদুটো ঘাড় ফিরিয়ে বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টিতে তাকালো। শ্লেজের লম্বা হাতলদুটো কালো ধুলোয় ঢাকা।

'আরে, কাঠকয়লা-পোড়ানোওয়ালা বলে মনে হচ্ছে।' সালাকিন খুশিতে যেন চলকে উঠলো। 'আমার মনে হচ্ছে লোকটা ওই দিকেই যাবে।'

বাস্তবিকই মদের দোকানের ভেতরে জানলার সামনের টেবিলে বসে অল্প-বয়স্ক একজন লোক বীয়ার পান করছে। ভানুশকা প্রথমেই কালো কালো-দাগে ভরা ওর শীর্ণ মুখে অদ্ভুত লম্বা নাকটা দেখে আকৃষ্ট হলো। কাঠকয়লা

পোড়ানোওয়ালা লোকটা পাদুটো ফাঁক করে বসে ভারিক্কি চালে ধীরে ধীরে বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। কিন্তু পান করতে করতে হঠাৎ একসময়ে ও এমন কাশতে শুরু করলো যে সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো, আর ওর ভারিক্কি চালটাও চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেলো।

দোকানির টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সুগন্ধি এক গেলাস কড়া ভদকা পান করতে করতে ভানুশকা কয়লাওয়ালার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সালাকিনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। সালাকিন লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিগেস করলো 'কি ইয়ার, শহরের দিকে যাচ্ছো নাকি?'

সালাকিনের দিকে আয়ত চোখদুটো মেলে দিয়ে উদাস স্বরে ও বললো, 'মালপত্তর বোঝাই না করে আমরা শহরে যাই না।'

'তাহলে তুমি শহর থেকেই আসছো?'

'তাতে তোমার কি?'

'না, এমনি···মানে আমরা দু বন্ধু বরিসভোয় যাচ্ছি, তেলকলে চাকরি পেয়েছি। তাই বলছিলুম তোমার শ্লেজে যদি একটু তুলে নাও, কেননা আমরা ওই দিকেই যাবো।'

কয়লাওয়ালা প্রথমে সালাকিন, পরে ভানুশকাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর নিজের জন্যে গেলাসে খানিকটা বীয়ার ঢেলে নিলো। আঙুল দিয়ে সোলার একটা কুচি তুলে ফেলে দিয়ে গেলাসে চুমুক দিলো। শেষে সংক্ষেপে বললো, 'আমার সুবিধে হবে না।'

'একটু উপকার করো দোস্ত, আমাদের তুলে নাও। দুজনে পাঁচ কোপেক করে দোবো···'

'হবে না।' কোন দিকে না তাকিয়ে ও সাফ জবাব দিলো।

'খ্রীষ্টের দোহাই, তুলে নাও ভাই।' ভানুশকা ভয়ে ভয়ে মিনতি করলো।

ভ্রূ কুঁচকে কাঠকয়লাওয়ালা ওদের দিকে তাকালো, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।

'তুমি কি রকম লোক হে!' সালাকিন বলে উঠলো। 'এত করে বলছি! সত্যিই আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নিজে চোখেই তো দেখছো, কি ধরনের পোশাক পরে আছি।'

কয়লাওয়ালা বিদ্রূপ করে বললো, 'তোমাদের আরও গরমের পোশাক-পরা উচিত ছিলো।'

‘ছিলো তো, কিন্তু অত টাকা কোথায় ? দেখছোই তো আমরা গরীব।’

কয়লাওয়ালা কোন কথা না বলে নিঃশব্দে মদের গেলাসে চুমুক দিলো।

ভানুশকা বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। তারপর দুজনেই টুপি হাতে নীরবে কাঠকয়লাওয়ালার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

তখন মদের দোকানের মালিক, এক বৃদ্ধা ওকে বললো, ‘এত চাল দেখিও না নিকোলাই, ওদের উঠিয়ে নাও। তোমার অসুবিধেটা কোথায় ? সেই তো ঘোড়াদুটোকে নিয়ে ফিরেই যেতে···তাছাড়া, ওরা যখন পাঁচ কোপেক করে দিতে চাইছে। যদি বিশ্বাস না হয়, পয়সাটা তুমি বরং ওদের কাছ থেকে আগাম নিয়ে নাও।’

কয়লাওয়ালা আর একবার দুবন্ধুর সর্বাঙ্গ জরিপ করে নিলো। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ‘দশ কোপেক করে দিতে হবে।’

‘বেশ’, সালাকিন দুটো দশ-কোপেক ওর দিকে এগিয়ে দিলো। ‘এই নাও, ভোগ করো।’

বৃদ্ধা পরামর্শ দিলো। ‘পয়সাটা আগে ভালো করে দেখে নাও !’

কাঠকয়লাওয়ালা মুদ্রা দুটো টেবিলের ওপর ফেলে আওয়াজ শুনলো, দাঁত দিয়ে কামড়ে দেখলো, তারপর দোকানির টেবিলের কাছে গিয়ে বৃদ্ধার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, ‘এই যে, বীয়ারের দাম।’

সালাকিন ভানুশকার কানে কানে বললো, ‘ব্যাটা রাম শয়তান !’

বৃদ্ধার কাছ থেকে খুচরা পয়সা কটা ফিরোত নিয়ে কয়লাওয়ালা বাইরে বেরিয়ে এলো। ভানুশকার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, ‘তুমি ভেতরে বোসো। আর তুমি আমার পাশে।’

‘বেশ।’ সালাকিন রাজি হলো। ‘কিন্তু আমরা দুজনে বেশ একসঙ্গেই ভেতরে বসি না কেন ?’

কাঠকয়লাওয়ালা সন্দিগ্ধ হয়ে জিগেস করলো, ‘কেন, এক সঙ্গে কেন ?’

‘গরম হতো···’

‘যা বলছি তাই করো।’ কয়লাওয়ালা খেঁকিয়ে উঠলো। ‘তোমার সঙ্গী যদি আমার কোন ঘোড়া চুরি করার মতলব করে থাকে, তাহলে আধসেরি বাটখারা দিয়ে তোমার মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেবো, আর তোমাকে···’

কথাটা শেষ না করে ও হাসলো। তারপরে হঠাৎই ওরা দারুণভাবে কাশতে শুরু করলো।

ছয়

মাইল তিনেক পথ যাবার পর অবশেষে কাঠকয়লাওয়ালা তার আরোহীর সঙ্গে আলাপ শুরু করলো। 'তুমি কে?'

দাঁতে দাঁত চেপে সালাকিন জবাব দিলো, 'মানুষ।'

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সালাকিনের সারা দেহ তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দু দুবার সালাকিন শ্লেজ থেকে নেমে শরীরটাকে গরম করার জন্যে শ্লেজের পাশাপাশি ছুটেছে। কিন্তু এমন ঘন নরম তুষারের ওপর দিয়ে ছোটা খুব কঠিন। একটুতেই ক্লান্ত হয়ে আবার শ্লেজে ফিরে এসেছে। আর তখন আরও শীত বোধ করেছে। যতবার ও শ্লেজ থেকে লাফিয়ে নিচে নেমেছে, ততবারই কাঠকয়লাওয়ালা তার ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেটের ওপর পরা ভারি ওভারকোটের হাতার ভেতর থেকে ছোট মোটা একটা লাঠি বার করেছে। লাঠির মাথায় শিকল দিয়ে বাঁধা একখানা আধসেরি বাটখারা ঝোলানো। শীতের দিনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডারই মতো ভয়ঙ্কর এই অস্ত্রটা দেখে সালাকিনের বুক ভরে থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

'মানুষ সবাই। আমি জিগেস করছি, তুমি থাকো কোথায়?'

'কোথাও থাকি না। আত্মীয়-স্বজন ঘরবাড়ি বলতে আমার কিছু নেই।' হঠাৎ সালাকিন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভান্না, তুমি বেঁচে আছো তো?'

ভানুশকা অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, এখনও আছি।'

'তোমার শীত করছে?'

'করছে।'

'নাঃ, তোমরা দেখছি সত্যিই হতভাগ্য!' কয়লাওয়ালা অনুযোগের সুরে বললো। 'যা নোংরা ছোড়া জামা-কাপড়···অদ্ভুত লোক তোমরা!'

সালাকিন হাত-পা গুটিয়ে কুঁজো হয়ে বসেছিলো, কোন কথা বললো না। ও তখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে দাঁতের ঠকঠকানি বন্ধ করতে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেছে, পেছনে পড়ে রয়েছে কেবল সীমাহীন নির্জন ধু ধু প্রান্তর। কোথাও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর এই হিমেল নির্জনতা যেন ওর বুকে এসে বিঁধলো।

'···আর আমরা সেমাকিনরা তিন ভাই। আমরা তিন জনেই কাঠকয়লা বেচি, তারপর শহরের শোধনাগারে নিয়ে যাই। আমরা খুব শান্তিতে আছি।

খাওয়া-পরা জামা-জুতোর কোন অভাব নেই। যেমন হওয়া উচিত, সবকিছুই ঠিক তেমনি আছে। এর জন্যে অবশ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! যে লোক কাজ জানে, অলস নয়, মিছিমিছি ঘুরে বেড়ায় না, তার কোনদিন অভাব হয় না। বড় ভাইদের বিয়ে হয়ে গ্যাছে, আমিও খুব শিগগির বিয়ে করছি। আসল কথা হচ্ছে হাতের-কাজ জানা চাই।'

ঘোড়াদুটো প্রচণ্ড কষ্ট করে গরম তুষারের মধ্যে পা টেনে টেনে চলছে। শ্লেজটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। আর সালাকিন হাতের তালুতে ছাড়ানো ছোট্ট একটা গোটা বাদামের মতো দুলছে। কয়লাওয়ালার একটানা কথাগুলো যেন সালাকিনের মাথায় এক একটা ভারি থান ইঁটের মতো এসে পড়ছিলো আর অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা ওর যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলো। লোকটার কথা শুনতে শুনতে নিজেকে ওর নিঃস্ব রিক্ত মনে হলো। হঠাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরেই ও চিৎকার করে উঠলো। 'ভানুশকা!'

'অ্যাঁ!'

'নিচে নেমে একটু ছুটছো না কেন?'

ভানুশকা ক্ষীণ স্বরে জিগেস করলে, 'কেন?'

'তাহলে আর ঠাণ্ডায় জমে মরতে হবে না।'

'না, ঠিক আছে।'

কাঠকয়লাওয়ালা বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর জামার হাতা দিয়ে নাক মুছে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাসলো। 'তোমাদের মতো লোকেরা কেন যে বাঁচতে চাও! শীতে জমে যাচ্ছো, খিদেয় মরছো···সত্যিই, অদ্ভুত! বাঁচতে গেলে ভালো ভাবে বাঁচা উচিত।'

সালাকিন রুক্ষ স্বরে বললো, 'তোমার টাকার অর্ধেক আমাকে ভাগ দাও না, দেখবে খুব ভালো বাঁচবো।'

'কি বল্লে?'

'বলছি তোমার টাকার অর্ধেক ভাগ···'

'তোমাকে ভাগ দেবো। এটা কি দেখতে পাচ্ছো?'

সালাকিনের চোখের সামনে শিকলের প্রান্তে ঝোলানো সেই আধসেরি বাটখারাটা দুলে উঠলো। সে দেখলো কাঠকয়লাওয়ালার মুখটা শয়তানের মতো কুৎসিত হাসিতে বিকৃত হয়ে গেছে। হঠাৎ সালাকিনের বুকের ভেতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো, যেন তার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে

গেছে, আর তার চারপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহ শিখা। সে শিখা তার মস্তিষ্কে উঠে তার চোখের সামনে সবকিছুকে রক্তের মতো গাঢ় রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডান হাতটা ঘুরিয়ে সালাকিন কনুই দিয়ে কয়লাওয়ালার মুখে এত জোরে আঘাত করলো যে লোকটা চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাটখারাটা আঘাত করলো সালাকিনের কাঁধের পাখনায়। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় দম যেন বন্ধ হয়ে এলো। কাঠকয়লাওয়ালা শঙ্কিত আর্তনাদ করে উঠলো, 'খুন! বাঁচাও! বাঁচাও!'

সালাকিন কিন্তু বাঘের মতো ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে টুঁটিটা চেপে ধরলো, হাঁটু দিয়ে চাপ দিলো ওর পেটে। 'এবার কথা বল্! বল্! চেঁচা!'

কাঠকয়লাওয়ালার গলার ভেতর থেকে ঘড ঘড আওয়াজ উঠলো, দাঁত দিয়ে ও সালাকিনের কাঁধটা কামড়ে ধরলো। জীবন্ত মাছ কাটলে যেমন ছটফট করে, কাঠকয়লাওয়ালাও তেমনি ছটফট করতে করতে সালাকিনের গলাটা হাতড়াতে লাগলো। চাবুকটা মুঠো থেকে খসে গেছে, কেবল হাতলের ফিতেটা আটকে রয়েছে ওর কব্জিতে। প্রায়ই সেটা সালাকিনের দেহ স্পর্শ করছে, আর স্পর্শগুলো বেদনাদায়ক না হলেও কেমন যেন একটা হিমেল আতঙ্কে সারা শরীর তার সিরসির করছে। তাড়াতাড়ি সে চিৎকার করে ডাকলো, 'ভানুশকা, শিগগির এসে আমাকে সাহায্য করো!'

ভানুশকা শীতে কুঁকড়ে কয়লার খালি বস্তাগুলোর তলায় শুয়েছিলো, কাঠকয়লাওয়ালার আর্তনাদ শুনে সে আঁতকে উঠেছিলো। অনুমানে বুঝতে পেরেছিলো কি ঘটেছে, ফলে বস্তাগুলোর আরও নিচে সে সেঁধিয়ে গিয়েছিলো। মনে মনে ভেবেছিলো, আমাকে কিছু জিগেস করলে বলবো, 'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিচ্ছু শুনতে পাইনি।'

কিন্তু বন্ধুর সাহায্যের ডাক শোনা মাত্র সে শ্লেজ থেকে এমন ভাবে লাফিয়ে নামলো, যেন ঘোড়ার খুরের তলা থেকে ছিটকে উঠলো এক খাবলা তুষার। হঠাৎ তার মনে হলো, কয়লাওয়ালা যদি সালাকিনকে একবার বাগে আনতে পারে তাহলে তাকেও খুন করবে। কিন্তু যখন দেখলো দুটো মানুষের দেহ প্রকাণ্ড একটা গ্রন্থির মতো জট পাকিয়ে রয়েছে, কয়লাওয়ালার মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে, আর মুঠো থেকে খসে-যাওয়া চাবুকটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে, ভানুশকা তখন ওর হাতখানা ধরে পেছন দিকে জোরে মুচড়ে দিলো।

ছোট্ট লোমশ ঘোড়াদুটো ঘন তুষারের মধ্যে কোন রকমে পা টেনে টেনে চলছে। তুষার-ছাওয়া নির্জন এই প্রান্তরে স্লেজের মধ্যে তিনটে মানুষকে এ ভাবে মারামারি করতে দেখে ওরা করুণ চোখে তাকিয়ে ঘনঘন মাথা নাড়ছে, আর আচমকা লাথি লাগার ভয়ে থেকে থেকে সরে যাচ্ছে।

সাত

প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ক্লান্ত ঘর্মাক্তদেহে ভানুশকা যখন চেতনা ফিরে পেলো, আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে সে ফিসফিস করে বললো, 'এই, আর একটা ঘোড়া কোথায়? আমার মনে হয় পালিয়েছে!'

'হ্যাঁ।' সালাকিন ওর মুখের রক্ত মুছে ফেললো। 'আর যাই হোক, ও অন্তত বলে বেড়াবে না।'

সঙ্গীর শান্ত কণ্ঠস্বরে ভানুশকার ভয় অনেকটা হালকা হয়ে গেলো।

'আমরা তাহলে কাজটা সেরে ফেললুম!' কয়লাওয়ালার দিকে তাকিয়ে সালাকিন শান্ত স্বরে কথাটা বললো। 'আমাদের খুন হতে দেওয়ার চাইতে ওকে মেরে ফ্যালাই ভালো। এসো, ওর পোশাকগুলো খুলে নিই। তুমি বরং নাও ওর ভেড়ার লোমের জ্যাকেটটা, আর আমি ওভারকোটটা। তাড়াতাড়ি করতে হবে, না হলে হয়তো আবার কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।'

ভানুশকা নীরবে কাঠকয়লাওয়ালার দেহটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পোশাক খুলছে আর অনবরত বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে, 'এটা কি সম্ভব যে ভয়ে সালাকিনের বুক কাঁপছে না!'

নিহত লোকটার প্রতি সালাকিনের অবিচল নিপুণ তৎপরতা ভানুশকাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেললো। সবচেয়ে যা বিস্মিত করলো, তা হলো ওর বসন্তের দাগে ভরা ছড়ে যাওয়া মুখখানা নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, নানান ভঙ্গি করছে, আর চোখদুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলছে, যেন প্রচুর মদ খেয়েছে কিংবা কোন কিছুতে ওর আনন্দ উপছে উঠছে। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় ভানুশকা তার টুপিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলো। সালাকিন কাঠকয়লা-ওয়ালার টুপিটা নিয়ে ভানুশকার হাতে দিলো। 'এটা পরে নাও, নাহলে ঠাণ্ডা লাগবে। তা ছাড়া, এতো আর হয় না—এমন শীতের রাতে একটা মানুষ টুপি পরে থাকবে না।'

কথা বলতে বলতেই ও নিহত লোকটার পকেট হাতড়ে হাতড়ে দেখছিলো আর এমন নিপুণ ভঙ্গিতে সবকিছু করছিলো, যেন দেখলে মনে হবে খুন আর লুঠ-তরাজ করাটাই ওর জীবনের একমাত্র পেশা। কয়লাওয়ালার তামাকের থলিটা খুলতে খুলতে সালাকিন বললো, 'তোমাকে সবদিকেই কড়া নজর দিতে হবে। শীতের দিনে লোকে যেমন টুপি না পরে কোথাও বার হয় না, তেমনি আবার···এই, এই ছাখো কি পেয়েছি! একটা মোহর, পাঁচটা রুবল··· না, পাঁচটা নয়, সাতটা, আর একটা আধ রুবল···'

'তাই নাকি!' মোহরটার দিকে তাকিয়ে ভানুশকার চোখদুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো। 'এটা কি···'

'কি আবার, টাকা!'

'না, আমি টাকার কথা বলছি না। বলছিলুম···'

'কি?'

'এটা কি তোমার এই প্রথম বার?' ভানুশকা কাঠকয়লাওয়ালার নগ্ন মৃত-দেহের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলো।

'আরে বোকা,' সালাকিন হেসে উঠলো। 'আমি হলুম গিয়ে একটা আস্তো ঘাঘী!'

'তুমি যা তাড়াতাড়ি ওর পোশাক খুলছিলে···'

'জ্যান্তো মানুষের চেয়ে মরা মানুষের পোশাক খুলে নেওয়া অনেক সহজ, এই কথাটা বুঝলে না?'

সালাকিন হাঁটু গেড়ে বসেছিলো, হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে ভান্নার পায়ের ওপর ধপ করে পড়ে গেলো। ঠাণ্ডা জলে ঝপাং করে পড়ে যাওয়ার মতো ভানুশকা শিউরে উঠলো। সালাকিনকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে সে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। আর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে তারস্বরে ডেকে উঠলো।

'আরে, ও কিছু নয়। এমনি পড়ে গিয়েছিলুম, এতে এমন ভয় পাবার কি আছে?' সালাকিনের মুখটা এখন নীলচে আর ম্লান দেখাচ্ছে। 'ও আমার পিঠের পাখনায় মেরেছিলো, এখনও টনটন করছে···হয়তো সেরে যাবে।'

ভানুশকা প্রকম্পিত গলায় বললো, 'সালাকিন, দোহাই তোমার···চলো, আমরা ফিরে যাই!'

'কোথায়?'

'শহরে। আমার ভয় করছে।'

'শহরে! মোটেই না। আগে আমরা ঘোড়াটাকে বেচবো, তারপর মাৎভের বাড়িতে যাবো।'

'আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।'

'কিসের ?'

'আমাদের দফারফা শেষ! এখন কি হবে, ভাই? এর জন্যেই কি আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম ?'

'উচ্ছন্নে যাও!' সালাকিন চিৎকার করে উঠলো। রাগে ওর চোখদুটো জ্বলছে। 'দফারফা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো? আমরাই কি একমাত্র মানুষ যারা এই প্রথম নরহত্যা করলো? পৃথিবীতে এটা কি এই প্রথম ঘটনা?'

বন্ধুর মুখখানাকে আবার ক্রুদ্ধ হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠতে দেখে ভানুশকা অশ্রুসজল চোখে করুণ মিনতি করে বললো, 'রাগ কোরো না ভাই!'

'সাধে রাগ করি না, বুঝলে ?'

'কিন্তু এটাকে নিয়ে আমরা কি করবো ?' প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে চারদিক তাকালো। 'একে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? আমরা হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে ভেশেঙ্কিতে পৌঁছে যাবো, তখন এই ভারি বোঝা নিয়ে···'

'তাই তো! তুমি ঠিক বলেছো।' একলাফে সালাকিন শ্লেজ থেকে পথে নেমে এলো, তারপর কাঠকয়লাওয়ালার একখানা হাত ধরে টানলো। 'আমি হাত ধরে টানছি, তুমি ওর পাদুটো ধরো।'

ভানুশকা মৃতদেহের পা দুখানা ধরে তুললো, আর তখনই নজর পড়লো কাঠকয়লাওয়ালার ঠেলে বেরিয়ে আসা ভয়ঙ্কর নীল চোখদুটোর ওপর।

'এখানে একটা গর্ত খোঁড়।' সালাকিন হুকুম দিলো। তারপর নিজেই নরম তুষারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিপুণ তৎপরতায় দুপাশের তুষার সরিয়ে ফেলতে শুরু করলো। এমন অদ্ভুত ভাবে ও কাজটা করতে লাগলো যে সাহায্য না করে ভানুশকা ঠায় ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি?' নিহত লোকটাকে গর্তের মধ্যে টেনে এনে ওর ওপর তুষার চাপাতে চাপাতে সালাকিন বললো, 'শিগগির পুঁতে ফ্যালো!'

দু বন্ধু যখন কাজ হাঁসিল করছিলো, ঘোড়াটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের দেখছিলো। এমন নিশ্চল ভঙ্গিতে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন জমে পাথর বনে গেছে।

'চলো, কাজ মিটে গ্যাছে।'

ভানুশকা আপত্তি করলো। 'ঠিক হলো না।'

'কেন?'

'নিজেই তাকিয়ে ছাখো। কেমন ঢিপি মতন…'

'ওতে কিছু হবে না।'

দু জনে আবার স্লেজে ফিরে এসে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলো। স্লেজটা চলতে শুরু করলো। ভানুশকা পেছন ফিরে তাকালো। তার মনে হলো যেন গাড়িটা ভীষণ আস্তে এগুচ্ছে, কেননা মৃতদেহের ওপর তুষারের ঢিপিটা তখনও ঠিক একই দূরত্বে রয়েছে। 'এবার সত্যিই আমাদের দফা শেষ, সালাকিন!' অস্ফুট স্বরে ভানুশকা আর্তনাদ করে উঠলো।

'এত অস্থির হবার কি আছে?' সালাকিন শান্ত উদাস স্বরে জবাব দিলো। 'ঘোড়াটাকে বেচেই আমরা শহরে ফিরে যাবো। তখন আমাদের কে ধরবে ধরুক দেখি! আরে, ওই তো ভেশেঙ্কি!'

পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার-ছাওয়া পথটা ঢালু জমির দিকে নেমে গেছে। পথের দুধারে পাতাবিহীন নগ্ন কালো কালো গাছের সারি। কোথায় যেন একটা দাঁড়কাক ডাকছে। দুই বন্ধু কাঁপতে কাঁপতে নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। ভানুশকা ফিসফিস করে বললো, 'সাবধান!'

আট

দুজনে খুশিতে ডগমগ করতে করতে একটা ভাটিখানায় প্রবেশ করলো।

'এই যে, বুড়ো কর্তা। আমাদের দুজনকে দু গেলাস দাও দিকিনি।'

'বসুন, দিচ্ছি।'

বিক্রেতার টেবিল থেকে যে লোকটা কথাটা বললো—লম্বা, কালো, টাক-মাথা একজন চাষী। ভানুশকার দিকে ও এমন নম্র সরল চোখে তাকালো যে ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো নীরবে না হেসে সে পারলো না।

সালাকিনের সামনে দুটো গেলাস রেখে সরাইওয়ালা বললো, 'এখানকার রীতি হচ্ছে, কোথা থেকে কেউ এলে বলে শুভদিন কিংবা কেমন আছেন। আপনারা কি অনেক দূর থেকে আসছেন?'

'আমরা ? না না, এই সামনেই···মাইল-বিশেক দূর থেকে আসছি।'

'কোন দিক থেকে ?'

'এই দিক থেকে।' আঙুল দিয়ে ও ভাটিখানার দরজাটা দেখিয়ে দিলো।

'তাহলে আপনারা শহর থেকে আসছেন ?'

'ঠিক ধরেছো। কি ব্যাপার ভান্না, হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন ? খাও।'

'উনি কি আপনার ভাই ?'

'না।' ভানুশকাই তাড়াতাড়ি জবাব দিলো, 'আমরা ভাই নয়।'

দরজার পাশে একেবারে কোণের দিকে একজন চাষী বসেছিলো। বেঁটে-খাটো দেখতে, পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, তীক্ষ্ণ ধূসর দুটো চোখ। চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে ও বিক্রেতার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং ওদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

সরাইওয়ালা জিগেস করলো, 'কি ?'

'কিছু না।' চাষীটা ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'ভেবেছিলুম, আমি বোধহয় ওদের চিনি।'

'চলো, আমরা বরং ওইখানটায় বসে একটু গরম হয়ে নিই।' ভানুশকার জামার হাতা ধরে টানতে টানতে সালাকিন অন্য পাশের একটা টেবিলে গিয়ে বসলো। বাঁকানো-নাক চাষীটা ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো এবং চাপা গলায় সরাইওয়ালাকে কি যেন বললো।

ভানুশকা সালাকিনের কানে কানে বললো, 'চলো, পালাই এখান থেকে।'

সালাকিন রেগে উঠলো। 'সবুর করো।'

ভানুশকা ভর্ৎসনার চোখে তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। তার মনে হলো অপরিচিতদের সামনে এভাবে চেঁচিয়ে কথা বলাটা শুধু অন্যায়ই নয়, রীতিমত অস্বাভাবিক এবং বিপজ্জনকও বটে।

সালাকিন ফরমাস দিলো, 'আমাদের দুজনকে আর দু গেলাস দাও।'

ভাটিখানার বন্ধ দরজায় খুট করে শব্দ হলো, দুজন চাষী ভেতরে প্রবেশ করলো। ওদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। অন্য জন গাঁট্টা গোঁট্টা, হেঁড়ে মাথা, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট।

'তোমার শুভ হোক !' বৃদ্ধ বললো।

'আসুন, আসুন !' অভ্যর্থনা জানিয়ে সরাইওয়ালা আড়চোখে সালাকিনের মুখের দিকে তাকালো।

দরজার দিকে তাকিয়ে হেঁড়েমাথা চাষীটা জিগেস করলো, 'ঘোড়াটা কার ?'

বাঁকানো-নাক চাষীটা সালাকিনকে দেখিয়ে বললো, 'এদের দুজনের।'

সালাকিন সমর্থন করলো। 'হ্যাঁ, ওটা আমাদের ঘোড়া।'

ওদের কণ্ঠস্বর শুনে ভানুশকার বুকের ভেতরটা ভয়ে দুরদুর করে উঠলো। তার মনে হলো এই লোকগুলো এমন অদ্ভুত এমন সহজভাবে কথা বলছে যেন ওরা সব জানে, কোন কিছুতে বিস্মিত হচ্ছে না, বরং একটা কিছু ঘটার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। সালাকিনের কানে ফিসফিস করে সে বললো, 'চলো, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি।'

'তোমরা কে ?' সেই হেঁড়েমাথা চাষীটা জিগেস করলো।

মৃদু হেসে সালাকিন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো। 'আমরা ? আমরা কসাই।'

ভানুশকা অবাক হয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, 'কি বলছো তুমি !'

চারজন চাষীই ভানুশকার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলো, ঘাড় ফিরিয়ে ওরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সালাকিনের মুখের দিকে তাকালো। সালাকিনও শান্ত স্থির চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো, কেবল মৃদু কাঁপতে লাগলো তার ঠোঁটদুটো। ভানুশকা টেবিলে মাথা নুইয়ে বসে রইলো। তার মনে হলো সে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। কিন্তু অনড় মেঘের মতো এই নিটোল নিস্তব্ধতা বেশিক্ষণের জন্যে রইলো না। হেঁড়েমাথা চাষী বললো, 'তাই দেখলুম স্লেজের সামনে রক্ত লেগে রয়েছে।'

'কই, আমি তো কোনো রক্ত দেখিনি !' বৃদ্ধ বললো। 'সত্যি কি কোনো রক্ত লেগে ছিলো ? আমি তো দেখলুম স্লেজটা আগাগোড়া কালো। সেই জন্যে ভাবলুম এরা বোধহয় কাঠকয়লা পোড়ায়। আইভান পেত্রোভিচ, আমাকে এক গেলাস দাও তো ভাই।'

সরাইওয়ালা বৃদ্ধের হাতে এক গেলাস ভদকা দিয়ে ধীরে ধীরে দরজার বাইরে বেরিয়ে গেলো। ও চলে না যাওয়া পর্যন্ত বাঁকানো-নাক চাষীটা ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো, তারপর সে-ও বেরিয়ে গেলো।

'চলো ভান্না, এবার যাওয়া যাক। সালাকিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'কি ব্যাপার, সরাইওয়ালাটা আবার গেলো কোথায় ? ও কি পয়সা-কড়ি কিছু নেবে না নাকি ?'

হেঁড়েমাথা চাষী সিগারেট পাকাতে পাকাতে সালাকিনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ও একখুনি ফিরে আসবে।'

ভানুশকা উঠে দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়লো। সারা শরীর তার ঘামছে, পাদুটো দেহের ভার যেন আর বইতে পারছে না। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে সে সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো এবং সালাকিনের ঠোঁট দুটোকে কাঁপতে দেখে ভয়ে যন্ত্রণায় সে নীরবে ডুগরে উঠলো।

সরাইওয়ালা ফিরে এলো। যেমন নীরবে বেরিয়ে গিয়েছিলো ঠিক তেমনি ভাবে আবার ফিরে এলো। ধীরে শান্ত পায়ে টেবিলে ফিরে এসে একটু ঝুঁকে বৃদ্ধকে বললো, 'আবার একটু একটু গরম পড়ছে।'

'এটা সময়ের গুণ।'

'আমাদের এবার যেতে হবে,' সরাইওয়ালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সালাকিন চড়া গলায় বললো। 'এই যে, তোমার দাম।'

সরাইওয়ালা অলস ভঙ্গিতে হাই তুললো 'আর একটু থাকুন।'

'আমাদের তাড়া আছে।'

'আর একটু সবুর করে যান।'

'কেন, কিসের জন্যে ?'

'অঞ্চল-প্রধানকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।'

'তোমাদের অঞ্চল-প্রধানকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে সালাকিন মাথায় টুপিটা পরে নিলো।

'আপনি কেয়ার করেন না, কিন্তু উনি করেন।'

বৃদ্ধ আর সেই হেঁড়েমাথা চাষী এবার কৌতূহলী হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলো। হেঁড়েমাথা চাষী বললো, 'উনি শুধু তোমাদের একটাই প্রশ্ন করবেন —তোমরা বেচো মাংস, বয়ে বেড়াও কয়লার থলে, এ কি-রকমের ব্যাপার ?'

বৃদ্ধ ওকে সমর্থন করলো। 'ঠিক, খুব ঠিক কথা।'

'আসল ঘটনা হচ্ছে, ঘোড়াটা ওরা চুরি করেছে।'

'না !' তীক্ষ্ণস্বরে ভানুশকা আর্তনাদ করে উঠলো।

সালাকিন ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো। 'নাঃ, তুমিই ডোবাবে দেখছি !'

গোলমাল করতে করতে আরও পাঁচজন চাষী ভেতরে প্রবেশ করলো। ওদের মধ্যে একজন দীর্ঘকায়, মাথার চুলগুলো সব লাল, হাতে লম্বা একটা লাঠি। ভানুশকা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মনে হলো সবাই মাতালের মতো টলছে আর ঘরখানাকেও দোলাচ্ছে।

'শুভদিন বন্ধুরা !' লাঠি-হাতে চাষী বললো, 'এবার বলো দেখি তোমরা

কে ? কোথা থেকে আসছো ? ধরে নাও আমিই বেলিফ, এখানকার অঞ্চল-প্রধান। কিন্তু তোমরা কে ?'

সালাকিন অঞ্চল-প্রধানের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো। হাসিটা ওর শোনালো কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকের মতো। মুখখানা হয়ে গেলো বিবর্ণ।

আস্তিন গুটিয়ে চাষীদের একজন কঠোর স্বরে বললো, 'তুমি হাসছো ?'

'সবুর করো, করনি···' অঞ্চল-প্রধান তাকে নিরস্ত করলো। 'একে একে সব হবে। তারপর, খুলে বলতো দেখি, ঘোড়াটা তোমরা কোথায় পেয়েছো ?'

ছাদ থেকে ধীরে ধীরে তুষার গড়িয়ে পড়ার মতো ভানুশকা ধীরে ধীরে তার চেয়ার থেকে পিছলে নেমে এলো, তারপর হাঁটু মুড়ে বসে কোন রকমে তোলাতে তোলাতে বললো, 'গোঁড়া, ধর্মভীরু লোক আমি···বিশ্বাস করুন, আমি করিনি ! ও করেছে ! ঘোড়াটাকে চুরি করিনি, আমরা কাঠকয়লা-ওয়ালাকে খুন করেছি···এখান থেকে খুব কাছেই, তুষারের নিচে ওকে কবর দিয়েছি। ঘোড়াটা চুরি করিনি, শ্লেজটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম···বিশ্বাস করুন ! আমি কিচ্ছু জানি না, সব ও করেছে ! আর একটা ঘোড়া নিজে থেকেই পালিয়ে গ্যাছে···নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে ! আমরা ওকে খুন করতে চাইনি, লোকটাই প্রথম লাঠিতে বাঁধা শেকল দিয়ে···বিশ্বাস করুন, প্রথমে আমরা বরিসভোতে যাচ্ছিলুম সেখানকার নায়েবের বাড়িতে চুরি করতে···আমরা ওর গোয়াল ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতুম। কিন্তু আমরা ঘোড়া দুটোকে ছুঁইনি। ওই, ওই আমাকে এ কাজে···'

'থামলে কেন, ভান্না ? বলো, বলে যাও,' প্রচণ্ড রাগে সালাকিন চিৎকার করে উঠলো। তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে ঘন অন্ধকার প্রাচীরের মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা চাষীদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'ব্যাস, খেল খতম ! বাকিটুকু বলেই ফ্যালো, আর ওরা আমাকে মাটিতে জ্যান্তো পুঁতে ফেলুক !'

সালাকিনের সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র মুখের দিকে তাকিয়ে ভানুশকা কোন কথা বলতে পারলো না, চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো। মাথাটা তার নুয়ে পড়েছে বুকের কাছে, হাত দুটো অসহায়ের মতো ঝুলছে দুপাশে।

চাষীরা অনেকক্ষণ বিষণ্ণ চোখে তাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো। অবশেষে ওদের মধ্যে একজন, বাঁকানো-নাক সেই প্রথম চাষীটাই হঠাৎ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিরক্তির সঙ্গে বললো, 'বদমাসগুলো আচ্ছা বোকা তো !'

১৯০১

এ শহরের সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত আর দুর্বোধ্য। গির্জাগুলো তাদের নানা রঙের গম্বুজগুলোকে মেলে ধরেছে আকাশের গায়ে, কিন্তু ঘন্টা বাজার বরুজগুলোকেও ছাড়িয়ে উঠেছে কল কারখানার বিশ্রী নোংরা দেওয়াল আর কালো চিমনি। বিশাল বিশাল অফিস-বাড়িগুলোর চাপে, প্রাণহীন পাথরের দেওয়ালের গোলকধাঁধায়, স্তূপীকৃত ধুলো আর ভাঙা-চোরা জিনিসের মধ্যে গির্জাগুলো যেন চাপা পড়ে গেছে। যখনই প্রার্থনার ঘন্টা বাজে, দেওয়ালে দেওয়ালে, ছাদের কিনারে প্রতিধ্বনিত হয় তার ধাতব আর্তনাদ, হারিয়ে যায় বাড়িগুলোর ফাঁকে, সংকীর্ণ গলিপথে।

বাড়িগুলো যেমন বিশাল, তেমনি সুন্দর। কিন্তু মানুষগুলো সব কুৎসিত আর জঘন্য। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শহরের আঁকা-বাঁকা গলিপথে এরা ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করে, লোলুপ চোখে কেউ তাকিয়ে থাকে খাবারের দিকে, কেউ বা সস্তা আমোদের খোঁজে। কেউ কেউ আবার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দুর্বলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, যাতে ওরা সবলের বশ্যতা মেনে চলে। ধনীরাই শক্তিমান এবং সবার ধারণা একমাত্র অর্থই মানুষকে স্বাধীনতা আর প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। সবাই ক্ষমতা চায়, কেননা প্রত্যেকেই ক্রীতদাস। এবং ধনীদের বিলাস-ব্যাসন গরীবদের মনে ঈর্ষা আর ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তোলে। প্রত্যেকেরই কাছে টাকার ঝনঝনানির চেয়ে মিষ্টি গান আর কিছু নেই। তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু, সকলেই নিষ্ঠুরতার শিকার।

মাঝে মাঝে সূর্যের আলো এসে পড়ে শহরের বুকে। কিন্তু জীবন এখানে অন্ধকার আর মানুষগুলো যেন ছায়া। রাত্তিরে যখন রাস্তায় রাস্তায় উজ্জ্বল আলোগুলো জ্বলে উঠে, ক্ষুধার্ত মেয়েরা তখন বেরিয়ে আসে পয়সার বিনিময়ে নিজেদের দেহ বিক্রি করার জন্যে। সুস্বাদু খাবারের গন্ধে লোভার্ত চোখগুলো তাদের চকচক করে। শহরের বুকে প্রতিধ্বনিত হয় নিদারুণ দুঃখে ভরা করুণ চাপা একটা আর্তনাদ। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠার মতো শক্তিও বুঝি আর অবশিষ্ট নেই।

জীবন এখানে বিষণ্ণ আর উদ্বিগ্নতায় ভরা। সবাই পরস্পরের শত্রু, সবাই ভ্রান্ত। অল্প কয়েকজন যারা নিজেদের ন্যায়পরায়ণ বলে ভাবে, তারা পশুরই মতো নিষ্ঠুর।

সবাই বাঁচতে চায়, কিন্তু জানে না কেমন ভাবে বাঁচবে। নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলতে পারে না, ভবিষ্যতের দিকে চলতে গিয়ে পদে পদে বর্তমানের দিকে পেছন ফিরে তাকায়—যে বর্তমান দৈত্যের নিষ্ঠুর হাতে মানুষের পদ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জীবনকে বেঁধে রেখেছে তার ক্লেদাক্ত নাগপাশে।

জীবনের কুৎসিত ভাঙা-চোরা এই মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিহ্বল যন্ত্রণায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। আর জীবনও অগণন বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে মানুষের দিকে, যেখানে তাদের বুকের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবিগুলো ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর অসহায় আর্তনাদ নিষ্পেষিত হচ্ছে জীবনের যাঁতাকলে।

করুণ বিষণ্ণতা, উৎকণ্ঠা আর এই আতঙ্কেরই মাঝে অন্ধকার সারাটা শহর অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দির-আড়াল-করা বিশাল পাথরের স্তূপ নিয়ে। মানুষকে ঘিরে রেখেছে বন্দীশালার মতো, প্রতিহত করছে সূর্যের আলো।

জীবনের গান এখানে যেন ক্রুদ্ধ আক্রোশে ভরা অন্তিম আর্তনাদ, অবদমিত ঘৃণার জান্তব ধ্বনি, নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের স্নায়ুভেদী উন্মত্ত চিৎকার···

দুই

দুঃখ হতাশার ক্লান্তিকর এই বিষণ্ণতার মধ্যে দু একজন নিঃসঙ্গ স্বপ্নদ্রষ্টার দেখা মেলে বই কি। নিচের মহলে যেখানে গরীবরা থাকে, যারা সৃষ্টি করছে শহরের এই বিপুল ঐশ্বর্য, লোকে যাদের অবজ্ঞা করে, বিদ্রূপ করে, স্বপ্নদ্রষ্টারা অমিত বিশ্বাসে তাদের শোনায় বিদ্রোহের বাণী, ওরা যে সত্যের সুদূর অগ্নিশিখার বিদ্রোহী স্ফুলিঙ্গ। নিচের মহলের আঁধারে ওরা গোপনে নিয়ে আসে সহজ অথচ মহৎ এক বাণীর উর্বর অঙ্কুর, যা অসহায় মূক এইসব ক্রীতদাস-মানুষের বুকের মধ্যে একদিন ফুলে-ফলে বিশাল মহীরুহ হয়ে উঠবে।

আর অবহেলিত নিষ্পেষিত এই মানুষগুলো সন্দেহের চোরা-চোখে শোনে নতুন এক পৃথিবীর গান। যে গান শোনার জন্যে তারা এতদিন উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেছে, সেই গানের সুর শুনতে শুনতে তারা নিঃশব্দে মাথা তোলে। লোলুপ ক্ষমতা আর শোষণের যে জাল এতদিন তাদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিলো, সেই নিপুণ মিথ্যের জাল ছিঁড়ে ওরা নিজেদের মুক্ত করে।

চাপা অসন্তোষ ভরা তাদের জীবনে, অজস্র অন্যায়ে বিষাক্ত হয়ে-ওঠা তাদের হৃদয়ে, শক্তিমানের দম্ভে বিভ্রান্ত তাদের মনে, দুঃসহ গ্লানিময় তিক্ত অস্তিত্বের মাঝে হঠাৎ শোনা যায় দীপ্ত একটি শব্দ :

'কমরেড !'

শব্দটা তাদের কাছে নতুন নয়। এর আগেও শব্দটা তারা বহুবার শুনেছে, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তা ছিলো পরিচিত আর পাঁচটা শব্দেরই মতো নিতান্তই মামুলি, ফাঁকা একটা শব্দ, যা ভুলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এখন নতুন এক অর্থে শব্দটা স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত হলো তাদের কানে। যেন কঠিন বহুমুখী কোন দুর্লভ রত্নের মতো দীপ্ত জ্বলে উঠলো।

শব্দটাকে তারা সাবধানে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো নিজেদের কণ্ঠে। মা যেমন শিশুকে দোলনায় সন্তর্পণে দোলায়, তেমনি ভাবে শব্দটাকে তারা সযত্নে লালন করলো নিজেদের বুকের মধ্যে। আর শব্দটা যতই তাদের বুকের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগলো, ততই তাদের মনে হতে লাগলো শব্দটা কি আশ্চর্য উজ্জ্বল আর মধুর।

তারা বললো, 'কমরেড !'

তারা অনুভব করলো এই একটি মাত্র শব্দ যা তামাম দুনিয়াকে এক সাথে মেলাতে পারে, মানুষকে নিয়ে যেতে পারে মুক্তির উত্তুঙ্গ চূড়ায়, অসীম শ্রদ্ধায় পরস্পরকে বেঁধে দিতে পারে মৈত্রীর এক নতুন বন্ধনে।

এই শব্দটা যখন শিকড় গাড়লো মানুষের মনে, তখন তারা আর ক্রীতদাস রইলো না। তারা একদিন সারাটা শহরে সোচ্চার ঘোষণা করলো :

'ঢের হয়েছে, আর নয় !'

তারপর থেকে জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেলো। কেননা তারাই হচ্ছে এক-মাত্র সেই শক্তি যা জীবনকে গতি দেয়। জলধারা বন্ধ হয়ে গেলো, আগুন নিভে এলো, আঁধারে ডুবে গেলো সমস্ত শহর আর শক্তিমানেরা হয়ে পড়লো শিশুর মতো অসহায়। আতঙ্কিত হয়ে উঠলো অত্যাচারীর মন, নিজেদের বিষ্ঠার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো, বিদ্রোহীদের মিলিত শক্তি দেখে ভয়ে ঘৃণা প্রকাশ করতেও ওরা সাহস পেলো না। ক্ষুধার অপচ্ছায়াগুলো ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো। গির্জা আর বাড়িগুলোয় পড়লো বিষাদের ম্লান ছায়া, অশুভ নিস্তব্ধতায় গলিঘুপচিগুলো যেন মুমূর্ষু। জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেলো। কেননা যে শক্তি তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, সে এখন নিজেই নিজেকে চিনতে পেরেছে।

তাই দাসত্বের শৃঙ্খলে-বাঁধা মানুষগুলো তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করার সেই যাদু-মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে—নির্যাতনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে প্রত্যক্ষ করেছে তাদের আপন শক্তিকে, যে শক্তি স্রষ্টার।

এতদিন যারা নিজেদেরকে জীবনের প্রভু বলে মনে করতো, এবার ওদের ভাগ্যে দুঃখের দিন ঘনিয়ে এলো। মানুষের রক্ত আর ঘামে তিল তিল করে গড়া মৃত শহরে যে দু-একটা মৃদু শিখা টিমটিম করছে, তাতে আরও জমাট বেঁধে উঠেছে হাজারো রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। অন্ধ জানলাগুলো বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে পথের দিকে, সেখানে জীবনের নতুন প্রভুরা বলিষ্ঠ পায়ে ঘোরাফেরা করছে। তারাও ক্ষুধার্ত, প্রকৃতপক্ষে অন্যদের চাইতে আরও বেশি ক্ষুধার্ত। তবু ক্ষুধার এই তিক্ত অনুভূতিটা তাদের পরিচিত। জীবনের প্রভুদের কষ্টের চাইতে দৈহিক যন্ত্রণা তাদের অনেক কম, কেননা তাদের সত্তার গভীরে জ্বলছে এক উজ্জ্বল আলোক। আপন শক্তির চেতনায় তারা প্রোজ্জ্বল, আগামী বিজয়ের প্রতিশ্রুতিতে চোখগুলো তাদের চকচক করছে।

শহরের পথে পথে তারা ঘুরে বেড়ালো, যেখানে এতদিন পেয়েছে কেবল অপমান আর উপহাস, যেখানে তাদের বুকের মধ্যে জমেছে কেবল যন্ত্রণার পাহাড়। তারা উপলব্ধি করলো শ্রমের মহান তাৎপর্য, জীবনের নয়া কানুন বানাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে উঠলো। তখনই সাড়া-জাগানো চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় প্রতিধ্বনিত হলো নিটোল একটি শব্দ:

'কমরেড!'

বর্তমানের অলীক শব্দপুঞ্জের মাঝে দীপ্ত ঝঙ্কৃত হলো আগামীকালের এই সুন্দর শব্দটি, যে অনাগত সবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে এক নতুন জীবন নিয়ে। সে জীবন দূরে, না কাছে? তারা উপলব্ধি করলো সেটা স্থির করতে হবে তাদেরই। তারা সেই মুক্তিরই লক্ষ্যে এগিয়ে চললো।

তিন

গতকালও পর্যন্ত যে দেহপণ্যটি ছিলো আধপেটা পশুর মতো, ক্লান্ত ম্লান দেহে নোংরা গলির ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো কেউ এসে কটা পয়সার বিনিময়ে তার সোহাগ কিনবে, সেও কথাটা শুনেছে। কিন্তু সহজ ভাবে হেসে কথাটা ও উচ্চারণ করার সাহস পায়নি। ওর কাছে এগিয়ে এলো একটা মানুষ, যে এ পথ আর কখনও মাড়ায় নি, ওর কাঁধে হাত রেখে সে আন্তরিক স্বরে বললো:

'কমরেড!'

আনন্দের আতিশয্যে পাছে কেঁদে ফেলে সেই ভয়ে মেয়েটি কোমল ভাবে হাসলো। বিক্ষত বুকে এত তীব্র আনন্দ ও আর কখনও অনুভব করেনি। গতকালও যে-চোখের বেহায়া ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে ও পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থেকেছে, আজ সেই চোখে টলটল করে উঠলো সদ্যজাত আনন্দের দু ফোঁটা অশ্রু।

গতকালও পর্যন্ত যে ভিখিরিটার দিকে ধনীরা তার ঘ্যানঘ্যানানির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একটা কানাকড়ি ছুঁড়ে দিয়েছে, সেও এই কথাটা শুনেছে। কথাটা শুনে তার দারিদ্র্য-পীড়িত বুক ভিক্ষা পাওয়ার চাইতে নতুন এক আনন্দে ভরে গেলো।

আর এই কোচওয়ানটা যে খদ্দেরের তাড়া খেয়ে হাড়জিরজিরে ক্ষুধার্ত ঘোড়াটার পিঠে চাবুক চালিয়েছে, মারধোর খেতেই যে অভ্যস্ত, চাকার ঘড়ঘড়ানি শুনতে শুনতে যার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে, সেও অবাধ হেসে পথচারীকে বললো :

'তোমাকে কি পৌঁছে দেবো, কমরেড?'

কথাটা বলেই মনে মনে ভয় পেলেও থমথমে লাল মুখ থেকে সুখের হাসিটুকু সে মুছে ফেলতে পারলো না।

পথিক প্রীতিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো।

'ধন্যবাদ, কমরেড! আমি এই সামনেই যাবো।'

কোচওয়ান হাসলো, যেন সুখের অনুভূতিতে মুদে এলো চোখের পাতা। মুখে উৎচকিত শব্দ করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সে চলে গেলো।

লোকেরা দল বেঁধে রাস্তায় ঘুরছে, আর যে-শব্দটা তামাম দুনিয়াকে এক সাথে মেলাতে পারে সেই শব্দটা দীপ্ত স্ফুলিঙ্গের মতো নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে :

'কমরেড!'

রাস্তার মোড়ে একজন প্রবীণ বক্তৃতা দিচ্ছে, তার চারপাশে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন সেপাই কয়েক মিনিটের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলো। তারপর ভারিক্কি চালে বললো, 'রাস্তা জুড়ে এভাবে সভা করে বে-আইনী···চলে যান মশাইরা সব, চলে যান।' পরমুহূর্তেই গলার স্বর নামিয়ে ও আস্তে করে বললো :

'কমরেড···'

যারা তাদের বুকের মধ্যে এই শব্দটাকে বহন করছে, রক্তের মধ্যে লালন করছে এই মন্ত্রটাকে, তূর্যনিনাদে তুলছে ঐক্যের আহ্বান, তাদের মুখগুলো সৃষ্টির তরুণিমায় দীপ্ত উজ্জ্বল। তারা বুঝতে পেরেছে এই কথাটার পেছনে যে বিরাট শক্তি রয়েছে সে শক্তি অপরাজেয় দুর্মর।

যদিও ন্যায়ের জন্যে যারা লড়ছে সেইসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সশস্ত্র বাহিনীকে সুসজ্জিত করা হয়েছে, তবু এই শহরের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলিপথে, অজানা শ্রমিকদের হাতে-গড়া হিমেল দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়ছে, পূর্ণতা পাচ্ছে ভ্রাতৃত্বের এক অসীম আত্মপ্রত্যয়।

'কমরেড !'

এখানে ওখানে জ্বলে উঠছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, একদিন মানুষের বলিষ্ঠ চেতনায় যা দাবদাহের মতো আচ্ছন্ন করে ফেলবে সমস্ত পৃথিবী। তারপর সেই লেলিহ শিখায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে যা কিছু ঘৃণা, বিদ্বেষ আর নিষ্ঠুরতা। তার অসহ্য তাপে সমস্ত হৃদয় গলে গিয়ে গড়ে উঠবে একটি হৃদয়, মুক্ত স্বাধীন শ্রমজীবী পরিবারের ঘন সন্নিবিষ্ট তামাম নারী পুরুষের অভিন্ন এক মহৎ হৃদয়।

ক্রীতদাসদাসীর রক্ত আর ঘামে গড়া এই মৃত শহরের অলিতে গলিতে, যেখানে নৃশংসতা একদিন ভয়ের রাজত্ব চালিয়েছিলো, সেই শহরেরই প্রতিটি রাজপথে মানুষ নিজেদের আর দুনিয়ার অশুভ শক্তিকে জয় করার জন্যে সঞ্চয় করছে তাদের অমিত শক্তি।

বিষণ্ণ অস্তিত্ব আর অসন্তোষ-ভরা এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্বচ্ছ উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের মতো আগামীকালের দীপ্ত মশাল হয়ে জ্বলজ্বল করছে সেই মর্মস্পর্শী একটি কথা :

'কমরেড !'

১৯০৫

নয়ই জানুয়ারি

জনতাকে ঠিক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ঊর্মিল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। উত্তাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। মুখগুলোকে দেখাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় অস্পষ্ট ফেনার মতো। উত্তেজনায় চোখগুলো চকচক করছে, তবু পরস্পরের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে। যেন নিজেদের অটল সংকল্পে নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছে না। ওদের টুকরো টুকরো কথাগুলো মাথার ওপরে ছোট ছোট ধূসর পাখির মতো চক্রাকারে ঘুরছে।

থমথমে চাপা গলায় ওরা আলাপ করছে, যেন নিজেরাই নিজেদের কাছে জবাবদিহি করছে। 'আর সহ্য করা অসম্ভব! সেই জন্যেই তো এলাম…'

'কারণ না থাকলে কেউ মাগনা আসে না।'

'সে কথা 'উনি' কি বোঝেন না?'

ওদের অধিকাংশ আলাপ-আলোচনা এই 'উনি' সম্পর্কে। 'উনি' ভালো, 'উনি' সুহৃদ, এক নজরেই 'উনি' সবকিছু বুঝতে পারবেন…কিন্তু ওরা যে-ভাবে ওঁর সম্পর্কে বলছে তার মধ্যে রঙিন কোন আবেগ নেই। যেন 'ওঁর' সম্পর্কে কেউ গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করেনি, কিংবা 'উনি' যে জীবন্ত সে-সম্পর্কে কারুর কোন ধারণা নেই। কিংবা তা যদি নাও হয়, 'উনি' যে সত্যিকারের কি, কেন, বা কি করতে পারেন—সে-সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না। অথচ আজ 'ওঁর' প্রয়োজন। সকলেই 'ওঁকে' জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব। যদিও ওঁর প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না, তবু সবার ধারণা 'উনি' মহান একটা কিছু। বিপুল ওদের আশা, এবং এই আশাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে মহৎ একটা কিছু করা দরকার।

মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে দু একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর:

'কমরেড! ভাঁওতাবাজিতে নিজেদের ভোলাবেন না…'

অথচ নিজেরাই নিজেদের আত্ম-প্রবঞ্চনায় ভোলাচ্ছে। আতঙ্কিত, ক্রুদ্ধ চিৎকারে ডুবে গেলো সেই কণ্ঠস্বর।

'খোলাখুলি ভাবেই আমরা বেরিয়ে আসতে চাই।'

'আরে ভাই, তুমি চুপ করো তো…'

'তাছাড়া ফাদার গ্যাপন তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন…'

'উনি জানেন…'

বিসর্পিল পথ ধরে জনতা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, ধাক্কা খাচ্ছে, মর্মরিত গুঞ্জন তুলছে, তর্ক আর আলাপ-আলোচনা করছে, দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ছে, আবার ফিরে আসছে রাস্তার মাঝখানে—উত্তাল উদ্দাম জনসমুদ্র। সন্দেহ কিংবা চরম লক্ষ্যের পথকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে এমন কিছুর তীব্র আশায় ওরা দুলে উঠছে। নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে এমন একটা বিশ্বাস, যা টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একত্রে জোড়া লাগিয়ে সৃষ্টি করবে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ একটা অবয়ব। নিজেদের দুর্বল বিশ্বাসকে ওরা গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। ফলে আশঙ্কার অস্পষ্ট একটা অনুভূতি, বিশেষ করে শব্দ সম্পর্কে তীব্র সংবেদনাগুলি ওদের মধ্যে আরও নগ্ন হয়ে পড়েছে। সতর্ক ভঙ্গিতে কান খাড়া করে সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন কি খুঁজতে খুঁজতে ওরা মন্থর পায়ে এগিয়ে চলেছে। বাইরের শক্তির ওপর বিশ্বাস না রেখে যারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রেখেছিলো যে বর্তমান শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বোঝাপোড়া করার অধিকার ওদের আছে, তাদের কণ্ঠস্বরে জনতা ভীত ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

রাস্তা থেকে রাস্তায় দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চলেছে জনস্রোত। একটু একটু করে সৃষ্টি হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়ের মনোভাব, জেগে উঠছে একটা তীব্র চেতনা যে গোলামদেরও অধিকার আছে সরকারকে তাদের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দিতে বলা।

'যা খুশি বলো না কেন, কিন্তু আমরাও তো মানুষ···'

' 'উনি' নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে আমরা শুধু জানতে চাই···'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন ! আমরা তো আর বিদ্রোহ করতে আসিনি···'

'তা ছাড়া ফাদার গ্যাপন রয়েছেন···'

'কমরেড ! স্বাধীনতা এত সহজে মেলে না···'

'হা, ভগবান !'

'একটু সবুর করো না, ভাই !'

'এই শয়তানটাকে দূর করে দাও !'

'ফাদার গ্যাপন ভালো কোরেই জানেন···'

কাঁধের ওপর হলদে তালি লাগানো কালো ওভারকোট-পরা লম্বা মতন একজন লোক উঁচু ঢিপির উপর উঠে দাঁড়ালো, তারপর টাক-পড়া মাথা থেকে টুপিটা খুলে চড়া আর গম্ভীর গলায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। চোখ

দুটো চকচক করছে, গলাটা কাঁপছে। 'উনি' আর তার সম্পর্কে সে বক্তৃতা দিচ্ছে।

প্রথম দিকে লোকটার কণ্ঠস্বরে, তার কথা বলার ভঙ্গিতে কৃত্রিম একটা জড়তা ছিলো, এমন কোন উদ্দীপ্ত আবেগই ছিলো না যাতে করে ও আশ্চর্য অলৌকিকতায় অন্যদের অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারতো। মনে হচ্ছে যে ব্যক্তি বহুকাল আগেই তার প্রাণ-সত্তা হারিয়েছে, যে অবলুপ্ত, তাকেই মূর্ত করে তোলার জন্যে যেন লোকটা আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। ভাবটা এই রকম—যেন সারা জীবন 'উনি' মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে ছিলেন, অথচ এখন মানুষ বুক-ভরা সমস্ত আশা নিয়ে চাইছে 'ওঁকে'ই।

তারপর দেখতে দেখতে মৃত মানুষটা একটু একটু করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। জনতা কানপেতে শোনে, তারা অনুভব করে—'ওঁর' সম্পর্কে একটা অলীক ধারণা নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠলেও, তাদের কল্পনার সঙ্গে 'ওঁর' প্রকৃত প্রতি-মূর্তির মিল খুব কম থাকলেও, এই ধরনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একজন আছে, না থেকে পারে না। বক্তার অভ্রান্ত ধারণা ক্যালেণ্ডারের প্রতিকৃতি থেকে যে মানুষটি সবার পরিচিত, তিনি আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সেই মানুষটি অভিন্ন। উঁচু গলায়, বক্তার স্পষ্ট উচ্চারণে রূপকথার প্রতিমূর্তি থেকে ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে একটা মানুষের ছবি—অমিত ক্ষমতার অধিকারী, ন্যায়পরায়ণ আর জনসাধারণের হিত-কল্যাণে যাঁর মনো-ভাব প্রায় পিতৃসুলভ।

বিশ্বাস করতে করতে জনতা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়, যখন ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, মুছে যায় সন্দেহের চাপা ফিসফাস, যেন এরই জন্যে ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলো। ওরা পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, কাঁধ আর নিতম্বের ঘন সন্নিবেশে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ওরা, আশা আর সাফল্যের দৃঢ় প্রত্যয়ে ভরে ওঠে সারা বুক।

'লাল ঝাণ্ডা আমরা চাই না!' চিৎকার করে বলে বক্তা। টুপি নাড়তে নাড়তে সে এগিয়ে আসে ভিড়ের দিকে, ফ্যাকাশে আলোয় চকচক করে তার মাথার টাক। সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তার ওপর।

'আমরা যাচ্ছি আমাদের বাপের কাছে।'

' 'উনি' আমাদের কখনও পায়ে ঠেলতে পারেন না।'

'কমরেড, লাল হচ্ছে আমাদের রক্তের রঙ।' জনতার মাথার উপর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয় বলিষ্ঠ একটা কণ্ঠস্বর।

'জনগণের সম্মিলিত শক্তি ছাড়া কেউ জনগণকে মুক্তি দিতে পারে না।'

'আরে থাম্ বাবা, থাম্।'

'প্ররোচকদের সব হটাও। ওদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই!'

'ফাদার গ্যাপন যাচ্ছেন ক্রুশ নিয়ে, আর ও ব্যাটা এসেছে ঝাণ্ডা নিয়ে!'

'তোমার বয়েস কত হে ছোকরা, যে মোড়লি করতে এসেছো!'

নিজেদের ওপর বিশ্বাস যাদের কম তারা ভিড়ের মধ্যে থেকে ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'যে ব্যাটা ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে চলেছে, ওকে প্যাঁদাও!'

এবার ওরা আরও দ্রুত পায়ে হাঁটছে, কোন দ্বিধা নেই, যেন আত্মপ্রবঞ্চনার উন্মাদনায় প্রতিটা পদক্ষেপে ফুটে উঠেছে কৃত্রিম একতার একটা ছন্দ। যে 'উনি'কে ওরা এইমাত্র সৃষ্টি করলো তা ওদের মনের গহনে জাগিয়ে তুলেছে প্রাচীনকালে উদারচেতা বীরদের প্রতিচ্ছবি, ছেলেবেলায় শোনা রূপকথারই অনুরণন। আর মানুষের মনে বিশ্বাস করার যে অদম্য স্পৃহা, সেই স্পৃহার কেন্দ্রে ওদের কল্পনায় 'উনি' একটু একটু করে রূপ নিচ্ছেন…

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, ' 'উনি' আমাদের ভালোবাসেন!'

তাতে আর সন্দেহ কি! এই বিপুল জনসমষ্টি যাঁকে এইমাত্র সৃষ্টি করলো তার ভালোবাসায় ওদের অগাধ আস্থা আছে বই কি।

রাস্তা থেকে বেরিয়ে জনস্রোত যখন বাঁধের ওপর এসে পড়ে, তখন দেখা যায় আঁকা-বাঁকা দীর্ঘ একসারি সৈন্য সেতুর মুখ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এই তুচ্ছ অবরোধে জনতা দমে না। চওড়া নদীর নীলাভ পটভূমিতে দাঁড়ানো সৈন্যদের মূর্তিগুলোকে আদৌ হিংস্র মনে হচ্ছে না, বরং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে-আসা পা-গুলোকে গরম রাখার জন্যে ঠুকছে, হাত নাড়ছে, পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করছে। নদীর অন্য পারে আবছা বিরাট একটা প্রাসাদ চোখে পড়ে। ওখানেই থাকেন 'উনি', মহান, সর্বশক্তিমান, স্নেহপরায়ণ, তাদের সেই জার। তারা ওঁকে ভালোবাসে, ওঁর কাছে চলেছে নিজেদের প্রয়োজনের কথা জানাতে, আর সেই 'উনি' সৈন্যদের আদেশ দেবেন তাদের বাধা দিতে, এ হতেই পারে না।

তবু অনেকের মুখে অসহায় বিহ্বলতার একটা ছায়া পড়ে, সামনের সারির লোকগুলোর চলার গতি কমে আসে। কেউ কেউ পেছনে ফিরে তাকায়, অনেকে ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে পাশে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রত্যেকেই এমন ভাব করে যেন সৈন্য উপস্থিত থাকবে এ তো জানা কথা, এতে অবাক হবার

কিছু নেই। কেউ কেউ আকাশের গায়ে দুর্গ-চূড়ার সোনালী দেবদূত মূর্তিটার দিকে অলস চোখে তাকিয়ে থাকে। সমবেদনার সুরে কে যেন বলে, 'সৈন্যদের বোধহয় ঠাণ্ডা লাগছে…'

'হ্যাঁ…'

'তবু না-দাঁড়িয়ে থেকেই বা উপায় কি!'

'নিশ্চয়ই, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গেলে ওদের প্রয়োজন বইকি!'

'গোলমাল কোরো না ভাইসব, শান্ত হও!'

হঠাৎ কারা যেন চিৎকার করে উঠলো, 'সৈনিক, জিন্দাবাদ!'

মাথায় হলদে শিরস্ত্রাণ-পরা একজন অফিসার খাপ থেকে তার তলোয়ারটা টেনে বার করে, তারপর ইস্পাতের ঝকঝকে বাঁকা ফলাটা শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে জনতাকে কি যেন বলে। চকিতে সৈন্যেরা 'প্রস্তুত' অবস্থায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়।

মোটাসোটা চেহারার একজন মহিলা জিগেস করলো, 'ওরা কি করছে?'

কেউ তার কথার জবাব দিলো না। সবাই দেখলো সামনে পা-ফেলার আর একটুও জায়গা নেই।

'ব্যাস, আর এক পাও নয়।' অফিসার চিৎকার করে বললো।

কেউ কেউ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো জমাট-বাঁধা মানুষের শরীরের কালো একটা নদী অন্তহীন প্রবাহের মতো তখনও ধেয়ে আসছে। এই উদ্দাম প্রবাহের চাপ সামলাতে না পেরে জনতা সেতুর সামনের ফাঁকা জায়গাটা ক্রমশ ভরিয়ে তুলছে। কয়েকজন লোক সাদা রুমাল নাড়তে নাড়তে অফিসারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এগিয়ে গেলো।

'আমরা আমাদের জারের কাছে যেতে চাই!'

'সম্পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেই আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

'সরে দাঁড়াও। নাহলে আমি গুলি চালাবার আদেশ দিতে বাধ্য হবো।'

অফিসারের কথায় জনতার মধ্যে বিস্মিত গুঞ্জরনের ঢেউ বহে গেলো। কেউ কেউ অবশ্য আগেই বলেছিলো 'ওঁর' কাছে তাদের যেতে দেওয়া হবে না, তবু গুলি চালাবার এই হুমকিতে 'ওঁর' সম্পর্কে তাদের গড়ে-তোলা সেই মূর্তিটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেলো। 'উনি' হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, কেন 'উনি' অন্যকে ভয় করতে যাবেন, কেনই বা চাইবেন সঙ্গিন আর বুলেটে ওঁর আপন মানুষদের ফিরিয়ে দিতে…

শুকনো দড়ি-পাকানো চেহারার একটা লোক হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, 'গুলি করবে? করুক তো দেখি!'

'কেমন, আগে আমি বলিনি যে ওরা আমাদের যেতে দেবে না?'

'কারা? সৈন্যরা?'

'সৈন্যরা নয়। ওই যে, যারা ওখানে রয়েছে…' হাত নেড়ে সে দূরের দিকে দেখিয়ে দিলো। 'এমনটা যে হবে আমি জানতুম!'

'এখনও তো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না…'

'ওরা যখন শুনবে আমরা কেন এসেছি, তখন আমাদের নিশ্চয়ই যেতে দেবে!'

গোলমাল বেড়ে ওঠে। শোনা যায় জনতার ক্রুদ্ধ চিৎকার আর বিদ্রূপ। নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে শিরশিরে হিমেল বাতাস। টানটান মেলে-ধরা সঙ্গিনগুলো ঝিকমিক করছে। পেছন থেকে চাপ সহ্য করতে না পেরে লোকে সামনের দিকে ঠেলাঠেলি করছে। এলোমেলো মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। যারা এতক্ষণ রুমাল নাড়ছিলো, তারা ফিরে এসে মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে। অথচ যারা সামনের দিকে দাঁড়িয়েছিলো, স্ত্রী পুরুষ শিশু সবাই এখন সাদা রুমাল নাড়তে শুরু করেছে।

'গুলি করবে? কি বলছো তোমরা? খামাখা গুলি করতে যাবে কেন?'

কথাটা বললো কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একজন বয়স্ক লোক। 'তার মানে আসলে ওরা আমাদের সেতুর ওপর দিয়ে যেতে দেবে না। ওরা চায় আমরা সোজা বরফের ওপর দিয়ে নদীটা পেরিয়ে যাই।'

হঠাৎ চাপা একটা গুমগুম শব্দ শোনা গেলো। যেন অগণন অদৃশ্য চাবুক দিয়ে জনতাকে মারা হচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে সব কণ্ঠস্বর যেন জমাট বেঁধে গেলো, তবু ভিড়ের চোটে মানুষ সামনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

'ফাঁকা আওয়াজ,' শুকনো গলায় কে যেন কথাটা বললো। এটা ওর প্রশ্ন না বক্তব্য, স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

কিন্তু এখানে ওখানে চাপা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, ভিড়ের মধ্যে মানুষের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে কয়েকটা দেহ। বুকের উপর হাত চেপে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে একজন মহিলা এগিয়ে গেলো উদ্যত সঙ্গিনের দিকে। কয়েকজন লোক দ্রুত ছুটে যায় তার পেছন পেছন, কয়েকজন আবার তাকে পাশ কাটিয়েও ছুটতে থাকে তার আগে আগে।

আবার রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেলো। এবার আরও স্পষ্ট। যারা বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েছিলো তারা শুনতে পেলো তক্ত ফাটার প্রচণ্ড শব্দ, যেন অদৃশ্য হিংস্র দাঁতে কারা কামড় বসাচ্ছে। বেড়ার গা ঘেঁষে একটা বুলেট চলে গেলো, ছিটকে-ওঠা কাঠের টুকরো এসে লাগলো লোকের মুখে। দুজন তিন জন করে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো মাটিতে। কেউ কেউ তলপেট চেপে ধরে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছে, কয়েকজন আবার প্রায় বুকে হেঁটে বরফ পার হচ্ছে। বরফের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল টকটকে লাল রক্ত। রক্তের দাগগুলো ক্রমশ বড় হচ্ছে, ধোঁয়া উঠছে, সবার চোখ গিয়ে পড়ছে তার ওপর···মুহূর্তের জন্যে সবাই থমকে যেন পাথর বনে গেছে। তারপরেই উঠলো হাজারো কণ্ঠে বুক-কাঁপানো ক্রুদ্ধ একটা গর্জন। যেন অসহ্য যন্ত্রণায়, আতঙ্কে, প্রতিবাদে, শোকার্ত বিলাপে সে-গর্জন বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়লো একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে।

হতাহতদের তুলে আনার জন্যে কয়েকদল লোক নিচু হয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। আহতরা হাত-পা ছুঁড়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে। সবার মুখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেছে, চোখগুলো উন্মাদের মতো চকচক করছে। সে-চোখে ভয় বা আতঙ্কের কোন চিহ্ন নেই। যা-কিছু ভয় যেন তাদের বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। বরফের ওপর ছড়ানো-রক্তের দিকে তারা অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে বিশৃঙ্খল মানুষের ভিড়ে শায়িত নিস্পন্দ নিথর মৃতদেহগুলোর দিকে। সে-চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে জ্বলন্ত ঘৃণা, শোকার্ত অক্ষম ক্রোধ আর অজস্র বিহ্বলতা। চোখগুলো আশ্চর্য রকমের অনড়, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে ভ্রূগুলো টানটান, মুষ্টিবদ্ধ বাহু আর বিক্ষুব্ধ শরীরের প্রতিটা শিরা-উপশিরা। মনে হচ্ছে যেন অবসন্ন আত্মবিধ্বংসী একটা বিমূঢ়তা সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। অথচ একটু আগেও স্পষ্ট একটা ধারণা নিয়ে তারা একসঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে এসেছিলো, চোখের সামনে ছিলো রূপকথার সেই মহিমান্বিত মূর্তি—যাঁকে তারা শ্রদ্ধা করেছিলো, ভালোবেসেছিলো, যাঁকে অবলম্বন করে বিপুল আশায় ভরে উঠেছিলো তাদের সমস্ত বুক। কেবল দু-ঝাঁক ঝাঁক গুলি, রক্ত, মৃতদেহ আর আর্তনাদ···তারপরেই দেখলো তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে ধূসর একটা শূন্যতার সামনে, কোন আশা সেই, বুকগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

একই জায়গায় তারা ঘুরছে, যেন অদৃশ্য কোন বেড়িতে বাঁধা, যে বেড়ি

ভাঙার ক্ষমতা তাদের নেই। কয়েকজন নিঃশব্দ শোকার্ত ভঙ্গিতে হতাহতদের তুলে নিয়ে গেলো, অন্যরা এমনভাবে তাকিয়ে দেখলো যেন ওরা স্বপ্ন দেখছে। অনেকে মাথা থেকে টুপি খুলে ঘুষি পাকিয়ে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে অশ্লীল ভাষায় চিৎকার করতে লাগলো।

উদ্যত রাইফেল হাতে সৈন্যরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে। ঋজু মুখ, টানটান গালের চামড়া, চিবুকের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে সব সৈনিকেরই চোখগুলো সাদা আর ঠোঁটগুলো ঠাণ্ডায় জমে গেছে···

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন মৃগীরোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভুল করেছে, ভাইসব, ওরা ভুল করেছে। নিশ্চয়ই ওরা অন্য কারুর সঙ্গে আমাদের গুলিয়ে ফেলেছে। নাহলে, এ অসম্ভব! চলো ভাইসব, আমরা ওদের কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলি।'

একটা ছেলে ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে ওপরে উঠে চিৎকার করে বললো, 'গ্যাপন বেইমান!'

'দেখলে না কমরেড, ওরা আমাদের কেমন অভ্যর্থনা জানালো···'

'না, নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে! এমন হতেই পারে না! চলো গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসি।'

'সরুন সরুন, আহতদের জন্যে পথ করে দিন!'

শুকনো দড়ি পাকানো লোকটাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে দুজন শ্রমিক এবং একজন স্ত্রীলোক। লোকটার সর্বাঙ্গে বরফ লেগে রয়েছে, ওভারকোটের হাতা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। বিবর্ণ পাংশুল মুখ, খাড়া নাক, মৃদু ঠোঁট নেড়ে সে ফিসফিস করে বললো, 'আমি আগেই বলছিলুম না ওরা আমাদের যেতে দেবে না! আমাদের থেকে ওরা 'ওঁকে' দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সাধারণ মানুষদের জন্যে 'ওঁর' ভারি বয়েই গ্যাছে!'

'এই, অশ্বারোহী সৈন্য!'

'পালাও পালাও!'

নড়ে উঠলো সারিবদ্ধ সৈন্যের দেওয়াল, মাঝখান থেকে খুলে গেলো কাঠের দুটো পাল্লার মতো। আর সেই ফাঁক দিয়ে দুজন দুজন করে টগবগিয়ে প্রবেশ করলো একদল অশ্বারোহী সৈন্য। অফিসারের উৎচকিত আদেশ শোনা গেলো, ঘোড়সওয়ারদের মাথার ওপরে ঝলসে উঠলো বাঁকানো তলোয়ারের রূপোলী ঝিলিক, যেন চাবুকের তীক্ষ্ণ স্বননে খান খান হয়ে গেলো হিমেল বাতাস। নড়ে

উঠলো জনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর, উত্তেজিত, তারা প্রতীক্ষা করছে, যেন নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

একটু নিস্তব্ধতার পরেই হঠাৎ শোনা গেলো তীক্ষ্ণ আদেশ 'মা-আ-র-চ!'

প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণীঝড় আছড়ে পড়লো মানুষের মুখে, যেন প্রতিটা আঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠলো পায়ের নিচের মাটি। তারপরেই হতাহতদের ফেলে ভয়ার্ত উন্মাদের মতো যে যার ছুটতে শুরু করলো। ওদের পেছন পেছন ধেয়ে আসছে ঘোড়ার খুরের ভারি শব্দ, টপকে টপকে পার হচ্ছে হুমড়ি খেয়ে-পড়া আহত আর মৃত দেহগুলো। শোনা যাচ্ছে ইস্পাতের ফলার সঙ্গে হাড়ের ঠোকাঠুকির শব্দ, আহতের একটানা অন্তিম আর্তনাদ···'আ-আ-আ!'

মানুষের মাথা লক্ষ্য করে অশ্বারোহীরা তলোয়ার চালাচ্ছে, আর প্রতিবারে আঘাত হানার আগে হিংস্রভাবে দাঁত খিচিয়ে ঘোড়াগুলো হ্রেষাধ্বনি করছে, অস্থির হয়ে মাথা নাড়ছে ঘন ঘন।

যে-পথ দিয়ে মিছিল এসেছিলো সেই পথ পর্যন্ত লোকজনদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। আর ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। তখনও হাঁপাচ্ছে, চোখে স্তব্ধ বিস্ময়। অনেকেরই মুখে কেমন যেন অপরাধী-অপরাধী ভাব। কে যেন ম্লান হেসে বললো, 'আমি কিন্তু দৌড়োইনি!'

'বাজে বোকো না! সবাইকে কুকুর-ছোটা করিয়ে ছেড়েছে!'

সহসা চারদিকেই একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শোনা গেলো, 'এ সবের অর্থ কি···'

'ভাইসব, আপনারাই বলুন এটা খুন কি না!'

'তাছাড়া আর কি?'

'এদেশে আবার সরকার বলে কোন পদার্থ আছে নাকি!'

'নাহলে এভাবে কেউ খুন করে? আমাদের ওপর ঘোড়া ছোটায়···'

বিহ্বল বিস্ময়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে যার মনের ঝাল ঝাড়ে। বুঝতে পারে না কি করবে। তবু কেউ নড়েও না, বরং পরস্পরের আরও গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চেষ্টা করে এলোমেলো বিশৃঙ্খল এই অনুভূতি কাটিয়ে কোন একটা পথ খুঁজে পেতে। কান খাড়া করে ওরা উদ্বিগ্ন চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন কোন একটা কিছুর আশায় ওরা অপেক্ষা করছে। যত না ভয়, ওরা অবাক হয়েছে তার চাইতে বেশি। কিন্তু সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত। তবু অপ্রত্যাশিত, আতঙ্কবিহ্বল, অনর্থক নিরপরাধীর এই রক্ত ঝরার মুহূর্তে

সবার মনোবল একসাথে মিশে অস্বাভাবিক একটা কিছু রূপ নেবার জন্যে উদ্দাম হয়ে উঠে…

হঠাৎ একজন তরুণের দীপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'চলুন, আহতদের তুলে নিয়ে আসি !'

জড়তা কাটিয়ে সবাই নড়ে উঠে, তারপর দ্রুত ধেয়ে যায় নদীর দিকে। রক্ত আর বরফে মাখামাখি হয়ে আহতরা আসছে উলটো দিক থেকে—কেউ বুকে হেঁটে, কেউ বা টলতে টলতে। তাদের ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো। কয়েকটা টমটম থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে তার জায়গায় আহতদের তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সবায়েরই মুখ থমথমে আর বিষণ্ণ। আহতদের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ওরা কি যেন যাচাই করে, অবয়বহীন অলীক কালো ছায়ার মতো এই যে ভয়ঙ্কর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তার জবাব খুঁজে পাবার জন্যে ওরা তন্ময় হয়ে কি যেন চিন্তা করে। একটু আগেও যে বীর, অসীম দয়াময় উদার সেই জারের প্রতিমূর্তিটা ওরা মনে মনে গড়ে তুলেছিলো, সেটা নিঃশব্দে মুছে গেছে। তবু খুব অল্প কয়েকজনই স্বীকার করতে সাহস পায় যে মূর্তিটা সত্যিই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এ কথা স্বীকার করা কঠিন, কেননা স্বীকার করা মানেই ওদের একমাত্র আশা ধুলোয় ম্লান হয়ে যাওয়া।

মাথায় টুপি নেই, কোঁকড়ানো কালো চুল, চওড়া-কাঁধ একটি ছেলে এবং ফারের জীর্ণ কোট-পরা বিষণ্ণ চেহারার একজন মহিলা হলদে তালি-লাগানো ওভারকোট-পরা টাক-মাথা সেই লোকটাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে। টাক মাথাটা রক্তে মাখামাখি, কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে, হাঁটুতে যেন কোন জোর নেই। 'কি অবাক কাণ্ড বলতো, মিখাইলো ?' আহত লোকটা বিড়বিড় করে বললো। 'আমাদের ওপর গুলি চালালো ! আমি যেন এখনও ভাবতেই পারছি না !'

'কিন্তু ঘটনাটা সত্যি !' ছেলেটার কণ্ঠস্বর যেন অসন্তোষে ফেটে পড়লো।

মহিলাটি ম্লান হতাশ স্বরে বললো, 'শুধু গুলিই চালায়নি, তরোয়াল দিয়েও কেটে কুচি কুচি করেছে…'

'আমার কি মনে হয় জানো মিখাইলো, ওদের হয়তো এই আদেশ…'

'নিশ্চয়ই !' ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো ছেলেটির কণ্ঠস্বর। 'তা নয়তো কি আপনার মনে হয় ওরা আমাদের সঙ্গে আলাপ বা আদর-আপ্যায়ন করতে এসেছে ?'

'একটু দাঁড়াও তো, মিখাইলো…' আহত লোকটা কোন রকমে একটা

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, তারপর চিৎকার করে বলে, 'খ্রীষ্টান ভাইসব, ওরা আমাদের কেন খুন করলে ? এ কোন্ আইনে ? কার আদেশে ?'

মাথা নিচু করে লোকজন যাওয়া আসা করছে।

খানিকটা পরে রাস্তার কোণে একদল লোক জড় হয়েছে। সেই জটলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে যেন ক্রুদ্ধ সন্ত্রস্ত গলায় বলে, 'গত রাত্রে ফাদার গ্যাপন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তার মানে আজ কি ঘটবে উনি জানতেন। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।'

'কেন, তাতে ওর কি লাভ ?'

'সে আর আমি কি করে জানবো ?'

উত্তেজনা বাড়ে। প্রত্যেকেই এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হয় যা তখনও অস্পষ্ট। অথচ প্রত্যেকেই অনুভব করে প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জরুরী এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, যার জবাব কোনমতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। আবার বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে এমন আশা করাও বোকামি, উত্তেজনার আগুনে তাদের সে-আশা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

জীর্ণ পোশাক-পরা, কোমল মুখ, বড় বড় বিষণ্ণ চোখ, মোটাসোটা একজন মহিলা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলো। রক্তমাখা বাঁ হাতটা ডান হাতে চেপে কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, 'এখন আমি কি করে কাজ করবো ? কেমন করে ছেলেমেয়েদের খাওয়াবো ? জার নিজে যদি আমাদের বিরুদ্ধে যান তাহলে আর কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো ?'

মায়ের আর্ত অথচ স্পষ্ট প্রতিটা প্রশ্ন জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তুললো, তাদের নাড়া দিলো। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো, কান পেতে শুনলো তার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর, 'তার মানে সাধারণ মানুষদের জন্যে কোনো আইন নেই !'

কয়েকজন গভীর নিশ্বাস ফেললো। কেউ কেউ গালাগালি দিলো। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'লাভের মধ্যে লাভ যা হলো···ওরা আমার ছেলের ঠ্যাংটাই ভেঙে দু টুকরো করে দিলো।'

'আর আমার পিটারকে খুন করেছে।'

এই ধরনের আরও অজস্র ক্রুদ্ধ প্রতিধ্বনি শোনা গেলো। যেন চাবুকে চাবুকে উদ্দীপ্ত করে তুললো তাদের প্রতিহিংসার সুপ্ত বোধকে—হ্যাঁ, এই কসাইদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করা দরকার। দেখতে দেখতে জনতার বিবর্ণ

মুখে ফুটে উঠলো সিদ্ধান্তের অস্পষ্ট একটা আভাস। 'কমরেড, চলুন আমরা শহরে যাই। হয়তো শেষ পর্যন্ত এসবের একটা অর্থ খুঁজে পাবো···চলুন, বরং শহরেই যাওয়া যাক!'

'ওরা আমাদের খুন করবে···'

'সৈন্যদের সঙ্গে বরং একবার কথা বলা যাক। ওরা হয়তো বুঝতে পারবে এভাবে মানুষ খুন করাটা কত অন্যায়, আইনবিরুদ্ধ।'

'আইনবিরুদ্ধ কিনা আপনি কি করে জানলেন? হয়তো সত্যই এরকম কোন আইন আছে।'

দেখতে দেখতে জনতা রূপান্তরিত হয়ে গেলো জনগণে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তরুণরা সবার আগে ছুটছে নদীর দিকে। ইতিমধ্যে আরও হতাহতদের বয়ে আনা হয়েছে। উষ্ণ রক্তের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, শোনা যাচ্ছে ক্রুদ্ধ উত্তেজিত চিৎকার আর আর্তনাদ।

'ইয়াকভ জিনিনের কপালে গুলি লেগেছে···'

'তার জন্যে আমাদের ক্ষুদে-বাপ, জারকে ধন্যবাদ!'

'হ্যাঁ, যা চমৎকার একটা খেল্ দেখালেন।'

কতকগুলো অশ্লীল মন্তব্য শোনা গেলো। মাত্র মিনিট পনেরো আগেও কেউ যদি এমন একটিও মন্তব্য করতো তবে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো জনতা নিজেই।

একটি বাচ্চা মেয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সবাইকে জিগেস করছে, 'তোমরা কেউ আমার মাকে দেখেছো?'

লোকজনেরা নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

খানিকটা পরে হাতে গুলি-বেঁধা সেই মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'এই যে, আমি এখানে!'

দেখতে দেখতে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেলো। তরুণরা আগেই চলে গেছে, বয়স্করা চলেছে দুতিনজন করে দল বেঁধে। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে ধীরে সুস্থে ওরা হাঁটছে আর আড়চোখে দ্রুতগামী তরুণদের দিকে তাকাচ্ছে। কথা বলছে খুবই কম। মাঝেমধ্যে শুধু দু একজন যারা নিজেদের তিক্ত অনুভূতিটাকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না, চাপা স্বরে মন্তব্য করছে:

'তাহলে জনসাধারণকে ওরা দূরেই সরিয়ে রাখতে চায়···'

'জাহান্নমে যাক সব, খুনীর দল!'

নিহতদের জন্যে ওরা দুঃখ প্রকাশ করে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে বিশ্রী একটা দাস-মনোভাবের মৃত্যু ঘটেছে সেটাও ওরা আভাসে বুঝতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে ওরা বিচক্ষণের মতো একটি কথাও উচ্চারণ করে না। যেমন উচ্চারণ করে না, 'তাঁর' নামটা, যেন কত শ্রুতিকটু, যেন বুকের মধ্যে যে বেদনা যে ক্রোধটা ধিকধিক জ্বলছে তাকে ওরা আর নাড়াতে চায় না···

কিংবা এমনও হতে পারে, ওরা এ সম্পর্কে একটা কথাও বলেনি যেহেতু ওরা ভয় পেয়েছিলো পাছে একটি দাস-মনোভাবের পরিবর্তে অন্য আর একটি দাস-মনোভাব দেখা দেয়।

জারের প্রাসাদ ঘিরে দুর্ভেদ্য এক সৈন্য-প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছে। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, সারিবদ্ধ জানলাগুলোর ঠিক সামনেই দাঁড় করানো হয়েছে অশ্বারোহী সৈন্যদের। কাটা ঘাস, ঘোড়ার মল আর ঘামের গন্ধের সঙ্গে অস্ত্রের ঝনঝনা, রেকাবের ঠুংঠাং, সামরিক আদেশ আর অস্থির খুরের শব্দ মিশে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে।

লাখো লাখো মানুষের ঘন সমাবেশ চারদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সৈন্যদের ওপর। চাপা ক্রোধে মুচড়ে উঠেছে বুকের ভেতরগুলো। তবু ওরা শান্তভাবে কথা বলছে—নতুন শব্দ-সম্ভার, নতুন সুর-ঝঙ্কার, নতুন আশা-উদ্দীপনা নিয়ে ওরা কথা বলছে, যা ওদের নিজেদেরই কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। সৈন্য-বাহিনীর খানিকটা অংশ প্রাসাদের দেওয়াল আর প্রাঙ্গণের রেলিং-এ হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছে, বাকি অংশ প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের প্রবেশ-পথ অবরোধ করে রেখেছে। আর তাদের খুব কাছেই ঘন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সীমাহীন নির্বাক জনসমুদ্র।

'অনুরোধ করছি, আপনারা সরে দাঁড়ান!' চাপা স্বরে কথাটা বলে একজন সার্জেন্ট-মেজর। কারুর মুখের দিকে না তাকিয়ে জনতাকে সে সৈন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে হাত ও কাঁধ দিয়ে ঠেলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

কে যেন তাকে জিগেস করে, 'আমাদের যেতে দিচ্ছেন না কেন?'

'কোথায়?'

'জারের কাছে।'

সার্জেন্ট-মেজর মুহূর্তের জন্যে যেন থমকে যায়; তারপর ক্লান্ত স্বরে বলে, 'কিন্তু আমি তো আপনাদের বলছি, উনি এখানে নেই।'

'কি বললেন ! জার এখানে নেই ?'

'বলছি তো—না। আপনারা চলে যান !'

'তা উনি কোন্ কামেটা গ্যাছেন জানতে পারি কি ?'

সার্জেন্ট-মেজর আবার থমকে দাঁড়ায়, তারপর শাসানির ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলে, 'আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, এধরনের কথা বলার ফল কি আপনারা ভালো করেই জানেন।' তারপরেই আবার গলার স্বর নামিয়ে সে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'আমি বলছি, বিশ্বাস করুন, উনি সত্যিই শহরে নেই।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন টিপ্পুনি কাটে, 'উনি কোথাও নেই !'

'শা-লা মরে গ্যাছে !'

'পাজীর পা-ঝাড়া, তোমরাই তাকে গুলি করে মেরেছো।'

'তোমরা কি মনে করো খুশি মতো মানুষকে খুন করতে পারো ?'

'খুন করে আমাদের শেষ করা যাবে না···সংখ্যায় আমরা অনেক অনেক···'

'তোমরা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরাই জারকে খুন করেছো, বুঝলে ?'

'আপনাদের অনুরোধ করছি, সরে দাঁড়ান এবং এই ধরনের কথাবার্তা বন্ধ করুন।'

'কে হে তুমি ? সৈনিক ? কি ধরনের সৈনিক হে তুমি ?'

সারির অন্য আর এক জায়গায় ছুঁচলো দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ উদ্দীপ্ত স্বরে বলছে, 'তোমরাও মানুষ, আমরাও মানুষ ! আজ উর্দি পরে আছো, কাল হয়তো সাধারণ পোশাক পরবে। তখন হয়তো কাজের জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে, কেননা খেতে তো হবে। তখন দেখবে চাকরি নেই, পেটে দানা জুটছে না। তখন কি হবে জানো, আমরা যা করছি তোমরাও তাই করবে···আর ওরা তোমাদের ওপর গুলি চালাবে, ঠিক কিনা ? খিদের কথা বললে ওরা তোমাদের খুন করবে, তাই কিনা বলো ?'

সৈন্যদের শীত করছে। এক পা থেকে অন্য পায়ে লাফাচ্ছে, পা ঠুকছে, কান ঘষছে, রাইফেল হাত বদল করছে। কথাগুলো শুনতে শুনতে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, ঠাণ্ডায় জমে আসা ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটছে। মুখগুলোয় নির্বোধ হতাশার ছাপ, চোখের পাতাগুলো মাটির দিকে নামানো। কেবল অল্প কয়েক জনই চোখ ঘোঁচ করে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন ভিড়ের মধ্যে কোন কিছু লক্ষ্য করছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই জনসমাবেশের জন্যে

ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলে ওরা মনে মনে রাগে ফুঁশছে। ওদের সবাইকেই ক্লান্ত আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

লোকেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে সৈন্যদের ঠিক মুখোমুখি, কখনও পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ওদের গায়ের ওপর। আর যতবারই এরকম হচ্ছে, সৈন্যদের কেউ না কেউ বলছে, 'ঠিক হয়ে দাঁড়ান!'

অনেকে সৈন্যদের হাত চেপে ধরে আগ্রহের সঙ্গে কথা বলছে। সৈন্যরা চোখ মিটমিট করতে করতে শুনছে। অস্পষ্ট ভঙ্গিতে ওদের মুখগুলো হয়ে উঠছে বিব্রত, যেন কত না করুণ কিংবা লাজুক।

'বন্দুকে হাত দিও না বলচি!'

একজন সৈনিক লোমের টুপি-মাথায় একটি তরুণকে কথাটা বলে। তরুণ সৈনিকটির বুকে টোকা দিতে দিতে বোঝাচ্ছিলো, 'তুমি সৈনিক, তুমি তো কসাই নও। বাহিনীতে তোমাকে দেওয়া হয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্যে, কিন্তু এখন ওরা তোমাকে জনসাধারণের ওপর গুলি চালাবার কাজে বাধ্য করেছে···ব্যাপারটা একবার ভালো করে বুঝে দেখার চেষ্টা করো! জনসাধারণই তো রাশিয়া!'

'গুলি আমরা করছি না।' সৈনিকটি জবাব দেয়।

'ছাখো, এই হচ্ছে রাশিয়া,' ছেলেটি জনতার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। 'এরাই রাশিয়ার জনগণ। এরা এদের জারকে দেখতে চায়···'

কে যেন চিৎকার করে উঠে, 'না, চায় না!'

'জনসাধারণ যদি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে জারের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাতে কি দোষ কিছু আছে? তুমিই বলো না?'

'আমি জানি না!' থুতু ফেলে সৈনিকটি ছোট্ট করে জবাব দিলো। পাশের সৈনিকটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের পাতা নামিয়ে বলে, 'আমাদের কথা বলা নিষেধ!'

হঠাৎ রোগা মতন দেখতে একটি সৈনিক খুশিতে চলকে উঠে তার সামনের লোকটিকে জিগেস করলো, 'আরে, তুমি! তুমি রিয়াজানের লোক না!'

'না, আমার বাড়ি পস্কোভ-এ। কেন?'

'না, এমনি। ভেবেছিলুম বুঝি···আমার বাড়ি তো রিয়াজানে···'

ধূসর সৈন্য-প্রাচীরের সামনে জনতা আন্দোলিত হচ্ছে, আছড়ে পড়ছে উপলবেলায় নদীর ঢেউয়ের মতো। অথচ এদের অনেকেই জানে না—কেন ওরা

এখনও এখানে রয়েছে, কি চায়, কিসের জন্যেই অপেক্ষা করছে। সচেতন, স্পষ্ট কোন লক্ষ্যই নেই। কেবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিক্ত একটা অনুভূতি, ঘৃণা আর প্রতিশোধস্পৃহা ওদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে এই পথের মাঝে। কিন্তু কার ওপর প্রতিশোধ নেবে—সৈন্যরা তো আর কোন অন্যায় করেনি। সৈন্যরা বরং নিজেরাই বিব্রত, ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড়, অনেকে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

'ভাবো তো একবার, আমরা সেই ভোর চারটে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি!'

'বাব্বাঃ, এর পরেও তোমাদের ইচ্ছে করে না হাত পা ছড়িয়ে একটু চোখ বুজোই!'

'কিন্তু তোমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা তো আর ছাউনিতে ফিরে যেতে পারি না।'

'এখন কটা বাজে?'

'ছুটো।'

'আপনারা এত উত্তেজিত কেন বলুন তো? আর কেনই বা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?' সার্জেন্ট-মেজরের এই প্রশ্ন, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে তার কথা বলার ভঙ্গি, তার থমথমে মুখ জনতার উৎসাহকে যেন দমিয়ে দিলো। কথাগুলো শুনতে সহজ হলেও নিঃসন্দেহে গভীর অর্থবহ। 'মিছিমিছি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই! আপনারা শুধুমুধু এতগুলো লোককে ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন···'

একজন তরুণ জিগেস করলো, 'আমাদের ওপর গুলি চালাবেন নাকি?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে সার্জেন্ট-মেজর শান্ত স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, আদেশ হলেই চালাবো।'

চকিতে ভর্ৎসনায় বিদ্রূপে ফুঁসে উঠলো জনতা।

অন্য গলা ছাপিয়ে শোনা গেলো লম্বা লালচুল একটি লোকের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, 'কেন, কিসের জন্যে?'

'যেহেতু আপনারা কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করছেন।'

সৈন্যরা ভ্রূ কুচকে সব কথা শুনছিলো। ওদের কে একজন নরম গলায় বললো, 'গরম কিছু পানীয় পেলে বেশ ভালো হতো!'

কে যেন ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'যদি চাও তো আমার দেহের খানিকটা গরম রক্ত দিতে পারি, খাবে?'

বিষণ্ণ বিরক্ত গলায় সৈনিকটি জবাব দেয়, 'আমি তো বুনো জানোয়ার নই।'

অনেকে থমথমে সারিবদ্ধ এই নিরুৎসাহ নিশ্চুপ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, চেষ্টা করছে নিজেদের উত্তেজনার আগুনে ওদের উদ্দীপ্ত করতে, ওদের বুকের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে। অথচ ছাউনির ছক-বাঁধা জীবন ওদের বুকগুলো পাথর বানিয়ে দিয়েছে, মগজে ঠেসে দিয়েছে যত নোংরা আবর্জনা। অধিকাংশ জনতাই চাইছে নিজেদের ভাবনা চিন্তাকে কোন রকমে বাস্তবে পরিণত করতে, কিন্তু সে শুধু বৃথাই হিমেল ধূসর এই সৈন্য-প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরা। সৈন্যদের এখন একমাত্র কামনা নিজেদের শরীর-গুলোকে কোনরকমে একটু গরম করে তোলা।

একটু একটু করে কথা বলার ভঙ্গি, শব্দের প্রয়োগ আরও তীক্ষ্ণ, আরও মর্মভেদী হয়ে ওঠে।

'সৈন্যগণ!' ঘন দাড়ি, নীল চোখ, গাট্টা-গোট্টা চেহারার একজন লোক আবেগের সঙ্গে বলে, 'তোমাদের পরিচয় কি? তোমরা কি রাশিয়ান জনগণেরই সন্তান নও? অথচ দারিদ্র্যনিপীড়িত এই জনগণ আজ অসহায়, তাদের কাজ নেই, রুটি নেই—তাই আজ তারা এসেছে জারের কাছে সাহায্য চাইতে। আর সেই জার কিনা তোমাদের হুকুম দিয়েছেন গুলি চালাতে, খুন করতে! তাই সৈন্যগণ, জনগণ যারা তোমাদেরই বাপ ভাই, তারা আজ সাহায্য চাইতে এসেছে শুধু নিজের জন্যে নয়, তোমাদেরও জন্যে! তোমাদের কাজে লাগানো হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে, তোমাদের বাধ্য করা হচ্ছে নিজেদের বাপ ভাইকে খুন করতে। তোমরা ভালো করে ভেবে ছাখো। তোমরা কি বুঝতে পারছো না যে এতে তোমরা নিজেদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছো?'

লোকটার আবেগদীপ্ত ভরাট কণ্ঠস্বর, এমন কি তার সুন্দর মুখ, তার কথা বলার ভঙ্গিতে সৈন্যরা যে বিচলিত হয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেকে চোখের পাতা নামিয়ে তার কথা মন দিয়ে শোনে, কেউ কেউ ভ্রূ কুঁচকে এদিক ওদিক তাকায়। সৈন্যদের মধ্যে থেকে কে যেন চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলে, 'চুপ করুন, অফিসার শুনতে পাবে!'

পেল্লাই গোঁফ, সুশ্রী দেখতে লম্বা চওড়া চেহারার একজন অফিসার তখন সত্যিই সারিবদ্ধ সৈন্যদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছেন। ডান হাতের দস্তানাটা খুলে দাঁতে দাঁত চেপে উনি বলছেন, 'যান, যান এখান থেকে। সরুন, কি বললেন? কথা বলতে চান? বেশ, আপনাদের কথা বলা আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।'

উজ্জ্বল লাল মুখ, বড় বড় চোখ, অথচ সে-চোখে দীপ্তি নেই। বলিষ্ঠ পায়ে ধীরে ধীরে উনি এগিয়ে চলেছেন, মনে হচ্ছে সৈন্য-সারিকে সমান্তরাল করার জন্যে উনি যেন একটা অদৃশ্য রুলার টেনে নিয়ে চলেছেন। আর সৈন্যরা পায়ের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে বুক চিতিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ চোখের ইঙ্গিতে অফিসারটি সম্পর্কে জনতাকে সতর্ক করে দিচ্ছে। সারির শেষ প্রান্তে পৌঁছে উনি আদেশ দিলেন, 'প্রস্তুত হ-ও।'

চকিতে সৈন্যরা প্রস্তুত অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়, যেন সারি সারি সব পাথরের প্রতিমূর্তি।

অফিসারটি খাপ থেকে নিজের তলোয়ারটা টেনে বার করলেন, 'আদেশ দিচ্ছি, আপনারা এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান।'

এই মুহূর্তে জনতার পক্ষে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া অসম্ভব। কেননা ছোট জায়গাটা তখন মানুষে ঠাসাঠাসি হয়ে রয়েছে, তার ওপর রাস্তার দিক থেকে ক্রমাগত চাপ আসছে।

ঠিকরে-পড়া চোখের ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ, অশ্লীল মন্তব্য সত্ত্বেও অফিসারটি নিশ্চল। ওঁর ধৈর্যের ভঙ্গি দেখে জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, ফুঁসে উঠলো মিলিত কণ্ঠস্বর :

'এই লোকটাই তাহলে হুকুম দেবে ?'

'ওই লোকটাই বা হুকুম দেবার কে ?'

'হুকুমের তোয়াক্কা না করেই ওরা গুলি চালাবে···'

'হ্যাঁ, শুরুতেই যে রকম তলোয়ার উঁচিয়ে রয়েছেন···'

'এই যে শুনছেন, ও মশাই ! আপনি কি খুন করবেন নাকি ?'

শ্লেষের সুরটা ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে বিদ্রূপ।

সার্জেন্ট-মেজর অফিসারের দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়, মৃদু কাঁপতে থাকে, তারপর দ্রুত টেনে বার করে নিজের তলোয়ার।

হঠাৎ অশুভ সংকেতে বেজে ওঠে তূর্য। জনতা সেদিকে ফিরে তাকায়। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড রলরোলে, চিৎকার চেঁচামেচি আর অশান্ত করতালিতে ডুবে যায় শিঙাধ্বনি। যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু অতর্কিতে হানা দিতে পারে একথা ওরা যেন ভুলে গেছে। অথচ মৃত্যুকে এড়িয়ে পালাবার কোন জায়গাও নেই। কতকগুলো কালো কালো মূর্তি হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে। নীল চোখ, ঘন দাড়িওয়ালা লোকটা নিজের ওভারকোট ছিঁড়ে বুক ফুলিয়ে সৈন্যদের দিকে

তাকিয়ে কি যেন বলে। কিন্তু এলোমেলো চেঁচামেচির মধ্যে তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যায় না।

'প্রস্তুত' অবস্থা থেকে রাইফেল তুলে 'উদ্যত' অবস্থায় নিয়ে এসে সৈন্যরা সতর্ক ভঙ্গিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জনতার দিকে লক্ষ্য করে উঁচানো থাকে ওদের সঙ্গিন।

ভয়-চকিত, হতাশ একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'কি করছো তোমরা, খুনীর দল কোথাকার!'

সঙ্গিনের সারি থরথর করে কেঁপে ওঠে। প্রচণ্ড শব্দে ছুটে বেরিয়ে যায় এক ঝাঁক গুলি। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে ভিড়ের মধ্যে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই প্রাঙ্গণের রেলিং টপকাতে শুরু করেছে।

আর একঝাঁক গুলি ছুটে আসে—তারপর আর একঝাঁক।

রেলিং বেয়ে ওঠার সময় একটি ছেলে হঠাৎ গুলি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে, পা-দুটো উঠে যায় ওপর দিকে। মাথায় একরাশ সোনালী চুল, দীর্ঘাঙ্গী, বেশ সুন্দর দেখতে একজন তরুণী ছেলেটির পাশে ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ে।

'নরকেও তোদের স্থান হবে না।' কে যেন চেঁচিয়ে বলে।

জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা আর শান্ত হয়ে গেছে। পেছন দিক থেকে লোক ছুটতে শুরু করেছে রাস্তায়। তারপর আশ্রয় নিচ্ছে ওপারের বাড়ির বারান্দায়, উঠোনে। যেন অদৃশ্য হাতের ঠেলা খেয়ে জনতা ধীরে ধীরে পিছু হটছে। সৈন্য আর জনতার মাঝে ফাঁকা জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে ছড়ানো ছিটানো দেহ-গুলো পড়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে দ্রুত জনতার দিকে ছুটছে। কেউ কেউ নিদারুণ কষ্ট করে বুকে হেঁটে এগুচ্ছে, পড়ে থাকছে চাপ চাপ জমাট রক্ত। কখনও রক্তের দাগ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে তাদের পেছন পেছন। অনেকেই নিশ্চল পড়ে রয়েছে, কারও মুখ আকাশের দিকে তোলা, কারও বা মুখ মাটির দিকে নামানো, কেউ পড়ে রয়েছে আড় হয়ে। কিন্তু সবাই উৎকণ্ঠিত একটা কামনায় টানটান হয়ে রয়েছে, যেন মৃত্যু ওদের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে, আর মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

রক্তের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, মনে পড়িয়ে দেয় গুমোট দিনের শেষে সন্ধ্যায় সমুদ্র-থেকে-ওঠা উষ্ণ লবণ-গন্ধ হাওয়ার কথা। এই গন্ধ মানুষের মনে যেন নেশা ধরিয়ে দেয়, আচ্ছন্ন করে তোলে সুস্থ চেতনা।

অভিশাপ, চিৎকার, গর্জন, আর্তনাদ করতে করতে জনতা পিছু হটে, আর মাটিতে শিকড় গেড়ে সৈন্যরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। ঠোঁটে ঠোঁট-চাপা মুখগুলো ধূসর, হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন চিৎকার করে উঠতে চাইছে, কিন্তু আইন-বিরুদ্ধ বলে নিজেদের কোন রকমে সংযত করে রেখেছে। চোখ মিটমিট না করে ওরা এখন বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ সে-চোখে মানবিক কোন দৃষ্টি নেই, যেন ওরা অন্ধ। কিংবা হয়তো ওরা দেখতে চায় না, যেহেতু মনে মনে ভয় আছে রক্ত দেখলে পাছে আরও বেশি রক্তপাত করবার ইচ্ছা জাগে। রাইফেলগুলো কাঁপছে মুঠোর মধ্যে, সঙ্গিনগুলো বাতাস বিদ্ধ করে যেন নাচছে। এই কাঁপুনি সত্ত্বেও ওরা ওদের মনের নিস্পৃহ উদাসীনতাকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারে না। নীল চোখ দাড়িওয়ালা লোকটা মাটি থেকে কোনরকমে উঠে দাঁড়ায়। যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে সারা শরীর। রুদ্ধ গলায় সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে সে বলে, 'তোমরা আমাকে খুন করতে পারোনি, যেহেতু আমি তোমাদের যা কেবল ধ্রুব সত্য শুধু তাই বলেছি···'

হতাহতদের তুলে নেবার জন্যে জনতা আবার ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। চিৎকার, চেঁচামেচি আর ভর্ৎসনা ক্রমশ বেড়ে ওঠে। তবে ঠিক ক্রুদ্ধ ভঙ্গি নয়, বরং সে-কণ্ঠস্বরে করুণ বিষণ্ণতার সুরই স্পষ্ট ধরা পড়ে, বেজে ওঠে বলিষ্ঠ একটা প্রত্যয়—যেন যে উন্মাদ নিষ্ঠুর কদর্যতার পরিচয় সৈন্যরা দিয়েছে, সে ভয়ংকর ভুল ওরা বুঝতে পারবেই। জনতা প্রাণপণে সৈন্যদের বোঝাবার চেষ্টা করে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে লজ্জাকর জঘন্য ভূমিকা ওরা নিয়েছে, সে ভুল ওরা যেন বুঝতে পারে।

অফিসারটি এবার তাঁর খাপ থেকে রিভলবারটি টেনে বার করেন এবং সৈন্যদের সঙ্গে কথা-বলা জটলাটির দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। কোন ব্যস্ততা না দেখিয়ে লোকজন এক পাশে সরে গিয়ে ওঁকে পথ করে দেয়। কিন্তু নীল-চোখ, দাড়িওয়ালা লোকটা একটুও নড়ে না। বরং অফিসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চারদিকে রক্তের প্রতি আঙুল দেখিয়ে ভর্ৎসনার সুরে জিগেস করে, 'এসবের যুক্তিসংগত কোন কারণ আছে কি? নেই, কোন কারণ নেই!'

অফিসারটি তার সামনে দাঁড়িয়ে এমন ভঙ্গিতে ভ্রূ কোঁচকান যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন, তারপর হাত তোলেন। গুলির শব্দ শোনা যায় না, অথচ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে—একবার, দুবার, তিনবার। তিনবারের পর দাড়িওয়ালা লোকটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চারিদিক থেকে লোকজন খুনীর

দিকে ছুটে আসে। রিভলবার উঁচিয়ে তলোয়ার আস্ফালন করতে করতে উনি পেছিয়ে আসেন। একটি ছেলে পড়ে ছিলো ঠিক পায়ের কাছে, উনি তলোয়ার ঢুকিয়ে দেন তার পেটে। রুক্ষ গলায় আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মতো লাফাতে থাকেন। কে যেন একটা টুপি ছুঁড়ে মারে ওঁর মুখে। বরফ আর রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় সারা মুখ। সার্জেন্ট-মেজর আর কয়েকজন সৈন্য সঙ্গিন উঁচিয়ে তেড়ে যায় তার দিকে, কিন্তু তার আগেই দুষ্কৃতকারী গা-ঢাকা দিয়েছে ভিড়ের মধ্যে। বিজয়ী অফিসারটি তখন পিছু হটে-যাওয়া জনতার দিকে তর্জন গর্জন করতে করতে হঠাৎ পায়ের নিচে ছেলেটিকে দেখে আর এক বার তলোয়ার চালিয়ে দেন। ছেলেটি তখন প্রাণপণ শক্তিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগুবার চেষ্টা করছিলো, সারা শরীর তার রক্তস্নাত।

আবার তূর্যধ্বনি বেজে ওঠে। সেই অশুভ ধ্বনি শুনে সবাই দ্রুত স্থান ত্যাগ করে, পড়ে থাকে শুধু নির্জন প্রাঙ্গণ। তবু বাতাসে তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে শিঙাধ্বনি, যেন তুলির শেষ আঁচড় পড়ছে সৈন্যদের অবাক চোখে, অফিসারটির নিপুণ বীরত্বে, তাঁর রক্তাক্ত তলোয়ার আর অবিন্যস্ত গোঁফে···

টকটকে তাজা লাল রক্তে চোখ ঝাঁঝিয়ে যায়, তবু তারও একটা আকর্ষণ আছে। একবার দেখলে বারবার দেখার উন্মাদ একটা কামনা জাগিয়ে তোলে। ঘাড় উঁচিয়ে সৈন্যরা সতর্ক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকায়, যেন গুলি বেঁধার মতো জীবন্ত কোন বস্তু আছে কিনা আঁতিপাতি করে খোঁজে।

সারির একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অফিসারটি তখনও তর্জন গর্জন করছেন, ক্রুদ্ধ বুনো গলায় হুঙ্কার ছেড়ে সৈন্যদের কি যেন বলছেন।

চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গ শোনা যাচ্ছে :

'কসাই!'

'নীচ, ইতর!'

অফিসারটি গোঁফে তা দেন।

ছুটে যায় একঝাঁক গুলি, তারপর একঝাঁক, তারপর আর একঝাঁক···

রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। মজুর শ্রেণীর লোক খুব কমই রয়েছে, অধিকাংশই ছোট ছোট দোকানদার, ফেরিওয়ালা আর কেরানি। এর মধ্যে কিছু লোক আগেই রক্ত আর মৃতদেহ দেখেছে, অন্যরা কেবল মার খেয়েছে পুলিসের হাতে। ওরা এখন বাড়ি থেকে পথে বেরিয়েছে কেবল আতঙ্ক আর

গুজব ছড়াতে। স্ত্রী পুরুষ শিশু উদ্বিগ্ন চোখে চারদিক তাকাচ্ছে, যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটার আশঙ্কায় ওরা অপেক্ষা করছে। নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কে ওরা বলাবলি করছে, বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করছে, রাগে চাপা গর্জন ছাড়ছে, সামান্য আহত মজুরদের নানান প্রশ্ন করছে, আর মাঝে মাঝে গলার স্বর নামিয়ে অদ্ভুত রহস্যজনক ভাবে পরস্পরের কানে কানে কি যেন বলছেন। কেউ বুঝতে পারছে না কি করবে, অথচ কেউ বাড়িও ফিরে যাচ্ছে না। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস এই খুনোখুনির পরে নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটবে, শতশত নিহত অনাত্মীয়ের চাইতেও যা আরও গভীর, আরও মর্মান্তিক।

এতদিন কোন রকম চিন্তা না করেই ওরা দিন কাটিয়েছে। নিজেদের অধিকার, সরকার আর আইন সম্পর্কে ওদের একটা অলীক ধারণা ছিলো, ওরা ভাবতো এমন একটা শাসনশক্তি আছে যার দায়িত্ব ওদের রক্ষা করা। এই ধরনের বিশ্বাস ওদের মধ্যে এনে দিয়েছিলো নিরাপত্তার একটা মনোভাব। যদিও মাঝে মাঝে বাস্তব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে ওদের এই ধারণা বহুবার বিপর্যস্ত হয়েছে, কখনও চরম আঘাত হেনেছে, তবুও ওরা একগুঁয়ের মতো খাড়া থেকেছে। কিন্তু আজ ওদের সে-মোহ ঘুরে গেছে, হিমেল দমকা বাতাসের মতো আতঙ্কে ভরে গেছে সারা বুক। নিষ্ঠুর রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের বিষণ্ণ ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে ওরা স্পষ্ট বুঝতে পারে—এখানে মানুষের অধিকার বলে কিছু নেই, আইন নেই। মৃত্যু ঝরাতে পারে যে শক্তি, মানুষ আজ সেই শক্তির হাতের মুঠোয় বন্দী। বাধা দেবার কেউ নেই। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে মৃতদেহ-আকীর্ণ শহরের রাস্তায় রাস্তায় যারা মানুষের রক্ত ঝরালো সেই শক্তিই আজ ক্ষমতার আসনে সমাসীন। রক্ত-লোলুপ সর্বগ্রাসী এই উন্মাদনা জনসাধারণের মনে ছড়িয়ে দিয়েছে আত্মবিধ্বংসী একটা আতঙ্ক। অন্যদিকে আবার তেমনি নিজেদের জীবনকে টিঁকিয়ে রাখার ভাবনায় মানুষের মনকে করে তুলেছে দৃঢ়সংকল্প।

বেঁটে-খাটো একজন শ্রমিক মাথা নিচু করে রক্তমাখা হাতদুটো দোলাতে দোলাতে পথ হাঁটছিলো। তার কোটের সামনের দিকেও ছোপছোপ রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। কে যেন তাকে জিগেস করলো, 'তুমি কি আহত হয়েছিলে না কি?'

'না।'

'তাহলে এত রক্ত লেগে রয়েছে?'

'ও আমার গায়ের রক্ত নয়।' শ্রমিকটা চলেই যাচ্ছিলো, হঠাৎ কি ভেবে থমকে দাঁড়ালো। তারপর কেমন যেন অদ্ভুত গলায় বললো, 'আমার গায়ের রক্ত নয়। এ হচ্ছে সেই সব মানুষের রক্ত যারা ওদের বিশ্বাস করতো···'

কথাটা সম্পূর্ণ না করেই সে মাথা নিচু করে চলে গেলো।

ভয়ঙ্কর চাবুক দোলাতে দোলাতে একদল অশ্বারোহী সৈনিক ঘোড়া ছুটিয়ে আসে ভিড়ের মধ্যে। চারদিক থেকে লোক পরস্পরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সরে দাঁড়ায় একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে। সৈন্যরা তখন পুরোদমে মাতাল। বোকার মতো হাসছে, ঘোড়ার জিনের ওপর বসে ঢুলছে আর যেন নিজেদের অজান্তেই বেপরোয়া চাবুক চালাচ্ছে। প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে একজন লোক মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু চকিতে সে উঠে দাঁড়িয়ে সৈন্যটিকে জিগেস করে, 'এই জানোয়ার, তুই আমাকে মারলি কেন, অ্যাঁ?'

ঘোড়ার লাগাম না টেনেই সৈন্যটি সোজা গুলি চালায়। লোকটি আবার মাটিতে পড়ে যায়। সৈন্যটি মাতালের মতো হো হো করে হেসে ওঠে।

'দেখলে, কাণ্ডটা দেখলে একবার!' সম্ভ্রান্ত পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক শিউরে উঠে চারদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকালেন। 'ইশ, চোখের সামনে কি অদ্ভুত কাণ্ডটাই না ঘটে গ্যালো!'

উত্তেজিত কোলাহল বেড়ে ওঠে। উৎকণ্ঠা ভয় আর ক্রুদ্ধ হতাশার মধ্যে কি যেন একটা ধীরে ধীরে জন্ম নেয়, সম্মিলিত করে তোলে স্থবির মন-গুলোকে।

কিন্তু মুখে শান্তির বাণী প্রচারের লোকেরও বুঝি অভাব নেই। তাদের মধ্যে থেকে কে যেন বললো, 'ও কেন সৈনিকটিকে গালাগালি দিলো?'

'সৈন্যটি আগে ওকে চাবুক মেরেছে।'

'রাস্তা থেকে ও সরে দাঁড়ালেই পারতো।'

তোরণের নিচে দুজন মহিলা ও একটি ছাত্র হাতে গুলি-বেঁধা একজন শ্রমিকের পরিচর্যা করছিলো। যন্ত্রণাহত শ্রমিকটি ক্রুদ্ধ চোখে আশেপাশের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, আমাদের মধ্যে ঢাকঢাক-গুড়গুড় কিছু ছিলো না। যা বলার আমরা ওদের স্পষ্টাস্পষ্টই বলেছিলাম। মন্ত্রীরাও জানতো কেন আমরা যাচ্ছি। আবেদনপত্রের নকলও ছিলো ওদের কাছে। যদি আমাদের যেতেই না দেবে, আগে থেকে বললে পারতো। যত্ত সব বদ-মাইশের ধাড়ি! আমাদের সঙ্গে কথা বলার যথেষ্ট সময় ছিলো, আমরা তাহলে

আজকে এই সমাবেশের আয়োজন করতাম না···মন্ত্রী পুলিস, ওরা সবাই জানতো আমরা যাচ্ছি। শয়তান খুনীগুলো···'

'আবেদনপত্রে তোমরা কি লিখেছিলে?' শীর্ণকায় একজন বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় জিগেস করলো।

'জারকে আমরা লিখেছিলুম জনসাধারণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে দেশ শাসন করতে হবে, সরকারী আমলাদের দিয়ে নয়। এই হাড়বজ্জাত-গুলোই দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষকে শোষণ করছে।'

'ঠিক, একেবারে খাঁটি কথা!' বৃদ্ধ মন্তব্য করে। 'শাসনের ভার জনসাধারণের হাতেই থাকা ভালো।'

হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর শ্রমিকটি তার কোটের হাতাটা সন্তর্পণে নামিয়ে দিলো। 'কমরেডদের আমি আগেই বলেছিলুম গিয়ে কোন লাভ নেই। এবার ওরা বুঝুক।'

তারপর ওভারকোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে ও চলে গেলো।

'দেখলে, লোকটার কথা বলার ধরন দেখলে? মানেটা বুঝলে তো···'

'তা আর বলতে! তবু, ওই লোকটাকে খুন করাটা ওদের ঠিক হয়নি।'

'আজ ওকে খুন করছে, কাল হয়তো আমাকে খুন করবে।'

'হক কথা বলেছেন দাদা···'

আর এক জায়গায় দুজনের তুমুল তর্ক লেগেছে, প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। একজন বলছে, ' 'উনি' হয়তো কিছু জানতেন না!'

'বাজে এঁড়ে তর্ক কোরো না, বুঝলে···'

কিন্তু 'উনি' নামক শবটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় ভিড়ের মধ্যে এমন লোক খুব কমই চোখে পড়ে। যেন যে প্রেতাত্মাটাকে কবর দেওয়া হয়েছে, তাকে তুলে আনার চেষ্টা করাটা শুধু শত্রুতারই নামান্তর।

দূরে কোথায় যেন গুলির শব্দ শোনা যায়। ত্রস্ত জনতা চকিতে কান পেতে শোনে।

'আবার!'

হঠাৎ উত্তেজনার একটা ঘূর্ণীঝড় যেন পাকিয়ে ওঠে রাস্তার নিচে থেকে।

'কোথায়, কোথায়?'

'দ্বীপে, ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে···'

'আপনি দেখে এলেন নাকি?'

'কেন, শুনতে পাচ্ছেন না ?'

'কি বলছেন আপনি !'

'দিব্যি দিয়ে বলছি ! ওরা একটা বন্দুকের দোকান লুঠ করে নিয়েছে…'

'তাই নাকি !'

'টেলিগ্রাফের খুঁটি উপড়ে অবরোধ বানিয়েছে…'

'সত্যি বলছেন ?'

'ওখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে ?'

'সমুদ্দুরের মতো থৈ থৈ করছে।'

'আঃ, ওরা যদি এই রক্তপাতের প্রতিশোধ নিতে পারে !'

'চলো ওখানে যাই !'

'কি হে ইভান ইভানোভিচ, যাবে নাকি ?'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ…কিন্তু…'

গোধূলির ম্লান আলোয় একটি মানুষের মূর্তিকে হাত নেড়ে আবেগদীপ্ত স্বরে বলতে শোনা যায়, 'মুক্তিসংগ্রামে কারা সামিল হতে চান ? জনসাধারণের জন্যে, জীবন ও শ্রমের জন্যে মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে কারা সংগ্রাম করতে চান ? কারা ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার জন্যে এই সংগ্রামে প্রাণ দিতে চান, এগিয়ে আসুন, আমাদের সঙ্গে হাত মেলান !'

অনেকে চারদিক থেকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানো লোকটিকে ঘিরে ধরে। অন্যেরা তাড়াতাড়ি সরে যায়। 'দেখেছো, মানুষগুলো কেমন খেপে গ্যাছে !'

'খ্যাপা তো স্বাভাবিক ! খুব স্বাভাবিক !'

'কিন্তু এ পাগলামি ছাড়া…'

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড়ও পাতলা হয়ে আসে। অপরিচিত নিঃসঙ্গতার একটা তিক্ত অনুভূতি, আশঙ্কা, দাসত্বের শৃঙ্খলে-বাঁধা নির্যাতিত মর্মান্তিক জীবনের অস্ফুট চেতনা নিয়ে যে যার বাড়ি ফেরে…

এমন থমথমে উত্তেজনা এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। তবু মানুষের সঙ্গে মানুষের বাইরের যে শিথিল যোগসূত্রটুকু তখনও টিমটিম করছিলো, এই অন্ধকার এসে তা যেন ছিন্ন করে দিলো। যাদের বুকে তেমন করে কোন আগুন জ্বলেনি তারা আগে ফিরে গেছে নিজেদের অভ্যস্ত ডেরায়।

দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে আসে, অথচ রাস্তায় তখনও আলো জ্বালানো হয়নি।

অন্ধকারেই কে যেন রুক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'এই, ঘোড়সয়ার !' পাশের গলি থেকে হঠাৎ একদল অশ্বারোহী সৈনিক অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছোট দলটার ওপর। শুধু মুহূর্তের জন্যে শোনা গিয়েছিলো ঘোড়ার খুরের শব্দ, তারপরই সব শব্দ ডুবে গেলো গলিত তর্জন আর অমানুষিক আদিম হিংস্র চিৎকারে। অন্ধকারে কেবল দেখা গেলো কালো কালো কয়েকটা মূর্তি, বাঁকানো তলোয়ার থেকে ঠিকরে-পড়া ম্লান আলোর রেখা। শোনা গেলো অজস্র আঘাত হানার শব্দ।

'কমরেড, হাতের কাছে যে যা পাও, তাই দিয়ে ওদের আঘাত করো। রক্তের বদলা রক্ত চাই !'

'পালাও !'

'সাবধান, সৈনিক ! আমরা চাষী নই। ছেড়ে কথা কইবো না !'

'ইঁট পাটকেল চালাও, কমরেড ! কেউ পালিও না !'

ছোট ছোট কালো মূর্তিগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে ঘোড়াগুলো দ্রুত লাফাচ্ছে, হ্রেষাধ্বনি করছে। শোনা যাচ্ছে ইস্পাতের ফলার ঠকাঠক শব্দ, মাতালের ক্রুদ্ধ গর্জন : 'ঘোড়া ছোটাও···'

লোক ছুটছে, ঠেলা খেয়ে পড়ছে হুড়মুড় করে। রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেছে, কালো কালো উয়ের ঢিপির মতো কয়েকজন পড়ে রয়েছে মাটিতে। কোথা থেকে যেন আরও দ্রুত ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে···

'কমরেড, লেগেছে নাকি ?'

'কানটা উড়ে গেছে মনে হচ্ছে···'

'খালি হাতে আর কি-ই বা করা যাবে ?'

নির্জন পথে প্রতিধ্বনিত হলো গুলির শব্দ।

'নাঃ, শয়তানগুলোর এখনও আশ মিটেনি দেখছি !'

নিস্তব্ধতা। ত্রস্ত পায়ের শব্দ। জলোচ্ছ্বাসের চাপা একটা কলকলধ্বনি ভেসে আসছে চারদিক থেকে, যেন সমুদ্র উপচে পড়ছে সারাটা শহরে। কাছেই কোথায় অন্ধকারে শোনা গেলো অস্ফুট আর্তনাদ···কে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। শোনা গেলো তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, 'কোথায় লেগেছে ইয়াকভ ?'

'ও কিছু না !'

যে গলি থেকে ঘোড়সয়াররা আতর্কিতে আক্রমণ করেছিলো, সেখান থেকে বেরিয়ে আসে একদল লোক। তারপর সারা রাস্তা জুড়ে এগিয়ে চলে

দুরন্ত প্রবাহের মতো। মিছিলের পুরো ভাগ থেকে কে যেন, বলে 'বন্ধুগণ, আজ থেকে আমরা রক্তের স্বাক্ষরে শপথ নিলাম—ক্রীতদাস নই, আমরা দেশের স্বাধীন নাগরিক!'

'নিশ্চয়ই, আমাদের বাপেরা দেখিয়ে দিয়েছে তাদের আসল চেহারাটা কি!'

'আজকের দিনটা জীবনে আমরা কোনদিন ভুলবো না!'

গায়ে গা ঘেঁষে ঘনসংবদ্ধ হয়ে ওরা দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে। ক্রুদ্ধ চাপা জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মেশে ওদের এলো মেলো কণ্ঠস্বর। মাঝে মাঝে সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে শোনা যায় দু একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর:

'ইশ, আজ যে কতগুলো লোক খুন হলো!'

'অথচ অকারণে!'

'না, এই দিনটাকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না!'

পাশ থেকে ভয়ঙ্কর গলায় কে যেন ভবিষ্যদ্বাণী করে, 'গোলামের দল, তোমরা একদিন ঠিকই ভুলে যাবে! অপরের রক্তের মূল্য তোমাদের কাছে এক কানা-কড়িও নয়!'

'চুপ, চুপ করো ইয়াকভ!'

আরও নিঝুম, আরও গাঢ় অন্ধকার হয়ে ওঠে চারদিক। মাঝে মাঝে দু একজন পথচারী ঘাড় ফিরিয়ে কান পেতে শোনে সেই মিলিত প্রবাহের ক্রুদ্ধ গর্জন।

কোন একটা জানলা থেকে ম্লান হলদে আলোর রেখা এসে পড়েছে রাস্তায়। তার সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে দুটো মূর্তি। একজন বাতি-স্তম্ভে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে মাটিতে, অন্যজন ঝুঁকে পড়ে তাকে টেনে তুলতে সাহায্য করছে। তাদের একজন বিষণ্ণ কোমল স্বরে বললো:

'গোলামের দল…'

১৯০৭

নেপলসে ট্রাম শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে। রিভিয়েরা ডি চিয়াইয়া জুড়ে সারি সারি খালি ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। চালক, কণ্ডাকটর আর মুখর, স্ফূর্তি-বাজ, পারার মতো চঞ্চল নেপলস্‌বাসীরা সব পিয়াজা দেল্লা ভিত্তোরিয়াতে জটলা করছে। ওদের মাথার ওপরে পার্কের বেড়া ছাড়িয়ে ফোয়ারার জলধারা-গুলো সরু তলোয়ারের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। আর ওদের চারধার ঘিরে একদল বিরোধী জনতা, যাদের বিস্তীর্ণ শহরের নানা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিলো, সেইসব দোকান-কর্মচারী, কারিগর, ব্যবসায়ি আর মেয়ে-দর্জিরা ধর্মঘটীদের সরবে তিরস্কার করছে। দুপক্ষেই কড়া কড়া কথা আর গা-জ্বালানো টিটকিরি চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নানান অঙ্গভঙ্গি। কেননা নেপলসের লোকেরা কথা বলে যেমন জিভ দিয়ে, তেমনি হাত নেড়ে, দুয়েতেই তাদের সমান দক্ষতা।

সমুদ্র থেকে বহে আসছে ঝিরঝিরে হালকা বাতাস। পার্কে উঁচু উঁচু তাল-গাছের ঘন সবুজ পাতায় লাগছে মৃদু কাঁপন, ওদের গুঁড়িগুলো দেখলে মনে হবে যেন দানবীয় হাতীর গোদা গোদা পা। রাস্তার অর্ধনগ্ন ছোট ছোট বাচ্ছা-গুলো হুটোপুটি করছে, চড়ুয়ের মতো কিচির মিচির উল্লাসে ভরিয়ে তুলছে বাতাস।

পুরনো কোন কাঠ-খোদাইএর মতো দেখতে শহরটা যেন জ্বলন্ত সূর্যের অকৃপণ আলোয় স্নান করছে, মন্দ্রিত হয়ে উঠছে অর্গানের মতো। শহরের এই হৈচৈ আর চিৎকারের সঙ্গে ঢাকের মতো অস্পষ্ট তাল দিয়ে চলেছে উপ-সাগরের নীল তরঙ্গমালা, আছড়ে পড়ছে শান-বাঁধানো পাথরের গায়ে।

থমথমে মুখে ধর্মঘটীরা সব গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জনতার কটু মন্তব্যে ওরা প্রায় কোন জবাবই দিচ্ছে না। ওদের কয়েকজন পার্কের রেলিংএ উঠে কুকুরের বেড়াজালে আটকে-পড়া একপাল নেকড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মাথার উপর দিয়ে রাস্তার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে রয়েছে। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একই রকম উর্দিপরা শ্রমিকরা যা করবে বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে তারা তা করবেই, আর এতে জনতা ততই অধৈর্য হয়ে উঠছে। ভিড়ের মধ্যে দু-একজন দার্শনিক আছে বইকি। ধীরে সুস্থে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওরা ক্রুদ্ধ ধর্মঘট-বিরোধীদের বোঝাচ্ছে, 'দেখুন সিনোর, ওরা যদি

বাচ্ছা-কাচ্ছাদের মুখে দেবার মতো সামান্য খুঁদ-কুঁড়োও যদি না জোটাতে পারে, তাহলে কি করে চলবে বলুন ?'

ফিটফাট উর্দি-পরা পৌরসভা-পুলিসের দু তিনজনের এক একটা দল লোকের ভিড়ে যাতে গাড়িঘোড়ার পথ না আটকায় তা দেখাশোনা করছে। অসীম ধৈর্য সহকারে ওরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কেবল চিৎকার আর অঙ্গভঙ্গির ব্যাপারটা যখন বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, তখন উভয় পক্ষকেই সপরিহাসে টিটকিরি দিচ্ছে। ছোট ছোট হালকা রাইফেল হাতে একদল সশস্ত্রবাহিনী পাশের গলিতে একটা দালানের গায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুরুতর কোন সংঘর্ষ বাধলে তারা হস্তক্ষেপ করবে। তেকোণা টুপি, খাটো কুর্তা আর রক্তের মতো লাল ডুটো করে পটি-দেওয়া ট্রাউজারে তাদের কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা আর অনুনয়-বিনয়ের পালা থেমে এলো। থমথমে কঠিন মুখে ধর্মঘটীরা আরও ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে দাঁড়ালো, যখন ভিড়ের মধ্যে থেকে কারা যেন চিৎকার করে উঠলো ঃ

'সৈন্য !'

নতুন একটা ঝোঁক জনতাকে পেয়ে বসলো। ধর্মঘটীদের প্রতি চিৎকার, বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ শিসের সঙ্গে এবার মিশলো স্ফূর্তির উল্লাস। পানামা টুপি আর হালকা ধূসর পোশাকপরা বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক হঠাৎ শান-বাঁধানো পাথরের ওপর পা ঠুকে লাফাতে শুরু করলো। চালক আর কণ্ডাকটররা ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে ট্রামগুলোর দিকে এগুতে লাগলো, কেউ কেউ তাতে চড়েও বসলো। চারদিকে জনতার বক্রোক্তিতে ওদের এখন আরও থমথমে দেখাচ্ছে। চাপা গুঞ্জন হঠাৎ থিতিয়ে এলো।

সান্তা লুসিয়া বাঁধের ওপর ছন্দিল তালে পা ফেলে এবার ধূসর পোশাকপরা সৈন্যদের আসতে দেখা গেলো, বাঁ হাতগুলো ওদের যন্ত্রের মতো দুলছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন খেলনার মতো ঠুনকো সব টিনের সেপাই। লম্বা, সুপুরুষ চেহারা একজন অফিসার ওদের পরিচালনা করছে, কোঁচকানো ভ্রূ, ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি। ওর পাশে লাফাতে লাফাতে আসছে মোটা মতন একজন লোক, মাথায় উঁচু টুপি, বাতাসে হাত নেড়ে হড়বড় করে কি যেন সব বলাবলি করছে।

জনতা ট্রামগুলোর কাছ থেকে সরে এলো। পাটাতনের ওপর যেখানে

ধর্মঘটীরা দাঁড়িয়ে ছিলো, রুদ্রাক্ষের মালার মতো সৈন্যদল সেদিকে এগিয়ে গেলো। উঁচু-টুপি-মাথায় লোকটা এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠলো :

'এই শেষ বারের মতো তোমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে! শুনতে পাচ্ছো?'

অফিসার এক পাশে মাথা হেলিয়ে গোঁফ চোমরাচ্ছে। টুপি হাতে একজন লোক ছুটে এসে রুক্ষ গলায় তাকে কি যেন বললো। বাঁকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে অফিসার মন দিয়ে সব শুনলো, তারপর বুক চিতিয়ে চিৎকার করে হুকুম দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা দুজন দুজন করে ট্রামের প্রতিটা পাটাতনের ওপর লাফিয়ে উঠলো, আর চালক কণ্ডাকটররা একে একে ট্রাম থেকে নেমে এলো।

জনতার কাছে ব্যাপারটা মজার মনে হলো—চিৎকার, শিস, হাসাহাসিতে সবাই মুখর হয়ে উঠছে। কিন্তু পরক্ষণেই হৈ-হট্টগোল সব থেমে গেলো। ভয়ার্ত চোখে, থমথমে গম্ভীর মুখে জনতা সারির প্রথম ট্রামখানার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো।

সেখানে চাকার ঠিক সামনে লাইনের ওপর শুয়ে পড়েছে একজন চালক। মাথাটা খালি, পাকা চুল, সৈনিকের মতো ক্রুদ্ধতায় ফুলে ওঠা একজোড়া গোঁফ, অপলক চোখে ও আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ বাঁদরের মতো চটপটে পুঁচকে একটা ছোঁড়া চালকের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর তার দেখাদেখি অনেকেই পটাপট শুয়ে পড়তে লাগলো।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ভেসে এলো মৃদু গুঞ্জন, ম্যাডোনাকে স্মরণ করার ভয়ার্ত স্বর, গালাগালি আর মেয়েদের চাপা আর্তনাদ। অধীর উত্তেজনায় বাচ্চা-গুলো রবারের বলের মতো লাফাচ্ছে।

উঁচু-টুপি-মাথায় লোকটা বিকারগ্রস্তের মতো চিৎকার করে কি যেন সব বললো। অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। ট্রামশ্রমিকদের হাত থেকে গাড়িগুলো দখল করার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধর্মঘটীদের সঙ্গে সংঘর্ষের কোন হুকুম তাকে দেওয়া হয়নি।

উঁচু-টুপি-পরা লোকটা তখন কর্তব্যপরায়ণ কিছু নাগরিককে জুটিয়ে লাইনের ওপর শুয়ে থাকা লোকগুলোকে হটাবার জন্যে এগিয়ে গেলো।

সামান্য একটু ধস্তাধস্তিও হলো। কিন্তু দর্শকের গোটা ভিড়টাই যেন দুলে

উঠলো, চাপা গর্জন করলো, তারপর লাইনের দিকে ছুটে গেলো। পানামা টুপি-পরা লোকটা সবার আগে তার টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধর্মঘটীদের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে শুয়ে পড়লো, আর পাশের ধর্মঘটীর কাঁধ চাপড়ে তার কানে কানে উৎসাহ দিলো।

তখন একের পর এক সবাই লাইনের ওপর ধপাধপ শুয়ে পড়তে শুরু করেছে, যেন ওদের পাগুলো হঠাৎ খোয়া গেছে। উৎফুল্ল জনতা যারা দুমিনিট আগেও সেখানে ছিলো না, মাটির ওপর শুয়ে ওরা এখন পরস্পরে হাসাহাসি করছে আর অফিসারের দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে। উঁচু-টুপি-পরা লোকটার নাকের কাছে দস্তানা নাচিয়ে অফিসারটি মৃদু মৃদু হাসছে আর সুন্দর মাথাটা দোলাচ্ছে।

এদিকে লোকের পর লোক, মেয়েরা হাতের ঝুড়ি ফেলে, বাচ্ছারা কুকুর-ছানার মতো হেসে লুটোপুটি খেয়ে লাইনের ওপর শুয়ে পড়ছে। এমনকি সুন্দর পোশাক-পরা লোকেরাও ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

প্রথম গাড়িখানার পাটাতনে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচজন সৈনিক চাকার নিচে মানুষের স্তূপ দেখে হাতল ধরে মাথাগুলো পেছনে হেলিয়ে কৌতুকে হো হো করে হেসে উঠলো। এখন আর ওদের আদৌ টিনের সেপাইয়ের মতো দেখাচ্ছে না।

ঘন্টা আধেক পরে নেপলসের রাস্তা দিয়ে ট্রামগুলো ঠুংঠাং শব্দে দ্রুত ছুটে চলে। স্মিত মুখে বিজয়ীরা যাত্রীদের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে যেতে যেতে নম্রভাবে জিগেস করে :

'টিকিটি !'

চোখ ঠেরে, হেসে, ঠাট্টা তামাসা করতে করতে যাত্রীরা তাদের লাল হলদে কাগজের টুকরোগুলো এগিয়ে দেয় ওদের দিকে।

১৯০৬-১৩

পার্মার শিশুরা

জেনোয়া রেল স্টেশনের সামনের ছোট উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটায় রীতিমত ভিড় জমেছে। ওদের অধিকাংশই মজুর, সম্ভ্রান্ত পোশাক-পরা কিছু ভদ্র নাগরিকও রয়েছে। ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নগরপরিষদের সদস্যরা। ওঁদের মাথার ওপরে উড়ছে সুন্দর রেশমী সুতোয় কাজ-করা শহরের ভারি পতাকাটা। তার পাশেই রয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলোর বহু বর্ণের নিশান। ভিড়ের মধ্যে ঝলমল করছে সোনালী ফিতে, ঝালর আর পতাকার দণ্ডশীর্ষগুলো। রেশমী পতাকার পতপত শব্দ আর জনতার মৃদু গুঞ্জরন মনে হচ্ছে সট্রো ভোসের অনুচ্চ মন্ত্রোচারণের মতো।

সামনে উঁচু বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বপ্নদর্শী কলম্বাসের প্রতিমূর্তি, বিশ্বাসের জন্যে যাঁকে সারাজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছিলো, বিশ্বাসের জন্যেই যিনি জয়ী হয়েছিলেন। আজও যেন দেশবাসীর দিকে তাকিয়ে মর্মর পাথরের ঠোঁট নেড়ে উনি বলছেন :

'বিশ্বাস যাদের আছে জয় তাদের অনিবার্য।'

বাজনদাররা বেদীর পাদদেশে তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো নামিয়ে রেখেছে, আর রোদ্দুরে পেতলের চাকতিগুলো সোনার মতো ঝিকমিক করছে।

অর্ধ-বৃত্তাকার স্টেশন-বাড়িটা যেন পাথরের দুটি বিশাল ডানা মেলে উন্মুক্ত জনতাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। বন্দরের দিক থেকে ভেসে আসছে বাষ্পীয় পোতের ক্লান্ত নিঃশ্বাস, জলের মধ্যে চাকা ঘোরার মৃদু গুঞ্জরন, শেকলের ঝন-ঝনা, শিস দেওয়ার শব্দ আর হৈ-হুল্লোড়। অথচ জ্বলন্ত সূর্যের উত্তপ্ত আলোয় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটা সে তুলনায় অনেক বেশি নিস্তব্ধ। আশপাশের ঝোলানো বারান্দা আর জানলার সামনে মেয়েরা ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের পাশে ছুটির পোশাক-পরা বাচ্ছাদের দেখাচ্ছে ঠিক যেন ফুটন্ত গোলাপ।

প্রচণ্ড গর্জন করে ট্রেনটা স্টেশনে প্রবেশ করতেই জনতা সচকিত হয়ে উঠলো, দলামোচড়া টুপিগুলো উড়লো বাতাসে, যেন কয়েকটা কালো পাখি। বাজনদাররা তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো তুলে নিলো, আর গম্ভীর প্রকৃতির কয়েকজন বয়স্ক ভদ্রলোক সামনের দিকে এগিয়ে গেলো, তারপর জনতার দিকে ফিরে ডাইনে বাঁয়ে হাত নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলতে শুরু করলো।

ধীরে ধীরে জনতা দুভাগ হয়ে গিয়ে একটা চওড়া পথ করে দিলো।

'এখানে কাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে?'

'পার্মার শিশুদের!'

পার্মায় ধর্মঘট চলছে। মালিকপক্ষ কিছুতেই হার মানতে রাজি নয়। এ-দিকে শ্রমিকদের অবস্থা এমন সঙ্গীন যে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ওরা শিশুদের জেনোয়ায় সংগ্রামী বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

স্টেশনের থামগুলোর আড়াল থেকে ছোটদের সুন্দর একটা মিছিল বেরিয়ে এলো। নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড়ে ওদের দেখাচ্ছে অদ্ভুত লোমশ কতকগুলো প্রাণীর মতো। হাত ধরাধরি করে এক এক সারিতে পাঁচজন ওরা হাঁটছে, অসম্ভব ক্লান্ত, ধূলিধূসর দেহ। থমথমে মুখ, অথচ চোখগুলো আশ্চর্য উজ্জ্বল। বাদ্যযন্ত্রে যখন গ্যারিবলদি স্তোত্রের সুর বেজে উঠলো, ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মুখগুলো অবাধ হাসিতে ঝলমল করে উঠলো।

উল্লসিত জনতা অনাগতের এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভ্যর্থনা জানালো, ওদের সম্মানে পতাকা অবনমিত করা হলো আর ছোটদের বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ পেতলের রামশিঙা বেজে উঠলো। আচমকা এই অভ্যর্থনায় ওরা মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলো, তারপর চকিতে বুক টানটান করে দাঁড়ালো। এখন মনে হচ্ছে ওরা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা হয়ে গ্যাছে। পর মুহূর্তেই শতশত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো একটি মাত্র ধ্বনি:

'ইতালি জিন্দাবাদ!'

ওদের ঘিরে জনতা বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলো, 'তরুণ পার্মা দীর্ঘজীবী হোক!'

'গ্যারিবলদি জিন্দাবাদ!' সমবেত জনতাকে যেন দুভাগে ভাগ করে শিশুরা চেঁচিয়ে উঠলো।

হোটেলের জানলা আর বাড়ির ছাদ থেকে সাদা সাদা পাখির মতো রুমাল উড়ছে, নিচে জনতার মাথার ওপর ঝরে পড়ছে পুষ্পবৃষ্টি, শোনা যাচ্ছে উল্লসিত চিৎকার, আনন্দধ্বনি আর উতরোল।

সব কিছুতেই একটা উৎসবের আমেজ, প্রাণের স্পন্দন বইছে। এমনকি ধূসর পাথরগুলোও যেন উজ্জ্বল রঙের প্রলেপে রঙিন হয়ে উঠেছে।

বাতাসে নিশান দুলছে, ফুল আর টুপিগুলো উড়ছে আকাশে। ভিড়ের মধ্যে বাচ্ছারা মাথা উঁচিয়ে ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো লুফছে আর অবিরাম বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলছে:

'সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ!'

'ইতালি দীর্ঘজীবী হোক!'

সবকটা বাচ্ছাকেই কেউ না কেউ তুলে নেয়—কেউ তাদের বলিষ্ঠ কাঁধে, কেউ বা তাদের চওড়া বুকের মধ্যে। হাসি আর হৈ-হট্টগোলের মধ্যে বাজনার শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

ভিড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করে মেয়েরা অবশিষ্ট নবাগতদের কোলে তুলে নেয়।

'আন্নিতা, তুমি কি দুটো বাচ্ছাকে নেবে?'

'হ্যাঁ, আর তুমি?'

'খোঁড়া মার্গারেটকে একটা দিতে হবে, ভুলো না কিন্তু...'

চারদিকে উচ্ছল আবেগের একটা স্রোত, অশ্রু-সজল, চোখের করুণ দৃষ্টি। ইতিমধ্যেই শিশুদের কেউ কেউ রুটি চিবুতে শুরু করেছে।

'আমাদের সময়ে এমন কাণ্ড কেউ ভাবতেও পারতো না!' পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক এক বৃদ্ধ মন্তব্য করলো, দাঁতের ফাঁকে তার পেল্লাই একটা চুরুট।

'অথচ খুব সহজ।'

'হ্যাঁ। সহজ আর প্রয়োজনীয়ও বটে।'

বৃদ্ধ মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দেখলো কাছেই পার্মার দুটো শিশু, সম্ভবত দুই ভাই, গম্ভীর মুখে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। বৃদ্ধ তখন চোখের ওপর টুপিটা নামিয়ে দিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দিলো। ছেলে দুটি ভ্রূ কুঁচকে পেছিয়ে যাবার উপক্রম করতেই বৃদ্ধ হঠাৎ বসে পড়ে মোরগ ডাকতে শুরু করলো। ছেলেরা মাটিতে খালি পা ঠুকে হো হো করে হেসে উঠলো। বৃদ্ধ উঠে টুপিটা ঠিক করে নিয়ে টলমলে পায়ে চলে গেলো, ভাবখানা এই রকম যেন সে তার কর্তব্যটুকু করে গেলো।

কলম্বাসের প্রতিমূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে ডাইনির মতো দেখতে কুঁজো পিঠ এক বুড়ি কাঁদছে আর বিবর্ণ শালের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছছে। উত্তেজিত জনতার মধ্যে ময়লা রঙ কুৎসিত এই বুড়িটাকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে।

ছন্দিল পায়ে এগিয়ে এলো কালো চুল জেনোয়ার একজন তরুণী। সঙ্গে তার হাত-ধরা বছর সাতেকের একটা বাচ্ছা ছেলে, পায়ে কাঠের জুতো, মাথায় ধূসর রঙের টুপিটা এত বড় যে তার কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ছোট্ট মাথাটা

ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সে চেষ্টা করছে যাতে টুপিতে তার চোখ ঢাকা পড়ে না যায়, কিন্তু টুপিটা অনবরত তার মুখের ওপর নেমে আসছে। তাই দেখে তরুণী হাসতে হাসতে টুপিটা ওর মাথা থেকে তুলে নিয়ে হাওয়ায় দোলাতে থাকে আর গান গায়। বাচ্ছাটা মাথা হেলিয়ে দেখলো, তারপর টুপিটা ধরার জন্যে লাফাতে শুরু করলো। একটু পরেই ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলো।

এরপর দেখা গেলো চামড়ার সজ্জাবরণী-পরা দীর্ঘকায় একজন পুরুষকে, অনাবৃত বলিষ্ঠ দু হাতে সে বছর ছয়েকের ফুটফুটে একটা বাচ্ছা মেয়েকে ধরে রয়েছে তার কাঁধে। তার পাশে পাশে উজ্জ্বল লাল-চুল ছোট একটা বাচ্ছা ছেলেকে নিয়ে হেঁটে চলেছে একজন মহিলা। 'তাই বলছিলুম, এই রকম ব্যাপার যদি একবার রপ্ত হয়ে যায়, আমাদের হারানো এত সহজ হবে না, তাই কি না বলো?'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে কাঁধের ফুটফুটে মেয়েটাকে নীল শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা চিৎকার করে উঠলো:

'পার্মা জিন্দা-বা-দ!'

শিশুদের নিয়ে জনতা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। নির্জন প্রাঙ্গণে শুধু পড়ে থাকে থ্যাঁতলানো ফুল, মিঠাইয়ের মোড়ক, উৎফুল্ল কয়েকজন কুলিকামিন আর নতুন জগতের অবিষ্কারক সেই মহান মানুষের প্রতিমূর্তি।

বিরাট রামশিঙার তূর্য নিনাদের মতো উল্লসিত জনতা আনন্দধ্বনি করতে করতে এগিয়ে চলে নতুন এক জীবনের দিকে।

১৯০৬-১৩

গুমোট দুপুর। মধ্যাহ্নের তোপ পড়লো দূরে। বিরাট পচা একটা ডিম ফাটানোর শব্দের মতো ফাঁপা বিস্ফোরণের আওয়াজে ঘুলিয়ে উঠলো বাতাস—জলপাই-য়ের তেল, রশুন, মদ আর রৌদ্রতপ্ত ধুলো, শহরের যত বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধ।

প্রকম্পিত তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঝলসানো দিনের মুখর কোলাহল যেন রাস্তার উত্তপ্ত পাথরের ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলো, তারপরেই আবার রাস্তা ছাপিয়ে স্রোতধারার মতো প্রবাহিত হয়ে গেলো সমুদ্রের দিকে।

নানা রঙে কারুকার্য-করা বাউলের আলখাল্লার মতো শহরটাকে দেখাচ্ছে রঙিন। উদ্বেলিত চিৎকার, কোলাহল আর টুকরো টুকরো কথার সংলাপে তাকে মনে হচ্ছে যেন জীবনের স্তবগানে মুখর। সব শহরই মানুষের মেহনতে গড়া এক একটা মন্দির, আর সব মেহনতই হলো ভবিষ্যতের জন্যে এক একটা প্রার্থনা।

আকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে গনগনে সূর্যটা জ্বলছে, তার তেজদীপ্ত রশ্মিগুলো যেন জ্বলন্ত তরবারির মতো এসে বিঁধছে জল আর পাথরের বুকে। সমুদ্রের জল মনে হচ্ছে রূপোলী জরিতে-বোনা যেন কোন রেশমী ওড়না। তার উষ্ণ সবুজ তরঙ্গমালা তীরে আছড়ে পড়ে জীবন আর আনন্দের উৎস সেই সূর্যের পানে তুলছে মৃদু মর্মর-গাঁথা।

দলে দলে ধুলোমাখা ঘামঝরা মজুরেরা চলেছে তাদের দুপুরের খাওয়ার জন্যে, উচ্ছল খুশিতে কলকল করছে। অনেকে ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রবেলায়, তারপর জামাকাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। জলের মধ্যে তাদের বাদামী রঙের দেহগুলো দেখাচ্ছে আশ্চর্য ছোট, যেন বিরাট একটা সুরাপাত্রের মধ্যে ভাসছে কয়েকটা কালো কালো কুটো।

সদ্যস্নানে উল্লসিত বাচ্চাদের চিৎকার, হাসি আর তাদের পায়ের আঘাতে ছিটকে-ওঠা রামধনুরাঙা জলোচ্ছ্বাস যেন সূর্যকে উপহার দিচ্ছে মুঠো মুঠো অর্ঘ।

বড় একটা বাড়ির ছায়ায় বাঁধানো চত্বরে চারজন মজুর খাবার আয়োজন করছে। ধুলোয় ধূসর আর পাথরেরই মতো শক্ত শরীর। পাকাচুল একজন বুড়ো তীক্ষ্ণ চোখে ভ্রূ কুঁচকে লম্বা একটা রুটি কাটছে। রুটির ফালাগুলো যাতে ছোট বড় না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখছে। মাথায় হাতে-বোনা লাল একটা টুপি। টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাকটা ওর কাঁপছে।

বুড়োর পাশে চামড়ার পোশাক-পরা একজন তরুণ, বাদামী রঙ, কুচকুচে কালো চুল, গরম পাথরের ওপর চিতপাত হয়ে শুয়ে রয়েছে। রুটির গুঁড়ো-গুলো ঝরে পড়ছে ওর বুকের ওপরে, আর ও চোখ বুজিয়ে মৌজে গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজছে। অন্য দুজন বাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঝিমুচ্ছে।

এক হাতে খড়-জড়ানো মদের একটা বোতল, অন্য হাতে ছোট একটা মোড়ক নিয়ে একটি ছেলে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। মাথা দুলিয়ে পাখির মতো চাঁচা গলায় ও কি যেন একটা গান গাইছে, খেয়ালই নেই যে বোতলের গা বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়ছে চুনির মতো ঘন লাল মদ। বুড়োর কিন্তু নজর পড়েছে। শুয়ে-থাকা-ছেলেটার বুকের ওপর ছুরি আর রুটিটা নামিয়ে রেখে সে হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠে :

'এই কানা ! দেখতে পাচ্ছিস না, মদ যে পড়ে যাচ্ছে।'

মদের বোতলটা তুলে ধরে ছেলেটা দৌড়ে এলো মজুরদের দিকে। চকিতে ওরা সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো। বোতলটা নামিয়ে রেখে ছেলেটা আবার ছুটে বাড়ির উঠোন থেকে হলদে রঙের বেশ বড় একটা জগ নিয়ে ফিরে এলো।

জগটা ও নামিয়ে রাখলো মাটিতে। বুড়ো বোতল উপুড় করে মদটা ঢেলে দিলো তার মধ্যে। চারজোড়া চোখে খুশিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো রোদ্দুরে কেমন টলটল করছে তার দীপ্তি। শুকনো ঠোঁটগুলো ওদের মৃদু কেঁপে উঠলো।

ফিকে নীল রঙের পোশাক আর কালো চুলে সোনালী ঝালর দেওয়া ওড়না মাথায় একটি মেয়ের জুতোর শব্দ শোনা গেলো সেই বাঁধানো চত্তরে। সঙ্গে হাত-ধরা কোঁকড়ানো চুল ফুটফুটে ছোট্ট একটা মেয়ে, হাতে একগুচ্ছ রক্ত-গোলাপ। গোলাপের গুচ্ছটা দোলাতে দোলাতে ও গান গাইছে :

'ও মা, ও মা, ও মি-য়া মা···'

বুড়ো মজুরের ঠিক পেছনে এসে বাচ্ছাটার গান থামলো। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে ও গম্ভীর ভাবে বুড়োর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো হলদে পাত্রে মদ ঢালা হচ্ছে, কলকল শব্দটা মনে হচ্ছে ঠিক যেন মেয়ে-দের খিলখিল হাসির মতো।

চকিতে মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চড়ুয়ের ডোনার মতো ছোটছাট নরম হাতে গোলাপের কয়েকটা পাপড়ি ছিঁড়ে ও ফেলে দিলো মদের পাত্রে।

চারজনেই চমকে উঠে রাগে মাথা তুলে তাকায়। মেয়েটা হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে। লজ্জায় লাল হয়ে মা চাপা স্বরে ধমক দেয়, মেয়েটার হাত ধরতে যায়। মেয়েটার হাসি আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠে, আর ফুলের পাপড়িগুলো মদের পাত্রে ছোট ছোট নৌকার মতো ভাসতে থাকে।

একটা গেলাসে পাপড়ি-সমেত খানিক মদ ঢেলে নিয়ে বুড়ো গেলাসটা রোদ্দুরে তুলে ধরলো। তারপর থমথমে অথচ স্নেহঝরা গলায় বললো, 'ঠিক আছে সিনোরা, ও কিছু নয়! শিশুর দেওয়া হলো ভগবানেরই দান! আপনার স্বাস্থ্য, রূপসী সিনোরা, আর তোমারও স্বাস্থ্য, মেয়ে···মায়েরই মতো দিন দিন রূপসী হয়ে ওঠো, আর মায়ের চেয়ে অনেক বেশি সুখী!'

পাকা গোঁফের প্রান্ত ডুবিয়ে বুড়ো ধীরে ধীরে মদের গেলাসে চুমুক দিলো, শব্দ করে ঠোঁটদুটো চাটলো আর মৃদু কেঁপে উঠলো তার বাঁকানো নাকটা।

মা স্মিত হেসে অভিবাদন জানালো, তারপর মেয়েটার হাত ধরে এগিয়ে চললো। বাঁধানো পাথরের ওপর দুষ্টুমি করে পা ঘসে ঘসে এদিক ওদিক দুলে দুলে বাচ্চাটা গান গাইছে: 'ও মা, ও মা, ও মি-য়া মা···'

মজুরেরা একবার মদের পাত্র আর একবার ছোট মেয়েটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে। তারপর দক্ষিণাঞ্চলের দ্রুত উচ্চারণে পরস্পরের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে।

জগের মধ্যে গোলাপের রক্ত পাপড়িগুলো তখনও ভাসছে।

সমুদ্র গান গাইছে, মৃদু গুঞ্জরন উঠছে শহরের বুক থেকে, আর সূর্য তার উজ্জ্বল রশ্মিতে বুনে চলেছে যত অদ্ভুত রূপকথা।

১৯০৬-১৩

চির তুষার-মৌলি উঁচু পাহাড়ে ফ্রেমে বাঁধানো শান্ত নীল হ্রদ। জলের কোল পর্যন্ত নেমে এসেছে ঘন গাছগাছালির নিপুণ কারুকার্য। জলের দিকে তাকিয়ে থাকা সাদা সাদা বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে যেন মিছরির তৈরি, আর শিশুর নম্র ঘুমের মতো নিস্তব্ধ নিথর।

নিশান্তিকা। পাহাড় থেকে ভেসে আসছে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। সবে তখন সূর্য উঠছে। গাছের পাতা আর ঘাসের আগায় ঝিলমিল করছে শিশিরবিন্দু। স্তব্ধ গিরিখাদ থেকে নেমে আসা পথটা মনে হচ্ছে ধূসর ফিতের মতো। পাথর বিছনো, তবু পথটাকে দেখাচ্ছে ঠিক মখমলের মতো কোমল আর মসৃণ।

পাথরের স্তূপের পাশে বসে রয়েছে একজন শ্রমিক, ভোমরার মতো কালো তার গায়ের রঙ, মুখে সাহস আর আন্তরিকতার অভিব্যক্তি। বুকে তার একটা পদক ঝুলছে।

তামাটে হাতটা হাঁটুর ওপর রেখে মাথা তুলে সে বাদাম গাছের তলায় দাঁড়ানো পথিকের মুখের দিকে তাকালো।

'এই যে পদকটা দেখছেন, সিনোর, এটা আমি পেয়েছিলুম সিমপ্লন সুড়ঙ্গে আমার কাজের জন্যে।' বুকের ওপর উজ্জ্বল পদকটার দিকে তাকিয়ে সে স্মিত হাসলো। 'নিশ্চয়ই, অস্থি-মজ্জায় গেঁথে না যাওয়া পর্যন্ত প্রথম প্রথম সব কাজই কঠিন। তারপর একবার ভালবাসতে শুরু করলে মানুষ হয়ে ওঠে চঞ্চল, তখন কোন কাজই আর কঠিন মনে হয় না। তবে, আমাদের কাজটা নিঃসন্দেহে খুব সহজ ছিলো না।'

অল্প একটু মাথা নেড়ে সে রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে হাত নাড়লো, জ্বলে উঠলো তার কালো চোখের মণিদুটো।

'হ্যাঁ, কখনও সখনও একটু-আধটু ভয় লাগতো বই কি। এমনকি মাটিরও বোধশক্তি আছে, তাই কি না বলুন? যখন আমরা পাহাড়ের গায়ে প্রচণ্ড ভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাটির গভীরে গর্ত খুঁড়তুম, তখন মাটির সে কি ভীষণ রাগ! তার উত্তপ্ত নিঃস্বনে আমাদের বুক কাঁপতো, মাথা নুয়ে পড়তো আর হাড় পর্যন্ত ব্যাথায় বিষ হয়ে যেতো। আমাদের অনেকেরই এ অভিজ্ঞতা হয়েছে! তারপরে তো মাটি থেকে ছিটকে ছিটকে উঠছে পাথর, গরম জলে আমাদের একেবারে ভিজিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। উঃ, সত্যি সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কখনও কখনও আলো পড়লে সে জল হয়ে উঠতো টকটকে লাল। আমার বাবা বলতেন—আমরা পৃথিবীকে আঘাত করছি, তাই সে আমাদের সবাইকে তার তাজা রক্তে ঝলসে ডুবিয়ে মারবে। কথাটা যদিও কাল্পনিক, তবু মাটির একেবারে গহন গভীরে, শ্বাসরুদ্ধ-করা অন্ধকারে, যেখানে অবিরাম ঝিরঝির করে জল ঝরছে, পাথরে গাঁইতির ঘা পড়ছে, সেখানে এই রকম কথা শুনলে মনে হয় সবই বুঝি সম্ভব, সিনোর, সবই অদ্ভুত! যার অভ্যন্তর ভাগ আমরা খুঁড়ে চলেছি, সেই মেট-ছোঁয়া পাহাড়ের তুলনায় মানুষ আর কতটুকু! নিজে চোখে দেখলে বুঝতে পারতেন আমি কি বলতে চাইছি। কিন্তু সেই ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষ-গুলোই আমরা পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ কাটছি, গুড়ি মেরে তার মধ্যে সেঁধোচ্ছি আর বিমর্ষ দৃষ্টিতে সূর্য আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। যন্ত্রপাতির শব্দে, পাগলের অট্টহাসির মতো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে যদি একবার দেখতেন পাহাড়ের থমথমে গোমড়া মুখটাকে।'

নিজের হাতদুটোর দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। নীল কামিজের ওপর পদকের ফিতেটা ঠিক করে নিয়ে সে ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর গর্বিত স্বরে বলে চললো, 'মানুষ জানে বটে কেমন করে কাজ করতে হয়! হ্যাঁ, সিনোর, মানুষ যত ক্ষুদেই হোক, একবার কাজে নামলে কেউ আর তাকে রুখতে পারবে না। যা করবে বলে একবার কোমর বেঁধে লেগেছে, তা সে করবেই। আমার বাবা প্রথমটায় এ কথা বিশ্বাস করতেন না। উনি বলতেন, পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ভগবান একটা দেশকে আর একটা দেশ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন, তাকে এক দেশ থেকে আর এক দেশ পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলে ম্যাডোনার ইচ্ছাকে অমান্য করা হবে। ওঁর কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। ম্যাডোনাকে যারা ভালোবাসে ম্যাডোনা তাদের ছেড়ে কখনও চলে যান না! আমি যা ভাবতুম পরে অবশ্য বাবাও তা ভাবতে শুরু করেছিলেন, কেননা পাহাড়ের চেয়ে আমরা বড় আর শক্তিশালী এটা ওঁর ঠাহর হয়েছিলো। তবু মাঝে মাঝে উৎসবের দিনে টেবিলে মদের বোতল নিয়ে বসে উনি আমাদের সবাইকে উপদেশ দিতেন, 'ঈশ্বরের সন্তানেরা সব শোনো।' উনি ছিলেন খুব সরল আর ধর্মভীরু, আমাদেরকে তাই, ঈশ্বরের সন্তান' বলে সম্বোধন করতে ভালোবাসতেন, 'তোমরা এভাবে মাটির সঙ্গে লড়াই করে পারবে না। তোমরা যে তাকে আঘাত করছো এর জন্যে ও প্রতিশোধ নেবেই, তাকে হার মানানো যাবে না! দেখে নিও, খুঁড়তে খুঁড়তে আমরা যখন পাহাড়ের কলজের কাছে

পৌঁছে যাবো, যখনই তাকে স্পর্শ করবো, তখন দাউ দাউ আগুনের শিখা আমাদের গিলতে আসবে, কেননা ধরিত্রীর বুকের কলজের মধ্যে যে আগুন আছে সে কথা সবাই জানে। চাষ আবাদ করা, প্রকৃতির গর্ভে ফসল ফলানো সে এক জিনিস, তার তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে বিকৃত করা আর এক জিনিস। তাই দেখছো না, যতই আমরা পাহাড়ের গভীরে প্রবেশ করছি, বাতাস ততই গরম হয়ে উঠছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে…'

শ্রমিকটি মৃদু হাসলো, আঙুলের ডগা দিয়ে গোঁফের প্রান্তদুটো পাকালো।

'আমার বাবা যে একাই এসব ভাবতেন তা নয়। তাছাড়া সত্যিই, আমরা সুড়ঙ্গের যত গভীরে প্রবেশ করতে লাগলুম আবহাওয়া ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। আমাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে মারা গেলো। উষ্ণ জলের প্রস্রবণ উঠতে লাগলো আরও তোড়ে, পাথরের চাঁই পড়তে লাগলো ধসে ধসে। আমাদের দলে লুগানো অঞ্চলের দুজন লোক তো পাগলই হয়ে গেলো। রাত্তিরে ছাউনিতে কত লোক যে ঘুমের ঘোরে ভুল বকতো, আতঙ্কে লাফিয়ে উঠতো বিছনা থেকে…

'কি, ঠিক বলিনি?' বাবা বলতেন। চোখে মুখে ওঁর ভয়ের ছাপ। আর কাশিটা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। উনি বললেন, 'কি, বলেছিলুম না, প্রকৃতিকে হার মানানো অত সহজ নয়?'

'শেষকালে সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। বুড়ো হলে কি হবে, শক্ত জান ছিলো আমার বাবার। মৃত্যুর সাথে সমানে যুঝলেন তিন সপ্তারও বেশি। কারুর বিরুদ্ধে কোনদিন নালিশ করেননি, নিজের শক্তির ওপর ছিলো ওঁর অগাধ বিশ্বাস।

'একদিন রাত্তিরে আমায় ডেকে বললেন, 'আমার কাজ ফুরুলো, পাওলো; নিজের ওপর নজর রাখিস আর বাড়িতে ফিরে যাস। ম্যাডোনা তোর সহায় হবেন!' তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, চোখ বুজিয়ে টেনে টেনে শ্বাস ফেললেন।'

শ্রমিকটি উঠে দাঁড়ালো, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে আড়মোড়া ভাঙলো যে হাড়গোড় তার মটমট করে উঠলো।

'তারপর হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে উনি বললেন—সত্যি, বিশ্বাস করুন, সিনোর, উনি বললেন, 'বুঝলি পাওলো, আমার মনে হয়, এ দিকে আমরা আর পাহাড়ের অন্য দিক থেকে যারা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আসছে, পাহাড়ের মাঝখানে

তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবেই। তোরও তো তাই ধারণা, তাই না পাওলো?' হ্যাঁ সিনোর, এ বিশ্বাস আমার ছিলো। 'বহুত আচ্ছা, বেটা! মরদ মাত্তরই তাকে কাজে বিশ্বাস রাখতে হবে, নিজের সাফল্যের ওপর ভরসা করতে হবে, আর ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখলে ম্যাডোনা তাকে ভালো কাজে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। আমি তোকে একটা অনুরোধ করে যাই বাপ, যদি তাই হয়, পাহাড়ের মধ্যে যদি লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়, তবে আমার কবরে এসে বলে যাস—বাবা, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। তাহলে আমি ঠিক শুনতে পাব!'

'আমি কথা দিলুম, সিনোর। পাঁচদিন পরে উনি মারা গেলেন। মরার দুদিন আগে আমাদের সব্বাইকে বললেন, সুড়ঙ্গের মধ্যে যেখানে উনি কাজ করছেন সেখানে ওঁকে কবর দিতে। খুব মিনতি করে বললেন, অবশ্য আমার ধারণা উনি তখন ভুল বকছিলেন।

'ওঁর মৃত্যুর তেরো সপ্তা বাদে আমরা আর ওদিক থেকে যারা আসছিলো সুড়ঙ্গের মধ্যে এক সঙ্গে মিললুম। উঃ, সে এক পাগল-করা দিন, সিনোর! মাটির নিচের ঘুটঘুটে অন্ধকারে যখন প্রথম শুনলুম এগিয়ে আসা অন্য দলটার কাজের আওয়াজ, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না! অথচ ছোট ছোট মানুষ আমরা, জগদ্দল পাথরের চাপে এক লহমায় সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারতুম!

'অনেকদিন ধরেই কতকগুলো ফাঁপা আওয়াজ আমাদের কানে আসতো, দিনের পর দিন তা হয়ে উঠতে লাগলো তীব্র আর স্পষ্ট। বিজয়ীর উন্মাদ আনন্দে আমরা ক্ষেপে উঠলুম। ক্লান্তি নেই,. তাগাদাবিহীন অবিরাম আমরা দৈত্য-দানোর মতো কাজ করে চললুম। আঃ, সে যে কি সুন্দর, বিশ্বাস করুন, ঠিক যেন রোদের দিনে নাচের মতো! আমরা সবাই তখন শিশুর মতো সহজ সরল হয়ে গেছি। উঃ, মাসের পর মাস অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে নেংটি ইঁদুরের মতো গর্ত করে চলার পর অন্য দলটার সঙ্গে মেলার জন্যে সে যে কি তীব্র ব্যাকুলতাই না আমাদের পেয়ে বসেছিলো সিনোর, যদি একবার দেখতেন!'

স্মৃতিচারণের উত্তেজনায় তার মুখখানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। আরও কাছে এগিয়ে এসে সে গভীর একজোড়া চোখের দৃষ্টি মেলে শ্রোতার মুখের দিকে তাকালো। তারপর মৃদু স্বরে বললো, 'আর শেষ পর্যন্ত যখন পাহাড়ের শেষ দেওয়ালটা ভেঙে গেলো, তার হাঁ-মুখের মধ্যে দিয়ে মশালের উজ্জ্বল হলদে

আলোর শিখা এসে পড়লো, আমরা দেখতে পেলুম আনন্দের অশ্রুতে পরিপূর্ণ কালো একটা মুখ। তার ঠিক পেছনে আরও মশাল, আরও মুখ, বিজয় উল্লাসে সবাই ফেটে পড়েছে—আঃ, আমার জীবনের সে হলো সবচেয়ে স্মরণীয় দিন! মনে পড়লেই ভাবি আমার জীবন বৃথা যায়নি। এই হলো কাজ সিনোর, আমার পবিত্র কাজ! তারপর আমরা যখন বাইরের সূর্যালোকে বেরিয়ে এলুম, আমাদের অনেকেই ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে মাটিতে চুমু খেতে লাগলো, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। রূপকথারই মতো সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, সিনোর! হ্যাঁ, হেরে-যাওয়া পাহাড়টাকে আমরা চুমু খেলুম, চুমু খেলুম মাটিকে। আর সেদিন প্রিয়তমারই মতো মাটিকে যতটা আপনার মনে হয়েছিলো, তেমনিটি আমার আর কখনও মনে হয়নি, সিনোর!

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সেদিন বাবার কবরে গিয়েছিলুম বইকি। যদিও জানি মরে গেলে মানুষ শুনতে পায় না, তবু গিয়েছিলুম। কেননা আমাদের জন্যে যিনি মেহনত করলেন, অনেক-কিছু সহ্য করলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছে তো আর অমান্য করতে পারি না, তাই কি না বলুন?

'সেদিন কবরে গিয়ে পা দিয়ে মাটি সরিয়ে যেমনটি বলতে বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে বললুম: 'কাজটা শেষ হয়ে গ্যাছে, বাবা। আমরা মানুষেরা জিতেছি!'

১৯০৬-১৩

রোম আর জেনোয়ার মাঝামাঝি ছোট্ট একটা রেলস্টেশনে একজন কণ্ডাকটর আমাদের কামরার দরজাটা খুলে তেলকালিমাখা এক-চোখ-কানা একজন বুড়োকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এলো।

অমায়িক হেসে সবাই একসঙ্গে বললো, 'ইশ্, কি অসম্ভব বৃদ্ধ!'

বুড়ো কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ। কোঁচকানো হাত নেড়ে তার সাহায্যকারীকে ধন্যবাদ জানালো, তারপর ধবধবে সাদা মাথা থেকে দোমড়ানো টুপিটা খুলে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে বেঞ্চিটার দিকে এক চোখে তাকিয়ে বললো, 'বসতে পারি?'

যাত্রীরা একটু একটু সরে জায়গা করে দিলো। বুড়ো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বসলো, হাত দুটো রাখলো শীর্ণ হাঁটুর ওপর। অনাবিল হাসিতে ঠোঁট দুটো ওর ফাঁক হয়ে গেলো।

একজন সহযাত্রী জিগেস করলো, 'দূরে কোথাও যাচ্ছেন না কি, দাদু?'

'না না, খুব কাছেই, তিনটে স্টেশন পরে।' বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো। 'যাচ্ছি আমার নাতির বিয়েতে।'

একটু বিরতির পরে চাকার ছন্দিল শব্দে ঝড়ে-ভাঙা শাখার মতো এদিক ওদিক দুলতে দুলতে বুড়ো শুনিয়ে চললো তার কাহিনী। 'আমি হলাম লিগুরিয়ান। লিগুরিয়ানরা খুব শক্ত জাত। এই আমার কথাই ধরো না কেন, আমার তেরোটা ছেলে, চারটে মেয়ে আর নাতিনাতনী যে কতো আমি নিজেই জানি না। যার বিয়েতে যাচ্ছি সেটা দ্বিতীয় নাতি। ব্যাপারটা মন্দ নয়, কি বলো?' নিষ্প্রভ অথচ উচ্ছল এক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বুড়ো গর্বিত ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসলো। 'ছাখো, আমার দেশ আর রাজার জন্যে কতগুলো জীবনকে আমি উপহার দিয়েছি!'

'কি বল্লে, চোখ নষ্ট হলো কি করে? সেটা গ্যাছে অনেকদিন আগেই। যখন আমি এই এতটুকুন তখন থেকেই বাপের সঙ্গে কাজে লেগে পড়েছি। আঙুর ক্ষেতের জন্যে জমি ঠিক করছিলো বাপ—আমাদের ওদিককার জমি আবার ভারি শক্ত আর পাথুরে, রীতিমত তোয়াজ করতে হয়। বাপের গাঁইতি থেকে একটা পাথর ছিটকে এসে সোজা লাগলো আমার চোখে। তখন যে খুব একটা যন্ত্রণা হয়েছিলো তা নয়, কিন্তু সেদিন রাত্তিরে খাবার সময় চোখটা আমার খসে পড়লো। সে ভারি বিশ্রী ব্যাপার। সবাই মিলে তো চোখটাকে

আবার গরম রুটির পুলটিশ দিয়ে বসিয়ে দিলো, কিন্তু কোন কাজই হলো না, চোখটাকে জন্মের মতো খোয়াতে হলো !'

লোল চিবুকটা ঘসে বুড়ো আবার অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলো। 'তখনকার দিনে তো আর এত ডাক্তার ছিলো না, আর লোকের বুদ্ধিসুদ্ধিও ছিলো কম। অবশ্য তখনকার দিনে লোকের প্রাণে দয়ামায়া ছিলো, তাই কি না বলো ?'

ধূসর-সবুজ দাড়ি-ভরা গভীর বলিরেখা-পড়া কুঞ্চিত মুখে ফুটে উঠলো ধূর্ত চতুর একটা অভিব্যক্তি। 'যতদিন বাঁচলাম ততদিন বাঁচার পর লোকজনকে যাচাই করে দেখার একটা অধিকার জানায়, তাই কি না বলো ?'

কাউকে ধমকানোর ভঙ্গিতে বুড়ো তার শীর্ণ বাঁকা আঙুলগুলো শূন্যে মেলে দিলো। 'তাহলে লোকজন সম্পর্কে তোমাদের দুটো কথা শোনাই। বাপ যখন মারা গেলো, আমার বয়স তখন তেরো। এখন যা দেখছো তখন তার চেয়েও ছোটোখাটো দেখতে ছিলুম, চটপটে আর একবার কাজে লেগে পড়লে কিছুতেই থামতুম না। বাপের কাছ থেকে শুধু এই গুণটুকু পেয়েছিলুম, কেননা দেনার দায়ে বাড়ি আর জমিটুকু আগেই বিকিয়ে গিয়েছিলো। তাই একটা চোখ আর দুখানা হাতকে সম্বল করেই আমাকে বাঁচতে হয়েছে, যেখানে কাজ পেয়েছি সেখানে গিয়েই হাজির হয়েছি···কষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জোয়ান বয়েসে কষ্টকে ডরালে কি চলে ?

'আমার বয়েস যখন উনিশ, দেখা হলো সেই মেয়েটার সঙ্গে। আমারই মতো গরিব, ইয়া তাগড়াই গতর, গায়ের জোরও আমার চাইতে বেশি। সে থাকতো তার পঙ্গু মায়ের সঙ্গে, আমারই মতো যে কাজ জুটতো করতো। দেখতে তেমন আহা মরি মরি কিছু ছিলো না, তবে প্রাণে দয়ামায়া ছিলো আর ছিলো খাসা মাথা। গাইতোও ভারি মিষ্টি, ঠিক পেশাদার গাইয়ের মতো। মিষ্টি গলার কদর অনেক, তা ছাড়া আমি নিজেও ভালো গাইতে পারতুম।

'একদিন ওকে জিগেস করলুম, 'কি গো, আমরা বিয়ে করবো না ?'

'দুখ্যু করে ও বললো, 'বিয়ে করাটা বোকামি রে একচোখো। তোর কিছু নেই, আমারও কিছু নেই। খাবোটা কি ?'

'কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের কারুরই কিছু ছিলো না। কিন্তু জোয়ান মেয়ে-মরদের পীরিত হলে আর কি চাই ? জানো তো, কথায় বলে পীরিতে অভাব কিছু নাই। আমি স্রেফ জবরদস্তি করলুম, শেষমেশ ইদাও সায় দিলো, 'হয়তো তোর কথাই ঠিক। আমাদের আলাদা আলাদা থাকাটা মা মেরীর ইচ্ছে

নয়, একসঙ্গে থাকলে হয়তো তাঁর পক্ষেও দেখাশোনা করতে সুবিধে হবে।'

'তারপরেই আমরা দুজন তো গেলাম পুরুতের কাছে।

'পুরুত বললে, 'পাগল হয়েছিস! লিগুরিয়ায় এখন কতো ভিখিরি জানিস? এমনিতেই তোরা হলি গিয়ে দুঃখী, শয়তানের হাতের শিকার। লোভকে জয় কর, না হলে পরে পস্তাবি।'

'ছেলে-ছোকরারা ঠাট্টা করতে লাগলো, বুড়োরা গালমন্দ দিলো। কিন্তু যৌবন হলো গিয়ে একরোখা, একবার যা মাথায় ঢোকে, শত বোঝালেও তা বোঝে না। এদিকে বিয়ের দিন এসে গেলো। আগে যা ছিলুম তখনও তেমনি গরিব, বাসর রাতটুকু কোথায় কাটাবো তারও কিছু ঠিক নেই।

'ইদা বললে, 'চল, মাঠে যাই। তাতে কি হয়েছে? মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, মা মেরীর কৃপা থাকলেই হলো।'

'আমরা তাই ঠিক করলুম, 'বেশ তাহলে মাটিই হোক আমাদের বাসর-শয্যা আর খোলা আকাশ আমাদের চাঁদোয়া।'

'তারপর সে এক বিচিত্র কাহিনী ভাই, আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা কাহিনী! বিয়ের ঠিক আগের দিন বুড়ো জিয়োভান্নি, যাঁর কাছে আমি বহুদিন জনমজুরি খেটেছিলুম, ভোরবেলায় এসে আমাকে ডেকে বললেন, যেন ব্যাপারটা আদৌ কিছু নয়, 'এই যে, ভেড়ার পুরোনো গোয়ালটা পরিষ্কার করে কিছু খড় পেতে নে। জায়গা শুকনোই আছে, বছর খানেক হলো ওখানে আর ভেড়া থাকে না। তুই আর ইদা যদি থাকতে চাস তো জায়গাটা পরিষ্কার করে নে।'

'সেই হল আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই!

'গুনগুন করতে করতে গোয়ালঘর সাফ করছি, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি দোর-গোড়ায় ছুতোর মিস্ত্রি কনস্তানজিয়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'তুই আর ইদা তাহলে এখানেই ডেরা বাঁধছিস? কিন্তু বিছনা কই তোদের? আমার বাড়িতে এক-প্রস্থ বাড়তি বিছনা আছে, ঘর পরিষ্কার হয়ে গেলে নিয়ে আসিস।'

'ছুতোরের বাড়িতে যাচ্ছি এমন সময় দোকানির মেয়ে মুখরা মারিয়া গাল পাড়তে শুরু করলো, 'আচ্ছা বোকা হাঁদা তো! বিয়ে করছে অথচ না আছে একখানা বালিশ, না একটা চাদর! একচোখোটার মরণদশা আর কি! যা, তোর কনেকে পাঠিয়ে দিস আমার কাছে…'

'ওদিকে আবার খোঁড়া এস্তোরে ভিয়ানো, সারা জীবন যে বাতে পঙ্গু, তার বাড়ির দোরগোড়া থেকে চেঁচিয়ে মারিয়াকে বললো, 'আচ্ছা বেহিসেবি

লোক তো, নিমন্ত্রিতদের জন্যে কত মদ জোগাড় করে রেখেছে সেই কথাটা ওকে আগে জিগেস কর !'

দম আটকানো হাসিতে ছেলে মানুষের মত খুশিতে হাত নাড়তে নাড়তে বুড়ো বললো, 'সত্যি বলছি বিশ্বাস করো, বিয়ের দিন সকালে যা যা দরকার সব এসে গেলো—ম্যাডোনার মূর্তি, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, আসবাব সব কিছু ! ইদা যত হাসে তত কাঁদে, আমিও তাই। অন্য সবাই শুধু হাসলো, কেননা বিয়ের দিনে কাঁদতে নেই, আর আপনজনরা সব ঠাট্টা করলো।

'সত্যি, লোকজনকে আপনার বলে ভাবতে পারাটা যে কি সুন্দর, আর আত্মীয় স্বজন বলে ভাবতে পারলে তো কথাই নেই ! আসলে তাদের কাছে আমাদের জীবনটা নিতান্ত ঠাট্টা তামাসা বা জুয়া খেলার ব্যাপার ছিলো না।

'আর হ্যাঁ, সে বিয়ে বটে একখানা। সেদিন গাঁয়ের সবাই এলো আমাদের সেই ভেড়ার গোয়ালঘরে, দেখতে দেখতে সেটা হয়ে উঠলো একেবারে প্রাসাদের মতো। যা যা প্রয়োজন সব কিছুই আমরা পেয়েছিলুম—মদ ফল রুটি মাংস, সবাই খেলো, সক্কলেই হাসিখুশি···কেননা লোকের উপকার করার চাইতে বড় সুখ আর কিছুই নেই, তার চাইতে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না !

'পুরুতঠাকুরও এসেছিলেন, ভারি চমৎকার একখানা ভাষণ দিলেন। উনি বললেন, 'তোমরা দুটিতে সবায়ের বাড়িতে কাজকর্ম করেছো, ওরা তোমাদের এই সুন্দর দিনটিতে যথাসাধ্য করলো। এই তো করা উচিত। কেননা খাটুনির মজুরি রূপোর টাকা-পয়সার চাইতে অনেক বেশি। টাকা চলে যায়, থেকে যায় শুধু খাটুনিটা—হাসিখুশি এই মানুষ দুটি, এরা বিনয়ী। জীবনে কষ্ট করেছে, কিন্তু তার জন্যে কখনও নালিশ করেনি। জীবনে হয়তো আরও কষ্ট আসবে, কিন্তু তার জন্যে এরা কখনও রুষ্ট হবে না। প্রয়োজনে তোমরা এদের সাহায্য করো। এদের হাতের কাজ ভালো, দিল দুখানা আরও ভালো···'

'ইদা আর আমাকে এবং গোটা সমাজকে প্রশংসা করে উনি আরও অনেক কথা বললেন।'

বুড়োর এক চোখের দৃষ্টি যেন তরুণিমায় ভরে উঠেছে। গর্বিত সেই চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক আমাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বুড়ো বললো, 'এই হলো গিয়ে মানুষজন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা, তোমাদের শোনালাম। কি, ঘটনাটা ভালো নয়, বলো ?'

১৯০৬-১৩

মায়েদের সম্পর্কে কাহিনীর আর অন্ত নেই।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই শত্রুসৈন্য অস্ত্রের কঠিন বেড়াজালে শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। রাত্রে আগুন জ্বলে ওঠে, নগর-প্রাচীরের গাঢ় অন্ধকারে অগণন লাল চোখের মতো নেচে ওঠে তার দীপ্ত শিখা—কুৎসিত হিংস্রতায় জলতেই থাকে সে লেলিহ শিখা। তার শঙ্কাতুর ঝলকানিতে গুমরে ওঠে অবরুদ্ধ সারাটা শহর।

নগর-প্রাচীর থেকেই চোখে পড়ে শত্রুর কঠিন বেড়াজাল, আগুনের চার-পাশে কালো কালো ছায়ামূর্তিদের নড়াচড়া, বলিষ্ঠ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, অস্ত্রের ঝনঝনা, জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিন্ত লোকজনের উলোল উল্লাস। কিন্তু শত্রুর হাসি আর গানের চাইতে উৎকট, শ্রুতিকটু আর কি হতে পারে?

পানীয় জলের প্রতিটি স্রোতধারায় শত্রুরা মৃতদেহ ফেলছে, প্রাচীরের চারপাশের আঙুর বাগিচাগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, পদদলিত করেছে ফসলের ক্ষেত, ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ফলের বাগান। সব দিক থেকেই শহর এখন শত্রুপক্ষের কাছে উন্মুক্ত। প্রায় প্রতিদিনই শত্রুর গোলাবর্ষণে ঝরে পড়ে অগ্নিবৃষ্টি।

যুদ্ধক্লান্ত ক্ষুধার্ত সৈন্যবাহিনীর বিচ্ছিন্ন দল বিষণ্ণ মনে শহরের সংকীর্ণ পথে টহল দিয়ে ফেরে। ঘরবাড়ির জানলা দিয়ে ভেসে আসে আহতদের আর্তনাদ, প্রলাপ, নারীদের প্রার্থনা, শিশুদের ক্রন্দন। লোকে ফিসফিস করে কথা বলে, বলতে বলতে হঠাৎ মাঝপথে উৎকর্ণ হয়ে থমকে যায়—শত্রুরা এসে পড়ল নাকি?

সবচেয়ে জঘন্য এই রাতগুলো। নৈশ-নিস্তব্ধতায় গোঙানি আর আর্তস্বর আরও স্পষ্ট শোনা যেতো। শত্রু-ছাউনিকে আড়াল করে দূর পাহাড়ি খাদ থেকে কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলো চোরের মতো চুপি চুপি ভাঙা প্রাচীরের দিকে এগিয়ে আসতো। পাহাড়ের কালো চূড়ার ওপর তরোয়ালের ঘা-খাওয়া আধখানা ঢালের মতো চাঁদ উঠতো।

দিন দিন মুক্তির আশায় হতাশ হয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত নগরবাসীরা আতঙ্কে তাকিয়ে থাকতো সেই চাঁদের দিকে, তাকাতো দাঁত-বার-করা পাহাড়িচূড়া, খাদের অতল গহ্বর আর কোলাহলমুখর শত্রু-ছাউনিগুলোর দিকে। সবকিছু থেকেই ভেসে আসতো মৃত্যুর ফিসফিসানি, আকাশে সান্ত্বনার একটাও তারা দেখা দিতো না।

ভয়ে কেউ ঘরের বাতি জ্বালতো না। রাস্তাগুলো গাঢ় অন্ধকারে মোড়া। আর সেই গাঢ় অন্ধকারে কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে একজন নারী নদীর গভীরে মাছের মতো নিঃশব্দ পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতো।

ওকে দেখলেই সবাই কানাকানি করতো, 'এ সেই না?'

'হ্যাঁ, সেই।'

তারপরেই ওরা মাথা নিচু করে দ্রুত ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতো, নয় তো প্রাচীরের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে পড়তো। টহলদার প্রহরীরা রুক্ষ স্বরে ওকে সতর্ক করে দিতো: 'আবার বেরিয়েছেন, মোনা মারিয়ানা? সাবধান, কোনদিন মারা পড়বেন, আর সেদিন আততায়ীকে খুঁজে বার করার জন্যে কারুর মাথাব্যাথা পড়বে না…'

থমকে দাঁড়িয়ে মেয়েটা অপেক্ষা করতো। প্রহরীরা হয় সাহস পেতো না, না হয় তো ওর গায়ে হাত তুলতে ঘেন্নাবোধ করতো, তাই ওরা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতো। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরাও ওকে মড়ার মতো এড়িয়ে চলতো। অন্ধকারে একা একা মেয়েটা আবার নিঃশব্দে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো আর হতভাগ্য শহরের করুণ শোক-মূর্তিটাও ঘুরে বেড়াতো ওর চার-পাশে। বেদনাবিধুর শব্দ উঠতো রাত্রির বুক চিরে, তার সাথে আর্তনাদ, কান্না, প্রার্থনা আর হতোদ্যম পরাজিত সৈন্যদের বিষণ্ণ প্রলাপ।

শুধু নাগরিকই নয়, ও একজন মা। তার দেশ, নিজের ছেলের সম্পর্কে ওর ভাবনার অন্ত নেই। কেননা অবরুদ্ধ করে শহরখানাকে যারা ধ্বংস করেছে ওর ছেলে তাদের দলনেতা। যেমন হাসিখুসি সুপুরুষ দেখতে, তেমনি নিষ্ঠুর। অল্প কিছুদিন আগেও ছেলেকে দেখে গর্বে বুক ওর ভরে উঠতো, ভাবতো দেশকে বুঝি এক মহামূল্য অর্ঘ উপহার দিয়েছে। যে শহরে ও নিজে জন্মেছে, যে শহরে জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছে ওর নিজের ছেলে, সেই শহরবাসীর কাছে মার মনে হতো ও বুঝি এক কল্যাণময় শক্তি। অগণন অদৃশ্য বন্ধনে ওর হৃদয় এই প্রাচীন পাথরগুলোর সঙ্গে বাঁধা—এই পাথর দিয়েই ওর পূর্বপুরুষেরা একদিন সৌধ তুলেছে, নগর-প্রাচীর গেঁথেছে। যে মাটিতে জড়িয়ে রয়েছে ওর আত্মীয় পরি-জনের অস্থি, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা গান আর লোকগাথা। আজকাল ওর হৃদয় প্রিয়জনকে হারানো ব্যথায় অশ্রুসজল। মনে মনে হৃদয়ের তুলাদণ্ডে ও যাচাই করে দেখতো কোনটের ওজন বেশি, পুত্রের জন্যে না দেশের জন্যে ওর ভালোবাসা। কিন্তু কোনটের ওজন বেশি ও বুঝতে পারতো না।

তাই এমনি ভাবে রাতের পর রাত ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। যারা চিনতে পারতো না, অনেকেই ওকে মূর্তিমতী মৃত্যুর কালো ছায়া ভেবে ভয়ে ছিটকে সরে আসতো, কেননা মৃত্যু ঘুরতো ওদের ঠিক আশেপাশেই। আর যারা চিনতে পারতো, নিঃশব্দে সরে দাঁড়াতো বেইমানের মার কাছ থেকে।

কিন্তু একদিন নগর-প্রাচীরের নিভৃত এক কোণে ও দেখলো আর একজন নারী একটি মৃতদেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে, এত নিস্তব্ধ যে তাকে মাটির ঢিবির মতোই মনে হচ্ছে। নক্ষত্রের দিকে বেদনাতুর মুখখানা তুলে সে নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে। প্রাচীরের ওপর শান্ত্রীরা মৃদু স্বরে কথা কইছে, পাথরের গায়ে শব্দ উঠছে ওদের অস্ত্রের।

বেইমানের মা জিগেস করলো, 'এ কে, তোমার স্বামী ?'

'না।'

'ভাই ?'

'না, আমার ছেলে। স্বামী মারা গ্যাছেন তেরো দিন আগেই, আজ মারা গেলো আমার ছেলে।' শোকাতুর মা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে নম্র স্বরে বললো, 'ম্যাডোনা সবই দেখেছেন, সবই জানেন, ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ !'

'কেন ?' প্রথম নারী জিগেস করলো।

দ্বিতীয় নারী বললো, 'আজ ও দেশের জন্যে সসম্মানে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে। একদিন ওর জন্যে আমার শঙ্কার অন্ত ছিলো না, কেননা ও ছিলো বড় হালকা প্রকৃতির। আমোদ-স্ফূর্তি করতে ভালোবাসতো। ভয় হতো ও বুঝি দেশের প্রতি বেইমানি করবে, যেমন করছে মারিয়ানার ছেলে। সে হলো ঈশ্বরের শত্রু, মানুষের শত্রু, আমদের শত্রুপক্ষের নেতা। অভিশাপ লাগুক তার, আর যে তাকে পেটে ধরেছে সেই মার !'

মুখ ঢেকে মারিয়ানা চলে এলো। পরের দিন-দুপুরে নগর-রক্ষীদের কাছে গিয়ে ও বললো, 'আমার ছেলে তোমাদের শত্রু। হয় আমাকে মেরে ফ্যালো, না হয় তো ফটক খুলে দাও যাতে আমি ওর কাছে যেতে পারি।'

ওরা জবাব দিলো, 'তুমি মানুষ, তোমার কাছে তোমার দেশ নিশ্চয়ই অনেক বড়। তোমার ছেলে যেমন আমাদের সবার শত্রু তেমনি তোমারও শত্রু।'

'আমি ওর মা, ওকে ভালোবাসি। তবু ও যা করেছে তার জন্যে আমিও দোষী।'

ওরা পরস্পরে পরামর্শ করে নিয়ে বললো, 'ছেলের পাপের জন্যে তোমাকে হত্যা করা সম্মানের হবে না। আমরা জানি এই জঘন্য অপরাধ করার জন্যে তুমি তোমার ছেলেকে পাঠাওনি, আমরা তোমার যন্ত্রণা বুঝতে পারছি। কিন্তু এ শহরে তোমাকে আর ধরে রেখে লাভ নেই, কেননা তোমার ছেলে তোমার জন্যে আদৌ উদ্বিগ্ন নয়। ওটা একটা আস্তো শয়তান, হয়তো তোমার কথা ও সম্পূর্ণ ভুলেই গ্যাছে। আমাদের ধারণা এইটেই তোমার যোগ্য শাস্তি, মৃত্যুর চাইতে যা আরও ভয়াবহ।'

'হ্যাঁ, সত্যি,' বিষণ্ণ স্বরে মা বললো। 'মৃত্যুর চাইতে এ আরও ভয়ঙ্কর!'

সুতরাং ফটক খুলে ওরা ওকে নগর ছেড়ে চলে যেতে দিলো। প্রাকারের ওপর থেকে ওরা দেখলো ওর ছেলেরই রক্তে স্নাত স্বদেশভূমি ছেড়ে যেতে ওর পা যেন সরছে না, খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে। নগর রক্ষা করতে গিয়ে যারা মারা গ্যাছে সেইসব মৃতদেহ লক্ষ্য করে মাথা ওর নত হয়ে গেলো, ভাঙা একটা হাতিয়ার লাথি মেরে সরিয়ে দিলো দূরে, কেননা জীবন রক্ষা ছাড়া আর সব হাতিয়ারই মায়েদের কাছে ঘৃণ্য।

ও এমন ভাবে হাঁটছে যেন বোরখার নিচে পবিত্র একটা জলের পাত্র বহন করে নিয়ে চলেছে, যাতে একটা ফোঁটাও না চলকে পড়ে। নগর-প্রাকার থেকে যারা ওকে লক্ষ্য করছিলো তারা ওর মূর্তিটাকে ছোটো থেকে আরও ছোটো হয়ে যেতে দেখলো এবং তাদের হতাশা ও নৈরাশ্যও যেন ক্রমশ মিলিয়ে আসতে লাগলো। তারা দেখলো মাঝ-পথ পর্যন্ত গিয়ে মা থমকে দাঁড়ালো, তারপর মাথার অবগুণ্ঠনটা পেছনে ঠেলে দিয়ে বহুক্ষণ নগরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। আর শত্রুশিবিরের লোকজনরা দেখলো মাঠের মধ্যে ও একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিঃশব্দ পায়ে কয়েকটা ছায়ামূর্তি ওর দিকে এগিয়ে এসে ও কে, কি জন্যে এসেছে, এই সব বৃত্তান্ত জিগেস করলো।

মা বললো, 'তোমাদের অধিনায়ক আমার ছেলে।'

সৈন্যদের কেউ তা অবিশ্বাস করলো না। বরং তারা ওকে ঘিরে ছেলের প্রশংসা করলো, বললো যেমন দুঃসাহসী, তেমনি বুদ্ধিমান তিনি। মা একটুও বিস্মিত হলো না, সগর্বে মাথা তুলে সব শুনলো, কেননা ওর ছেলে এ ছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না।

অবশেষে মা গিয়ে দাঁড়ালো তার ছেলের সামনে, যাকে ও চেনে জন্মের ন মাস আগে থেকে, যাকে ও নিজের হৃদয় থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারে

নি। রেশম আর মখমলের পোশাক পরে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে, দুর্লভ রত্নে শোভিত তার অস্ত্রশস্ত্র। ঠিক যেমনটি মা তাকে বহুবার দেখেছে স্বপ্নে— তেমনি ঐশ্বর্যশালী, গর্বিত আর সুন্দর।

মায়ের হাত চুম্বন করে সে বললো, 'মা, তুমি এসে গ্যাছো! ব্যাস, আর কোন ভাবনা নেই। কালই আমি ওই অভিশপ্ত শহরটাকে অধিকার করছি।'

মা স্মরণ করিয়ে দিলো, 'যে শহরে তুই জন্মেছিস?'

শক্তির দম্ভে মাতাল, গৌরবের আশায় উন্মাদ হয়ে সে যৌবনের উদ্ধত স্পর্ধায় জবাব দিলো, 'আমি জন্মেছি দুনিয়ার বুকে, এই দুনিয়ারই জন্যে, আর আমি চাই আমাকে দেখে তামাম দুনিয়া বিস্ময়ে কাঁপুক! এতদিন এ শহরটাকে আমি কিছু করতে পারিনি, সে শুধু তোমার জন্যেই। এ যেন আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে, ম্লান করে দিয়েছে আমার গৌরবের দীপ্তি। কিন্তু কালই আমি তাকে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দেবো।'

'সেখানের প্রতিটা পাথর তোকে ছেলেবেলা থেকে জানে, তোকে চেনে।'

'পাথর তো বোবা মা, মানুষই তাদের কথা বলায়! পাহাড়েরাও আমার কথা বলুক, আমি শুধু তাই চাই।'

'আর মানুষের কি হবে?' মা জিগেস করলো।

'নিশ্চয়ই, তাদের কথাও ভুলিনি। মানুষের স্মৃতিতেই তো বীরেরা অমর হয়ে থাকে।'

'বীর সেই, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনকে যে সৃষ্টি করে, মৃত্যুকে যে জয় করে।'

'না!' সে প্রতিবাদ করে উঠলো। 'নগর-স্রষ্টার মতো নগর-বিধ্বংসীরাও সমান গৌরবদীপ্ত। রোম কে গড়েছে—আয়েনিয়াস না রোমুলাস, তা আমরা জানি না। কিন্তু রোমকে যারা ধ্বংস করেছে সেই আলারিক আর অন্যান্য বীরদের নাম আমরা খুব ভালো করেই জানি।'

'তবু সব নামকে ছাপিয়ে বেঁচে আছে শুধু রোম।'

এইভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চললো দুজনের কথা কাটাকাটি। ছেলের উদ্ধত যুক্তির প্রতিবাদে ক্রমশই নত হয়ে এলো মায়ের মাথা। মার কাজ সৃষ্টি করা, তাকে রক্ষা করা। ধ্বংসের কথা বলা মানেই মায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা। কিন্তু ছেলে সে কথা জানে না, জানে না যে এতে মায়ের অস্তিত্বকেই সে অস্বীকার করছে।

মা চিরদিনই মৃত্যুর প্রতিবাদী। যে হাত মানুষের মৃত্যুকে টেনে আনে মা

তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু ছেলে সেটা বুঝলো না, কেননা হৃদয়কে যা নিষ্প্রাণ করে দেয় তারই হিমেল গৌরব-দীপ্তিতে সে তখন অন্ধ!

সে জানতো না মার সৃষ্টি জীবন বিপন্ন হলে সেই মা-ই কি ভীষণ চতুর, নির্মম, আর নির্ভীক হয়ে উঠতে পারে।

মাথা নত করে মা বসে রইলো, আর সুসজ্জিত তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখলো সেই শহরটাকে, যেখানে ও তার বুকের মধ্যে প্রথম অনুভব করেছিলো জীবনের মধুর স্পন্দন, অনুভব করেছিলো সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা, যে কিনা আজ ধ্বংসের নেশায় মাতাল।

সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় রঙিন হয়ে উঠেছে শহরের যত ভগ্ন প্রাচীর আর মিনারগুলো, জানলার সার্শিগুলো জ্বলছে ক্রুদ্ধ দীপ্তিতে, যেন প্রতিটা ক্ষতমুখ থেকে ঝরে পড়ছে রক্তিম জীবনরস। দেখতে দেখতে সারাটা শহর মৃতদেহের মতো কালো হয়ে গেলো, সমাধি-দীপের মতো আকাশে জ্বলে উঠলো টিপটিপ কয়েকটা তারা।

মা দেখতে পেলো সেই অন্ধকার বাড়িগুলো, সেখানে শত্রুর দৃষ্টির আকর্ষণের ভয়ে লোকে বাতি জ্বালতে সাহস পায় না। শবদেহের দুর্গন্ধে ভরা রাস্তাগুলো গভীর অন্ধকারে মোড়া। শোনা গেলো মৃত্যুর প্রতীক্ষান্মুখ মানুষের মৃদু গুঞ্জরন। এ সবকিছুই মার কাছে অত্যন্ত প্রিয় আর পরিচিত মনে হলো, মনে হলো ও যেন এ শহরে সবার মা, আর সবকিছুই যেন ওর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় নির্বাক হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

অন্ধকার পাহাড়ি চূড়া থেকে নেমে মেঘগুলো ছড়িয়ে পড়ছে উপত্যকার বুকে, যেন একপাল পক্ষীরাজ ঘোড়া পদদলিত করছে অভিশপ্ত শহরটাকে।

'রাতটা গাঢ় আঁধারে ঢাকা থাকলে আজ রাতেও আমরা আক্রমণ করতে পারি! চোখে রোদ পড়লে অস্ত্রের ঝলকানিতে অনেক সময় হত্যা করতে খুব অসুবিধে হয়।' তরোয়ালটা পরীক্ষা করতে করতে ছেলে মন্তব্য করলো।

মা বললে, 'আয় সোনা, আমার বুকে মাথা রেখে একটু শো। মনে পড়ে ছেলেবেলায় তুই কি উচ্ছল আর সুন্দর ছিলিস, সবাই তোকে কেমন ভালোবাসতো…'

'আমি ভালোবাসি শুধু গৌরব।' মার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে সে বললো, 'আর ভালোবাসি তোমাকে, কেননা আমি যা হয়েছি সে শুধু তোমার জন্যে।'

'আর মেয়েদের ভালোবাসিস না তুই?' ছেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মা জিগেস করলো।

'ওরা সংখ্যায় অনেক, বড্ড বেশি ক্লান্তি লাগে, মা।'

'আর সন্তান চাস না তুই?'

'কি হবে সন্তান দিয়ে? শেষ পর্যন্ত আমারই মতো কেউ এসে তাদের খুন করবে। তাতে আমার ব্যথা লাগবে। হয়তো তখন এমন বৃদ্ধ আর ভঙ্গুর হয়ে পড়বো যে প্রতিশোধও নিতে পারবো না।'

মা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'সুন্দর দেখতে হলেও তুই বিদ্যুত চমকেরই মতো ব্যর্থ।'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক বিদ্যুত চমকেরই মতো…'

ছেলে মৃদু হেসে জবাব দিলো, তারপর মার কোলে ছোট্ট শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

নিজের কালো পোশাক দিয়ে ছেলেকে ঢেকে দিয়ে মা তার বুকে ছোরাখানা বসিয়ে দিলো। দু একবার থরথর করে কেঁপে উঠে ছেলে মারা গেলো। ছেলের বুকের কোথায় ধুকপুক করেছিলো মার চাইতে বেশি আর কেউ জানে না। তারপর স্তম্ভিত প্রহরীদের পায়ের কাছে মৃতদেহখানা ফেলে দিয়ে নগরের দিকে তাকিয়ে মা বললো, 'মানুষ হিসেবে দেশের জন্যে যা করার ছিলো আমি তা করেছি, কিন্তু মা হিসেবে আমার সত্তা ছেলের সঙ্গে জড়িত! আর একটি সন্তানের মা হবার বয়েস যখন আর নেই, তখন কারুর কাছে আমার জীবনের আর কোন মূল্যও নেই।'

ছেলের রক্তে তখনও উষ্ণ ছোরাখানা মা দৃঢ় হাতে বসিয়ে দিলো নিজের বুকে। এবারেও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো না, কেননা ব্যথিত হৃদয়টা ও খুব সহজেই খুঁজে পেয়েছিলো।

১৯০৬-১৩

ছিপছিপে চেহারা, আমেরিকানদের মতো পরিষ্কার কামানো চিবুক, হালকা সুটপরা একজন লোক রেস্তোরাঁর দরজার কাছে লোহার টেবিলের সামনে বসে অলস সুরে হাঁক পাড়লো, 'গা-আ-রসন্…'

সাদা আর সোনালী অ্যাকেসিয়া ফুটে রয়েছে থরে থরে। বসন্তের কোমল উচ্ছ্বাসে পৃথিবী আকাশ ভরে উঠেছে সকালের সোনা-রোদে। রাস্তার মাঝ দিয়ে খুট খুট শব্দ করে চলেছে লোমশ-কান ছোট ছোট গাধাগুলো। ঘোড়ায়-টানা মালগাড়িটা ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেলো। পথচারীরা মন্থর পায়ে হাঁটছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যতক্ষণ পারে ওরা সকালের সোনালী রোদটুকু পুহিয়ে নিতে চাচ্ছে, নিঃশ্বাসে গ্রহণ করতে চাচ্ছে ফুলের গন্ধঘন এই মিষ্টি বাতাস।

বসন্তের দূত, ছোট ছোট বাচ্চারা ঝিলমিলিয়ে উঠছে, সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠছে ওদের উজ্জ্বল রঙিন পোশাক। সূর্যস্নাত দিনের পরেই যেমন থাকে তারাভরা আকাশ, তেমনি বাচ্ছাদের পেছনে রয়েছে সুন্দর পোশাক-পরা নারীরা। মন্দ মন্থর পায়ে ওরা হেঁটে চলেছে।

হালকা পোশাক-পরা সেই লোকটার হাবভাবে কেমন যেন একটা বিমর্ষতা জড়িয়ে রয়েছে, যেন এতদিনের জমানো ময়লা আজ তার গা থেকে ঘষে সাফ করা হয়েছে। ফলে তার শরীরের সজীব লাবণ্যটুকুও বুঝি চিরদিনের জন্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। উদাস চোখে সে চারদিকে তাকাচ্ছে, যেন দেয়ালের গায়ে রোদ্দুরের ঝিলিমিলিগুলো গুনছে, ছায়াভরা রাস্তা আর তরুবীথি দিয়ে যারা যাওয়া আসা করছে তাদের ওপর দৃষ্টি বোলাচ্ছে। নরম ঠোঁট দিয়ে সে বিষণ্ণ করুণ একটা গানের মৃদু শিস দিচ্ছে আর ফরসা লম্বা লম্বা আঙুলে টেবিলে টোকা দিচ্ছে। আঙুলের নখগুলো কেমন যেন বিবর্ণ। অন্য হাতে বাদামী রঙের একটা দস্তানা দিয়ে হাঁটুর ওপর তাল ঠুকছে। মুখে প্রতিভা দীপ্ত দৃঢ়-চেতা মানুষের অভিব্যক্তি। অথচ আফসোস হয়, তার মুখ থেকে সমস্ত দীপ্তি কে যেন নিঃশেষে মুছে নিয়েছে।

সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে পরিচারক যখন তার টেবিলে এক পেয়ালা কফি, সবুজ মদের বোতল আর কিছু বিস্কুট সাজিয়ে রাখছিলো, তখন চাওড়া বুক অকীক পাথরের মতো চোখ, পেল্লাই চেহারার একজন লোক এসে বসলো তার পাশের টেবিলে। হাতে ঘাড়ে গালে ওর কালিঝুলি মাখা। সমস্ত শরীরে ইস্পাত-

কঠিন এমন একটা শক্তির আভাস রয়েছে যে দেখলে মনে হবে ও যেন বিরাট কোন যন্ত্রেরই একটা অংশ।

হালকা পোশাক-পরা লোকটার ক্লান্ত দৃষ্টি যখন গিয়ে পড়লো ওর ওপর, অল্প একটু উঠে আঙুলে টুপিটা ছুঁয়ে ঘন গোঁফের ফাঁক দিয়ে সে বললো, 'সুপ্রভাত, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।'

'আরে ট্রামা, তুমি!'

'হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আমিই।'

'তা হলে নতুন কিছু আশা করাটা অহেতুক হবে না, কি বলো?'

'আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে?'

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঠোঁটের কোলে ম্লান হাসলেন। 'শুধু প্রশ্ন দিয়ে কি আর আলাপ চালানো যায় হে?'

ওঁর সঙ্গী ভদ্রলোক মাথার টুপিটা কানের এক পাশে ঠেলে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। 'ঠিক, ঠিক বলেছেন! কিন্তু আমি যে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই···'

চিত্রবিচিত্র রঙের লোমশ একটা গাধা কয়লার গাড়িটা টেনে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গলা বাজিয়ে করুণ স্বরে ডেকে উঠলো। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেলো সেদিন নিজের গলার স্বরটা ওর খুব একটা পছন্দ হলো না, কেননা উঁচু পর্দায় গলা তুলেই হঠাৎ ও বিব্রতের মতো থেমে গেলো। তারপর লোমশ কানদুটো ঝাঁকিয়ে মাথাটা নুইয়ে খুট খুট করে হেঁটে গেলো।

'···নতুন বই থেকে নতুন কিছু শেখার মতোই আপনার সেই মেশিনটার কথা জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে রয়েছি।'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, 'তোমার উপমাটা ঠিক বুঝলাম না।'

'ভালো বই যেমন মানুষকে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দেয়, ভালো মেশিনও তেমনি দৈহিক গ্লানি থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, তাই কি না বলুন?'

'হ্যাঁ, হয়তো ঠিক।' খালি পেয়ালাটা ইঞ্জিনিয়ার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। 'তারপর তোমার প্রচার অভিযান আবার কবে থেকে শুরু হচ্ছে?'

'শুরু আমি ইতিমধ্যেই করে দিয়েছি।'

'তাহলে আবার সেই ধর্মঘট আর গণ্ডগোল?'

ট্রামা কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসলো। 'প্রয়োজন না পড়লে নিশ্চয়ই না···'

সন্ন্যাসিনীর মতো সরল দেখতে কালো পোশাক-পরা একজন বৃদ্ধা নিঃশব্দে এক গুচ্ছ ভায়োলেট এগিয়ে দিলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দিকে। উনি দুটো তোড়া কিনে একটা তাঁর সঙ্গীকে দিয়ে বললেন, 'তোমার এত ভালো মাথা ট্রামা, অথচ বড় আফসোস হয় তুমি একজন আদর্শবাদী···'

'ফুল আর এই প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ। আর আফসোস হয় বলছেন?'

'নিশ্চয়ই! আসলে তুমি হলে কবি। ভালো করে পড়াশোনা করলে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারতে।'

ট্রামা মৃদু হাসলো, ঝিকমিক করে উঠলো তার সাদা দাঁতের সারি। 'তা যা বলেছেন! ইঞ্জিনিয়ারাও তো আসলে কবি। আপনার সঙ্গে কাজ করতে করতেই আমি সেটা শিখেছি।'

'তুমি বড় কাব্যিক!'

'আমি ভাবছি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবই বা কেন সমাজতন্ত্রী হবেন না! সমাজতন্ত্রীরা তো আসলে কবিই···'

পারস্পরিক আন্তরিকতায় দুজনেই হেসে উঠলো, হেসে উঠলো সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারার দুটি মানুষ—একজন শীর্ণ, ম্লান, ঝাপসা চোখের দৃষ্টি; অন্যজনকে দেখলে মনে হবে এইমাত্র যেন কামারশালা থেকে তৈরী করে আনা হয়েছে, এখনও পালিশ পড়েনি।

'না ট্রামা, না। আমি চাই শুধু আমার নিজের একটা কারখানা আর তোমার মতো খাসা কিছু ছেলে, যারা আমার হয়ে খাটবে। তখন আমরা এমন একটা কিছু করতে পারবো ···'

ট্রামা আঙুল দিয়ে টেবিলে মৃদু টোকা দিলো। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোতামের ঘরে ভায়োলেট গুচ্ছ আঁটতে আঁটতে বললো, 'যাগ্‌গে! যখন ভাবি এই সব তুচ্ছ ব্যাপার মানুষের জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়···'

'ও, তাহলে তুমি মানুষের ইতিহাসটাকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলতে চাও নাকি হে যন্ত্র-বিশারদ ট্রামা?' ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মুচকি মুচকি হাসলেন।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে ট্রামা উত্তেজিত স্বরে জিগেস করলো, 'কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসটা কি?'

'তোমাদের পূর্বপুরুষ?' প্রথম শব্দটার ওপর জোর দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাঁকা হেঁসে জিগেস করলেন।

'হ্যাঁ, আমাদের পূর্বপুরুষ! আপনি হয়তো ভাববেন ঔদ্ধত্য। কিন্তু জিয়ো-

দোনো ব্রুনো, ভিকো আর মাজিনিই বা আমাদের পূর্বপুরুষ নয় কেন? আমরা কি এঁদের পৃথিবীতে বাস করি না, এঁদের উঁচু মনের ফল ভোগ করি না?'

'ও, এই অর্থে!'

'যাঁরাই এ পৃথিবীকে কিছু না কিছু দিয়ে গেছেন সে তো সবই আমাদের!'

'অবশ্যই!' ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গম্ভীরভাবে ভ্রূ কোঁচকালেন।

'আর যা কিছুই আমার আগে, আমাদের আগে করা হয়ে গেছে, সে হলো আকরিক লোহা, যা থেকে বানাতে হবে ইস্পাত, তাই কি না বলুন?'

'নিশ্চয়ই, সেটা তো স্বাভাবিক?'

'পারতপক্ষে অতীতের ফল ভোগ করছে যেমন আমাদের মতো মজুররা, তেমনি আপনাদের মতো শিক্ষিতেরাও।'

'আমি অস্বীকার করছি না।' মাথা ঘোরাতেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চোখে পড়লো জীর্ণ ছেঁড়া পোশাক-পরা একটা বাচ্চার ওপর। ছোট ছোট নোংরা হাতে তার এক গুচ্ছ ক্রোকাস। করুণ স্বরে মিনতি করে সে বললো, 'এই ফুল কিছু কিনুন সিনোর...'

'ফুল তো আমার রয়েছে।'

'আরও ফুল নিলে কোন দোষ হয় না, সিনোর।'

'ঠিক বলেছিস, বাচ্চা!' ট্রামা হাসলো। 'দে, দুটো তোড়া আমাকে দে।'

বাচ্চাটার কাছ থেকে ফুলের তোড়া দুটো কিনে ট্রমা তার টুপিটা উঁচু করে একটা তোড়া এগিয়ে দিলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দিকে।

'ধন্যবাদ।'

'দিনটা আজ সত্যিই চমৎকার, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, এমন কি এই পঞ্চাশ বছর বয়েসেও সৌন্দর্যকে তারিফ করার মতো মন আমার এখনও রয়েছে বইকি। কিন্তু...'ভ্রূ কুঁচকে চারদিকে তাকিয়ে উনি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'বসন্তের সূর্যকে তুমি যে রক্তের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি করো, সে শুধু জোয়ান বয়েস বলেই নয়, আমার বিশ্বাস, আমার চাইতে তুমি তামাম এ দুনিয়াটাকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চোখে ছাখো বলেই। কি, তাই না?'

হাসতে হাসতে ট্রামা জবাব দিলো, 'জানি না, শুধু জানি জীবন সুন্দর!'

'কেন?'

প্রশ্নে অবিশ্বাসের সুরটাই ট্রামাকে বেশি করে বিঁধলো। টুপিটা মাথায় দিয়ে

আবেগপ্রকম্পিত স্বরে ও বললো, 'জীবন সুন্দর যেহেতু তাকে ভালোবাসি। যাই বলুন না কেন, শব্দ আমার কাছে শুধু কতকগুলো অক্ষর বা ধ্বনিই নয়। যখন কোন বই পড়ি, ছবি দেখি, কিংবা এমন কোন কিছুর দিকে তাকাই যা সুন্দর, তখন মনে হয় এ সবকিছুই যেন আমি নিজে হাতে তৈরি করেছি!'

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মাথাটা পেছনে হেলিয়ে বুক চিতিয়ে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন, যেন প্রাণ খুলে হাসতে পারার জন্যে উনি গর্বিত। 'বাঃ, তুমি তো বেশ খাসা ছোকরা হে, ট্রামা! তোমাকে দেখলেও আনন্দ হয়।' চোখ ঠেরে উনি যোগ করলেন, 'শুধু হাঙ্গামা-হুজ্জুতগুলো যদি একটু কম করতে…'

'হাঙ্গামা-হুজ্জুত!' অতলস্পর্শী কালো দু চোখের মণিতে বিদ্রূপের একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে ট্রামা প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু সেবার আমাদের আচরণ খুবই সঠিক ছিলো বলে আমার বিশ্বাস, আপনারও কি তাই মনে হয় না?'

'হ্যাঁ' হয়তো ছিলো,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। 'কিন্তু সেবার সংস্থার ক্ষতি হয়েছিলো প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার লিরা।'

'টাকাটা শ্রমিকের মজুরি হিসেবে বাড়িয়ে দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো।'

'ভুল ভায়া, ভুল। বুদ্ধিমানের কাজ বলছো? কিন্তু প্রত্যেক জন্তুরই নিজস্ব এক ধরনের বুদ্ধি থাকে।' রুক্ষ বাদামী হাতের থাবাটা বাড়িয়ে উনি করমর্দন করলেন। 'আমার এখনও ধারণা, তোমার ভালমতো পড়াশোনা করা উচিত।'

'কিন্তু আমি যে প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু শিখে চলেছি!'

'আর একটু কল্পনাশক্তি থাকলে তুমিও খুব ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতে।'

'উপযুক্ত ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তি আমার কিন্তু বেশ ভালোই খ্যালে!'

'বেশ তাহলে চলি, একগুঁয়ে বন্ধুটি আমার!'

দস্তানার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বড় বড় পা ফেলে উনি অ্যাকেসিয়া ঝোপের নিচে রোদ্দুরের ঝিলিমিলি মাড়িয়ে চলে গেলেন। রেস্তোরাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কালো-নীল পোশাক-পরা একজন পরিচারক এদের কথাবার্তা শুনছিলো, ট্রামা যখন তার টাকার ব্যাগে খুচরো পয়সা খুঁজছে, পরিচারকটি তার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। 'আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিন্তু দিন দিন বুড়িয়ে যাচ্ছেন…'

'না, না,' ট্রামা প্রতিবাদ করলো। 'ওঁর মাথার মধ্যে এখনও অজস্র স্ফুলিঙ্গ ঠাসা রয়েছে।'

'পরের বারে আবার কোথায় বক্তৃতা দিচ্ছেন ?'

'সেই একই জায়গায়, মজদুর ইউনিয়ান ভবনে। আমার বক্তৃতা কখনও শুনেছো নাকি ?'

'তিনবার শুনেছি, কমরেড।'

আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দন করতে করতে দুজনে হেসে উঠলো। তারপর ইঞ্জিনিয়ার যে পথে গিয়েছিলেন তার উলটো পথ ধরে একজন এগিয়ে গেলো, অন্য জন টেবিল পরিষ্কার করতে করতে আপন মনে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে লাগলো।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছে স্কুলের সাদা পোশাক-পরা একদল ছোট ছেলেমেয়ে, হাসি আর কলকলানিতে চলকে চলকে উঠছে চারদিক। সামনের দুটো বাচ্ছা ব্যাকুল আগ্রহে তাদের কাগজের বাঁশিতে ফুঁ দিলো, আর ওদের মাথার ওপরে ঝরে পড়লো অ্যাকাসিয়ার তুষারশুভ্র একরাশ পাপড়ি।

যখনই ছোট ছোট বাচ্ছাদের দেখি, বিশেষ করে বসন্তকালে, তখনই ইচ্ছে হয় উচ্ছল আবেগে চিৎকার করে বলি ঃ

'আহা সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা, ভবিষ্যৎ যেন গড়ে ওঠে শুধু তোদেরই জন্যে !'

১৯০৬-১৩

জিওভান্নি তুবা

ছেলেবেলা থেকেই বুড়ো জিওভান্নি তুবার মন মজেছে সমুদ্রের মায়ায়। তার নীলিম অতল জলরাশি কখনও কুমারীর চোখের চাউনির মতো স্নিগ্ধ কোমল, কখনও কামনা-উদ্বেলিত নারীহৃদয়ের মতো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ। এমনই অতল, যে মাছেদের কাছে পৌছয় না সূর্যের উত্তাপ, কেবল ঢেউয়ের মাথায় তিরতির করে কাঁপে উজ্জ্বল সোনালী কিরণগুলো। বেইমান সমুদ্র তার অবিলোপী গানের মায়ায় মানুষের মনে অদম্য বাসনা জাগিয়ে তোলে পাল তুলে সুদূরে পাড়ি দেবার। কত মানুষকে সে বোবা মাটি থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সীমাহীন আকাশের নিচে, কত মানুষকে যে সে ঘর-ছাড়া করেছে, অথচ তার বদলে কত-টুকু সুখ সে ফিরিয়ে দিয়েছে মানুষকে !

তুবা যখন নিতান্তই ছোট, ও কাজ করতো আঙুর-বাগিচায়। পাহাড়ের গায়ে ধূসর পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাক-থাক নেমে আসা বাগিচার ভেতর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ডুমুর, জলপাই, ঘন সবুজ কমলা আর জটপাকানো ডালিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, পায়ের নিচে উত্তপ্ত মাটি আর আকুল-করা ফুলের গন্ধ নিয়ে ও তৃষিত চোখে তাকিয়ে থাকতো উত্তাল নীলিম সমুদ্রের দিকে। লোনা বাতাস আকণ্ঠ পান করে যতক্ষণ না মাতাল হয়ে উঠতো, ও তাকিয়ে থাকতো। সমুদ্রের প্রেমে পড়লে, সমুদ্রের আশ্চর্য মায়ায় ধরা দিলে চিরকালই যা হয়—ওর মন উড়ু উড়ু করতো, বাঁধন-ছেঁড়া অবাধ্যতায় হয়ে উঠতো অশান্ত চঞ্চল…

আর ছুটির দিনে ভোরবেলায় সবে যখন সূর্য উঠতো, খুবানীর গাঢ় লাল পাপড়িতে পাপড়িতে ছেয়ে থাকা অনন্য কারুকার্যের মতো রঙিন হয়ে উঠতো সরেন্টোর সারা আকাশ, ছিপটা কাঁধে ফেলে তুবা ছোট্ট লোমশ কুকুরের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে আসতো নিচে, তারপর দৌড়তো সমুদ্রের দিকে। সদ্য-ফোটা ফুলের মিষ্ট গন্ধের চেয়েও ভোরের স্বচ্ছ বাতাসে যখন ভেসে আসতো সমুদ্রের ঝাঁঝালো গন্ধ, তুবার সারা মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠতো, কানে আসতো উপলবেলায় আছড়ে-পড়া তরঙ্গের মৃদু মর্মর, যেন কুমারী মেয়ের মতো ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে…

সেখানে সে মরচে-রাঙা-ধূসর বড় একটা পাথরের ওপর বাদামী রঙের পা দুখানা ঝুলিয়ে দিয়ে বসতো, তরল কাচের মতো স্বচ্ছসবুজ জলের দিকে তার অপলক কালো চোখদুটো মেলে দিয়ে সে দেখতো রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য

এক জগত—জলের তলায় শেওলার-গালচেয়-ঢাকা পাথরের গায়ে দুলছে যত লালচে সোনালী গুল্ম, তার মাঝে ভেসে উঠছে রঙ-ঝলমলে 'ভায়োলি' ফুল, মাতালের ঝাপসা চোখের মতো, ডোরা-কাটা, নীল ছিটছিট-দেওয়া 'পার্চ', সোনালী 'সার্প', ডগডগে দাগ-কাটা 'কেন', কালো 'গুয়ারসিনি', ছটফটে বিচ্ছুর মতো 'স্পারাগলিওনি' আর চকচকে রূপোর চাকতির মতো 'আকিয়েত'। এ ছাড়া কত যে সুন্দর সুন্দর সব মাছ আর তেমনি চালাক, গোলগাল মুখে টোপ গেলার আগে ছোট ছোট দাঁতে ভালো করে ঠুকরে দেখে নেয়!

বাতাসে ডানা-মেলা পাখির মতো স্বচ্ছ জলে জটাওয়ালা চিংড়িগুলো ভেসে বেড়াতো, রঙিন খোলস নিয়ে কাঁকড়ারা গুটি গুটি হাঁটতো জলের নিচের নুড়ির ওপর দিয়ে, রক্তের মতো লাল তারামাছগুলো নিঃশব্দে খেলা করতো, রক্তিম জেলি মাছেরা দুলতো, আর ধারালো দাঁতওয়ালা মুরায়েনাগুলো প্রায়ই বেরিয়ে আসতো পাথরের তলা থেকে, লাল ছিট-দেওয়া সর্পিল দেহগুলো যখন মোচড় খেতো, মনে হতো রূপকথার সেই কুৎসিত ডাইনি বুড়ি। তারপরেই হঠাৎ কোন ধূসর অক্টোপাস নোংরা ছেঁড়া ন্যাংকড়ার মতো হাতপা ছড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো তার শিকারের ওপর। এমন কত অদ্ভুত জীব বাস করতো আকাশের নিচে সমুদ্রের এই স্বচ্ছ জলে।

স্পন্দনে স্পন্দনে ওঠানামা করতো তার নীল বুক। তুবা যে পাথরের ওপর বসে থাকতো, তার গায়ে একের পর এক ফেনোচ্ছল তরঙ্গগুলো আছড়ে পড়ে ভিজিয়ে দিতো ওর পা দুখানা। তুবা হেসে উঠতো, কখনও বা হাসতে হাসতে ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ও পেছিয়ে আসতো, যেন কতই না ভয় পেয়েছে। ভাবনাবিহীন কামনাহীন আবিল একটা তন্দ্রার সুখে ওর মন হারিয়ে যেতো, যা কিছু চোখে পড়তো নিঃশব্দে উপভোগ করতো, শিরায় শিরায় উপলব্ধি করতো উজ্জ্বল তরঙ্গ-বিক্ষোভ, সীমাহীন সমুদ্রেরই মতো অসীম মুক্তিতে ওর মন পাখা মেলতো কোন সুদূর দিগন্তে।

এমনি করে কাটতো ওর ছুটির দিনগুলো। এরপর কাজের দিনগুলোতেও সমুদ্র ওকে ডাকতে শুরু করলো। কেননা সমুদ্র যখন কোন মানুষের মন কেড়ে নেয়, তখন সে হয়ে ওঠে সমুদ্র-সত্তারই আপনজন। তাই তুবা জমিজমা ভায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো সিসিলির উপকূলে প্রবাল ধরতে। ওর সঙ্গে ছিলো আরও কয়েকজন সঙ্গী-সাথী, তারাও সমুদ্রের প্রেমে পাগল। প্রবাল

ধরার কাজটা যেমন মজার, ডুবে মরার বিপদও আছে তেমনি পদে পদে। কিন্তু অর্ধবৃত্তাকারে লোহার কাঠি-লাগানো ভারি জালটা যখন টেনে তোলা হতো, নীল জলের তলা থেকে তখন কত অদ্ভুত অদ্ভুত রঙিন প্রাণীই না ধরা পড়তো। আর তার মাঝে উঁকি দিতো দুর্লভ যত প্রবালের গোলাপী ঝাড়, মানুষের জন্যে সমুদ্রের দেওয়া উপহার।

তাই সমুদ্রের মায়ায় বাঁধা-পড়া এই মানুষটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেলো মাটির বুক থেকে। মেয়েদেরকে ও ভালবাসতো, কিন্তু সে শুধু যেন স্বপ্নেরই মধ্যে, একটুখানির জন্যে, নীরবে। কেননা তাদেরকে ও কেবল বলতে পারতো সেই মাছ আর প্রবাল, ঢেউয়ের ওঠা-পড়া, বাতাসের খেয়াল আর অজানা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলা সেইসব বড় বড় জাহাজের কথা। ডাঙায় ও ভীরু, হাঁটতো সতর্ক হয়ে সন্দিগ্ধের মতো, লোকজনদের সঙ্গে কথা প্রায় বলতোই না, কেবল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো সমুদ্রের-অতল অনুসন্ধান-করে-ফেরা তীক্ষ্ণ চোখে। কিন্তু সমুদ্রে ও উচ্ছল, শুশুকের মতো ক্ষিপ্র আর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে সম্পর্কটা ওর নিবিড়।

কিন্তু যত সুখী জীবনই মানুষ যাপন করুক না কেন, তার আয়ু তো আর কয়েকদশকের বেশি নয়। লোনা জলে পোড় খেয়ে খেয়ে বুড়ো যখন আশি বছর বয়সে পৌঁছলো, তখন ওর হাতদুটো বাতে বেঁকে গেছে, গাঁট-পড়া পায়ের ওপর জীর্ণ দেহটা নড়বড় করছে। তাই শেষ কালে তুবা একদিন ফিরে এলো পাহাড়ের গায়ে সেই ভায়ের সংসারে, একগাদা নাতি-নাতনিদের মাঝখানে। একেই গরিবের সংসার, তার ওপর গাদা গাদা সুস্বাদু মাছ ধরে আনতে পারে না বলে কেউ ওকে অনুকম্পা দেখায় না।

এরই মধ্যে কষ্টে তুবার দিন কাটে। বাঁকাচোরা হাতে রুটি ভেঙে যখন ফোকলা মুখে পোরে, সবাই অত্যন্ত সর্তক দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করে। শিগগির তুবা টের পেলো, ওকে কেউ চায় না। মনের মধ্যে ওর আঁধার ঘনিয়ে উঠলো, বুকটা মুচড়ে উঠলো যন্ত্রণায়, রোদে-পোড়া চামড়ায় পড়লো আরও গভীর বলি-রেখা। বুড়ো হাড়গুলোয় নতুন করে শুরু হলো একটা যন্ত্রণা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারাটা দিন ও চুপচাপ বসে থাকে দরজার সামনে একটা পাথরে, নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দেখে স্বপ্নের মতো সুন্দর রৌদ্রদীপ্ত নীল সমুদ্রের দিকে।

এখান থেকে সমুদ্র অনেকটা দূরে, তার বেলভূমি পর্যন্ত পৌঁছানো একটা

বুড়ো মানুষের পক্ষে অত সহজ নয়। তুবা তবু মনস্থির করে ফেলে। এক নিস্তব্ধ রাতে এবড়ো খেবড়ো পাথর বেয়ে থ্যাঁতলানো গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে ও নিচে নেমে এলো। তীরের কাছাকাছি পৌঁছতেই শুনতে পেলো পরিচিত মর্মর, পাথরের গায়ে আছড়ে-পড়া জলের ছল-ছল-ছলাৎ শব্দ, মানুষের কণ্ঠস্বরের চাইতেও যা আশ্চর্য কোমল। সেখানে ও হাঁটু মুড়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু প্রার্থনা করেছিলো তার অনাত্মীয় সেইসব মানুষদের জন্যে। এটা অবশ্য লোকের ধারণা। তারপর যা দিয়ে ঢাকা ছিলো তার বুড়ো হাড় কখানা, যা তার নয়, সেই জীর্ণ ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাকগুলো পাথরের ওপর খুলে রেখে নেমে গিয়েছিলো জলের মধ্যে। সাদা মাথাটা হেলিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে সাঁতরে গিয়েছিলো অনেক দূরে, যেখানে ঘন নীল আকাশ তার রঙিন ওড়না দিয়ে স্পর্শ করেছে জলের রেখা, আর তারাগুলো ঢেউয়ের এত কাছে যেন হাত বাড়ালেই ধরা যেতো।

কোমল-ঘন গ্রীষ্মের রাতে সমুদ্র যেন সারাদিন-খেলে-বেড়ানো-ক্লান্ত-শিশুর মতো শান্ত নম্র। এমন নিস্তব্ধ রাতগুলোয় সমুদ্র ঘুমিয়ে পড়ে, মৃদু নিঃশ্বাসের ওঠা-নামায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। এমন রাতে তার নীল জল সাঁতরে গেলে হাতের নিচে জ্বলে উঠবে নীলচে আলোর দ্যুতি, ছড়িয়ে পড়বে দেহের চারদিকে, আর মায়ের মুখে শোনা রূপকথার গল্পের মতো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে সমস্ত সত্তা।

১৯০৬-১৩

নিটোল নিস্তব্ধতা আর সোনালী পর্ণাসীর গন্ধঘন নীলাভ কুয়াশা ভেদ করে সূর্য ওঠে, তারপর পাথুরে দ্বীপ ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে উঠে যায় অসীম আকাশে।

আকাশের ধূসর বৃত্ত ঘিরে ঘুমন্ত কালো জলের মাঝে দ্বীপটাকে মনে হয় যেন সূর্যবেদী।

তারাগুলো একটু আগেই মিলিয়ে গেছে, কেবল হিমেল আকাশে একরাশ পেঁজা তুলোর মতো স্বচ্ছ মেঘমালার ফাঁকে নিঃসঙ্গ শুকতারাটা তখনও জ্বলজ্বল করছে। প্রথম ঊষার কোমল আভায় আবছা গোলাপী রঙের ছোপ লেগেছে মেঘের গায়ে, আর তার ছায়া পড়েছে সমুদ্রের শান্ত জলে, যেন নীলিম সমুদ্রের তলা থেকে উঠে আসা ঝিনুকের কোলে টলটলে বিশাল একটা শুক্তি।

রুপোলী শিশিরবিন্দু ভরা ঘাসের শীষ আর ফুলের পাপড়িগুলো সূর্যের দিকে প্রসারিত। একটু একটু করে বড় হয়ে সেই উজ্জ্বল শিশিরবিন্দুগুলো টুপটাপ টুপটাপ ঝরে পড়ছে নিদ্রালস মাটির বুকে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে বুঝি নূপুরের কোমল নিক্বণ।

জলপাইয়ের ঘন শাখায় শোনা যাচ্ছে পাখিপাখালির প্রভাতী সংগীত, আর সূর্যের আলোয় ঘুম-ভেঙে-জেগে-ওঠা সমুদ্রের গভীর নিঃস্বন।

তবু চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, কেননা ভোরের কাঁথা-মুড়ি-দিয়ে সবাই তখনও ঘুমিয়ে, আর যা কিছু মৃদু মর্মর ছাপিয়ে ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে ফুলের মিষ্টি তাজা গন্ধ।

আঙুরলতায় ছোট্ট সাদা বাড়িটা এমনভাবে জড়ানো যে দেখলে মনে হবে যেন সবুজ ঢেউয়ে ভাসমান একটা নৌকা। সেই বাড়ির দরজা খুলে বুড়ো চেক্কো বাইরে বেরিয়ে আসে সূর্যোদয় দেখার জন্যে। ছোটখাটো নিঃসঙ্গ মানুষ, শীর্ণ দীর্ঘ দুখানা বাহু, টাক-পড়া মাথা, বয়েসের ছাপে মুখখানা এমন তোবড়ানো যে চোখদুটো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

লোমশ হাতখানা ধীরে ধীরে কপালের খুব কাছে রেখে বুড়ো গোলাপী আকাশের দিকে তাকায়। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে চুনী-পান্নার বিপুল সমারোহ, ধূসর-বেগুনি পাথরের আশেপাশে গোলাপী, হলুদ আর লাল ফুলের মেলা। ওর দু-ঠোঁটে ফুটে ওঠে মৃদু হাসি, ভারি গোল মাথাটা দোলায় তারিফের আবিল উচ্ছ্বাসে।

পিঠটা বেঁকিয়ে পাদুটো একটু ফাঁক করে বুড়ো এমন ভঙ্গিতে দাঁড়ায় যেন ওকে কত ভারি একটা বোঝা বইতে হচ্ছে। ওর চারপাশে তখন ঝলমল করছে সোনালী রোদ, আঙুরের উজ্জ্বল সবুজ পাতা, হলদে শালিখের কলকাকলি, কালজাম আর পর্ণাসী ঝোপে তিতিরের ডানার ঝাপট, আর কোথায় যেন হঠাৎ শিস-দিয়ে-ওঠা দোয়েলের মিষ্টি সুর।

দীর্ঘ অলস বাহুদুটো ওপরে তুলে বুড়ো আড়মোড়া ভাঙে। তারপর দরজার পাশে একটা পাথরের ওপর বসে জামার পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড বার করে আনে। ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ সে পোস্টকার্ডখানার দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে নিঃশব্দে। অবশেষে সে-ঠোঁটে ফুটে ওঠে দুঃখ, ভালোবাসা আর গর্বে মেশা এক বিচিত্র হাসি।

পোস্টকার্ডের ওপর সাঁটা নীল রঙের দুজন তরুণের ছবি, বুড়ো চেক্কোরই মতো গোল মাথা, কোঁকড়ানো ঘন চুল, চওড়া কাঁধ, দুজনে পাশাপাশি বসে হাসছে। পোস্টকার্ডের মাথার দিকে গোটা গোটা হরফে ছাপা রয়েছে :

'আতুরো এবং এনরিকো চেক্কো, শ্রেণীসংগ্রামের দুই বীর যোদ্ধা। হপ্তায় ছ ডলার মজুরির পঁচিশ হাজার সুতাকলে শ্রমিকদের সংগঠিত করার অপরাধে তাদের কারারুদ্ধ করা হয়।

সামাজিক ন্যায়ব্যবস্থার সংগ্রামী যোদ্ধারা দীর্ঘজীবী হোক !'

বুড়ো চেক্কো পড়তে জানে না, তার ওপর শিরোনামাটা আবার বিদেশী ভাষায় ছাপা। তবু সে জানে এই কথাগুলোই লেখা আছে, এর প্রতিটা শব্দ তার চেনা, তার প্রিয়।

মাস দুয়েক আগে এই নীল পোস্টকার্ডখানা পেয়ে বুড়োর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। বাপের মন তখনই টের পেয়েছিলো নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে, আইন না ভাঙলে তো গরিবের ছবি ছাপা হয় না।

পোস্টকার্ডখানা পকেটে লুকিয়ে রাখলে কি হবে, দিনের পর দিন তা ভারি বোঝার মতো চেপে বসছিলো বুকের ওপর। অনেকবার ভেবেছিলো গির্জের পুরুতের কাছে গিয়ে দেখায়, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সে ঠেকে শিখেছে— ভগবানের কাছে সত্যি কথা বললেও পুরুতেরা কখনও মানুষের কাছে সত্যি কথা বলে না।

প্রথম যে লোকটার কাছে চেক্কো ওই রহস্যময় পোস্টকার্ডখানা দেখিয়েছিলো সে একজন বিদেশী শিল্পী। লাল চুল, লম্বা মতন দেখতে, বুড়োর বাড়িতে

প্রায়ই আসতো। সারা দিন ছবি আঁকতো, ঘুম পেলে অসমাপ্ত ইজেলখানাকে ঘুরিয়ে তার ছায়ায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো।

বুড়ো ওকে সন্তর্পণে জিগেস করলো, 'এই ছেলেদুটো কি করেছে, দেখুন তো, সিনোর!'

হাসি হাসি ছেলেদুটোর দিকে তাকিয়ে শিল্পী বলেছিলো, 'নিশ্চয়ই কোন মজার কাজ।'

'কিন্তু ওদের সম্পর্কে এখানে কি লেখা আছে?'

'লেখাটা ইংরেজিতে। ইংরেজ ছাড়া কেউ পড়তে পারবে না। আমার স্ত্রী হয়তো বলতে পারে...'

পরের দিনই বুড়ো গিয়েছিলো শিল্পীর স্ত্রীর কাছে। পাতলা সাদা কাপড়ের ঢিলে বহির্বাস পরে উনি তখন বাগানে ঘুরছিলেন। নীল পোস্টকার্ডখানা দেখে ভাঙা ভাঙা ইতালিয়ান ভাষায় উনি বললেন, 'এদের জেল হয়েছে।'

বুড়োর পা-দুটো কেঁপে উঠলো, যেন ভূমিকম্পে নড়ে উঠলো গোটা একটা দ্বীপ। তবু সাহস করে সে জিগেস করলো, 'এরা কিছু চুরি করছে, কিংবা খুন খারাপি...'

'না না, ওসব কিছু নয়। ওরা হলো সমাজতন্ত্রী।'

'সমাজতন্ত্রী বলতে?'

সিনোরা চোখ বুজিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'এসব রাজনীতি, আপনি ঠিক বুঝবেন না।'

চেক্কো জানতো বিদেশীরা ভারি বোকা, ক্যালব্রিয়ানদের চাইতেও বোকা। তবু ছেলেদুটোর কি হলো জানার জন্যে সে সিনোরার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, কখন উনি তার বড় বড় চোখদুটো মেলে তাকাবেন। অবশেষে উনি যখন চোখ মেললেন বুড়ো চেক্কো পোস্টকার্ডখানা দেখিয়ে জিগেস করলো, 'এটা খাঁটি তো, সিনোরো?'

'জানি না। বললাম তো এটা রাজনীতি, বুঝতে পারলেন না?'

বুঝতে ও সত্যিই পারেনি। ওর ধারণা ছিলো রাজনীতি এমন একটা জিনিস যা দিয়ে রোমের মন্ত্রী আর বড়লোকেরা গরিবদের বেশি খাজনা দিতে বাধ্য করে। কিন্তু তার ছেলেরা তো মজুর, থাকে আমেরিকায়, ওদের আবার কি দায় পড়লো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার!

সারারাত ছবিটা হাতে নিয়ে বুড়ো বসে রইলো, দুর্ভাবনার কালো মেঘ

ঘনিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। ভোরের দিকে ভাবলো পুরুতকে জিগেস করবে। কালো আলখাল্লা-পরা লোকটা বেশ কড়া করেই তাকে শুনিয়ে দিলো, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করে যারা তারাই হলো সমাজতন্ত্রী। তোমার পক্ষে শুধু এইটুকুই জানলে চলবে। এতখানি বয়েসে এ নিয়ে মাথা ঘামানোটা সত্যিই লজ্জাকর!'

ভাগ্যিস ছবিটা ওঁকে দেখাইনি, বুড়ো চেক্কো মনে মনে ভাবলো।

আরও কটা দিন কেটে গেলো। বুড়ো একদিন গেলো নাপিতের কাছে। লোকটা ফুলবাবু, তাগড়াই চেহারা। লোকে বলে যে সব মার্কিনী মেয়েরা দ্বীপ দেখতে আসার নাম করে গরিব ছোকরাদের সঙ্গে ফুর্তি করে, তাদের কাছে ভালোবাসা বিলিয়ে ও নাকি অনেক পয়সা কামিয়েছে। ছবির ওপর লেখাগুলো পড়ে ও তো খুশিতে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো, 'আরে, কি আশ্চর্য! আর্তুরো আর এনরিকো হলো আমার কমরেড! সত্যই তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি গো খুড়ো, আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি! তাহলে আমার দেশের আরও দুটো ছেলে নাম করলো! এটা কি কম গর্বের কথা?'

'বাজে বোকো না,' বুড়ো ধমক দিলো। 'আসলে কি লেখা আছে তাই বলো?'

'কি লিখেছে তা পড়তে পারছি না। তবে একথা ঠিক—গরিবদের কথা যখন লিখেছে, তখন নিশ্চয়ই তারা খুব বীরত্বের কাজ করেছে!'

'দোহাই বাপু, তোমার বকবকানি থামাও!' কথাটা বলে বুড়ো বড় বড় পা ফেলে সেখান থেকে চলে এলো। গেলো সেই রুশ ভদ্রলোকের কাছে। লোকটা সৎ, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। চেক্কো গিয়ে বসলো তাঁর খাটিয়ার পাশে। মৃদু গলায় বললো, 'এই ছেলেদুটো সম্পর্কে কি লিখেছে একটু দেখুন না, সিনোর।'

লেখাটা পড়ে রুশ ভদ্রলোকের রোগজীর্ণ ম্লান ঠোঁটে ফুটে উঠলো উষ্ণ হাসির রেখা।

'দেখুন সিনোর,' বুড়ো চেক্কো আগ্রহের সঙ্গে বললো। 'আমার ঢের বয়েস হয়েছে, পরপারে যাবার সময় হয়ে এলো। ম্যাডোনা যখন জিগেস করবেন, ছেলেদের নিয়ে তুই কি করেছিস, তখন আমি যেন সত্যি বলতে পারি সিনোর। এ দুটো আমারই ছেলে, এরা কি করেছে, কেনই বা এদের জেল হলো, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'ম্যাডোনাকে বলবেন, তাঁর উদ্দেশ্যকেই ওরা সফল করেছে। ওরা ওদের প্রতিবেশীকে সত্যিকারের ভালোবাসতে পেরেছে…'

চেক্কো ওঁর কথা বিশ্বাস করলো। কেননা মিথ্যে কথা সহজ ভাষায় বলা যায় না, তার জন্যে চাই ভালো ভালো শব্দের বুলি। রুশ ভদ্রলোকের শীর্ণ হাতদুটো জড়িয়ে ধরে জিগেস করলো, 'তাহলে জেলে যাওয়াটা ওদের পক্ষে লজ্জার কিছু নয় তো, সিনোর?'

'না না।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। 'জানেন তো, বড়লোকেরা জেলে যায় শুধু তখনই যখন এত বেশি পাপ করে যে আর লুকিয়ে রাখতে পারে না। আর গরিবরা জেলে যায় মঙ্গলের একটু চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই। সেদিক থেকে আপনি সত্যই ভাগ্যবান!'

তারপর উনি অনেকক্ষণ ধরে ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে বুড়ো চেক্কোকে বোঝালেন, এ পৃথিবীতে ভালো মানুষেরা দুঃখ দারিদ্র্য অন্যায় অবিচার দূর করার জন্যে কি কি করছে···

মাঝ আকাশে গনগন করছে জ্বলন্ত একটা সূর্য। তার সোনালী কিরণ এসে পড়েছে ধূসর পাথরের গায়ে, আর সে-পাথরের প্রতিটা ফাটল থেকে ঘাস আর ফুলেদের উচ্ছল জীবন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে উলঙ্গ সূর্যের দিকে, নীলিম আকাশে।

বুড়ো দেখলো সূর্যের সেই সঞ্জীবনী সুধা পান করছে প্রতিটা জীবন্ত প্রাণী, নীড় বাঁধতে বাঁধতে পাখিরা গান গাইছে। এইসব দেখতে দেখতে বুড়ো ভাবে নিজের ছেলেদুটোর কথা, সমুদ্রের ওপারে মস্ত এক শহরের জেলখানায় ওরা এখন বসে আছে, হয়তো খুব রোগা হয়ে গেছে। কথাটা মনে হতেই বুড়োর মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবলো, ওদের জেলে যেতে হয়েছে কেননা ওরা সাচ্চা জোয়ান হয়ে উঠেছে, ঠিক যেমন সারা জীবন সাচ্চা থেকেছে তাদের বাপ। কথাটা ভাবতেই বুড়োর বাদামী রঙের মুখখানা গর্বের হাসিতে কোমল হয়ে উঠলো।

'পৃথিবী কত সমৃদ্ধ, অথচ মানুষ কি গরিব; সূর্য কত উদার, অথচ মানুষ কি নিষ্ঠুর! সারা জীবন আমি শুধু এইসব কথাই ভেবেছি, আর ওদের কিছু না বললেও ওরা ঠিক টের পেয়েছে বাপের ভাবনা। হপ্তায় ছ ডলার মানে চল্লিশ লিরা। চ্যাড্ডিখানি কথা! তবু ওরা ভাবলো এ খুব কমই মজুরি। শুধু ওরা নয়, ওদের মতো আরও পঁচিশ হাজার শ্রমিকও ভাবলো—মানুষকে ভালো ভাবে বাঁচতে গেলে এ মজুরিতে চলবে না···'

তার দৃঢ় বিশ্বাস এতদিন যে ভাবনা সে লালন করেছে বুকের মধ্যে, আজ তাই-ই ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে নিজের ছেলেদের মধ্যে। এর জন্যে সে গর্বিত। আবার এও জানে, দিনের পর দিন মানুষ যেসব সত্যকারের রূপকথা বানিয়ে চলেছে, নিজেরাই অনেক সময় তা বিশ্বাস করতে চায় না। তাই নিজের ভাবনা সে নিজের মনেই চেপে রাখে।

তবু মাঝে মাঝে ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বুকের ভেতরটা তার ছাপিয়ে ওঠে, টানটান হয়ে ওঠে জীর্ণ শিরদাঁড়া। তখন সে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে যেখানে তার ছেলেরা আছে সেই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠে:

'কোন ভয় নেই!'

তখন সমুদ্রের ঢেউয়ে সূর্য হেসে ওঠে। আর বুড়োর সে প্রতিধ্বনির জবাবে দূরের আঙুর-বাগিচা থেকে লোকজনের হাঁক আসে:

'নিশ্চয়ই!'

১৯০৬-১৩

তরুণ ইতালি

মখমলের পোশাক-পরা রাত্রি ধীরে ধীরে প্রান্তরের দিক থেকে এগিয়ে আসে শহরে, আর শহর তাকে বরণ করে নেয় সোনালী আলোর মালায়। মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় দুজন নারী আর একটি তরুণ, যেন ওরাও রাত্রিকে স্বাগত জানাতে চলেছে। ওদের পেছনে ভেসে আসছে দিনের শেষে বিশ্রামলব্ধ শহরের মৃদু গুঞ্জন।

রোমান ক্রীতদাসের হাতে গড়া প্রাচীন রাস্তার অন্ধকার পাথরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তিন জোড়া পায়ের অস্পষ্ট ধ্বনি। উষ্ণ নীরবতার মধ্যে বেজে উঠলো একটি নারীর স্বচ্ছ কোমল কণ্ঠস্বর, 'লোকের সঙ্গে কখনও রূঢ় ব্যবহার করতে নেই···'

'তুমি কি আমাকে কখনও রূঢ় ব্যবহার করতে দেখেছো, মা?' গাঢ় স্বরে তরুণ বললো।

'তুই বড্ড বেশি তর্ক করিস।'

'সত্যকে যে আমি বড্ড বেশি ভালবাসি, মা।'

তরুণের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে একজন তরুণী, পাথরে শব্দ হচ্ছে তার কাঠের জুতোর। এমন ভাবে হাঁটছে যেন ও অন্ধ, মুখখানা আকাশের দিকে তোলা—সেখানে জলজল করছে সন্ধ্যাতারাটি, আর তার নিচে সূর্যাস্তের শেষ রক্তিমাভা। সেই পটভূমিতে অপ্রজ্বলিত মশালের মতো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে দুটো পপলার।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'সমাজতন্ত্রীদের ওরা প্রায়ই জেলে পাঠায়।'

'চিরকাল তো আর এমন চলবে না।' ছেলে শান্ত স্বরে জবাব দিলো।

'তা ঠিক, কিন্তু এর মধ্যে···'

'পৃথিবীর তরুণ হৃদয়কে ধ্বংস করে ফেলতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই, কখন জন্মাবে না।'

'ওসব কথা গানেতেই মানায় ভালো।'

'লক্ষ লক্ষ মানুষ যে সেই গানই গাইছে, মা। তামাম দুনিয়া আজ সে গান কান পেতে শুনছে, যেমন তুমি আজকাল আমার কথা ধৈর্য ধরে শোনো।'

তা ঠিক! কিন্তু এই ধর্মধট তো তোকে আজ শহর ছাড়া করে ছাড়লো···'

'আমাদের কাছে এ খুবই তুচ্ছ। তাছাড়া ধর্মঘটে আমরা জিতবোই।'

'নিশ্চয়ই,' তরুণী আন্তরিক ভঙ্গিতে সায় দিলো। 'তুমি আর পাওলো…'

কথার মাঝে থেমে গিয়ে তরুণী কোমল স্বরে হাসলো। সবাই নীরবে কয়েক মিনিট হেঁটে গেলো। সামনে দেখা গেলো অন্ধকার পাথরের একটা ভগ্নাবশেষ। তার ওপর শীর্ণ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সুগন্ধি ইউক্যালিপটাস। ওরা তিনজনে তার কাছে আসতেই শোনা গেলো পাতার মৃদু খসখস শব্দ।

তরুণী বললো, 'ওই তো পাওলো।'

ভগ্নস্তূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো রাস্তার মাঝখানে। তরুণ হেসে ফেললো, 'তুই কি করে টের পেলি বল্ তো?'

'তোমরা নাকি?' প্রতিধ্বনিত হলো ছায়ামূর্তির ভরাট কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, আমরা।' তরুণ মার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। 'তোমাদের আর আমার সঙ্গে আসার দরকার নেই। এখান থেকে রোম মাত্র ঘণ্টা পাঁচেকের পথ, হেঁটে যেতে যেতেই ভবিষ্যত ভাবনাগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে পারবো…'

ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো। লম্বা লোকটা মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিলো। 'মা আর বোনের জন্যে কিছু ভেবো না। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'জানি। চলি, মা!'

মা মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো। শোনা গেলো তিনটি চুম্বনের শব্দ আর পৌরুষদীপ্ত একটি কণ্ঠস্বর, 'যাও, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করো। তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গ্যাছে। যাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে! আমার মতো পাওলোও তোমার এক ছেলে। তাহলে, চলি বোন…'

আবার চুম্বন আর পাথরের ওপর পায়ের মৃদু শব্দ শোনা গেলো। রাত্রির সতর্ক নির্জনতায় সব শব্দ যেন আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে আবার ফিরে এলো।

অন্ধকারে এক হয়ে মিশে-থাকা কালো মূর্তিগুলো যেন কিছুক্ষণের জন্যে আর আলাদা হতে পারলো না। তারপর নীরবে ওরা সরে এলো। তিনজনে ধীরে ধীরে ফিরে চললো আলোকিত শহরের দিকে আর একজন ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেলো পশ্চিমে, যেখানে সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু মিলিয়ে গিয়ে সারা আকাশ তারায় তারায় ঝলমল করছে।

রাত্রির আঁধারে প্রতিধ্বনিত হলো বিষণ্ণ একটা কণ্ঠস্বর, 'বিদায়।'

দূর থেকে উচ্ছল জবাব এলো, 'দুঃখ কোরো না, আবার দেখা হবে…'

তরুণীর কাঠের জুতোর ফাঁপা আওয়াজ উঠলো রাস্তার বাঁধানো পাথরে। পাওলো ভাঙা ভাঙা গলায় মাকে সান্ত্বনা দিলো, 'ওর জন্যে আপনি কিচ্ছু

ভাববেন না, ডোনা ফিলোমেনা ; আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন। ও যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দরাজ দিল। ও জানে কি করে ভালবাসতে হয়, আর লোকের কাছ থেকে কেমন করে ভালবাসা পেতে হয়। লোকজনকে একবার ভালোবাসতে পারলে তখন কোন বাধা আর বাধা হয়ে থাকে না।'

অন্ধকারে, শহরের ম্লান আলোয় পাওলোর কথাগুলো যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠলো। 'বুকের মধ্যে যার দুনিয়ার মানুষকে মেলাবার মন্ত্র আছে, চিরদিন সে সাদর অভ্যর্থনা পাবে সবখানেই !'

নগর-প্রাচীরের বাইরে নিচু ছাদওয়ালা ছোট একটা সরাইখানা. আলোকিত দরজার চৌকো চোখ দিয়ে তাকিয়ে সে যেন পথচারীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রবেশপথের মুখেই ছোট তিনটে টেবিল ঘিরে কালো কালো মূর্তিগুলো গীটার আর ম্যাণ্ডোলিনের উচ্ছল সুরে কলরব করছে।

ওরা তিনজন দরজার কাছে আসতেই বাজনা থেমে গেলো, গুঞ্জরনের শব্দ কমে এলো। কয়েকজন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'সু সন্ধ্যা, বন্ধুগণ !' পাওলো অভিনন্দন জানালো।

সমবেত কণ্ঠে আবেগ-দীপ্ত প্রত্যভিনন্দন ফিরে এলো, 'সু সন্ধ্যা, কমরেড পাওলো ! আমাদের সঙ্গে এক গেলাস হয়ে যাবে নাকি ?'

'না, ধন্যবাদ।'

মা বললো, 'আমাদের লোকেরা তোমাকেও খুব ভালবাসে দেখছি !'

'কি বললেন, ডোনা ফিলোমেনা, আমাদের লোকেরা !'

'থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না। এদের কাছে আমি অপরিচিত নই। ওরা সবাই তোমাদের ভালবাসে, তোমাকে আর ওকে···'

পাওলো তরুণীর একটা বাহু জড়িয়ে ধরলো। 'সব্বাই ভালবাসে। এ ছাড়া আরও একজন, কি তাই না বলো ?'

তরুণী অস্ফুট কোমল স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই !'

স্মিত হাসিতে ভরে উঠলো মার সারা মুখ। 'আঃ ছেলেমেয়েরা, তোমাদের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তোমাদের কথা শুনি, তখন বিশ্বাস না করে পারি না যে তোমাদের জীবন আমাদের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর হবে।'

তারপর ওরা তিনজন জীর্ণ আস্তিনের মতো নোংরা আর সংকীর্ণ গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

১৯০৬-১৩

একটি শিশুর জন্ম

আঠেরোশো বিরানব্বুই সাল, আকালের বছর। জায়গাটা সুকুম আর ওতসেন-চিরির মাঝামাঝি, কোডর নদীর ধারে। জায়গাটা সমুদ্রের এত কাছে যে পাহাড়ি ঝরনার স্বচ্ছ স্রোতেও শোনা যায় সমুদ্রের গভীর-কলোচ্ছ্বাস।

তখন শরতের সবে শুরু। বুনো লরেলের ঝরা পাতাগুলো কোডরের সাদা ফেনায় একঝাঁক দুরন্ত মাছের মতো ঘুরছে, চিকচিক করছে। টিলার ওপর বসে নদীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছি গাংচিল আর মাছরাঙারা না আবার আমারই মতো ভুল করে পাতাগুলোকে মাছ ভেবে ধরতে এসে হতাশ হয়। কেননা আমরা ডানদিকে গাছগাছালির ওপারে ওদের কলরব শুনতে পাচ্ছি।

আমার মাথার ওপরে বাদামগাছের পাতায় ধরেছে সোনারং, পায়ের নিচে করপল্লবের মতো ছড়িয়ে রয়েছে রাশীকৃত রঙিন ঝরা পাতা। নদীর ওপারে আমলকীর গাছগুলো সম্পূর্ণ নগ্ন, ছেঁড়া জালের মতো শূন্যে বিছিয়ে রয়েছে ডালপালা। কমলারঙের একটা কাঠঠোকরা অবিশ্রান্ত তার গায়ে গর্ত করে চলেছে, আর সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সুদূর উত্তর-থেকে-আসা একঝাঁক ছোট ছোট পাখি পতঙ্গ শিকার করছে।

বাঁ দিকে পাহাড়ের চূড়ায় জমের য়েছে ধোঁয়াচ্ছন্ন সজল ঘন মেঘ। তার ছায়া পড়েছে সবুজ পাদদেশে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট একটা মরা গাছ। ওর আশপাশে বীচ্ আর বাতাবিলেবু গাছের কোটরে সঞ্চিত আছে সুগন্ধি মধু, যার আশ্চর্য মাদকতা সুদূর অতীতে একদিন দুর্ধর্ষ পম্পীয় সৈন্য-বাহিনীর পতনের কারণও হয়েছিলো। বুনো মৌমাছিরা এই মধু সঞ্চয় করে আনে লরেল আর অ্যাজেলিয়া ফুল থেকে, আর অভিযাত্রীরা সেই মধু কোটর থেকে বার করে পাতলা বজরার রুটির সঙ্গে মাখিয়ে খায়।

আপাতত আমিও একটা বাদাম গাছের ছায়ায় টিলার ওপর বসে তাই করছি। মধুর ভরা-পাত্রে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছি আর শরতের মুমূর্ষু সূর্যের ম্লান আলো-ছায়ার খেলা দেখছি।

শরতে ককেসাস পর্বতমালাকে মনে হয় ঠিক যেন নিপুণ কারিগরের তৈরি কোন বিরাট গির্জা। অতীতকে গোপন করার জন্যে সোনাদানা মণিমুক্তো হীরে জহরত দিয়ে তৈরি এই গির্জা, তার গায়ে বিছোনো শেমি আর সমার-কান্দের তুর্কি কারিগরদের তৈরি সূক্ষ্ম রেশমী কারুকার্যকরা বহুমূল্য গালিচা।

সারা দুনিয়া লুটপাট করে সূর্যের পায়ে নিবেদিত এই অতুল সম্পদ : 'হে সূর্যদেব, তোমারই জন্যে সঞ্চয় করে এনেছি এই দুর্লভ ঐশ্বর্য !'

হ্যাঁ, কল্পনায় আমি দীর্ঘদাড়ি শুভ্রকেশ অতিমানবদের উজ্জ্বল চোখে শিশুর প্রসন্নতা নিয়ে নেমে আসতে দেখেছি। দুহাতে ওরা মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে বিচিত্র বর্ণের মণিমুক্তো, স্তবকে স্তবকে পাহাড়ি চূড়ায় পরিয়ে দিচ্ছে রূপোর আবরণ, পাদদেশে জীবন্ত গাছের দীর্ঘসারি। হ্যাঁ, আমি দেখেছি এইসব অলৌকিক দৃশ্যালী, তাদের অক্লান্ত শ্রমে পৃথিবী হয়ে উঠছে আশ্চর্য রূপবতী।

আর এ পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানো সত্যিই কি মজার। দু চোখ ভরে দেখা যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিপুল আনন্দে নেচে ওঠে বুক। যদিও কখনও কখনও মনে হয় জীবন দুর্বিষহ, তীব্র বিদ্বেষে বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়, বিষণ্ণ দুঃখে শিরা-উপশিরার রক্ত শুকিয়ে আসে, তবু সে দুঃখের দিনও কাটে। এমনকি কখনও কখনও সূর্যও মানুষের দুঃখে ম্লান হয়ে যায়, ওদের জন্যে এত কঠোর পরিশ্রম করছে, তবু তার বিনিময়ে মানুষ কতটুকু পাচ্ছে···

না, ভালো মানুষ যে একেবারে নেই, তা নয়। কিন্তু ওদেরও আরও পরিবর্তন হওয়া দরকার—আরও সুন্দর, সম্পূর্ণ নতুন করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

*

হঠাৎ বাঁদিকে ঝোপের ঠিক ওপারে কয়েকটা কালো মাথা দেখা গেলো। সমুদ্রের গর্জন আর নদীর কলোচ্ছ্বাসের দিক থেকে স্পষ্ট ভেসে এলো মানুষের কণ্ঠস্বর। এরা সব দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ, সুকুম থেকে পায়ে হেঁটে চলেছে সুদূর ওতসেনচিরির দিকে, রাস্তা তৈরির কাজে। ওরলভ প্রদেশ থেকে চলে-আসা এইসব চাষীদের আমি চিনি। কেননা ওদের পুরুষদের দলে আমি একসঙ্গেই কাজ করি, গতকালও একসঙ্গে ছুটি পেয়েছি। তবে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখবো বলে আমি ওদের আগে আগেই চলে এসেছি।

ওদের মধ্যে চারজন পুরুষ, একজন তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ। তরুণী আসন্নপ্রসবা। ওর চোয়ালের হাড়দুটো একটু উঁচু, ধূসর-নীল দুটো চোখ, যেন কোন কিছুর প্রতীক্ষায় নির্নিমেষ। এখন ঝোপের ওপারে হলদে রুমালে-বাঁধা ওর চঞ্চল মাথাটা মনে হচ্ছে যেন বাতাসে-দোলা একটা সূর্যমুখী ফুল। অতিরিক্ত তালের রস খেয়ে ওর স্বামী নাকি সুকুমে মারা যায়। ওদের সঙ্গে ছাউনিতে থাকার সময়ে আমি এই কাহিনী শুনেছিলাম। প্রাচীন

রুশ রীতি অনুযায়ী নবাগত কেউ এলেই তাকে ওদের সুখদুঃখের কাহিনী বলা চাই। সেই সুবাদে এদের অনেক গোপন কথাই আমার জানা।

নিঃসঙ্গ এই মানুষগুলো দুঃখ-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত। বাতাসে-ওড়া শীতের ঝরাপাতা বা ভূমি থেকে শেকড়-সমেত-ওপড়ানো গাছের মতো এইসব মানুষ-গুলো ছড়িয়ে পড়েছে ককেসাস অঞ্চলে। এখানকার অতুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওদের মনে তাক লাগিয়ে একেবারে দিশেহারা করে দিয়েছে, কিন্তু কাজের চাপ ওদের অন্তরের শেষ কণাটুকুকে পর্যন্ত নিঙড়ে নিয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি, দেখেছি অসহায় ম্লান করুণ চোখে জমির দিকে তাকিয়ে থাকতে, শুনেছি বিষণ্ণ হেসে পরস্পরে ফিসফিস করে কথা বলতে :

'আহা, কি খাসা দেশ!'

'চাষ করতে গেলে কালঘাম ছুটিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ, মাটিটা একটু শক্ত বটে।'

'মনে মনে যতটা ভাবছো, এ জমিতে আবাদ করা তত সহজ নয়।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে ওদের মনে পড়ে যায় নিজের দেশের কথা, সেখান-কার একমুঠো মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে পূর্বপুরুষের অস্থি। সে-মাটির প্রতিটা ফসলের কণায় মিশে রয়েছে কপালের ঘাম। তা কি এত সহজে ভোলা যায়।

সম্প্রতি ওদের দলে আর একটা মেয়ে এসেছে। লম্বা ঋজু চেহারা, চওড়া বুক, উদ্ধত স্তন। ঘোড়ার মতো লম্বা চোয়াল, কুচকুচে কালো চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বিষণ্ণ। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় মাথায় হলদে রুমাল-বাঁধা তরুণীকে নিয়ে ও ছাউনির বাইরে বেড়াতে যেতো। পাথরকুঁচির স্তূপের ওপরে বসে গালে হাত দিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরতো :

ঘন সবুজ ছায়ায় ঘেরা কবরখানার পাশে
আঁচলখানা বিছিয়ে নেবো বালিয়াড়ির ঘাসে,
প্রভু আমার প্রতীক্ষাতে রইবো বসে একা
হয়তো কোন শুভক্ষণে পাবো তোমার দেখা।

স্বভাবতই হলদে রুমাল-বাঁধা সঙ্গিনীর মাথা তখন নুয়ে আসতো, চোখদুটো অপলক, গর্ভের সন্তানের কথা ওর মনে পড়ে যেতো। কখনও কখনও হঠাৎ কান্না-ভেজা রুক্ষ গলায় গেয়ে উঠতো :

আহা প্রিয়, প্রিয় আমার, দয়িত আমার,
এ জীবনে দেখা আর পাবো না তোমার।

ওদের এই করুণ গানে আমার জন্মভূমি উত্তর-তুষারাঞ্চলের কথা মনে পড়ে যেতো, হু হু করে তুষার-ঝড় বইছে, দূরে শোনা যাচ্ছে নেকড়ের ক্রুদ্ধ গর্জন।

তারপর হঠাৎ একদিন লম্বা-চোয়াল মেয়েটা জ্বরে পড়লো। দড়ির খাটিয়া করে ওকে শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। ও তখন থর থর করে কাঁপছে, প্রলাপ বকছে, যেন ঘন সবুজ ছায়ায় ঘেরা সেই গানটা আপান মনে গেয়ে চলেছে।

মুহূর্তের জন্যে হলদে রুমাল-বাঁধা সেই মেয়েটাকে আর দেখা গেলো না।

প্রাতরাশ সেরে মধুর পাত্রটা পাতা দিয়ে মুড়ে বোঁচকাটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার ধীরে ধীরে রওনা হলাম। আমার আগে যারা রওনা হয়ে গিয়েছিলো তাদের পেছন পেছন একই পথে আমি এগিয়ে চললাম। পথটা সরু আর নির্জন। আমার ডানদিকে ঊর্মিমুখর অতল নীল সমুদ্র, যেন হাজার হাজার অদৃশ্য ছুতোর একসঙ্গে রেঁদা চালাচ্ছে। স্বাস্থ্যবতী রূপসীনারীর সুগন্ধি নিঃশ্বাসের মতো আর্দ্র অথচ উষ্ণ বাতাসে ছিটকে উঠছে ফেনপুঞ্জ, তারপর সশব্দে ভেঙে পড়েছে শুভ্র বালুবেলায়। একখানা তুর্কি বাণিজ্যপোত বন্দর ছেড়ে সন্তর্পণে সুকুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ফুলে উঠছে তার সাদা পাল। আমার মনে পড়লো শহরে একজন গোলগাল ইঞ্জিনিয়ারের কথা, চিৎকার করার সময় তার গাল-দুটো ঠিক পালের মতো ফুলে উঠতো। সে বলতো 'চুপ কর্, নাহলে তোকে জেলে পুরবো!' কারণে অকারণে লোকটা গ্রেফ্‌তার করতে ভালোবাসতো। আজ একথা ভাবতে ভালো লাগলো, এতদিনে কবরের পোকাগুলো হয়তো ওর হাড়-মাংস কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে।

বেশ আরামে চলেছি, যেন সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে বেড়াচ্ছি। মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠছে অতীত দিনের নানান রঙের স্মৃতি। এইসব স্মৃতিগুলো ঠিক যেন সমুদ্রের ফেনিল ঢেউয়ের মতো, কখনও উঠছে কখনও ভাঙছে। যৌবনের উজ্জ্বল আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো সমুদ্রের অতলে একঝাঁক রূপোলী মাছের মতো দুলছে।

ঢেউ বাঁচিয়ে সংকীর্ণ এই সৈকতরেখাটা বিসর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে চলে গেছে। আর পথের ধারের ঝোপ-ঝাড়গুলো ঊর্মিল ঢেউয়ে মুখ দেখবে বলে এমনভাবে সামনে ঝুঁকে এসেছে, যেন পশ্চিমের বিস্তীর্ণ জলরাশিকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

পাহাড় থেকে হিমেল বাতাস বইছে, বৃষ্টি হবে।

কিন্তু হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে অস্পষ্ট একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেলো—মুমূর্ষু মানুষের চাপা গোঙানির মতো। সমবেদনায় বুকের ভেতরটা আমার গুমরে উঠলো। ঘন পত্রালির মধ্যে দিয়ে পথ করে আমি মাথায় হলদে রুমাল-বাঁধা সেই তরুণীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম হিজল-ঝোপের আড়ালে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ও বসে রয়েছে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, দাঁতে দাঁত-চাপা মুখটা যন্ত্রণায় নীল, চোখের মণিদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। ঝুলে-পড়া পেটটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে ও অস্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। আর হলদে দাঁতে-চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নেকড়ের চাপা গর্জনের মতো একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে।

'কি ব্যাপার,' ওর ওপর প্রায় ঝুকে পড়েই আমি জিগেস করলাম। 'কেউ কি তোমাকে আঘাত করেছে?'

বালির ওপর খালি পা দুখানা ছুঁড়ে মাথাটা কোনরকমে তুলে অস্ফুট স্বরে ও বললো, 'আচ্ছা নিলোজ্জো তো! চলে যাও এখান থেকে।'

এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কেননা ঠিক এইরকম একটা অবস্থা এর আগে একবার দেখেছি। তবু হঠাৎ লজ্জা পেয়ে আমি দুপা পেছিয়ে এলাম। আর তরুণী সমানে চাপা গলায় কাতরাতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এইসব দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। বোঁচকা-বুঁচকি নামিয়ে ওর কাছে ফিরে এলাম। ওকে চিৎ করে শুইয়ে হাঁটুদুটো ওপর দিকে মুড়ে দিলাম। হঠাৎ ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো, তারপর উপুড় হয়ে ভাল্লুকের মতো হামাগুড়ি দিয়ে যন্ত্রণাহত স্বরে আমাকে গালাগালি দিতে দিতে ঝোপের আরও ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

'দূর হয়ে যা, শয়তান কোথাকার ...পশু...' দু হাতের মধ্যে মাটিতে মুখ গুঁজে পা দুখানা ছড়িয়ে ও চিৎকার শুরু জুড়ে দিলো।

উত্তেজনা একটু কমার পর, এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত সে সম্পর্কে যতটুকু জানতাম সেটুকু স্মরণ করে আমি আবার ওকে চিৎ করে শুইয়ে হাঁটুদুটো ওপর দিকে মুড়ে দিলাম। 'চুপটি করে শুয়ে থাকো, তাহলে দেখবে খুব শিগগিরই প্রসব হয়ে যাবে।'

তারপর দ্রুত সমুদ্রের দিকে ছুটে গিয়ে হাত দুখানা পরিষ্কার করে ধুয়ে এসে দাইয়ের কাজে লেগে পড়লাম।

আগুনে দিলে বার্চগাছের ছাল যেমন কুঁকড়ে যায়, তরুণীও ঠিক তেমনি

ভাবে দু হাতে মাটি খামচে শুকনো ঘাসপাতা ছড়িয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, ঠিকরে বেরিয়ে-আসা রক্তাভ চোখের মণিদুটো, অমানুষিক বীভৎস মুখে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কোঁতাচ্ছে। ইতিমধ্যে শিশুর ছোট্ট মাথাটা দেখা গেলো। আমি ওর পাদুখানা শক্ত করে চেপে রাখলাম, যাতে প্রসব হতে কোন অসুবিধে না হয়। যাতে ও শুকনো ঘাস মুখে না পুরে দেয়, সেদিকেও নজর রাখলাম। এই ফাঁকে আমরা পরস্পরকে খানিকটা গালমন্দ দিলাম—ও দিলো দাঁতে দাঁত চেপে, আর আমি দিলাম দম বন্ধ করে। ও গাল দিলো যন্ত্রণা আর লজ্জায় মিশে গিয়ে, আমি গাল দিলাম করুণা আর অস্বস্তিতে নাকানি-চোবানি খেয়ে।

'উঃ, ভগবান!' অস্ফুট স্বরে ও ককিয়ে উঠলো। দাঁত দিয়ে কামড়ে-ধরা ঠোঁটদুটো নীল হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ভাঙছে, চোখদুটো যেন সূর্যের উত্তাপে ঝলসে যাচ্ছে। মা হওয়ার দুঃসহ যন্ত্রণায় চিবুক বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রু-ধারা, শরীরটা এমনভাবে মোচড়াচ্ছে যেন এক্ষুনি ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাবে।

'দূর হয়ে যা, শয়তান কোথাকার!'

দুর্বল শিথিল হাতে ও আমাকে যত বার দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আমি তত-বারই ওকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছি। 'আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! আগে তাড়াতাড়ি খালাস হয়ে নাও, তারপর যত খুশি আমাকে গালাগাল দিও।'

সত্যি বলতে কি, ওর চোখে জল দেখে সমবেদনায় আমারই তখন চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসছে, যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে বুকের ভেতরটা। মনে হচ্ছে অসহ্য জোরে চিৎকার করে উঠি, আর উঠলামও তাই, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জোরে, আরও জোরে বেগ দাও।'

অবশেষে আদিম সৌন্দর্য নিয়ে আমার হাতের ওপর বেরিয়ে এলো ছোট্ট একটা শিশু। সজল চোখেই আমি তাকিয়ে দেখলাম সারা দেহ তার টুকটুকে লাল, যেন এ পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তীব্র অসন্তোষে হাত পা ছুঁড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। মায়ের সঙ্গে নাড়ির যোগ তখনও ছিন্ন হয়নি। নীল দুটো চোখ, চ্যাপটা লাল মুখের সঙ্গে নাকটা যেন মিশে রয়েছে, পাতলা ঠোঁটদুটো অনবরত নাড়ছে আর চিৎকার করছে:

'ওঙা···ওঙা···ও-ঙা!'

তাছাড়া তার সারা দেহ এত পিছল যে একটু অসাবধান হলেই আমার হাত থেকে ফসকে পড়ে যাবে। হাঁটু গেড়ে বসে তার দিকে তাকিয়ে আমি

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এর পরে কি কি করণীয় আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। চমক ভাঙলো মার কণ্ঠস্বরে। 'ওটা কেটে দাও!'

তাকিয়ে দেখলাম চোখের পাতাদুটো ওর বন্ধ হয়ে গেছে, শিথিল ক্লান্তিতে যেন বিবশ হয়ে এসেছে সারা দেহ, যন্ত্রণায়-ভেজা নীল ঠোঁটদুটো মৃদু নড়ছে।

'ছুরি দিয়ে নাড়িটা আগে কেটে ফ্যালো।'

ছাউনিতে থাকার সময়েই আমার পকেট-ছুরিখানা চুরি হয়ে গিয়েছিলো, তাই দাঁত দিয়েই নাড়িটা কেটে ফেললাম। বাচ্চাটা আর একবার তারস্বরে ককিয়ে উঠলো। মা অদ্ভুত ভঙ্গিতে মৃদু হাসলো। ওর অতলস্পর্শী চোখদুটো নীল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে। বিবশ হাতে পকেট হাতড়ে আমাকে কি যেন দিয়ে বললো, 'এই ফিতে দিয়ে ওর নাড়িটা বেঁধে দাও।'

আমি যখন নাড়িটা বেঁধে দিলাম, উজ্জ্বল হাসিতে সারা মুখ ওর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে হাসি এত উদ্দীপ্ত এত আন্তরিক যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

'এবার ঠিক হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ একে পরিষ্কার করিয়ে আনছি।'

'কিন্তু দেখো, খুব সাবধানে। বাচ্চাটার বেশি লাগে না যেন।'

বাচ্চাটা কিন্তু আদরযত্নের ধারে কাছেও ঘেঁষলো না। হাত দুখানা মুঠো করে এমন তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে দিলো, যেন সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে সে একা প্রতিবাদ ঘোষণা করছে।

'হ্যাঁ, আরও···আরও জোরে চেঁচা!' হাসতে হাসতে আমি বললাম। 'নিজেকে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে তোর স্বজাতিরাই তোর ঘাড় মটকে দেবে।'

ফেনিল সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছল আনন্দে আমাদের গায়ে আছড়ে পড়তেই আগের চাইতে আরও জোরে প্রাণপণ শক্তিতে সে চিৎকার জুড়ে দিলো। আর এর ফাঁকে ফাঁকেই আমি তার বুক পিঠ ধুইয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। চোখ বুজিয়ে ভ্রূ কুঁচকে হাত পা ছুঁড়ে সে সমানে ডুগরে ডুগরে ককিয়ে চললো।

মৃদু হেসে আমি তাকে উৎসাহ দিলাম। 'চেঁচা, চেঁচা বুড়ো···যত পারিস গলা ফাটিয়ে চেঁচা!'

আদর করতে করতে আমি তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। মা তখন চোখ বুজিয়ে দাঁতের ফাঁকে ঠোঁট চেপে ফুল-পড়ার ব্যথাটাকে সামাল দেবার চেষ্টা করছে। তবু কাতরানির মধ্যেই কোন রকমে অস্ফুট স্বরে বললো, 'দাও, ওকে আমার কাছে দাও।'

'এখন থাক না আমার কাছে। একটু পরে না হয়…'

'না না, এখনই দাও।'

কাঁপা কাঁপা শিথিল হাতে ও ব্লাউজের বোতাম খুললো। আমি ওর বুকের কাপড় উন্মুক্ত করতে সাহায্য করলাম, অগণিত শিশুর জন্যে প্রকৃতির গড়া অমৃতভাণ্ডার। তারপর রোরুদ্যমান শিশুটিকে আমি মার দেহের উষ্ণতায় শুইয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার কান্না থেমে গেলো। মা এবার অনন্য-সুন্দর নীল চোখদুটো নীলিম আকাশের দিকে মেলে দিলো। আর সে দু চোখের গহন গভীরে নেচে উঠলো আনন্দের উজ্জ্বল একটা দীপ্তি। অবসন্ন হাতে ধীরে ধীরে ও শিশু আর নিজের বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলো।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, হে পবিত্র ঈশ্বর-জননী! তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

নিঃসীম ক্লান্তিতে আবার ওর চোখের পাতাদুটো মুদে এলো। অনেকক্ষণ ধরে ও কোন কথা বললো না, নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝাই গেলো না। তারপর অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যয়ভরা স্বরে বললো, 'আমার ঝোলাটা একবার খোলো তো ভাই।'

আমি যখন ঝোলাটা খুলছিলাম ও অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। আমি যখন ঝোলাটা খুলে ওর সামনে মেলে ধরলাম, ম্লান হেসে ও সলজ্জ ভঙ্গিতে তাকালো। মসৃণ কপাল আর চিবুকদুটো আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

'যদি কিছু মনে না করো, একটুখানির জন্যে…'

'কিন্তু তোমার এখন বেশি নড়াচড়া করা ঠিক নয়।'

'দোহাই তোমার, শুধু একটুখানির জন্যে চলে যাও।'

আমি ঝোপের এপাশে চলে এলাম। বুকের মধ্যে অদৃশ্য একটা উদ্বেগ উঁকি ঝুকি মারছে। পাখিপাখালির গানের সঙ্গে এসে মিশছে সমুদ্রের অশান্ত কল্লোল। এত ভালো লাগছে যে সারা জীবন ধরে শুনলেও বুঝি ক্লান্তি আসবে না। অদূরে শোনা যাচ্ছে পাহাড়ি নদীর কলতান, যেন কোন তরুণীর প্রণয়মুখর সংলাপ। ··

এমন সময় ঝোপের ওপারে পরিপাটি করে হলদে রুমাল-বাঁধা মাথাটাকে আবার দেখা গেলো, আমি চেঁচিয়ে উঠলাল, 'আরে, তুমি! এত তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমার নড়াচড়া করা উচিত নয়।'

গাছের সরু একটা ডাল ধরে তরুণী পাথরের প্রতিমূর্তির মতো বসেছিলো। মুখ থেকে ওর সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে, কেবল ঝিকমিক করছে নীল

চোখের হ্রদদুটো। উচ্ছল আবেগে ফিসফিস করে বললো, 'এই, ছাখো ছাখো, বাচ্ছাটা কেমন ঘুমচ্ছে!'

ঘুমন্ত শিশুটিকে নিঃসন্দেহে সুন্দর দেখাচ্ছিলো। কিন্তু আমার মনে হলো সব শিশুই ঠিক এমনি করে ঘুমোয়। যদি কোথাও কোন পার্থক্য থেকে থাকে সে শুধু এই আরণ্যক পারিপার্শ্বিকতা। শরতের মসৃণ পাতা, যার ওপর শিশুটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে, এই ধরনের পাতা সাধারণত সুদূর ওরলভ প্রদেশে কোথাও মেলে না।

'এখন তুমিও বরং একটু শুয়ে থাকো,' আমি উপদেশ দিলাম।

'না না,' মা মাথা নাড়লো। 'যাবার আগে জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিতে হবে।'

'তুমি এখন কোন দিকে যাবে? ওতসেনচিরিতে?'

'হ্যাঁ। সঙ্গী-সাথীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গ্যাছে।'

'তুমি কি অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে?'

'মা মেরী আমাকে সাহায্য করবেন।'

সত্যিই উনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। তাই আমি চুপ করে রইলাম। ও ঝোপের নিচে ঘুমন্ত শিশুর টুকটুকে মুখখানার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। নীলিম দু চোখ থেকে ঝরে পড়ছে কোমল স্নেহ। তারপর শুকনো ঠোঁটদুটো চেটে বাচ্ছার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে আদর করলো।

কেটলিটা বসাবার জন্যে কয়েকখানা পাথর সাজিয়ে আমি আগুন ধরালাম। 'মনে হচ্ছে এবার তোমাকে একটু চা খাওয়াতে পারবো।'

'সত্যিই খুব খুশি হবো। গলাটা বড্ড শুকিয়ে গ্যাছে।'

'তোমার সঙ্গী-সাথীরা কি বলে তোমাকে একা ফেলে চলে গেলো?'

'না না, ওরা আমাকে একা ফেলে যায়নি। আমিই বরং নিজে থেকে পেছিয়ে পড়েছিলুম। ওরা আমার চারপাশে থাকলে কি বিশ্রী ব্যাপার হতো বলো তো?' নিজের হাত দুখানার দিকে তাকিয়ে ও সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসলো।

'এই কি তোমার প্রথম বার?'

'হ্যাঁ।' একটু নীরবতার পর ও মুখ তুললো। 'কিন্তু তুমি কে?'

'আমি? আমি একটা মানুষ।'

'তা তো বটেই। তুমি কি বিবাহিত?'

'না, এখনও সে সুযোগ হয়ে ওঠেনি।'

'কথাটা সত্যি নয়।'

'কেন ?'

চোখের পাতা নামিয়ে ও কি যেন ভাবলো। 'তা যদি হয়, মেয়েলি ব্যাপার তুমি এত সব জানলে কেমন করে ?'

এবারে আর মিথ্যে বলা ছাড়া কোন উপায় রইলো না। তাই বললাম, 'বয়ে পড়েছি। আসলে আমি ডাক্তারি পড়তাম।'

'ও, তাই বুঝি! আমাদের পুরোহিতের ছেলেও গির্জের ধর্মযাজক হবার জন্যে পড়াশুনো করতো।'

'হ্যাঁ, ঠিক সেই রকম। দাঁড়াও, আগে আমি একটু জল নিয়ে আসি।'

শিশুর ওপর ঝুঁকে মা ওর শ্বাস-প্রশ্বাস শুনলো। তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমারও একটু হাত-মুখ ধোয়া উচিত। কিন্তু এখানকার জল কেমন কে জানে। নোনা না তেতো, তুমি কিছু জানো ?'

'খুব ভালো জল। তুমি চোখ বুজিয়ে মুখ হাত পা ধুতে পারো।'

'সত্যি ?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া ঝরনার জলের চেয়েও গরম। এখানকার ঝরনার জল বরফের মতো ঠাণ্ডা।'

'ও বাব্বাঃ, তোমার এসব বেশ ভালোই জানা বলে মনে হচ্ছে!'

হাড়-জিরজিরে, ছোট একটা টাট্টু চড়ে একজন আবখাশিয়ান এদিকেই আসছিলো। কানখাড়া করে কুচকুচে কালো চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে টাট্টুটা একবার চিঁহিচিঁহি করে ডেকে উঠলো। তারপর লোমের টুপি-পরা আরোহীকে নিয়ে আবার তার গন্তব্যের দিকে চলে গেলো।

'এখানকার লোকগুলোকে কেমন অদ্ভুত দেখতে, তাই না ?' অরলভের মেয়েটি শান্ত সুরে জিগেস করলো।

মৃদু হেসে আমি মোহনার দিকে এগিয়ে চললাম। পাথরের ওপর দিয়ে কুলকুল করে বহে যাচ্ছে পারার মতো স্বচ্ছ জলধারা, শরতের ঝরা পাতাগুলো ঘুরতে ঘুরতে ভেসে চলেছে। হাত মুখ ধুয়ে কেটলিতে জল ভরে নিয়ে আমি ফিরে এলাম। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখলাম পাথরের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে তরুণী কি যেন করছে আর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

'কি ব্যাপার ?' আমি অবাক হয়ে জিগেস করলাম। মেয়েটার মুখ তখন

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। নিজের দেহের আড়ালে ও কি যেন লুকোবার চেষ্টা করলো। এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। 'ওটা আমাকে দাও, ওদিকে কোথাও গিয়ে পুঁতে দিয়ে আসছি।'

'জানো, আমাদের নিয়ম উনুনের নিচে মাটিতে পুঁতে ফ্যালা।'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানেও একটা উনুন তৈরি করে ফ্যালা অসম্ভব নয়।'

'ঠাট্টা করছো তো? সত্যি, বিশ্বাস করো···আমি এখানে পুঁততে চাইনি, পাছে কোন বন্য জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফ্যালে। মা বসুন্ধরাকে ফিরিয়ে দিতে হয়···আমার হাতে ভারি ভিজে একটি পুটলি দিয়ে সজল করুণ চোখে ও মিনতি করলো, 'দোহাই তোমার, আমার বাচ্ছাটার মঙ্গলের মুখ চেয়ে তুমি যতটা পারো মাটির নিচে এটাকে পুঁতে দিও।'

কথামতো কাজ সেরে যখন ফিরে এলাম দেখলাম টলটলে পায়ে সমুদ্রের ধার থেকে তরুণী ফিরে আসছে। হাতদুটো সামনের দিকে প্রসারিত, ঘাঘরার অর্ধেকটা ভিজে, মুখে অদ্ভুত উজ্জ্বল একটা দীপ্তি। হাত বাড়িয়ে ওকে আগুনের ধারে নিয়ে গেলাম। মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলাম সত্যি, মেয়েদের কি অদ্ভুত মনের জোর! তারপর দুজনে মধু দিয়ে তৈরি চা খেতে খেতে গল্প করলাম।

'তুমি কি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছো?' শান্ত স্বরে ও জিগেস করলো।

'হ্যাঁ।'

'সবকিছু তাহলে গুলে খেয়েছো?'

'হ্যাঁ, শেষ তলানিটুকু অব্দি।'

'তোমার মুখটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেবার সুকুমে ছাউনির সর্দারের সঙ্গে রেশনের বরাদ্দ নিয়ে তর্ক করতে দেখে বুঝেছিলুম এ ছেলেটার ভয়ডর বলতে কিছু নেই।'

ঠোঁট থেকে মধুটা চেটে নিয়ে ঝোপের নিচে অরলভের নবজাত ঘুমন্ত শিশুটার দিকে ও আবার নীল চোখ মেলে তাকালো। 'এর জীবনটা কেমন হবে কে জানে?' তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে ফিরে বিষণ্ণ স্বরে বললো, 'তুমি আমাকে যে সাহায্য করলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ···যদিও জানি না, এতে সত্যিই ওর কোন কল্যাণ হবে কিনা!'

রুটি আর বাকি চা-টুকু খাবার পর ও বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলো। এই ফাঁকে

আমি আমার জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিলাম। অপলক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ও তন্দ্রার মতো আচ্ছন্ন আবেশে একটু একটু ঢুলছে। শেষ পর্যন্ত ও কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

'তুমি কি সত্যিই হেঁটে যেতে পারবে?' আমি অবাক হয়ে জিগেস করলাম।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু…'

'মা মেরী আমার সঙ্গে আছেন। যদি কিছু মনে না করো ছোট্টো সোনা-টাকে আমার কাছে একটু তুলে দাও।'

'না, চলো। বাচ্ছাটাকে বরং আমি নিচ্ছি।'

খানিকটা তর্কাতর্কির পর ও রাজি হলো। আমরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চললাম। আমার কাঁধে হাত রেখে অপরাধীর মতো ম্লান হেসে ও বললো, 'আশাকরি এবার আর পড়ে যাবো না।'

ইতিমধ্যে রাশিয়ার নবাগত নাগরিকটি, যার ভবিষ্যত তখনও অজ্ঞাত, আমার দু বাহুর মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা, এখন রীতিমতো নাক ডাকছে। উত্তাল সমুদ্রের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে বালুবেলায়, ছিটকে উঠছে সাদা ফেনা। ঝোপঝাড়ে মর্মরিত হচ্ছে হাওয়ার কানাকানি। মাঝ আকাশে দুপুরের গনগনে সূর্যটা জ্বলছে।

মন্থর পায়ে আমরা হেঁটে চলেছি। মাঝে মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে মা বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। মাথা ঘুরিয়ে সাগর-বন-পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে আর উঁকি দিয়ে ছেলের মুখখানা দেখছে। অশ্রুতে বেদনার ক্লান্তি মুছে গিয়ে এখন সুন্দর স্বচ্ছ দু চোখে ফুটে উঠেছে অফুরন্ত ভালোবাসার স্নিগ্ধ মধুরিমা।

চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে ও বললো, 'হে ঈশ্বর, কি সুন্দর তোমার এই সৃষ্টি! এভাবে আমি যেন চিরদিন হেঁটে চলতে পারি। হ্যাঁ, চিরটা কাল আমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারি। শুধু যা চাই, চিরজীবন নবজাত এই ছোট্ট সোনাটা যেন আমার বুকের মধ্যে থাকে, বড় হয়ে ওঠে, মোমের মতো কোমল আর পাথরের মতো শক্ত!'

আর ঠিক তখনই শোনা গেলো সমুদ্রের অশান্ত গর্জন।

১৯১২

শহরের খুব কাছেই তুষারে-জমাট নদীর ওপারে সাতজন ছুতোরের একটা দল বরফ-কেটে-পথ-তৈরি-করার একখানা বড় বজরা মেরামত করছে। শীতের আগে স্থানীয় লোকেরা জ্বালানির জন্যে বজরাখানার গা থেকে কাঠ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো।

এ বছর বসন্ত আসতে দেরি করছে। তার ভরা-যৌবনে যেন এখনও জড়িয়ে রয়েছে শীতের আমেজ। কেবল দুপুরের দিকে, তাও প্রতিদিন নয়, মাঝে মাঝে স্বচ্ছ নীল মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে শীতের ম্লান সূর্যটা উঁকি মারে।

আজ গুডফ্রাইডে, সামনেই পবিত্র পুনরুত্থান পরবের উৎসব। গতকালও তুষার-জমাট নদীর ওপর আরও এক ফুটেরও বেশি তুষার পড়েছে, ধূসর মেঘের রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে তার বুকে। ছুতোর মিস্ত্রিরা বিষণ্ণ মনে কাজ করছে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ের চূড়া থেকে ভেসে-আসা গির্জার মিষ্টি ঘন্টা-ধ্বনি। থেকে থেকে মিস্ত্রিরা মাথা তুলছে আর ওদের বিষণ্ণ নীল চোখে ফুটে উঠছে ফেলে-আসা গ্রামের ঝাপসা স্মৃতি। ওরা এমনভাবে কুঠুল চালাচ্ছে, যেন আঘাত হানার আগে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করছে, পাছে ঘন্টার একটানা মিষ্টি শব্দটাকে না কেটে ফেলে।

নদীর চওড়া রেখার ওপর তুষারে মাঝে মাঝে টেরচা ভাবে দেবদারুর শাখা পুঁতে পুঁতে পথ, উন্মুক্ত স্থান আর তুষারের ফাটলগুলো নির্দেশ করা হয়েছে। ডুবন্ত মানুষের নিশ্চল বিকৃত বাহুর মতো ওগুলো তুষারের ওপর উঁচিয়ে রয়েছে।

নদীর বুক থেকে উঠে আসছে হতাশার করুণ দীর্ঘশ্বাস। তুষারের ঢাল বেয়ে নিঃসীম ক্লান্তিতে যেখান দিয়ে গড়িয়ে চলেছে বরফ-গলা ঘোলা জল, সেখান থেকে বয়ে আসছে মন্থর হিমেল বাতাস।

'আরে হাত পা চালিয়ে কাজ করো, ভাইসব!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো সর্দার ওসিপ। ছোটখাটো দেখতে হলে কি হবে, চমৎকার দেহের বাঁধুনি। কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর দাড়ি, গোলাপী চিবুক। কোন সময়েই সুস্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। এবার আমার দিকে ফিরে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো, 'এই যে ইনেসপেক্টর সাহেব, আকাশের দিকে ভোঁতা নাক উঁচিয়ে কি খুঁজছো শুনি? এখানে তোমার আসল কাজটা কি আমি তো সেইটেই বুঝতে পারি না। অথচ ঠিকেদার ভাসিলি সের্গেইভিচ তোমাকে পাঠিয়েছে আমাদের ওপর

খবরদারি করতে, অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে কাজ আদায় করে নিতে, আর সেই তুমি কিনা মরা গুঁড়ির মতো দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছো? হম্বিতম্বি করো ভায়া, হম্বিতম্বি করো।'

তার পরেই আবার কারিগরদের চিৎকার করে বললো, 'এই, হাত চালিয়ে কাজ করো সব···হাত চালিয়ে! আজ রাতের মধ্যেই আমাদের কাজ সব শেষ করতে হবে, না কি হবে না?'

আসলে কারিগরদের মধ্যে ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে অলস। কিন্তু কাজ জানে চমৎকার। যেমন নিখুঁত, তেমনি দ্রুত। দুর্ভাগ্যবশত সত্যিকারের আগ্রহ আর রুচি নিয়ে ও কাজ করে খুব কম, অধিকাংশ সময় রুদ্ধশ্বাসে গল্প করে কাটাতেই ভালোবাসে। হয়তো সবাই মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে, ওসিপ তখন তরল গলায় তার গল্প ফেঁদে বসলো, 'বুঝলে ভায়া, একবার হয়েছিলো কি···'

প্রথম দু তিন মিনিট মনে হবে লোকগুলো বুঝি তার কথা শুনছেই না—ওরা আপন মনে র‍্যাঁদা চালাচ্ছে, কাঠ কাটছে, তুরপুন ফুঁড়ছে, কিন্তু পরক্ষণেই স্বপ্নিল একটা কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট ওরা হবেই। আর ওসিপের উজ্জ্বল নীল চোখদুটো তখন তরল পরিহাসের মধ্যেই কুঁচকে ছোট হয়ে যাবে, কোঁকড়ানো দাড়িগুলো আঙুলে পাকাতে পাকাতে ঠোঁটে মৃদু একটা শব্দ করবে আর হালকা গলায় শব্দের পর শব্দ গেঁথে চলবে।'···ট্যাংরা মাছটাকে ও তো ঝুড়িতে ভরলো। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ভাবলো, 'নাঃ, আমাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে!' এমন সময়, কেউ, জানে না, হঠাৎ কোত্থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন ডাকলো, 'ইলেসা-আ! এই ইলেসা-আ!'

ইতিমধ্যে লম্বা, রোগা একজন মোরদ্‌ভিনিয়ান তরুণ, নাম লেয়নকা, ডাক নাম নেতিভ, কুঠুল ফেলে ওর পাশে হাঁ করে দাঁড়িয়ে শুনছে।

'তখন ঝুড়ির মধ্যে থেকে কে যেন ভারি গলায় জবাব দিলো, 'এই যে, আমি এ-খা-নে!' আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ির ডালা খুলে ট্যাংরাটা নিচে লাফিয়ে পড়লো। তারপর কিলবিল করতে করতে জলের তলায় চলে গেলো।'

সানিয়াভিন নামে একজন প্রাক্তন সৈনিক, পাঁড় মাতাল আর হাঁফানির রোগী, কর্কশ গলায় জিগেস করলো, 'শুকনো ডাঙা পেরিয়ে ট্যাংরামাছটা কি করে কিলবিল করতে করতে জলে চলে গেলো?'

ওসিপ রহস্যময় ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হেসে জবাব দিলো, 'আর মাছের কথা বলাটা বুঝি খুব স্বাভাবিক?'

বুড়ো চাষী মোকে বুদেরিন, ঠেলে বেরিয়ে-আসা চিবুকের হাড় আর ঢালু কপাল, সচরাচর যার উপস্থিতি টেরই পাওয়া না, হঠাৎ খনা গলায় ও সর্দারকে সমর্থন করলো, 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

যখনই কেউ কোন অদ্ভুত, বিচিত্র বা নোংরা কথা বলে, তখনই হঠাৎ শোনা যায় খনা গলার তিনটি শব্দ, 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

আর তখনই মনে হয় আমার বুকের মধ্যে কে যেন তিনটে ঘা মারছে।

আপাতত কাজকর্ম সব থেমে গেছে। কেননা টেরা চোখ, তোতলা ইয়াকভ বোয়েভ ঠিক ওই রকম একটা মাছের গল্প শোনাবার জন্যে এগিয়ে এসেছে, খানিকটা বলেও ফেলেছে। কিন্তু তার তোতলামির জন্যে সবাই হেসে উঠলো। রাগে বাটলি উঁচিয়ে গালাগালি দিতে দিতে সে চিৎকার করে উঠলো, 'কি! আমার কথা বি-বি-বি-শ্বাস হলো না বুঝি?'

সবাই যে যার কাজ ফেলে দিয়ে হৈ চৈ করছে, হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। সুন্দর রূপোলী মাথা থেকে টুপিটা খুলে ওসিপি চেঁচিয়ে বললো, 'থাক থাক, খুব হয়েছে বাপু। তোমার যা বলার ছিলো বলেছো, আমরা আনন্দ পেয়েছি, এবার থামো।'

হাতের চেটোয় থুতু ফেলে বুড়ো সৈনিকটি ধাঁ করে বলে বসলো, 'তুমিই তো প্রথম শুরু করেছিলে।'

ওর কথায় কান না দিয়ে সর্দার ওসিপ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে শুরু করলো, 'বুঝলে ইনেসপেক্টর...'

আমার ধারণা, এইভাবে গল্প ফেঁদে লোকগুলোকে কাজ থেকে সরিয়ে আনাই সর্দারের মূল উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম না ও নিজে আলস্যে সময় কাটাচ্ছে, না লোকগুলোকে অবকাশ দিতে চাইছে। অথচ ঠিকেদার সের্গেইভিচ উপস্থিত থাকলে ওসিপ সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, একেবারে বিনয়ে অবতার। স্রেফ অভিনয় করে প্রত্যেক শনিবারে মনিবের কাছে এক পেয়ালা চায়ের বকশিস আদায় করে ছাড়ে।

যদিও কারিগর হিসেবে ওসিপের কোন তুলনাই হয় না, তবু বয়স্ক সহকর্মীরা ওকে পছন্দ করে না, ভাঁড়েরই মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। অন্যদিকে তরুণরা আবার ওর গল্প শুনতে দারুণ ভালোবাসে, কিন্তু তা বলে ওকে তেমন গুরুত্ব দেয় না, বরং বদ মেজাজের জন্যে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়।

লেখাপড়া-জানা মোরদভিনিয়ান সেই তরুণ, লেয়নকার সঙ্গে আমি নানা

বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করি, একবার ওসিপ প্রসঙ্গেও বলেছিলো, 'ও হচ্ছে গভীর জলের মাছ! ওকে সত্যি করে বোঝা আমার কম্মো নয়। তবে মিখাইলো নামে একজন কারিগর, খুব চালাক, এখন মারা গ্যাছে—ও একবার ওসিপকে যাচ্ছে-তাই করে গালাগালি দিয়ে বলেছিলো—'তুমি কি নিজেকে একটা মানুষ বলে মনে করো? না হতে পারলে একজন সাচ্চা শ্রমিক, না কোন মনিব। দড়ির প্রান্তে ঝোলানো ওলনের মতো চিরকালটা কেবল তড়পেই গ্যালে!' আমার মনে হয় কথাটা ঠিক। তবে…'একটু থেকে লেয়নকা কি যেন ভেবেছিলো। 'সত্যি বলতে কি, সব মিলিয়ে লোকটা কিন্তু খারাপ নয়।'

এইসব লোকজনদের মধ্যে আমার অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। একে বয়েস সবে পনেরো, তার ওপর ঠিকেদারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মালপত্র খরচের হিসেব রাখা, অর্থাৎ ছুতোরেরা যাতে তক্তা বা পেরেক চুরি না করে তা দেখা-শোনার দায়িত্ব আমার ওপর। কিন্তু চুরি ওরা ঠিকই করতো। আমার উপস্থিতিতে ওরা বিব্রত হতো আর আমাকে ভাবতো অবাঞ্ছিত লোক। ফলে অহেতুক ভাবে মাথায় বাড়ি মারার সুযোগ কিংবা অন্য কোন ভাবে বিরক্ত করতে পারলে ওরা ছাড়তো না—কৌশলে তার পূর্ণ সুযোগ নিতো। আমার অস্বস্তি লাগতো। সব সময় চেষ্টা করতাম এমন ভাবে কথা বলতে যাতে ওদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না হয়, কিন্তু প্রয়োজনমতো ঠিক শব্দগুলো মুখে যোগাতো না। ফলে আমার উপস্থিতিতে আমি নিজেই বিব্রত বোধ করতাম।

যখনই খাতায় মালপত্র খরচের হিসেব লিখতাম, ওসিপ এসে আমাকে জিগেস করতো, 'লেখা হয়ে গ্যাছে? কি লিখলে শুনি?'

ভ্রূ কুঁচকে ও আমার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়তো, কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠতো বিরক্তি। 'বাঃ, কি সুন্দর তোমার হাতের লেখা।' ও শুধু ছাপার গোটা গোটা অক্ষর পড়তে পারতো, টানা হাতের লেখার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারতো না। তাই অবাক হয়ে জিগেস করতো, 'কিন্তু এই গোল্লাটার মানে কি?'

'মালপত্র।'

'মালপত্তর? আহা, কি লেখার ছিরি! আমি তো ভেবেছিলুম কয়েকটা গেরো। আর এই লাইনগুলো?'

'তক্তা। পৌনে দু ইঞ্চি ঘন, বিশ ফুট লম্বা তক্তা, পাঁচটা।'

'পাঁচটা কেন হবে? ছটা খরচ হয়েছে।'

'না, পাঁচটা।'

'একটা তক্তা বুড়ো সৈনিকটা কেটে দু টুকরো করে ফেলেছে না ?'

'কিন্তু তার তা করা উচিত ছিলো না।'

'সে কথা আর বলতে! টুকরো দুটো নিয়ে সে এখন ভাটিখানায় ঢুকেছে, মদ গিলতে।'

নীল চোখের স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও মুচকি মুচকি হাসতো, আর আঙুলে দাড়ি পাকাতে পাকাতে বলতো, 'ছটা লেখো, বুঝলে। আর শোন ভায়া, যা ঠাণ্ডা পড়েছে, এর মধ্যে কাজ করা খুব কঠিন। তাই শরীরগুলোকে চাঙ্গা রাখতে ওদের জন্যে দু এক ফোঁটা মদের ব্যবস্থা কোরো। আমাদের ওপর এত কঠোর না হলে ঈশ্বর বরং তোমার প্রতি প্রসন্নই হবেন।' ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ও কথাগুলোকে এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে বলতো, যেন কাঠের গুড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে যাওয়ার মতো আমার বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। আমি নিঃশব্দে সংখ্যাটা সংশোধন করে ওকে দেখাতাম।

'বাঃ, এই তো সংখ্যাটাকে এখন বেশ বড়লোকের নাদুসনুদুস রূপসী বউয়ের মতো দেখাচ্ছে।'

পরক্ষণেই দেখতাম অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে ও নিজের সাফল্যের কথাটা বিজয়গর্বে ঘোষণা করছে, আর ওরা সবাই আমার নামে যা তা বলছে। আমাকে যে কেউ পছন্দ করে না সেটা ও খুব ভালো করেই জানতো। পনেরো বছরের হৃদয় আমার এই অপমানে ডুগরে কেঁদে উঠতো, বিষণ্ন একটা যন্ত্রণায় সারা মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। মনে মনে ভাবতাম, 'কি আজব এই দুনিয়া! আচ্ছা, ওসিপ কেমন করে এমন নিশ্চিন্ত হলো যে ছয়কে কেটে আমি আবার পাঁচ বসাবো না, ঠিকেদারকে বলে দেব না যে ওরা একটা তক্তা চুরি করে মদ খেয়েছে ?'

আর একবার ওরা সেরখানেক লোহার নাট-বল্টু চুরি করলো।

আমি ওসিপকে ডেকে সাবধান করে দিলাম। 'শোন এ রকম করলে আমি কিন্তু ভাসিলি সের্গেইভিচকে বলে দিতে বাধ্য হবো।'

'ঠিক আছে।' ভ্রূ কুঁচকে ও বরং আমাকে সমর্থনই করলো। 'ব্যাপারটা যদিও খুব তুচ্ছ, আর আমি নিজে না দেখলে যা হয়, তবু তুমি বরং ওদের সবার নামে নালিশ ঠুকে দাও।' তারপরেই ও কারিগরদের দিকে ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, 'এই আহম্মোকের দল, তোমাদের সবাইকে জরিমানা করা হলো।'

বুড়ো সৈনিক দাঁতে দাঁত চেপে জিগেস করলো, 'কেন, কিসের জন্যে ?'

'কেন, সে তোমরা খুব ভালো করেই জানো।'

ওসিপ যখন শান্তভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলো, ওরা বিশ্রী ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি তখন নিজেই বুঝতে পারলাম না, যা বলেছি তা করবো কি না, আর করলে সেটা ঠিক হবে কি না।

ওসিপকে বললাম, 'ছাখো, আমি ভেবেছি ঠিকেদারের হয়ে কাজ করা ছেড়ে দেবো। তারপর তোমরা যা খুশি কোরো। কেননা এইভাবে যদি তোমাদের সঙ্গে থাকি, একদিন তোমরাই আমাকে চোর বানিয়ে ছাড়বে।'

'ঠিক ঠিক, খুব খাঁটি কথা। তোমরা বরং এখনই এ কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত। কি ধরনের পরিদর্শক হে তুমি ? এই ধরনের কাজে তোমাকে আগে সম্পদের প্রকৃত মর্ম বুঝতে হবে। তোমার মায়ের দেওয়া গায়ের চামড়াটা যেমন বাঁচাতে হবে, প্রভুর সম্পত্তি রক্ষার জন্যেও তোমাকে তেমনি সতর্ক হতে হবে। কিন্তু তুমি···তুমি এত ছেলেমানুষ যে এ ব্যাপারে তোমার সামান্যতমও কোন ধারণা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, কেউ যদি ভাসিলি সের্গেইভিচের কানে লাগায় যে তুমি আমাদের সঙ্গে সহজভাবে মিশছো, তাহলে উনি তখনই তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হাঁকিয়ে দেবেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তুমি যে আদৌ উপযুক্ত নও, সে তুমি নিজেই ভালো করে বুঝতে পারছো।'

একটা সিগারেট পাকিয়ে ও আমার হাতে দিয়ে বললো, 'বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও ভায়া, দেখবে সব ঠিক হয়ে গ্যাছে। তুমি যদি এত আনাড়ি না হতে আমি তোমাকে পাদ্রী হতে বলতুম। কিন্তু তোমার স্বভাব এমন রুক্ষ আর ঋজু যে পাদ্রীর চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। পাদ্রীদের স্বভাব হলো দাঁড়কাকের মতো, কার পাকাধানে তুমি মই দিচ্ছো তাতে ওঁদের মাথাব্যথা নেই, কেবল নিজের পেটটা ভরলেই হলো। আর তোমাকে এতসব বলার উদ্দেশ্য, আমাদের মধ্যে সত্যিই তুমি একটা অদ্ভুত—ঠিক যেমন কাকের বাসায় কোকিলের ডিম।'

প্রতিবারেই অদ্ভুত কিছু বলার সময় ও যেমন করে, মাথা থেকে টুপি খুলে ধূসর আকাশের দিকে তাকালো। তারপর খুব শান্ত মোলায়েম স্বরে বললো, 'ঈশ্বরের চোখে চোর আমরা সবাই এবং এর থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই।'

বুড়ো চাষী মোকে বুদেরিন তার স্বভাবসুলভ খনা গলায় সর্দারকে সমর্থন করলো, 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

সেই থেকে কোঁকড়ানো চুল, রূপোলী দাড়ি, উজ্জ্বল চোখ, দুর্বোধ্য ওসিপ আমারি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমাদের মধ্যে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো। কিন্তু অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে ও অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতো, ঠোঁটদুটো মৃদু কাঁপতো আর কৃত্রিম ভঙ্গিতে ঠাট্টা করে আমাকে বলতো, 'ও হে ছোকরা, রুজি-রোজগার টিকিয়ে রাখতে গেলে চোখ-কান খোলা রাখো, নইলে সৈনিক-শূয়োরটা আরও বেশি পেরেক হাতিয়ে নেবে।'

কিন্তু অন্য সময়ে যখন আমরা একা থাকতাম, ও অত্যন্ত ভদ্রভাবে কথা বলতো। নীল চোখে ছোট ছোট হাসির ঝলক ঢেউ খেলে যেতো। আর আমি ওর প্রতিটা শব্দ মন দিয়ে শুনতাম। একবার ওকে বললাম, 'ভালো লোক হওয়াই তো আসল কথা।'

'হুঁ, তা বটে!' একটু বিরতির পর বিদ্রূপের স্বরে হাসতে হাসতে ও জিগেস করলো, 'কিন্তু ভালো লোক বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো? আমার ধারণা লোকে উপকার না পেলে কারুর ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওদের সান্ত্বনা দাও, একটু প্রশ্রয় দাও, দু একটা মিষ্টি কথা বলো, দেখবে তার বিনিময়ে ওরা তোমাকে নিশ্চয়ই কিছু ফিরিয়ে দেবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, তুমি ভালো হলে আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি পড়বে না, বা নিজের মনে নিজে আনন্দ পাবে না। নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু আমার ধারণা, তুমি জোচ্চোরই হও বা সাধুই হও, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছো, ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলছো, ওরা তোমাকে ভালোবাসবেই।'

আমার দিক থেকে, বিশেষ করে সে সময়ে, লোকজনদের দেখতে, তাদের চরিত্রকে যাচাই করতে আমার কখনও ক্লান্তি আসেনি। কেননা আমার ধারণা এতে ওরা আমাকে ওপরে উঠতেই সাহায্য করবে, আর আমি আমাদের এই বিধ্বস্ত, জটিল জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো।

সেই সময়ে অশান্ত আকুল একটি প্রশ্ন কেবলই আমার মনের মধ্যে গুনগুন করতো—মানুষের আত্মার প্রকৃত রূপটি কেমন? আমার মনে হতো আত্মা তামার কোন বলের মতো—অনড়, অটল। তাতে প্রতিটা জিনিসই আপনা থেকে প্রতিফলিত হতো বিকৃত, কুৎসিত আর বিমর্ষ ভঙ্গিতে। কখনও মনে হতো আত্মা আয়নার মতো মসৃণ আর সমতল, হয়তো তার কোন অস্তিত্বই নেই। কখনও আবার মনে হতো মানবাত্মা মেঘেরই মতো অবয়বহীন, উপল মণির মতো যে রঙে তাদের রাঙানো যায় সেই রঙেই তারা রঙিন হয়ে ওঠে।

এতকিছু সত্ত্বেও সপ্রতিভ ওসিপের অন্তরাত্মার প্রকৃত রূপটি কি, আজও তা জানতে পারলাম না, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রয়ে গেলো।

এইসব চিন্তা যখন আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতো, নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে শহরটার দিকে তাকিয়ে আমি গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনতাম।

এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ উজানে বরফে-আটকে-পড়া একখানা বজরাকে মুক্ত করার জন্যে একদল কর্মী খালি পায়ে ভাসমান বরফের স্তর কাটছে। কুড়ুলের প্রতিটা আঘাতে ধূসর-নীল নদীর বুক থেকে ছিটকে ছিটকে উঠছে বরফের ছোট ছোট কুচিগুলো। বালুবেলা থেকেও শোনা যাচ্ছে বরফের নিচে মর্মরিত জলস্রোত। আমরা যেখানে কাজ করছি সেটা একটা সমতল। করাতে কাঠ চেরার আওয়াজ, মসৃণ হলদে তক্তার ওপর লোহার আঁকড়ি ঠোকার শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে একটানা মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনি। যেন আমাদের কর্মশ্রান্ত ম্লান ব্যথিত মনের ওপর বসন্তের স্নিগ্ধ একটা পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে।

কে যেন চেঁচিয়ে বললো, 'যাও, জার্মানদের ডেকে নিয়ে এসো। আমাদের লোকজন খুব কম।'

নদীর ওপর থেকে কার গলা শোনা গেলো, 'কি রে, কোথায় গেলি?'

'ছাখো গে হয়তো ভাটিখানায় গেলাস আঁকড়ে পড়ে আছে।'

স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে বাতাসে চওড়া নদী পেরিয়ে কণ্ঠস্বরগুলো দ্রুত কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আমাদের লোকজন দু একটা যে ভুলভাল করছে না তা নয়, তবু দারুণ উৎসাহে দ্রুত হাতে কাজ করছে। তাদের মনগুলো এখন নদীর ওপারে শহরের স্নানঘর আর গির্জায় ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করছে। বিশেষ করে সাসক দিয়েতলভ, ভায়েরই মতো ওর-ও চুলের রঙ কটা, সুন্দর স্বাস্থ্য আর দারুণ ছটফটে, মাঝে মাঝে ও প্রায়ই নদীর দিকে তাকাচ্ছে আর চাপা গলায় ভাইকে জিগেস করছে, 'তোর কি মনে হয় বরফে এখন ভাঙন ধরবে?'

গত দুদিন আগে থেকে বরফে ভাঙন ধরেছিলো। কাল থেকে জল-পুলিস নদীর ওপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করার অনুমতি দিচ্ছে না। কেবল দেবদারুর ডাল-পোঁতা চিহ্নিত-জায়গা দিয়ে লোকজন নদী পারাপার করছে। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের পায়ের চাপে ঝুপঝাপ বরফ ভেঙে পড়ার শব্দ। উত্তেজিত চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে মিসুক জবাব দিলো, 'নিশ্চয়ই, ভাঙন তো ধরেইছে।'

ভ্রূর ওপর হাত রেখে ওসিপ তীক্ষ্ণ চোখে নদীর দিকে তাকালো। তারপর মিসুককে ধমক দিলো। 'নদীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে হাত চালিয়ে কাজ করো। আর তোমাকেও বলিহারি ইনেসপেক্টর, বইয়ের মধ্যে নাক গুঁজে না থেকে তাড়াতাড়ি কাজ তোলার জন্যে আমাকে একটু সাহায্য করলে তো পারতে।'

ঘন্টা দুয়েকের মতো আর সামান্য কাজ বাকি রয়েছে। বজরাখানার সারা গা মাখনের মতো হলদে হলদে তক্তায় ভরে গেছে। বাকি শুধু মোটা মোটা লোহার পেরেক পুঁতে তক্তাগুলো আটকানো। বোয়েভ আর সানিয়াভিনের কাজ ছিলো তুরপুন দিয়ে কাঠের গায়ে গর্ত করা, কিন্তু ভুল করে গর্তগুলো ছোট হয়ে যাওয়ায় আঁকড়িগুলো ঠিকমতো কাঠের গায়ে আটকাচ্ছে না।

টুপিটা হাতে নিয়ে ওসিপ চিৎকার করে উঠলো, 'আরে অন্ধ, এটাকে কি কাজ বলে?'

সেই মুহূর্তে নদীর ওপার থেকে শোনা গেলো উন্মত্ত উল্লাস, 'ভাঙন, ভাঙন শুরু হয়ে গ্যাছে।' আর তখনই নদীর ওপর দিয়ে ভেসে এলো চাপা একটা মর্মর, দেবদারুর ডালগুলো এমনভাবে কাঁপছে যেন শূন্যে ওরা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে। খালিপায়ে লোকজনেরা বজরার ওপর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি করছে, দড়ির মই বেয়ে হুটোপুটি করে নিচে নামার চেষ্টা করছে।

নদীর এপারে যে এত লোকজন কাজ করছিলো ভাবতেও অবাক লাগে। যেন বরফের নিচে থেকে হঠাৎ সবাই গজিয়ে উঠেছে। গুলির শব্দে চমকে-ওঠা দাঁড়কাকের মতো যে যেদিকে পারছে ছুটছে। ওসিপ চিৎকার করে বলে উঠলো, 'যে যার যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে তীরের দিকে চলো। শিগগির!'

সাসক ফোঁস করে উঠলো, 'হ্যাঁ, তীরের ওপারে খ্রীস্টের পবিত্র উৎসব এখন তোমার জন্যে ঘুমোচ্ছে।'

এখন মনে হলো নদী যেমন ছিলো তেমনিই নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে, শুধু শহরটা কাঁপছে, দুলছে আর পাহাড়ের ওপর থেকে ধীরে ধীরে উজানের দিকে ভেসে চলেছে। এমন কি পঞ্চাশ গজ ব্যাপী ধূসর এই বালির চড়াটাও নড়েচড়ে হঠাৎ যেন চলতে শুরু করেছে।

ওসিপ আমাকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'এখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছো কি? ছোটো, ছোটো শিগগিরিই, ছোটো!'

এতে আমি যেন বিপদের গন্ধ পেলাম, বুকের মধ্যে বয়ে গেলো আতঙ্কের

হিমেল একটা স্রোত। মনে হলো আমার পায়ের নিচে তুষার যেন নড়ছে। তবু ইতিমধ্যে বোয়েভ, বুড়ো সৈনিক, মোকে বুদেরিন আর দিয়েতলভ দুই ভাইরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে, বালিয়াড়ির বুকে শীতের পাতা-ঝরা সেই রিক্ত উইলো গাছটার নিচে নিজেকে কোন রকমে টানতে টানতে নিয়ে এলাম। আমার ঠিক পাশে পাশেই ক্রুদ্ধ শাপান্ত করতে করতে ছুটছিলো লেয়নকা। পেছন থেকে ওসিপ চিৎকার করে ওকে বারণ করলো, 'এত চেঁচিও না, নেতিভ।'

'কিন্তু, সর্দার···'

'কিচ্ছু ভেবো না। যা হবার তা হবেই।'

'বলা যায় না, হয়তো দু একদিনের জন্যে আমরা এখানে আটকেও পড়তে পারি।'

'আটকে পড়লে আর কি করা যাবে।'

'কিন্তু আমাদের ইস্টারের কি হবে।'

'এবছর তোমাদের বাদ দিয়েই ইস্টার পালন করা হবে।'

বালির ওপর বসে সৈনিক বুড়ো পাইপ ধরালো। 'আচ্ছা ভীতু তো সব! এখান থেকে পঁয়ত্রিশ গজও নয়, অথচ এমন করছো যেন সব ভূতে পেয়েছে।'

মোকে বললো, 'তুমিই কিন্তু প্রথম দৌড়েছিলে।'

বুড়ো তার কথায় কান দিলো না। 'আর তোমাদের ভয়টাই বা কিসের? একদিন প্রভু যিশুকেও তো মরতে হয়েছিলো।'

লেয়নকা ফোড়ন কাটলো, 'উনি কিন্তু আবার জেগে উঠেছিলেন।'

বোয়েভ ওকে ধমক দিলো। 'চুপ কর্ হতভাগা, তোর জ্ঞানের বহর জানতে আমাদের আর কারুর বাকি নেই।'

বুড়ো বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো, 'তাছাড়া পুনরুত্থানের দিন শুক্কুর বার নয়, রোববার।'

নীল মেঘের ফাঁকে হঠাৎ বসন্তের প্রথম সূর্যটা জ্বলে উঠলো, তুষারে ঝলমল করে উঠলো তার দীপ্তি। চোখের ওপর হাত রেখে ওসিপ নদীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙন কমে যাবে।'

সাসক রেগে উঠলো, 'ততক্ষণে আমাদের উৎসবটাও মাঠে মারা যাবে।'

মোরদ্‌ভিয়ান তরুণ লেয়নকার দাড়ি-গোঁফহীন কচি মুখটাও রাগে থমথম করছে। 'হ্যাঁ, খাবার নেই, টাকাকড়ি নেই, কুকুরের মতো খালি পেটে আমাদের এখানে চুপচাপ পড়ে থাকতে হবে, ওপারে ওরা মজ্জাসে ফুর্তি মারবে।'

ওসিপ এতক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলো, এবার উদাস স্বরে জবাব দিলো, 'প্রয়োজন যেখানে বড়, খিদেতেষ্টা সেখানে কিছুই নয়। বজরা-টাকে যদি তুষারের হাত থেকে বাঁচাতেই না পারলুম, তাহলে আসাটা কিসের জন্যে ?'

'ভারি বয়েই গেলো। বজরাটা কি আমাদের সম্পত্তি ?'

'বোকার মতো তর্ক কোরো না।'

'ওটাকে অনেক আগেই মেরামতির কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিলো।'

বুড়ো সৈনিক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। 'মাথামোটা আর কাকে বলে।'

বজরার ওপর থেকে একদল লোক চেঁচিয়ে কি যেন বলছিলো, আর নদীর বুক থেকে উঠে আসছিলো এক ধরনের হিমেল নিঃস্বরণ। চারদিক নিস্তব্ধ নিথর, দেবদারুর ডালগুলো ওলোট পালোট হয়ে গেছে। সব কিছুকে কেমন যেন অন্যরকম আর প্রত্যাশিত চাপা উত্তেজনায় থমথমে মনে হচ্ছে।

তরুণদের একজন অসহায়ের মতো করুণ স্বরে প্রশ্ন করলো, 'ও ওসিপ খুড়ো, এখন আমরা কি করবো ?'

ওসিপ অন্যমনস্ক হয়ে জিগেস করলো, 'কি বল্লে ?'

'জিগেস করছি আমরা এখন কি করবো ? হাত পা গুটিয়ে কি শুধু চুপচাপ বসে থাকবো ?'

বোয়েভ তার স্বভাবসুলভ খনা গলায় জবাব দিলো, 'ঈশ্বর তোমাদের তাঁর পবিত্র পরব-উৎসবে যোগ দেবার অনুপযুক্ত ভেবে বাতিল করে দিয়েছেন।'

বুড়ো সৈনিক তার বন্ধুকে সমর্থন করে তামাকের নলটা নদীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'নদী পেরিয়ে শহরে যেতে চাও ? বেশ তো, যাও না। ভাগ্যবান হলে বরফের নিচে তলিয়ে যাবে, আর তা নাহলে পুলিস এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন একেবারে জেলে গিয়ে পরব-উৎসব উপভোগ করবে।'

মোকে বুদেরিন ওকে সমর্থন করলো, 'তুমি ঠিক বলেছো, ভাই !'

সূর্য মেঘের আড়ালে ঢেকে গেছে। নদীটাকে এখন বিষণ্ণ আর শহরটাকে স্পষ্ট দেখাচ্ছে। তরুণেরা বিমর্ষ চোখে সেদিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

স্বভাবতই আমি বিষণ্ণ আর অস্বস্তি বোধ করছিলাম। একদল লোক বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবলে বা সমবেত জনতা সুনির্দিষ্ট একটি ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারলে যেমন বিরক্তি লাগে, ঠিক তেমনি একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো সবাইকে ছেড়ে একা একা তুষারের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাই।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার মতো ওসিপ চকিতে উঠে দাঁড়ালো, মাথা থেকে টুপি খুলে শহরের দিকে ফিরে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলো, তারপর শান্ত সহজ অথচ আদেশের সুরে বললো, 'ঠিক হ্যায়, ভাইসব ; চলে এসো ! ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন।'

'কোথায় ?' সাসক লাফিয়ে উঠলো। 'শহরে ?'

'তা ছাড়া আবার কোথায় ?'

একমাত্র বুড়ো সৈনিকই উঠলো না, কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'আমরা ডুবে যাবো।'

'তা হলে এখানেই পড়ে থাকো।'

ওসিপ সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। 'নিজেদের সব চাঙ্গা করে নাও, ভাইসব। ঝটপট।'

সবাই একসঙ্গে ভিড় করলো। যন্ত্রপাতির ঝোলাটা বোয়েভ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। 'যাবার যখন আদেশ এসেছে, সবাইকেই যেতে হবে। কিন্তু যে নিজে মুখে আদেশ দিয়েছে সেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক সবার আগে।'

ওসিপকে এখন কেমন যেন ছেলেমানুষ আর অনেক বেশি তৎপর মনে হচ্ছে। গোলাপী চিবুক থেকে ধূর্ত আর দুষ্টুমির ভাবটা মুছে গেছে। কালো চোখের মণিদুটো হয়ে উঠেছে আরও তীক্ষ্ণ। অলস পদক্ষেপের পরিবর্তে এসেছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের একটা ভঙ্গি।

'প্রত্যেকেই সঙ্গে একটা করে তক্তা নিয়ে নাও এবং সামনের দিকে শক্ত করে ধরে রাখো। ঈশ্বর না করুন, কেউ যদি পড়ে যায়, তক্তার দু ধার বরফে আটকে যাবে। আর ফাটলগুলো পেরিয়ে যেতেও সাহায্য করবে। তোমাদের কারুর কাছে দড়ি আছে নাকি ? এই যে নেতিভ, সমান্তরাল-মাপার কাঠিটা দাও তো। কি, তোমরা সব প্রস্তুত তো ? বেশ, আমি সবার আগে যাবো, আমার পেছনে···কে সবচেয়ে ভারি ? হ্যাঁ, সানিয়াভিন, তুমি থাকবে আমার ঠিক পেছনে। তারপর মোকে, বুদেরিন ; তারপর লেয়নকা, তারপর বোয়েভ, তারপর মিসুক, তারপর সাসক। ম্যাক্সিমিচই সবচেয়ে হালকা, ও থাকবে সবার পেছনে। আর তোমরা সবাই টুপি খুলে পবিত্র ঈশ্বরজননীর কাছে প্রার্থনাটা সেরে নাও। আরে সূর্যিঠাকুর যেন আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে !'

দেখতে দেখতে ধূসর আর বাদামী রঙের মাথাগুলো সব খালি হয়ে গেলো,

আর ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্য তাদের ওপর এক ঝলক কিরণ বর্ষণ করে আবার মেঘের আড়ালে চলে গেলো।

'ভাইসব, এবার একে একে চলে এসো।' ওসিপের কণ্ঠস্বরে লেগেছে নতুন একটা সুরের আমেজ। 'তোমরা সবাই আমার পায়ের দিকে নজর রাখবে, কেউ হুড়োহুড়ি করবে না, আর একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে হাঁটবে। নাও, এবার শুরু করো।'

টুপিটা পকেটে পুরে মাপ-কাঠিটা আঁকড়ে ধরে ওসিপ সাবধানে বরফের ওপর দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এগিয়ে চললো। আর তখনই তীর থেকে আমাদের পেছনে কে যেন পরিত্রাহি চিৎকার করে বললো, 'আরে বোকা-হাঁদারা, কোথায় চল্লি সব?'

'ঘাবড়িও না বন্ধু, সোজা চলে এসো···কেউ পেছন ফিরে তাকিও না।'

'আচ্ছা বুদ্ধির ঢেঁকি তো সব!' আবার শোনা গেলো সেই কণ্ঠস্বর। 'এই বেলা বরং ফিরে আয়।'

'না না, কেউ ওদিকে কান দিও না।' ওসিপ আদেশের সুরে বললো। 'মনে রেখো আমরা ঈশ্বরের পবিত্র পরব-উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছি।'

পুলিসের বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেলো। বুড়ো সৈনিক তার মনের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারলো না। 'এবারে বোঝো ঠেলা! ওপারের সবাই পুলিসকে জানিয়ে দেবে আমরা নদী পেরিয়েছি, আর যদি না ডুবে মরি তো জেলে পড়ে পচতে হবে। আমি বাবা কোন দায়িত্ব নিচ্ছি না।'

বুড়োর প্যানপ্যানানিতে ওসিপ কান দিলো না। ওর ঋজু কণ্ঠস্বর দড়িতে-বাঁধা-সারিবদ্ধ-মানুষের মতো সবাইকে টেনে নিয়ে চললো।

'দেখো দেখো, চোখ কান খোলা রেখে সবাই পা ফ্যালো।'

নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে আমাদের মিছিল টলমলে পায়ে এগিয়ে চলেছে। দলের সবচেয়ে পেছনে থাকায় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তৎপর ওসিপের রূপোলী মাথাটা কেমন বরফের ওপর দিয়ে খরগোশের মতো টপকে টপকে এগিয়ে চলেছে। আর তার পেছনে এক সারিতে ঠিক যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা কালো কালো মূর্তি অনিশ্চিত ভাবে তাকে অনুসরণ করছে। সবায়ের মাথা নুয়ে পড়েছে, যেন ওরা পাহাড়ে উঠছে আর যে কোন মুহূর্তে পা পিছলে পড়ে যাবার ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে।

আমাদের পেছনে লোকজনরা চিৎকার করছে, স্পষ্ট অনুমান করতে পারছি

ওরা সবাই তীরে সমবেত হচ্ছে। একটা কথাও আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না, কেবল কানে তালা-লাগানো একটা তীব্র গর্জন শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের এই সতর্ক অভিযান কেমন যেন ক্লান্তিকর আর যান্ত্রিক মনে হলো। কেননা স্বাভাবিক ভাবে আমি দ্রুত হাঁটায় অভ্যস্ত। এখন মনে হচ্ছে আধো-ঘুম-আধো-জাগরণের মধ্যে আমি যেন ডুবে রয়েছি। বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে, অপরের ব্যক্তিত্ব ছাড়া নিজের সম্পর্কে আর কিছুই ভাবা যাচ্ছে না। ফলে সেই সঙ্গে আবার অন্য সবকিছু নির্ভুল ভাবে দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি। আমার পায়ের নিচে ধূসর-নীল ভাসমান জমাট তুষার, দীপ্ত ঝলকে চোখ যেন ঝলসে দিচ্ছে। এখানে ওখানে বড় বড় বরফের চাঁই ভাঙছে, জলস্রোতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছুটছে, কিংবা একরাশ ভাঙা কাচের টুকরোর মতো ঢিপি হয়ে উঠছে। পায়ের নিচে চিড়-খাওয়া প্রতিটা নীলচে ফাটল থেকে উঠছে হিমেল শিহরণ, আর প্রতি পদক্ষেপে ভিজে বুট-জোড়াটা সপসপ করে উঠছে, পড়ছে। বোয়েভ আর বুড়ো সানিয়াভিন, দুজনেই সমানে গজগজ করছে, যেন দুটো বাঁশিকে কে একই সঙ্গে বাজিয়ে চলেছে।

'আমি বাবা কোন দায়িত্ব নিচ্ছি না।'

'আমিও না।'

'আমাকে আসতে বলা হয়েছে তাই এসেছি। ব্যাস, ফুরিয়ে গেলো।'

'নিশ্চয়ই। আমারও ওই এক মত।'

'কেউ একজন হুকুম করলো, আর অন্যজন যদি তার চেয়ে হাজার গুণও বেশি বুদ্ধি-বিবেচক হয়, তবু তাকে সে-হুকুম তামিল করতে বাধ্য করা হলো।'

'আজকের দিন বুদ্ধি-বিবেচনার কথা বাদ দাও। আসলে যার গলা চড়া, সেই সব থেকে বড়।'

ওসিপ এখন তার চামড়ার বহির্বাসটা কোমরবন্ধের মধ্যে গুঁজে নিয়েছে। ফলে ওর ধূসর রঙের হালকা পা-জামাটা এমন ভাবে ফুলে উঠছে যেন ওর সামনে কেউ আছে যে ইচ্ছে করে ওকে সোজাসুজি কিংবা সংক্ষিপ্ত পথে যেতে বাধা দিচ্ছে, আর ওসিপ যেন সে নির্দেশ অমান্য করে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে, কখনও যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথেই পেছিয়ে বরফের ওপর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে টলমলে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ওসিপের গলার স্বর অনেক নরম হয়ে গেছে, আর দূর থেকে ভেসে-আসা ঘন্টা-ধ্বনির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে মিশে যাচ্ছে যে শুনতে বেশ ভালোই লাগছে!

নদীর প্রায় মাঝামাঝি যখন এসেছি, পায়ের নিচে বরফ ভাঙার অশুভ শব্দ শুনতে পেলাম! অসহায়ের মতো আমার পা কাঁপছে, আমি দোলা খাচ্ছি। পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি বেঁকে হাঁটুর ওপর ভর রাখছি। নদীর উজানের দিকে চোখ পড়তেই ভয়ে বুক আমার শুকিয়ে গেলো, গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। মনে হলো ধূসর বরফের চাঁইগুলো যেন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মসৃণ সমতল থেকে তীক্ষ্ণ কোণগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে একরাশ ভাঙা কাচের টুকরোর ওপর দিয়ে কারা যেন ভারি পায়ে মচমচ শব্দে হেঁটে চলেছে।

আমার চারপাশে শিস দেওয়ার মতো ঘূর্ণিজলের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেবদারুর বিরাট একটা ভাঙা ডাল কোথায় যেন সশব্দে আছড়ে পড়লো। আমার সঙ্গী-সাথীরা চিৎকার করছে, এক জায়গায় জোট বাঁধছে। সেই দেখে ওসিপ চাপা উত্তেজনায় আতঙ্ক-কাঁপা গলায় হাঁ হাঁ করে উঠল।

'সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও সব! যে যার আলাদা আলাদা, ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াও। একখুনি! উঁহু, কেউ ভয় পেও না!'

কথাটা বলেই ও এমন ভাবে লাফাতে লাগলো যেন ওকে ভীমরুলে তাড়া করেছে। আর মাপ-কাঠিটা বন্দুকের মতো এমনভাবে বাগিয়ে ধরে ও বরফের ওপর দিয়ে এগুতে লাগলো, যেন অদৃশ্য কোন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। সারা শহরটা মনে হচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে যেন কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে। আমার পায়ের নিচে বরফের চাঁইগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে, হাঁটু পর্যন্ত জলে ভিজে গেছে। আমি লাফিয়ে উঠে অন্ধের মতো দ্রুত ওসিপের দিকে ছুটে যাচ্ছি।

'এদিকে কোথায় আসছো?' মাপকাঠি উঁচিয়ে ওসিপ জোরসে এক ধমক দিলো। 'যেখানে আছো ওইখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।'

ওসিপকে এখন আর আদৌ ওসিপের মতো দেখাচ্ছে না। অদ্ভুতভাবে ওর বয়েসটা যেন অনেক কমে গেছে, নাল চোখদুটো ধূসর হয়ে গেছে, আর ওকে লম্বা দেখাচ্ছে। পাদুটো একত্র করে নতুন-তৈরি পেরেকের মতো সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভীষণ ভাবে চীৎকার করে ও সবাইকে মানা করলো, 'কেউ একসঙ্গে থেকো না বা ভিড় কোরো না, তাহলে কিন্তু আমি মাথা ভেঙে দেবো।' ও আবার আমার দিকে মাপকাঠি উঁচালো। 'তোমার কি হয়েছে বলো তো?'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কিসের ভয় ?'

'ডুবে যাবার।'

'থাক থাক, খুব হয়েছে।'

বকেঝকে পরমুহূর্তেই আবার আমার দিকে ফিরে মোলায়েম স্বরে বললো, 'ডোবে শুধু বোকারাই। এখন মনে সাহস নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসো।'

আবার মাথা তুলে বুক চিতিয়ে ও সবাইকে নতুন করে উৎসাহ দিলো।

তুষারে ফাটলের পর ফাটল ধরছে, বরফ ভেঙে ধীরে ধীরে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য একটা শক্তি জেগে উঠেছে আর নদীর দু তীর ছিঁড়েখুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার কিছুটা তখনও সুদৃঢ়! কিন্তু আমাদের বিপরীত দিকটা ধীরে ধীরে উজানে ভেসে চলেছে, অচিরেই কোথাও গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

এর সঙ্গে ভেসে চলেছে আমার সত্তা, যাকিছু চেতনাবোধ। হতাশায় হৃদপিণ্ডটা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, বিবশ হয়ে আসছে সারা শরীর। আকাশে ভেসে চলেছে রক্তিম মেঘমালা, ভাঙা তুষারকণায় ঝলসে উঠছে তার প্রতিফলন, যেন চারদিক থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। যেন বসন্তের নবজন্মে স্পন্দিত হয়ে উঠছে সারা পৃথিবী, নিজেকে প্রসারিত করছে, নিমজ্জিত করছে, আবার ওপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। আর তার বুকের ভাঙা হাড়-গোড়ের মধ্যে দিয়ে টগবগে রক্ত-শিরার মতো প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে এই নদীটা।

নিস্তব্ধ আর সীমাহীন এই বিশালতা যেন আমার বুকে ভারি বোঝার মতো নেমে আসছে, যেন নির্লজ্জের মতো ঠাট্টা করতে করতে বলছে, 'এবার আমি যদি পাহাড় আর নদীর ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলি—দাঁড়া, আমি আসছি, তাহলে কি হবে ?'

শহরের দিক থেকে বিষণ্ণ ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। আমার মনে পড়লো আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই ধ্বনি 'পুনরুজ্জীবন' উৎসবের উল্লাসে মুখর হয়ে উঠবে। মনে মনে ভাবলাম 'আহা, এই ধ্বনি শোনার জন্যে আমরা যেন চিরটা কাল বেঁচে থাকি।'

সাতটা কালো মূর্তি আমার চোখের সামনে নড়ছে, তুষারের ওপর দুলছে। হাতের তক্তাগুলো ওরা দাঁড় টানার মতো নাড়ছে। আর ওদের সামনে বুড়ো সৈনিক তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে, অনর্গল বকবক করছে। ওকে মনে হচ্ছে অদ্ভুত মজার লোক সেই সেন্ট নিকোলাসের মতো।

'ভাইসব, যে যার নিজের ওপর নজর রাখো !'

নদী আগের চেয়ে উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তার মেরুদণ্ড আমাদের পায়ের চাপে তিমির পিঠের মতো কাঁপছে, ডুবছে। তার মসৃণ পিছোল ত্বক ক্ষণে ক্ষণে ডুবে হিমেল জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে পায়ের পাতা।

হ্যাঁ, আমরা যেন সংকীর্ণ একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে অতল কোন গহ্বর পার হচ্ছি। তার চাপা কলকলানির শব্দে মনে পড়ছে অতল গভীরতা। একবার পিছলে পড়লে কোথায় তলিয়ে যাবো, অতল অন্ধকারে কেমন করে থেমে যাবে বুকের স্পন্দন, কথাটা ভাবতেই সারা শরীর আমার শিউরে উঠলো। চোখের সামনে আমি যেন জলে-ডোবা কোন মৃত মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সারা শরীর ফুলে ঢোল, মাথার খুলিটা ক্ষয়ে গেছে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা কাচের মতো স্বচ্ছ দুটো চোখ, আঙুলগুলো টানটান, হাতের তেলোদুটো জলে ক্ষয়ে কুঁচকে গেছে।

সবার আগে পড়লো মোকে বুদেরিন। অথচ ওই এতক্ষণ সবচেয়ে নীরবে আর শান্ত পায়ে এগুচ্ছিলো লেয়নকার ঠিক পেছন পেছন। হঠাৎ মনে হলো কে যেন ওর পা দুটো ধরে টেনে আবার চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বরফের ওপর শুধু ওর মাথা আর কাঁধটুকু দেখা যাচ্ছে, তক্তাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছে শক্ত করে।

'ধরো ধরো, শিগগির ধরো।' ওসিপ চিৎকার করে উঠলো। 'উহু, সবাই একসঙ্গে নয়। একজন কি দুজন গিয়ে ওকে টেনে তুলতে সাহায্য করো।'

লেয়নকা আর আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম,মোকে বুড়ো বাধা দিলো। 'না না, তোমরা এগিয়ে যাও। কিচ্ছু ভেবো না, আমি নিজেই সামলে নিচ্ছি।'

সত্যিই তাই, কারুর সাহায্য না নিয়েই ও নিজেকে বরফের মধ্যে থেকে টেনে তুললো। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'এাঃ, ভিজে একেবারে গোবর হয়ে গেছি! তাহলে সত্যিই আমি ডুবে যেতে পারতুম!'

দাঁতের ঠকঠক শব্দ আর ঠোঁট দিয়ে ভিজে গোঁফ চাটার ভঙ্গিতে ওকে এখন দেখাচ্ছে শান্তশিষ্ট পোষ-মানা বড় একটা কুকুরের মতো। আমার মনে পড়লো মাসখানেক আগে হঠাৎ ও কুড়ুলে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেলেছিলো। কাটা আঙুলটা তুলে নিয়ে, সেটার নখ তখন দ্রুত নীল হয়ে যাচ্ছিলো, অনেকক্ষণ ও মন দিয়ে দেখলো। তারপর যেন নিজেই অপরাধ করে ফেলেছে এমনিভাবে শান্ত স্বরে বললো, 'কতবার যে তোকে জখম

করেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া অনেকদিন থেকেই তুই অকেজো হয়ে পড়েছিলি···চল, আজ আমি তোকে কবর দেবো।'

কাটা আঙুলটা আগে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে তবে ও হাতে ন্যাকড়া বাঁধতে গিয়েছিলো।

এর পরেই ডুবলো তোতলা বোয়েভ। ও ছিলো মোকের ঠিক পেছনে। যেন নিজের মনে ফন্দি এঁকে ও ইচ্ছে করে ডিগবাজি খেলো। তারপরেই বরফের ফাটলের মধ্যে নিয়ে মাথা তুলে তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করলো, 'ডুবে গেছি! বাঁচাও বাঁচাও, ভাইসব, বাঁচাও!'

ভয়ে ও এমন জড়সড়ো হয়ে গিয়েছিলো যে ওকে টেনে বার করতে লেয়নকা প্রায় মারাই পড়েছিলো। আর একটু হলে সে পিছলে পড়ে যেতো।

'উঃ, খুব বরাত জোর, নইলে আজ রাতেই নরকের শয়তানের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতো।' বোয়েভকে এখন আগের চেয়ে অনেক রোগা আর বাঁকা দেখাচ্ছে।

পর মুহূর্তেই ও আবার পড়লো, আবার পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিলো।

'চুপ করো, রামছাগলের মতো অমন চেঁচিও না।' মাপকাঠি উঁচিয়ে ওসিপ বোয়েভকে ভয় দেখালো। 'আর শোন, তোমরা সবাই কোমরবন্ধ খুলে পকেট-গুলো উলটে নাও। এতে হাঁটতে অনেক সুবিধে হবে।'

প্রতি পায়ে পায়ে হাঁ-মুখ নীল ফাটলগুলো যেন আমাদের গিলতে আসছে। ভিজে জামা জুতো ভারি হয়ে গায়ের সঙ্গে এমন ভাবে সেঁটে রয়েছে যে হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলতে হচ্ছে।

ওসিপ যেন তুষারের ফাটলগুলো আগে থেকেই অনুমান করতে পারছিলো। তাই এক তুষারস্তর থেকে অন্য তুষারস্তরে খরগোশের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হবার পর ও প্রায়ই পেছন ফিরে আমাদের সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে, 'এখান দিয়ে পার হও। দেখো, খুব সাবধানে।'

ও যেন ঠিক নদীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। নদী ওর ছোট্ট দেহটার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে, আর ও অনায়াস ভঙ্গিতে তাকে কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও-ই যেন তুষারপ্রবাহকে বহে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে আর বড় বড় জমাট তুষারস্তরকে লাথি মেরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

'ছেলেরা, এটার ওপর সাবধানে পা রাখো। উঁহু, একটুও ঘাবড়িও না।'

লেয়নকা তো একবার আনন্দের আতিশয্যে বলেই ফেললো, 'এই হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ। কোন ভুলচুক নেই···কেমন সাহস, ওসিপ খুড়োর দিকে একবার তাকিয়ে ছ্যাখো!'

আমরা যত তীরের দিকে এগুচ্ছি, পাতলা তুষারস্তর ততই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আর আমরাও ধুপধাপ পড়ছি। শহর এখন আমাদের থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। আমরা শিগগিরই ভলগায় গিয়ে পড়বো। সেখানের তুষারস্তর এখনও অনড়, ফলে তার নিচে চাপা পড়তে আমাদের বেশি সময় লাগবে না।

বাঁ দিকে সন্ধ্যার ছায়াঘন নীল কুয়াশার দিকে তাকিয়ে লেয়নকা ফিস-ফিস করে বললো, 'হয়তো আমাদের এবার সত্যিই বরফের নিচে চাপা পড়ে মরতে হবে।'

হঠাৎ, আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি যেন দয়াপরবশ হয়েই বিরাট একটা তুষার-স্তর প্রচণ্ড শব্দে তীরে গিয়ে ভিড়লো। ওসিপ সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলো। 'ছোটো ছোটো, বাঁচতে চাও তো সবাই ছোটো।'

লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আমি বরফের ওপরেই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম, সর্বাঙ্গ জলে ভিজে গেলো। যখন কোন রকমে উঠে বসলাম, দেখলাম সাত-জনের পাঁচজনই ঠেলাঠেলি করে ওপরে উঠে গেছে। কিন্তু লেয়নকা আবার ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো, আমাকে হাত ধরে টেনে তুললো। এবার আমরা ওসিপকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

ওসিপ মানা করলো। 'আচ্ছা গাধা তো! যাও যাও, তীরে গিয়ে ওঠো।'

অদ্ভুতভাবে হাঁ হয়ে থাকা ওর মুখটা কাঁপছে, চোখদুটো বিবর্ণ, ম্লান।

আমি বললাম, 'তা হয় না। আগে ওঠো।'

'পারছি না। মনে হচ্ছে পাটা বোধহয় ভেঙে গ্যাছে।' 'মাথাটা ওর বুকের কাছে নুয়ে পড়েছে।

দুজনে কোনরকমে ধরাধরি করে ওকে তীরের দিকে বয়ে নিয়ে চললাম। আর ও আমাদের দুজনের কাঁধের ওপর ভর রেখে দাঁতের ঠকঠকনি বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 'আঃ, আমরা সবাই ডুবে যেতে পারতুম! কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উনি তা চাননি। তিনজনের দেহের ভার বরফ সইতে পারবে না, দেখে দেখে শক্ত জায়গার উপর পা ফ্যালো। তোমরা বরং আমাকে ছেড়ে দিলেই পারতে।' পরমুহূর্তেই আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে সর্দার ঠাট্টা

করলো, 'তোমার হিসেবের খাতাটা জলে ভিজে গ্যাছে ইনেসপেক্টর, আমার মনে হয় ওটা আর কোন কাজেই লাগবে না।'

তীরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় তুষারস্তরটা, যেটা একটু আগেই একটা ছোট নৌকাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলো, এখন জলের দিক থেকে তার বিরাট একটা অংশ প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে চলে গেলো। লেয়নকা হালকা সুরে বললো, 'যাক, এটার প্রয়োজন তাহলে এতক্ষণে মিটলো।'

জলে ভিজে, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় জমে, বিষণ্ণ মনে কাঁপতে কাঁপতে আমরা জনতার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। বোয়েভ আর বুড়ো সৈনিক ইতিমধ্যেই সরবে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। আমরা ওসিপকে একটা তক্তার ওপর শুইয়ে দিতেই ও সউল্লাসে বলে উঠলো,'ওহে বন্ধুরা, ম্যাক্সিমিচের হিসেবের খাতা খতম, ওটা জলে ভিজে জাব হয়ে গ্যাছে।'

যেহেতু ভিজে খাতাটা আমার কোটের নিচে থান ইটের মতো ভার মনে হচ্ছিলো, সবার অলক্ষ্যে ওটাকে আমি পকেট থেকে টেনে বার করে নদীর জলে ছুঁড়ে দিলাম, আর ওটা কোলা ব্যাঙের মতো টুক করে ডুবে গেলো।

দিয়েতলভ ভায়েরা আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটলো পাহাড়ের গায়ে ভাটিখানার দিকে। 'তোমরা থাকো, আমি চল্লুম।'

'এই দাঁড়া, আমিও যাবো।'

সাধুর মতো লম্বা দাড়ি, ডাকাতের মতো বড় বড় চোখ, দীর্ঘকায় একজন বুড়ো গজ গজ করতে লাগলো, 'শান্তিপ্রিয় মানুষদের এভাবে বিরক্ত করার জন্যে তোমাদের বেদম মার লাগানো উচিত।'

জামা-কাপড় বদলাতে বদলাতে বোয়েভ জিগেস করলো,'কি ভাবে তোমাদের বিরক্ত করলুম?'

এবার বুড়ো সানিয়াভিন এগিয়ে এলো, 'আর ক্রিশ্চান হওয়া সত্ত্বেও জলে ডুবে মরতে দেখে তোমরাই বা আমাদের কি সাহায্যোটা করলে শুনি?'

'আমরা আর তোমাদের কি সাহায্য করতে পারতুম বলো?'

পাদুটো সামনের দিকে টানটান করে মেলে দিয়ে ওসিপ এতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ছিলো, এবার কোটের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে ম্লান স্বরে বললো, 'ইস্, একদম ভিজে জাব হয়ে গেছি! এখনও এক বছর হয়নি, এর মধ্যেই কোটটা মাটি হয়ে গেলো।'

হঠাৎ ও যেন আবার সেই আগেরই মতো ছোটখাটো মানুষটি হয়ে গেছে, বরফের মতো ক্রমশ মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু কোনরকমে কনুইয়ে ওপর ভর দিয়ে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে রাগতস্বরে চেঁচিয়ে বললো, 'আরে বোকা হাঁদারা, এখানে সব বসে হাঁ করে দেখছো কি? যাও যাও, হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গির্জেয় যাও। দেখো, তোমাদের ছাড়াই আবার ঈশ্বরের পবিত্র পুনরুত্থান-পরব যেন না পালন করা হয়। আমি তো অর্ধেক মারাই পড়েছি, জামা-কাপড় গোল্লায় গ্যাছে, তবু তোমরা মিছিমিছি দেরি কোরো না।'

সবাই যে যার জুতো খুলে জামা-কাপড় নিঙড়ে নিলো, দু চারটে হাসি-তামাশাও করলো। ওসিপ রেগে গেলো। 'আরে মুখ্যু, যদি পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে চাও তো সব চানঘরে যাও, ওরা ওখানে তোমাদের খুঁজে বার করতে পারবে না।'

দর্শকদের মধ্যে থেকে কে যেন শান্ত স্বরে বললো, 'পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে।'

বোয়েভ ওসিপকে ধমকালো, 'তোমার আসল মতলবটা কি বলো তো?'

ওসিপ অবাক হয়ে গেলা। 'মতলব! আমার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার।'

'মানে! কি বলতে চাইছো তুমি?'

'বলতে চাইছি তুমিই আমাদের নদী পার হয়ে আসতে হুকুম দিয়েছিলে।'

'শুধু কি আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' এবার বুদেরিন শান্ত অথচ তীক্ষ্ণস্বরে কথাটা বললো। মোরদ্ভিনিয়ান তরুণও তাকে সমর্থন করলো। চাপা বিষণ্ণ স্বরে লেয়নকা বললো, 'হ্যাঁ ওসিপ খুড়ো, তুমি। ঈশ্বর সাক্ষী আছেন। এরই মধ্যে তুমি ভুলে সব গ্যালে!'

বুড়ো সৈনিক সানিয়াভিন চড়া গলায় বললো, 'তুমিই প্রথম এ বুদ্ধি সবার মাথায় ঢুকিয়েছিলে।

'ভুলে ও যায়নি!' বোয়েভ ঘৃণায় নাক কোঁচকালো। 'কি করে তোমরা বলছো যে ও ভুলে গেছে? আসলে ও নিজের দোষটা সবার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে! ও এখন সেই মতলবেই আছে।'

সেই মুহূর্তে ওসিপ কোন জবাব দিতে পারলো না, ভ্রূদুটো কুঁচকে অর্ধ-নগ্ন

মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ওর ঠোঁটের কোণের ম্লান হাসিটুকু আনন্দ না বেদনার, স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

'ঠিক আছে। তোমরা যদি খুশি হও, তাহলে মতলবটা আমার একারই।'

'বাঃ, এই তো ঠিক বলেছো!' বুড়ো সৈনিক সগর্বে মাথা নাড়লো।

ক্ষতবিক্ষত, গর্জমান, বিক্ষুব্ধ নদীর দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে ওসিপ বললো, 'কেমন করে হলো যে আমরা নদীতে ডুবে মরলাম না! সে কথা বললে তোমরা এখন আর বুঝতে পারবে না, অবশ্য না বোঝাই ভালো! যাগ্‌গে···আমার ওপর রাগ কোরো না ভাই। উৎসবের দোহাই, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। নিতান্ত মুখ্যু আমি···হ্যাঁ, আমিই তোমাদের নদী পেরুবার মতলব দিয়েছিলুম।'

'কিন্তু আমরা যদি ডুবে মরতুম তখন তুমি কি বলতে?' বোয়েভ গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করলো।

ওসিপের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এই দুর্ধর্ষ নেতা যে একটু আগেও অমিত উৎসাহে, নিপুণতায় আমাদের পরিচালনা করেছিলো, তার হঠাৎ কি হলো যে এমন নেতিয়ে পড়লো! মানুষকে শিক্ষা দেবার মতো নিপুণতা এই কর্তৃত্ব এখন আমরা কোথায় পাবো? মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। কেমন যেন অস্বস্তিকর একটা ব্যথায়, অনুকম্পায় সারা বুক আমার কান্নায় কান্নায় ভরে উঠলো। আমি ধীরে ধীরে ওসিপের পাশে এসে বসলাম, কোমল স্বরে বললাম, 'তুমি কিছু ভেবো না সর্দার, দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আঙুলে দাড়ি চোমরাতে চোমরাতে ওসিপ আড় চোখে আমার দিকে তাকালো। 'কি ঘটেছে না ঘটেছে সে তো তুমি নিজে চোখেই সব দেখেছো। এই রকমই হয়···'একটু বিরতির পর ও আবার ম্লান ঠোঁটে হাসলো, 'অবশ্য আমার পক্ষে এ বেশ ভালোই হলো, কি বলো?'

সন্ধ্যার আবছা আঁধারে আকাশে মাথা তুলে সারি সারি গাছগুলো কালো কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া পাহাড়টাকে মনে হচ্ছে যেন গুড়ি মেরে এগিয়ে আসা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাট কোন জন্তু। গভীর ক্ষতের মতো পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা বাড়িগুলোর পেছন থেকে উঁকি মারছে বসন্ত সন্ধ্যার নীলাভ ছায়া। মনে হচ্ছে গিরিখাদের লালচে থাবা উঁচিয়ে জন্তুটা যেন নদীতে জল খাবার জন্যে ঝুঁকে রয়েছে।

'অন্ধকার নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে তুষার ভাঙার প্রচণ্ড গর্জন। জলের স্রোত আরও বাড়ছে। কখনও কখনও চলকে লাফিয়ে উঠে তীর থেকে মাটি ধসিয়ে নিয়ে আবার বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যাচ্ছে। বাতাসে এমন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ভয়ঙ্কর কোন হিংস্র জন্তু কার হাড়-মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে লম্বা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে।

শহর থেকে ভেসে আসছে বিষণ্ণ অথচ মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনি। দূরত্বের জন্যে তা যেন আরও মিষ্টি শোনাচ্ছে।

এবার বোতল হাতে দিয়েতলভ ভাইদের উচ্ছল দুটো কুকুর ছানার মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেলো। ওদের ঠিক পেছনেই রয়েছে ছাইরঙের লম্বা কোট-পরা একজন পুলিস সার্জেন্ট, সঙ্গে দুজন প্রহরী।

'হা, ভগবান!' হাঁটু আঁকড়ে ওসিপ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো।

পুলিস সার্জেন্টকে এগিয়ে আসতে দেখে জনতা একটু দূরে সরে দাঁড়ালো। চারদিক জুড়ে থমথম করছে নিটোল নিস্তব্ধতা। লম্বা কোট-পরা ছোটখাটো দেখতে, বেলে রঙের খোঁচা খোঁচা গোঁফ, পুলিস সার্জেন্ট আমাদের দিকে তাকিয়ে বেশ রুক্ষ স্বরে টেনে টেনে বললো, 'ও, তোমরাই তাহলে সেই ক্ষুদে শয়তান!'

কনুয়ের ওপর ভর রেখে ওসিপ কোন রকমে নিজেকে টেনে তুললো। 'হ্যাঁ, আমিই এর জন্যে দায়ী। কিন্তু উৎসবের কথা স্মরণ করে আপনি আমাদের নিজগুণে ক্ষমা করে দিন, হুজুর।'

'তোর আসল মতলবটা কি আগে তাই বল?' সার্জেন্ট গর্জন করে উঠলো। কিন্তু ওর তর্জনগর্জন ওসিপের সাদর মিষ্টি শব্দপ্রবাহের মধ্যে দ্রুত ডুবে গেলো।

'আমরা এই শহরেরই লোক হুজুর, নদীর ওপারে আজ আমাদের কোন কাজ ছিলো না···এদিকে রুটি কেনবার মতো হাতে একটাও টাকা-পয়সা নেই, অথচ কাল ইস্টারের আগের দিন। প্রতিটা সৎ খ্রীস্টানেরই মতো স্নান করে আমরা গির্জেয় যেতে চাই। তাই আমি বন্ধুদের বলেছিলুম, 'চলো ভাইসব, ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন।' আমরা তো আর কোন অসৎ কাজ করতে যাচ্ছি না। তাছাড়া আমার বোকামির ফল আমি হাতেনাতেই পেয়ে গেছি··· দেখুন না, আমার পাটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে গ্যাছে।'

'হুঁ, তা তো বুঝলুম,' সার্জেন্ট চাপা স্বরে গর্জে উঠলো। 'কিন্তু তোমরা যদি ডুবে মরতে, তখন কি হতো?'

'হুজুর জানতে চাইছেন, তখন কি হতো ? কিছু না !' ওসিপ করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আর যাই হোক, অন্তত এভাবে আপনার কাছে করুণা ভিক্ষে করতে হতো না।'

সর্দারের কথা শুনে পুলিস সার্জেন্ট যার পর নাই গালমন্দ করলো। তবে অপমানজনক বা কুৎসিত ভাষায় নয়, অনেকটা লোকে যেমন তার মাকে বকা-ঝকা করে ঠিক তেমনি ভাবে। আর সত্যি বলতে কি আমরা সবাই তা চুপ-চাপ কান পেতে শুনলাম, কেননা উপদেশগুলো নিতান্ত অবহেলার তো নয়ই বরং তা রীতিমত গণনগ্রাহ্য।

শেষ পর্যন্ত আমাদের নামধাম লিখে নিয়ে পুলিস সার্জেন্ট চলে গেলো। আমরাও খানিকটা করে ভদকা খেয়ে বেশ গরম আর চাঙ্গা হয়ে সবে যখন বাড়ি ফেরার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, পুলিসের গমনপথের দিকে তাকিয়ে ওসিপ হঠাৎ দুপায়ে লাফিয়ে উঠে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো, তারপর সউল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তাহলে ব্যাপারটা হলো এই !'

'তার মানে !' তোতলা বোয়েভ রীতিমত অবাক হয়ে বিহ্বল গলায় জিগেস করলো, 'তোমার পা তাহলে ঠিক আছে ? আদৌ ভাঙেনি ?'

'কেন, তুমি কি তাই চাইছিলে নাকি ?'

পাশ থেকে কে যেন বললো। 'বাঃ, বেড়ে মজার লোক তো হে তুমি !'

'তাহলে,' ভিজে টুপিটা ওসিপ মাথায় চড়িয়ে নিলো। 'চলো ভায়া, এবার যাওয়া যাক।'

আমি ওর পাশে পাশে চললাম, অন্যেরা আমাদের একটু পেছনে। এমন শান্ত আর কোমল স্বরে ও আমার সঙ্গে কথা বলছে যেন একা আমাকেই ও তার গোপন রহস্য শোনাচ্ছে। 'যখন যেখানে যা-ই করো না কেন, এ জীবনে ছল চাতুরি ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। আমাদের জীবনটাই এরকম কদর্য ! তুমি যদি নিজের চেষ্টায় পাহাড়েও ঠেলে ওঠো, শয়তান তোমাকে সেখান থেকেও টেনে নামাবার চেষ্টা করবে।'

পায়ে পায়ে রাত্রি এগিয়ে এলো। সায়াহ্নকারে লাল আর হলদে বাতির শিখাগুলো যেন আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

'এসো, এদিকে এসো !'

ইতিমধ্যে পাহাড়ের চূড়া থেকে ভেসে আসা ঘণ্টাধ্বনি অনুসরণ করে আমরা অনেকটা ওপরে উঠে গেছি। ঝরনার ছোট ছোট জলধারাগুলো তিরতির করে

বহে চলেছে পায়ের তলা দিয়ে, আর তার একটানা মিষ্টি কলতানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওসিপের কোমল কণ্ঠস্বর।

'কেমন সহজে পুলিস সার্জেন্টকে ফাঁকি দিলুম, তুমি নিজেই বলো? ঠিক এমনি ভাবে কাজ হাঁসিল করতে হয়—যাতে কেউ কিচ্ছু না বুঝতে পারে, অথচ সবাই ভাববে তারাই বুঝি আসল হোতা, আর তাদের বুদ্ধিতেই হলো কিস্তি মাৎ…'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি ওর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলাম, কিন্তু সব যে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম তা নয়। আসলে আমি হয়তো ঠিক বুঝতে চাইছিলাম না। কেননা আমার মনে ধারা তখন বইছিলো অন্য খাতে। এই মুহূর্তে আমি ওসিপকে পছন্দ করি কি করি না সেটা বড় কথা নয়, তবে আমি যে কোন জায়গায় ওকে এখন ছায়ার মতো অনুসরণ করতে প্রস্তুত…হ্যাঁ, এমন কি পাতলা তুষারস্তর বেয়ে আবার নদী পেরুতেও রাজি আছি।

যত এগিয়ে চলেছি, ঘণ্টার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আমার বুকের মধ্যে ততই মন্ত্রোচ্চারণের মতো গুমরে উঠছে। আহা, বসন্তকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে যদি চিরটাকাল ঠিক এমনি ভাবে হাঁটতে পারতাম!

হঠাৎ ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওসিপ আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, 'মানুষের আত্মার পাখা আছে, বুঝলে ভায়া। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে পাখা মেলে উড়ে যায়…'

পাখা আছে? সত্যি, ভারি আশ্চর্য তো!

১৯১২

মোরদ্ভিনিয়ান মেয়ে

শনিবার সান্ধ্য-প্রার্থনার জন্যে যখন শহরের সাতটা বুরুজ-ঘর থেকে বেজে ওঠে মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনি, পাহাড়ের পাদদেশে তখন রুক্ষ কর্কশ স্বরে হঠাৎ ককিয়ে উঠে কলকারখানার ভেঁপু। কয়েক মিনিটের জন্যে শহরতলির আকাশ ভরে থাকে একটানা যান্ত্রিক বিলাপের করুণ আর্তস্বরে।

প্রতি শনিবারে কারখানার ফটক পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক প্যাভেল ম্যাকভের মনটা কেমন যেন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, বুকের ভেতরটা ভরে ওঠে অশ্রুত করুণ একটা বিষণ্ণতায়। সহকর্মী বন্ধুদের আগে আগে যেতে দিয়ে ধীর মন্থর পায়ে ও বাড়ির পথ ধরে, ম্লান চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে সবুজ মখমলে-ছাওয়া ঢেউ-খেলানো পাহাড়ি প্রান্তর, ঘন গাছগাছালির ফাঁকে বাড়ির ছাদ, নির্জন বন্ধ জানলা, আকাশে কালো কালো দেবদারুর মাথা ছাপিয়ে-ওঠা ধূসর চিমনি! অদূরে জুতো-তৈরির কারিগর ভাসিগিনের বাড়ি। সেখানে তার বউ, ছোট্ট মেয়ে আর শ্বশুর তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঢঙ-ঢঙ-ঢঙ! মাথার ওপর শোনা যাচ্ছে উদাত্ত মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনি।

নিচে পাহাড়ের ওপার থেকে ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ আর্তনাদ—আঁ-আঁ-আঁ-আঁ!

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সামান্য একটু ঝুঁকে প্যাভেল আপন মনে নুড়ি-বিছানো পথ ধরে হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে পথের দুপাশে এক চিলতে বাগান-ঘেরা ছোট ছোট বাড়ির বারান্দা থেকে শোনা যাচ্ছে বন্ধুদের কণ্ঠস্বর।

ঢালাই-মিস্ত্রি মিশা সেরদিউকভ চেঁচিয়ে বলে, 'এই প্যাভেল, সন্ধ্যেবেলায় আসছো তো?'

'জানি না। দেখি।' থমকে দাঁড়িয়ে প্যাভেল জবাব দেয়।

কোথাও ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে উচ্ছল হাসি আর মিষ্টি শিস দেওয়ার শব্দ। ছুটির আমেজে উদ্ভাসিত দীপ্ত মুখগুলো কখনও চকিতে চোখে পড়ছে।

বেড়াঘেরা শশা, কালো আঙুরের ক্ষেত পেরিয়ে প্যাভেল পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়ায়। দিনান্তে সূর্যাস্তের আলোয় রাঙা হয়ে রয়েছে সারা আকাশ। তার আভা পড়েছে পাহাড়ের ঢাল-বেয়ে-নামা পর্ণসীর ঝোপে, নিচে খরস্রোতা পাগলা-ঝোরার বুকে। যেন কল কল করে বহে চলেছে রক্তস্রোত।

প্যাভেল অপলক স্তব্ধ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

বাড়ির ফটকের সামনে ভাসিগিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। এক চোখ কানা, টাক-মাথা, হাড় জিরজিরে চেহারা। কানা চোখটা ঢাকার জন্যে যখনই পথে বেরোয় রঙিন একটা চশমা পরে। তাই আশপাশের সবাই তাকে 'চশমা-চোখো ভালেক' বলে ডাকে। বাঁকানো নাকের নিচে এলোমেলো একজোড়া সাদা গোঁফ। জুতো-তৈরি কারিগরের মুখটা দেখলেই মনে হয় যেন সব সময় রেগেটঙ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এখন জামাইকে প্রবেশ করতে দেখে বৃদ্ধের সারা মুখ অনাবিল হাসিতে ভরে উঠলো।

'আজ শনিবার, প্যাভেল!'

প্যাভেল ওর হাতে একটা কুড়ি কোপেক গুঁজে দিয়ে সবুজ ঘাসে-ছাওয়া ছোট আঙিনাটা পেরিয়ে এলো। আঙিনার এক কোণে কাঠগোলাপ গাছটার নিচে খাবার টেবিল পাতা। টেবিলের তলায় শুয়ে বুড়ো কুকুর চুরকিন লেজ নাড়ছে, প্যাভেলের বউ দাশা সিঁড়ির মুখে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে, আর ওদের তিন বছরের মেয়ে ওলগা ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিলো, বাবাকে দেখেই ও ছোট ছোট দু হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো। 'বাপি, বাপি! তুমি এসেছো!'

'এত দেরি হলো যে?' দাশা আড়-চোখে স্বামীর দিকে তাকালো। 'কারখানার সবাই সেই কখন বাড়ি ফিরে এসেছে···'

প্যাভেল গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো—উঃ, অসহ্য! আলতো করে বাচ্ছার নাকটা ধরে আদর করে স্ত্রীর দিকে তাকাতেই ওর উঁচু পেটটায় চোখ পড়লো।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? যাও, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নাও।'

প্যাভেল ভেতরে প্রবেশ করার পরেও শুনতে পেলো স্ত্রীর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর। 'আবার তুমি মদ গেলার জন্যে বাবাকে পয়সা দিয়েছো? তোমাকে আমি হাজার বার মানা করে দিয়েছি না! কিন্তু, আমাকে তুমি কি ভাবোটা শুনি··· আমি তোমাদের বেহায়া কমরেডনী নয়, বুঝেছো?'

মুখ ধুতে ধুতে প্যাভেল ফন্দি এঁটে কানে সাবানের ফেনা গুঁজে দিলো, যাতে শুকনো বাঁশবনে বাতাসের মর্মরের মতো ওর বহুপরিচিত শব্দগুলো তাকে না শুনতে হয়। সত্যি, ঈর্ষা-জড়ানো ওর বাঁকা বাঁকা শব্দগুলো যেন তার বুকের মধ্যে ছুরির ফলার মতো এসে বেঁধে। প্যাভেলের মনে পড়লো দাশার সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই প্রথম দিনগুলোর কথা—কুয়াশা-ভেজা চাঁদনি রাতে দুজনে কেমন স্লেজ নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তরতরিয়ে নিচে নেমে যেতো, তারপর অন্ধকার নির্জন কোন কোণে পরস্পরকে নিবিড় করে জড়িয়ে চুপচাপ বসে

থাকতো আর জীবন যেন ছায়াছবির রূপোলী পর্দায় দেখার মতো নিঃশব্দে কেঁপে উঠতো। সত্যি, সে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও তার সারা বুক যন্ত্রণায় ভরে ওঠে, যেন দীর্ঘ কারাবাসের পর এইমাত্র সে ফিরে এলো ছিন্নমূল বিধ্বস্ত কোন জীবনে!

ওলগা ছুটতে ছুটতে এসে প্যাভেলের একটা পা জড়িয়ে ধরলো। আঙুল থেকে জলের ফোঁটাগুলো ওর মসৃণ গালের ওপর ঝরিয়ে দিতেই ওলগা খিল-খিল করে হেসে উঠলো। দুজনে আবার আঙিনায় ফিরে এলো।

প্যাভেল শান্ত স্বরে স্ত্রীকে বললো, 'দোহাই দাশা, এবার একটু চুপ করো!'

ওলগা কুকুরটার সামনে উবু হয়ে বসে গম্ভীর গলায় বলছে, 'এই ওঠ্, ওঠ্ বলচি!'

বুড়ো চুরকিন দু একবার চোখ মিটিমিট করে তাকিয়ে লেজ নেড়ে বড় একটা হাই তুললো।

'ঠিকই চুপ করতাম, যদি দেখতাম কোন স্বামী তার কমরেডদের চেয়ে বউ ঘর-সংসারের ওপর বেশি নজর দিচ্ছে…' দাশা অনর্গল ধারায় বকবক করে চললো। দূরের বনবীথির দিকে তাকিয়ে প্যাভেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, মনে পড়লো দুজনে হাত ধরাধরি করে ওই পাহাড়ি পথে একদিন ওরা কত ঘুরে বেড়িয়েছে। ওলগা পেটে আসার পর থেকে ও এমন খিটখিটে হয়ে গেছে, না হলে আগে ও এমন ছিলো না! বুকের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস চেপে প্যাভেল নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো।

নিঃশব্দে চেয়ারে এসে বসতেই ওলগা প্যাভেলের হাঁটুদুটো জড়িয়ে তার কোলে মুখ গুঁজলো। 'বাপি আমার খেলনা আনোনি কেন? আমার পুতুলটা…'

'চুপ করো, ওলগা! সারাদিন তোমার কলকলানি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেলো!' তীক্ষ্ণ স্বরে মা ধমক দিলো।

প্যাভেলের অদম্য ইচ্ছা হলো দাশার কপালে চামচেটা সোজা ছুঁড়ে মারে, কিন্তু নিজেকে সে কোনরকমে সামলে নিলো। 'তোমার কিন্তু এভাবে ওকে বকা উচিত নয়…'

ভাসিগিন ফিরে এসে চেয়ারে বসলো। শীর্ণ মুখে পাতলা ঠোঁটদুটো কৃত্রিম হাসিতে ভরে রয়েছে। পকেট থেকে ছোট চ্যাপটা একটা বোতল বার করলো।

দাশা ফোঁস করে উঠলো, 'দেখলে তো, কোথায় গিয়েছিলো!'

প্যাভেল মুখ নিচু করে হাসি গোপন করলো, কেননা সে আগে থেকেই

জানতো বুড়ো ভালেক কি জবাব দেবে : 'বারে, না গেলে পাবো কেমন করে !'

বুড়ো ভ্রূ কুঁচকে ভাঁড়ের মতো অদ্ভুত ভঙ্গি করে বোতলের তরল পদার্থটা পরীক্ষা করে দেখলো, তারপর খানিকটা গলায় ঢেলে সশব্দে ঠোঁট চাটলো। চুরকিন উঠে এসে মুখ তুলে লেজ নাড়ে। বুড়ো ভাসিগিন ছোট্ট করে ধমক দেয়, 'যা, ভাগ, তুই পারবি না। ভদকা খেলে তুইও মাতাল হয়ে যাবি।'

এই শব্দগুলোও প্যাভেলের ভীষণ পরিচিত। এখানের সবকিছুই তার অসম্ভব চেনা।

'কাচা, সেলাই ফোঁড়াই, রান্নাবান্না···সারাদিনে এক মিনিটও ফুরসুত নেই। অথচ একটু চোখের আড়াল হয়েছো কি এমনি বাগানের শশাগুলো হাওয়া···'

দাশা একনাগাড়ে গজগজ করে চলে। রূপসী দেখতে না হলেও, লম্বা-চওড়া বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য, মসৃণ গোল মুখ, বাঁকানো দীর্ঘ ভ্রূ। কিন্তু অসম্ভব নোংরা, নিয়মিত স্নান করে না, ব্লাউজের বগলের কাছটা ছেঁড়া, বুকের কাছে সেফটি-পিন দিয়ে কোনরকমে আটকানো। চুলে তেল দেয় না, এলোমেলো রুক্ষ চুল-গুলো কথা বলার সময় প্রায়ই মুখের ওপর এসে পড়ছে। খাবার সময় এঁটো চামচে দিয়েই চুলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে পেছনে।

প্যাভেল মনে মনে ভাবে চুলটা আঁচড়ে একটু পরিষ্কার হয়ে নিতে ওর কত-ক্ষণ সময় যে লাগতো! তা করবে না! প্যাভেল জানে ও চুল আঁচড়ে পরিষ্কার হবে সেই কাল সন্ধোবেলায়। তারপর হলদে-সবুজ ডুরে-কাটা ব্লাউজ আর জলপাই রঙের ঘাঘরাটা পরে তার সঙ্গে বেড়াতে বেরুবে। ছুটির দিনে কেনা-কাটা করতে ও দারুণ ভালোবাসে। শহরতলির রাস্তা দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে যাবার সময় ওর পেটটা উঁচু হয়ে থাকবে, ফোলা ফোলা রক্তিম ঠোঁটদুটো শক্ত করে চাপা, বাঁকানো ভ্রূদুটো আপনা থেকেই কোঁচকানো। ঠিক এমনি মুহূর্তে পথে হঠাৎ কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, তাদের চোখগুলো নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ঝিকমিক করতে দেখলে প্যাভেল সত্যিই অস্বস্তি অনুভব করে, কানের পাশদুটো গরম হয়ে যায়। অহেতুক চিন্তাগুলো মন থেকে মুছে ফেলে প্যাভেল অন্যকিছু ভাবার চেষ্টা করলো। আজকের টিফিনের সময় সময়-রক্ষক কুলিগা ফ্রান্সের শ্রমিক-আন্দোলন নিয়ে যে কথা বলেছিলো সেগুলো ভাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারলো না। বুড়োর হঠাৎ-কণ্ঠস্বরে প্যাভেল চমকে উঠলো।

'জার্মানির খবর কি ?'

'কেন, ভালোই তো! ওখানে পার্টি-সংগঠন গোপনে খুবই জোরদার হচ্ছে।'

'না, আমি সে কথা বলছি না···' কাঁপা কাঁপা গলায় বুড়ো ভাসিগিন এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে আলগা দাঁতে ঠকঠক শব্দ করতে করতে সভয়ে আকাশের দিকে তাকালো যে ওলগা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। আর তখনই ওর হাত থেকে চামচেটা মাটিতে পড়ে গেলো।

দাশা ওর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলো 'কুড়িয়ে নে শিগগির!'

বাচ্ছাটা ডুগরে ককিয়ে উঠলো। প্যাভেল ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পায়ে পায়ে বেড়ার সামনে এসে দাঁড়ালো। গোধূলির তরল অন্ধকার অনেক-ক্ষণ আগেই হারিয়ে গিয়ে চারদিক ম্লান বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছে। বাদুড়ের কালো ডানা ঝাপটানোর মতো পেছনে থেকে ভেসে আসছে পরিচিত কণ্ঠস্বর: 'আর তোমাদেরও বলিহারি! জার্মানির কথা না ভেবে নিজেদের পকেটের কথা ভাবলে একটু ভালো হতো না? বিয়ে-থা করেছো যখন, নিজেদের ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ের কথা ভাবতে হয়, বুঝলে?'

'নিশ্চয়ই!' বুড়ো মেয়ের কথায় সায় দিলো। 'আজকের দিনে পকেটটাই তো হলো আসল!'

ঘুমে চোখ জড়িয়ে-আসা বাচ্ছাটাকে বুকে দোলাতে দোলাতে প্যাভেল বুড়োর কথা ভাবলো। চার বছর আগেও যাকে চিনতো, সে এক অন্য ভাসি-গিন। ইঁটখোলার সমাবেশে বৃদ্ধ মুচির সেই দীপ্ত ভাষণ তার আজও স্পষ্ট মনে আছে: 'নিশ্চয়ই, তোমাদের সবার জন্যে আমার দুখ্যু হয়। বাঁচতে গেলে বাঁচার মতো বাঁচতে হবে! ছোট ছোট শিশুদের মুখ চেয়েই এ সংগ্রামে মরদের মতো বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে।' অন্য আর একদিন তাকে বলেছিলো, 'সত্যি প্যাভেল, তোমাকে দেখলে তোমার কথা শুনলে গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে। আমার যে ছেলে নেই সে-দুখ্যু আমি ভুলে যাই।'

শহরে সেই 'দেশভক্ত' গুণ্ডাদের হাতে ডান চোখটা খোয়াবার পর থেকে বুড়ো হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে। বদলে শুধু ও একাই যায়নি, বদলে গেছে আরও অনেকেই। ঘুমন্ত বাচ্ছাটাকে ঘরে শুইয়ে দিতে যাবার সময় প্যাভেল শুনলো থালা বাসন গুছিয়ে টেবিল পরিষ্কার করতে করতে দাশা বুড়োকে বলছে, 'চামচেটা কুড়িয়ে দাও, আমি নিচু হতে পারছি না।'

দেবদারুর মাথা ছড়িয়ে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। প্যাভেল সামনের

সিঁড়িতে বসে দাশার চুলে হাত বুলতে বুলতে আদর করছে। 'এর জন্যে এত ভাবার কি আছে, দাশা? আমি জেলে গেলে বন্ধুরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

'ওটা কোন কাজের কথা নয়।'

'আমরা স্থায়ী একটা সংগঠন করার চেষ্টা করছি।'

'বিয়ে না করে তাই করলেই পারতে। কি দরকার ছিলো বিয়ে করার? আগে ফি মাসে একশো রুবল করে ঘরে আনতে, আর এখন···'

'সেটা আমার ত্রুটি নয়, দাশা। আজকে দিনের জটিল পরিস্থিতি···'

'চুলোয় যাক তোমার পরিস্থিতি! তুমি আর তোমার বন্ধুরা যদি মন দিয়ে কাজ করতে, তাহলে এত জরিমানা কাটা যেতো না।'

দাশা হয়তো সত্যিই যুক্তি দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে কথাগুলো প্যাভেলকে বোঝাতে চাইছিলো, কিন্তু সারাদিনের নিঃসীম ক্লান্তি এবার ওর দু-চোখের পাতায় ভর করে এলো। দীর্ঘ তিন বছর ধরে ও ঠিক এমনি ভাবে বুঝিয়ে আসছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। স্বামীর জন্যে ওর দুঃখ হয়, ভয় পায়। আর প্যাভেল যদিও সে দাশাকে দারুণ ভালোবাসে, তবু আগেরই মতো সমান জেদী আর একগুঁয়ে রয়ে গেছে। দাশা জানে এ বাধা ও কোনদিন অতিক্রম করতে পারবে না, ওলগার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওর মতো শক্ত মেয়ের বুকও আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। স্বামীর মিষ্টি কথাতেও শ্বাসরুদ্ধ-করা এই বিষণ্ণ তিক্ত হতাশার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার ও কোন পথ খুঁজে পায় না।

আর প্যাভেল কাঠগোলাপের ছায়ায়-ঢাকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তার মনও ভবিষ্যতের দিনগুলোকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ভাবনায় আচ্ছন্ন। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে-ওঠা নিটোল অথচ মিষ্টি স্বরে সে দাশাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'শোন, ফ্রান্সে কিন্তু এর মধ্যেই···'

'ফের আবার শুরু করেছো।' ক্রুদ্ধ চাপা স্বরে দাশা প্রায় গর্জে উঠলো। 'ওই সব দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে না, বুঝলে? আমাদের ছেলে-মেয়ের কথা ভাবতে হবে।'

বুকের মধ্যে নিঃশব্দ যন্ত্রণা দিয়ে প্যাভেল উঠে পড়লো। উঠে আঙিনায় পায়চারি করতে শুরু করলো। দাশারও গলার মধ্যে কান্নার মতো কি যেন দলা পাকিয়ে উঠলো, কোন রকমে অশ্রুধারা চেপে রেখে ও নিজেকে টেনে তুললো, তারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বললো, 'আমি শুতে চললাম। আশাকরি তুমি এখন নিশ্চয়ই তোমার কমরেডদের কাছে যাবে?'

একটু নিস্তব্ধতায় প্যাভেল ছোট্ট করে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

'বেশি রাত না করে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এলে খুশি হবো।' নিজের মনে গজগজ করতে করতে দাশা চলে গেলো।

আঙিনার বেড়ার সামনে প্যাভেল চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে রইলো।

চাঁদটা এখন আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে। দূরের ছায়াগুলোকে এখন অনেক হালকা আর ছোট দেখাচ্ছে। কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠলো।

কখনও কখনও এই ধরনের কথা-কাটাকাটি প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার মতো মনগুলোকে বিধ্বস্ত করে দেয়। সেইরকম কোন মুহূর্তে অসম্ভব উত্তেজনায় রাগে দাশা যখন হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে, নোংরা ছেঁড়া ব্লাউজের নিচে ওর ভারি বুকদুটো ঘন ঘন ওঠা-নামা করে, প্যাভেল তখন অসহ্য বিরক্তিতে ফেটে পড়ে। অশ্লীল কুৎসিত গালাগালিগুলোকে কোনরকমে এক পাশে ঠেলে রেখে স্তম্ভিত হয়ে সে নিজের মনেই ভাবার চেষ্টা করে—দাশা কোনদিন এত নিচে নেমে যাবে, সত্যিই আমি ভাবতেই পারিনি!

এই রকম কোনো ঘটনা ঘটার পর দ্বিধাদ্বন্দ্বে, প্রচ্ছন্ন প্রবঞ্চনায় প্যাভেলের সারা মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। পরক্ষণে সে নিজেই অপরাধী মনে করে, লজ্জা পায়, কিন্তু সে তাকে অতিক্রম করতে পারে না।

কোন এক শনিবারে সামান্য কটা টাকা এনে একবার দাশার হাতে দিয়েছিলো। প্রচণ্ড রাগে টাকা কটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাশা চিৎকার করে বলেছিলো, 'আমি কি ভিখিরি! লজ্জা করে না তোমার?' তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দরজার বাইরে বার করে দিয়েছিলো। 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে! অকম্মার ধাড়ি কোথাকার···জেলই তোমার আসল জায়গা! যাও, সেখানে গিয়ে পড়ে পড়ে পচো-গে!'

যদিও সে বুঝতে পেরেছিলো ওর ক্ষোভের কারণ—সেটা বাঁধাকপি লাগানোর সময়, বাগানের মাটি ঠিকঠাক করে কিছু চারা লাগাতে পারলে অর্থের সাশ্রয় হতো। তবু সেদিন প্যাভেল নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি, রাগে ক্ষোভে দুঃসহ অপমানে সে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলো পথে। অন্ধকার পাহাড়ের খাঁজে বসে অনেকক্ষণ ধরে বুকের যন্ত্রণা জুড়িয়ে শেষে শহরের নোংরা একটা শুঁড়িখানায় ফিরে এসেছিলো। তারপর আকণ্ঠ ভদকা খেয়ে রাস্তায় রাস্তায়

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে দেখলো সে ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হয়তো বুঝতে পারতো না, খেয়াল হলো গির্জার আশ্চর্য মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনির শব্দে। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে। টিমটিম করছে রাস্তার বাতিগুলো। তরুবীথির ওপার থেকে ভেসে আসছে পাতার মর্মর। নীলিম আকাশে একটা ফুটো পয়সার ওপর হুমড়ি খেয়ে-পড়া একপাল নোংরা ভিখিরির মতো ধূসর মেঘগুলো চাঁদটাকে বার বার ঢেকে দিচ্ছে।

দু হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে প্যাভেল একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে রইলো। জীবনের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে—ভালো কিছু করার জন্যে মানুষ যতই লালায়িত হয়ে উঠুক না কেন, মন্দ তাকে টেনে নামাবেই।

হঠাৎ প্যাভেলের মনে হলো বেঞ্চিতে তার পাশে কে যেন এসে বসলো। চকিতে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলো একটি মেয়ে। প্যাভেল অবাক হয়ে গেল। এত রাত্তিরে এ রকম একটা নির্জন জায়গায়—চোর, বদমাইশ কিংবা বাজা-রের মেয়েমানুষ ছাড়া আর কে আসতে যাবে? হয়তো তাকে মাতাল ভেবে···

প্রথমে ওরা পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকালো, তারপর কথা বললো, শেষে দীর্ঘক্ষণ শহরতলির নির্জন রাস্তায় রাস্তায় দুজনে ঘুরে বেড়ালো। আর মাতালের অসংলগ্ন প্রলাপের মতো প্যাভেল সারাটা পথ তার অসুখী জীবন, তার স্ত্রী, যার মধ্যে সে আজও কোমল হৃদয়ের কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি, যার কাছে তার বুকের নিভৃত স্বপ্নগুলোকে মেলে দিয়ে সে এতটুকু হালকা হতে পারেনি, তার সম্পর্কে অনর্গল বকে চললো।

মেয়েটি বললো, 'এমন ঘটনা কিন্তু প্রায়ই ঘটে।'

'প্রায়ই ঘটে!' প্যাভেল অবাক হয়ে গেলো, 'তুমি জানলে কেমন করে?'

'লোকজনদের প্রায়ই বলতে শুনি।'

প্যাভেল আড়চোখে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো—নতুনত্বের কোথাও কিছুই নেই, রাস্তার আর পাঁচটা মেয়েরই মতো অতি সাধারণ।

তখনই তার দাশার মুখটা মনে পড়লো। অলক্ষে বুকের অতল থেকে তার বেরিয়ে এলো বিষণ্ণ করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে ভাবলো—চোখ মেলে দেখুক, ওর স্বামী আজ কোথায় যাচ্ছে!

মেয়েটির ঘরে ফিরে আসার পরেও প্যাভেল জীবন সম্পর্কে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে অনেক অনেক কিছু ভাবলো, তারপর এক সময়ে মেয়েটি শয্যায় ফিরে আসার আগেই ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরে ঘুম ভাঙার পর নিজেকে তার কেমন যেন অপরাধী আর ভীষণ অপ্রতিভ মনে হলো। দুজনে মিলে চা খেলো, কিন্তু সারাক্ষণ সে মেয়েটির দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাতে পারলো না। বিদায় নেবার আগে প্যাভেল পকেট হাতড়ে তিরিশটা কোপেক বার করে নিঃশব্দে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিলো।

মেয়েটি কিন্তু আলতো করে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে নম্র অথচ স্পষ্ট স্বরে বললো, 'কোন দরকার নেই।'

প্যাভেল ভনিতা পছন্দ করে না, তাছাড়া মেয়েটির স্বচ্ছ কণ্ঠস্বরে সে তখন লজ্জায় ম্লান হয়ে গেছে। তবু কোন রকমে বললো, 'দোহাই তোমার, একটা রেখে দাও।'

'বেশ!' মেলে-দেওয়া হাতের তালু থেকে একটা পাঁচ কোপেক তুলে নিয়ে ও ছোট্ট করে হাসলো। 'কিন্তু সত্যিই এর কোন দরকার ছিলো না।'

কোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে প্যাভেল ভাবলো মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে আবার আসার কথা বলবে। একটু পরিচিত হলে হয়তো ও আমাকে তার নামও বলবে ···

নত চোখের পাতায় মেঝের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি শান্ত স্বরে বললো, 'কাল কিন্তু আপনি আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের জীবন সম্পর্কে ভারি সুন্দর সুন্দর সব কথা বলেছিলেন।'

'তাই নাকি!' অপ্রত্যাশিত প্রশংসায় মুহূর্তের জন্যে প্যাভেলের শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে গেলো। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মৃদু হেসে অস্ফুট স্বরে বললো, 'শুনে সত্যিই খুশি হলাম···কাল আমি মাতাল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন মাতাল হওয়া তো দূরের কথা, সাধারণত মদ আমি ছুঁইই না।'

মেয়েটি কোন কথা বললো না।

'আজ তাহলে চলি, বিদায়!'

মেয়েটি নিঃশব্দে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

পথে নেমে আসার পর প্যাভেল ভাবলো মেয়েটা তাকে আসতে বললো না কেন? কেন পয়সা নিলো না? হাজার চেষ্টা করেও সে এর যুক্তিসংগত কোন কারণ খুঁজে পেলো না, যেমন মনে করতে পারলো না গতকাল মেয়েটিকে সে কি কি বলেছিলো।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে প্যাভেল বুকের মধ্যে আনন্দ ও বেদনার মিশ্রিত

একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো। মনে মনে ভাবলো মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা হলে আমি ওকে ঠিক চিনতে পারবো।

তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে কোটটা তার কাঁধের ওপর ভারি হয়ে চেপে বসেছে, কাঁধদুটো ব্যথা করছে আর মনে হচ্ছে ঘুমে শিথিল ক্লান্তিকে যেন সর্বাঙ্গ ভেঙে আসছে।

দাশার সঙ্গে দেখা হতে ও একটা কথাও বললো না, এমনকি তার দিকে ফিরেও তাকালো না। অনেকক্ষণ রান্নাঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে বসে সে ওর ময়দা ঠাসা দেখলো, দেখলো ওর মৃসণ নিটোল হাতের পেশীদুটো কেমন নিঃশব্দে ওঠা নামা করছে। সারা ঘরে থম থম করছে দুঃসহ অতল নিস্তব্ধতা।

এই নিস্তব্ধতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই প্যাভেল জিগেস করলো, 'ওলগা কোথায়?'

'কেন, আজ কি বার তোমার মনে নেই?' ঝাঁঝালো গলায় দাশা জবাব দিলো। 'ছুটির দিনে সব মানুষই কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়। ওলগাও তার দাদুর সঙ্গে গির্জেয় গ্যাছে।'

আপসের সুরে নরম গলায় প্যাভেল বললো, 'সত্যিই, আজ যে রোববার সে-কথা আমার খেয়ালই ছিলো না। কিন্তু এরকম বিষ্টির মধ্যে বাচ্চাটাকে।'

দাশার হাতের চাপে ময়দার ডেচকিটাকে অসম্ভব জোরে ঢক ঢক শব্দ করতে দেখে প্যাভেল চুপ করে গেলো। পরমুহূর্তেই শুনলো বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে-ওঠা ওর কণ্ঠস্বর, 'বেশ তো, ওরা ফিরে আসুক···ওলগাকে বলবো মেয়ের জন্যে বাবার কত দরদ! শুনলে বেচারি খুশি হবে!'

হঠাৎ কেন জানি ভাবাবেগের আতিশয্যে প্যাভেল উঠে পেছন থেকে দাশার গলাটা দুহাতে মালার মতো আলগা করে জড়িয়ে ধরলো।

'থাক থাক, অত আদিখ্যেতা করতে হবে না! হাত সরাও!' হাতদুটো সরিয়ে দিয়ে দাশা ময়দা-মাখা হাতেই মুখের ওপর এসে-পড়া চুলগুলো ঠেলে পেছন দিকে সরিয়ে দিলো। চিবুকের দুপাশে ঢেউ খেলে গেলো মৃদু রক্তিমাভা —রাগে না লজ্জায়, স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

প্যাভেল তার আসনে ফিরে আসার আগেই দাদুর হাত ধরে ওলগা ভেতরে প্রবেশ করলো। তাকে দেখেই হাঁটুদুটো জড়িয়ে ওলগা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। 'বাপি! বাপি! বাপি-সোনা, তুমি কোথায় ছিলে?'

প্যাভেলের ইচ্ছে হলো দু-হাতে তুলে নিয়ে ওকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে

জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কোথায় রাত কাটিয়েছে কথাটা মনে পড়তেই হাতদুটো ধুয়ে ফেলার জন্যে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সমানে সারাটা দিন ধরে চললো দাশার স্বগত সংলাপ, বুড়ো ভাসিগিনের বিদ্রূপাত্মক উপহাস। 'হ্যাঁ, এই যে সমাজতন্ত্রের বীর সৈনিক, তোমাকে যে কথা বলছিলাম···এখন থেকে বরং হাত চিবিয়ে খাবার অভ্যেস করো না কেন? শ্রমিক শ্রেণীর শেষ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অভ্যেসটা বজায় রাখলে আখেরে উপকারই হতো, ভিখিরিদের কপালে তখন তো রোজই মাংস জুটবে···'

'সারাক্ষণ বকবক না করে এক মিনিট একটু চুপ করে থাকতে পারেন না!' প্যাভেল ক্ষেপে ওঠে। 'মিছিমিছি এ ভাবে দোষারোপ করে লাভটা কি হবে?'

'সত্যিই তো।' শীর্ণ মুখে পাতলা ঠোঁটদুটো চেপে বুড়ো অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসে। 'মিছিমিছি এভাবে দোষারোপ করে কি লাভ?'

নিটোল কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যায়।

এক সময়ে বুড়োই আবার শুরু করে, 'তোমার বুট জোড়াটা কেমন সেরে দিয়েছি, দেখেছো?'

'হ্যাঁ।'

'পছন্দ হয়েছে?'

'ধন্যবাদ।'

'দাশা, তোর আচারের জারের মধ্যে ধন্যবাদটা তুলে রাখিস তো। তারপর তোর ভাঁড়ারে যখন কিছু থাকবে না জারটা পেড়ে দিবি, আমি মনের সুখে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চিবুবো।'

বাইরে অঝরে বৃষ্টি পড়ছে, দমকা বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটগুলো আছড়ে পড়ছে জানলার সার্সিতে। ছাদের মাথায় দেবদারুর একটা শাখা মড়মড় করে ভেঙে পড়লো, কোথায় যেন দড়াম করে দরজার একটা কপাট বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেলো। একটানা রিমঝিম বৃষ্টিপাতের শব্দ কার যেন করুণ বিলাপের মতো মনে হচ্ছে, আর পিঁয়াজের ঝাঁঝালো গন্ধের সঙ্গে মিশে সে-বিষণ্ণতায় ভারি হয়ে উঠছে ঘরের স্তব্ধ বাতাস।

প্যাভেল বরাবর লক্ষ্য করেছে ঝগড়া বা এই রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সময় ওলগা বিহ্বল চোখের দৃষ্টি মেলে একবার এর মুখের একবার ওর মুখের

দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তখন ওর কচি মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়, যেন এখনই চোখ ফেটে জল আসবে।

আচ্ছা, এই দূষিত কদর্য পরিবেশে ও কেমন করে মানুষ হবে? প্যাভেল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আপন মনে ভাবে আর মেয়েটার জন্যে নিজেকেই তার অপরাধী বলে মনে হয়।

'এসো সোনামণি, আমার কোলে এসো!' দু হাত বাড়িয়ে প্যাভেল মেয়েকে আদর করে ডাকলো। ওলগা সবে যখন বাপির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, দাশা চিলের মতো ছোঁ মেরে ওর হাত ধরে টেনে আনলো।

'খবোদ্দার যাবি না।'

ওলগা তার কচি মুখখানা মার কোলের মধ্যে গুঁজে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। মা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। 'যা, শিগগির শুতে যা! আর যেন তোর মুখ একবারও না দেখি।'

প্যাভেলও উঠে পড়লো। অসম্ভব ক্রোধে সারা মুখ তার থমথম করছে, পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে হিমেল স্রোত।

চলে যেতে গিয়েও প্যাভেল আবার ফিরে এলো, ফিরে এসে স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়ালো। 'আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, তুমি এভাবে ওকে আর কোনদিন বকবে না…'

'কেন, মারবে নাকি?' অবজ্ঞায় ঘৃণায় ভ্রূদুটো বেঁকিয়ে দাশা প্রতিরোধের ঋজু ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকালো। 'কই, মার তো দেখি!'

'নাঃ, কোথাও আর একটু শান্তি নেই দেখছি!' বিড়বিড় করতে করতে বুড়ো চকিতে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

টেবিল থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে দাশাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে প্যাভেল ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বাইরে তখনও সমানে বৃষ্টি ঝরছে। দারুণ বেগে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বইছে। বৃষ্টির ছাঁটগুলো সোজা এসে পড়ছে প্যাভেলের চোখে মুখে। হিমেল বৃষ্টিভেজা জল-ছপছপে নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হলো বুড়োটা যদি না নাক গলাতো, আজ আমি ওকে খুনই করে ফেলতাম!

সেদিন রাত্তিরে আবার সে মেয়েটার ঘরে গেলো। ভিজে কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘরের এক কোণে। হাত দিয়েই গলার চারপাশে বৃষ্টির

জল মুছতে মুছতে এলোমেলো স্বরে বললো, 'আমি তো আর পশু নই! আমি জানি, আমি বুঝি সবটাই ওর দোষ নয়...'

মেয়েটা কোনো কথা বললো না। যেন অদৃশ্য কারো হাতে দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো ও তখন উদ্বিগ্ন হয়ে সারা ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে তাপ-চুল্লিতে কাঠের টুকরো ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে, নগ্ন কাঁধের ওপর থেকে শালটা খসে গিয়ে মাটিতে লুটচ্ছে।

'কিন্তু কি করবো বলো...তোমার কাছে আসা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না। যদিও আমার অনেক সঙ্গী-সাথী রয়েছে, তবু তাদের কাছে এসব কথা বলতে আমার লজ্জা করে... আর লজ্জার মাথা খেয়ে যদি তাদের বলিও, তখন হয়তো দেখা যাবে তাদের প্রত্যেকের পরিবারেই কেউ না কেউ কারুর ওপর এরকম নির্যাতন চালাচ্ছে। কিন্তু কেন, কেন এমন হয় বলতে পারো?'

'আমি কেমন করে জানবো বলো?' প্যাভেল শুনলো ওর অস্ফুট নম্র-মৃদুল কণ্ঠস্বর।

'দূষিত এই জীবন কারুর হৃৎপিণ্ডটা খাবলা মেরে তুলে নিচ্ছে। তারপরেই হঠাৎ একদিন দেখা যাবে পাগলের মতো অসহ্য যন্ত্রণায় তুমি ছটফট করছো, চিৎকার করে কাঁদতে চাইছো অথচ প্রাণভরে কাঁদতে পারছো না...'

এবার মেয়েটি উঠে পায়ে পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'ইশ্ তোমার শার্টটা তো ভিজে গেছে দেখছি! কিন্তু তোমাকে পরতে দেবার মতো তো এখানে কিছু নেই...এখন আমি কি করি?'

ওর একটা হাত প্যাভেল নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো। 'তোমাকে এ জন্যে কিচ্ছু করতে হবে না।'

মেয়েটি ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো, কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়লো নম্র-মধুর ব্যাকুলিমা। 'না না, তা হয় না...ঠাণ্ডা লেগে তোমার অসুখ করবে যে! যাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয়, তাদের অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে চলবে কেন!'

ছুটে বারান্দার দড়ি থেকে একটা রঙিন শেমিজ নিয়ে মেয়েটি আবার ফিরে এলো। খানিকক্ষণ তাপচুল্লির ওপর মেলে ধরে পোশাকটাকে ভালো করে শুকিয়ে ও প্যাভেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। 'জামা কাপড় ছেড়ে এটা পরে নাও। হয়তো মেয়েদের পোশাক, তবু তো শুকনো...'

শেমিজটা টেবিলের ওপর রেখে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। প্যাভেল ওর দিকে ম্লান বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট ধূসরিমায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো সারা মন। একেই বলে ভাগ্য! দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি? নাহলে আমার মতো একটা মানুষ···এখানে···ওর কাছে আসা ছাড়া আর কোন জায়গা নেই! সত্যি, ভাবতেও লজ্জা করে!

সীমাহীন একটা তিক্ততায় বুকের ভেতরটা তার মুচড়ে উঠলো, মনে পড়লো পাতলা ঠোঁটে চাপা বুড়ো ভাসিগিনের সেই নিঃশব্দ বিদ্রূপের হাসি। 'সে কি! এরই মধ্যে হতাশ হয়ে পড়লে? কমরেডরা তো রয়েছে? যাও না, সেখানে গিয়ে তাদের কাছে তোমার মনের দুখ্যু জানাও না! কেন, লজ্জা করছে বুঝি?'

কথাটা মনে পড়তেই প্যাভেলের বুকের মধ্যে থেকে কান্নার মতো কি যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে এলো, দু ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো যন্ত্রণায় ভেজা ম্লান একটুকরো হাসি।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলোমেলো ভিজে চুলগুলো প্যাভেল হাত দিয়ে ঠিক করে নিলো।

'ওমা, তুমি এখনও জামা কাপড় পালটাওনি!' ঘরে ঢুকতে গিয়েও মেয়েটি ঢুকলো না, দরজার সামনে থেকে কথাটা বলেই আবার ফিরে গেলো।

সত্যিই, ভিজে পোশাকটা না ছাড়লেই নয়! ঠাণ্ডায় তখন সে ঠকঠক করে কাঁপছে। দ্রুত হাতে পোশাক ছেড়ে প্যাভেল মেয়েদের রঙিন শেমিজটা পরে নিলো।

মেয়েটি ফিরে এলো। 'বাঃ, এই তো বেশ হয়েছে!'

'ঠিক সার্কাসের ভাঁড়ের মতো দেখাচ্ছে না?'

'হুঁ, তা একটু দেখাচ্ছে বই কি।' মুখে বললেও মেয়েটি কিন্তু হাসলো না।

প্যাভেল অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। দীর্ঘ পল্লব-ঘেরা টানা দুটো চোখ, কাকের ডানার মতো কালো চুলের নিচে শান্ত মুখশ্রী, লম্বা ছিপছিপে শক্ত শরীর।

'কি ব্যাপার, ভাঁড়ের মতো দেখাচ্ছে অথচ তুমি হাসছো না?'

'যেহেতু হাসা উচিত নয়।'

'তাই বুঝ!'

মেয়েটির গম্ভীর কাটা কাটা জবাবে প্যাভেল কেমন অস্বস্তি অনুভব করলো।

ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—ছোট্ট ঘরটা বড় একটা তক্তপোশ, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর বাসনপত্তর রাখার ছোট একটা আলমারিতেই ভরে গেছে। ঘরটা সম্ভবত বড়ই ছিলো, এখন মাঝখান থেকে কাঠের দেওয়াল তুলে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে। সছিদ্র জীর্ণ কাঠের দেওয়ালের এখানে ওখানে পাটের ফেঁসো গোঁজা। দরজার ওপাশে বড় একটা স্টোভ, এপাশে উইলোর পাতা আর কাগজের রঙিন ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো প্রতিমূর্তি। ধোঁয়ায় কালো কালো ছোপ-ধরা দেওয়ালে, নোংরা ছবির গায়ে আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ফর-ফর করে উড়ে গিয়ে পড়ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। সারা ঘরে একটিমাত্র ছোট চৌকো জানলা।

'এইটেই তোমার একমাত্র ঘর ?'

'হ্যাঁ।'

'আলাদা কোন রান্নাঘর নেই ?'

'না।'

'এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না ?'

স্টোভ নিভিয়ে গরম চায়ের কেটলিটা ও নামিয়ে রাখলো টেবিলের ওপর। তারপর তারের জাল-দেওয়া আলমারি থেকে বড় একটুকরো যবের রুটি কেটে নিয়ে ফিরে এলো। চা ছাঁকতে ছাঁকতে মেয়েটি এমন আশ্চর্য মিষ্টি আর নিচু স্বরে কথা বলে চললো, হঠাৎ শুনলে মনে হবে ঠিক যেন বাইরে কোথাও রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে।

'হ্যাঁ, এখানে আর দুজন বয়স্কা মহিলা থাকেন—দুজনেই অবিবাহিতা। রাত্তিরের দিকে সাধারণত ওঁরা ঘরে থাকেন না, বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গেই বাইরে বাইরে রাত কাটান। এই, শোন···আমি সত্যিই দুঃখিত, এছাড়া ঘরে কিন্তু আমার আর কিচ্ছু নেই!'

'না না, তুমি কিছু ভেবো না···' সংকোচে লজ্জায় প্যাভেল যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলো। অস্ফুট স্বরে কোন রকমে বললো, 'আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।'

মনে মনে ভাবলো সত্যিই কেন যে আমি এখানে মরতে এলাম।

'মোটেই তা নয়, আমি জানি···এটুকু খেয়ে নাও।'

হঠাৎ স্পষ্ট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্যাভেল দুম করে জিগেস করে বসলো, 'আচ্ছা, তোমার নাম লেখানো আছে ?'

'নাম লে-খা-নো ! কিসের নাম লেখানো ?'

'পুলিসের খাতায়।'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখানে আসার আগে পুলিসের কাছে আমার ছাড়পত্র জমা দিতে হয়েছিলো ! এবং এখানে যে আমি রাঁধুনি আর ঝিয়ের কাজ করি সে-কথাও তাদের জানিয়েছি। অবশ্য সারাদিনে কাজ আমার খুব সামান্য মাত্র কয়েক ঘণ্টার···'

'না আমি সে কথা বলছি না···'

দীঘল চোখের পাতাদুটো মেলে দিয়ে মেয়েটি চকিতে মুখ তুলে তাকালো। তারপর মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলো, দুঠোঁটের মাঝে ফুটে উঠলো ম্লান একটা হাসির রেখা। 'বুঝেছি···কাল অত রাত্তিরে আমাকে নির্জন পার্কে দেখে ভেবেছিলে···না না, আমি ওসব কিছু করি না !'

কথাটা প্যাভেল বিশ্বাস করতে পারলো না, তার মনে হলো ও বুঝি প্রকৃত সত্যটাকে গোপন করতে চাইছে। চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে প্যাভেল নিজের মনে হাসলো, মেয়েটির জন্যে একই সঙ্গে সে কৌতুক আর দুঃখ অনুভব করলো।

'তুমি কি ভাবছো আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করো, গতকাল তোমার মতো আমারও খুব খারাপ লাগছিলো···' মেয়েটির স্বচ্ছনীল চোখের মণিদুটো এখন যেন আরও উষ্ণ আরও সুন্দর মনে হলো। 'এত খারাপ লাগছিলো, ঘরে আর টি'কতে পারলাম না। ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। প্রায়ই আমি পার্ক-টায় অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকি। কাল গিয়ে দেখলাম দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে তুমি বসে রয়েছো। ভাবলাম একটা মানুষ, নিশ্চয়ই মনের মধ্যে কোন আঘাত পেয়েছে। আমি কিন্তু সত্যিই তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি, নিঃশব্দে উঠেই আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম তুমি কথা বলতে শুরু করলে। নিঃসঙ্গ কোন মানুষ কথা বলতে চাইলে কিছু না বলে উঠে আসাটা অশোভন, তাছাড়া সত্যিই তোমাকে তখন খুব বিধ্বস্ত আর মনমরা দেখাচ্ছিলো। আমি ভেবে-ছিলাম তুমি বোধহয়···এমন তো রোজই কত ঘটছে, বলো ? কত লোকে আত্মহত্যা করছে, গলায় দড়ি দিয়ে মরছে, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে···'

মেয়েটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে প্যাভেল নিস্পন্দ নিথর। আর মেয়েটি অবিরাম বৃষ্টিপাতের মতো রিমঝিম শব্দে তখন অনর্গল কলকল করে চলেছে। নিজের ফেলে আসা অতীত জীবনের কথাও ও বললো। আসলে ও

মোরদ্‌ভিনিয়ার সম্পন্ন একটা পরিবারের মেয়ে, গির্জার স্কুলে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনাও করছে। বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডে ওদের সারা গ্রামটাই উজাড় হয়ে যায়। বাবা চলে যান সাইবেরিয়ায় কাজের খোঁজে, তারপর আর ফেরেননি। ওকেও বেরিয়ে পড়তে হয় কাজের খোঁজে। ছোট একটা রেল-স্টেশনে কিছু-দিন রাঁধুনির কাজও করে। ওখানে ও বছর তিনেক ছিলো। স্টেশন-মাস্টারের এক ভাই ছিলো ওখানকার তারবার্তা-প্রেরক।

'তুমি যখন কথা বলো, ওর মুখটা আমার মনে পড়ে যায়!' চোখের পাতা নামিয়ে নিয়ে অস্ফুট স্বরে ও বললো, 'বিশ্বাস করো, ঠিক তোমার মতো দেখতে, তোমার মতো কথা বলার ধরন···'

'উনি এখন কোথায়?'

'পুলিসের হাতে ধরা পড়ে জেলে রয়েছে। ঠিক কোথায় বলতে পারবো না।'

ওর কণ্ঠস্বরে ম্লান বিষণ্ণতার কোন ছাপ না থাকলেও, চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ কেমন যেন করুণ হয়ে উঠলো। একমুঠো নিটোল নিস্তব্ধতার পর এক সময়ে হঠাৎ করেই ও বললো, 'আমার একটা বাচ্ছাও হয়েছিলো।'

'ওই ভদ্রলোকের?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বাচ্ছাটার কি হলো?'

'মারা গ্যাছে। জন্মের সময়তেই ও মারা যায়।'

'সত্যিই, খুব দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ, আজ ও থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না।'

'ভদ্রলোকের তো আর কোন খবর পাওনি, তাই না?'

'না।' একটু নিস্তব্ধতার পর মেয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস। 'সত্যিই, ঠিক তোমার মতো, এত সুন্দর আর মজার মজার সব কথা বলতো···আর দিনরাত পড়াশোনা করতো।'

বাইরে এখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো, তার সঙ্গে শোনা গেলো বাতাসের দুরন্ত গর্জন।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন চূড়ান্ত আত্ম-অবমাননায়, দুষ্টক্ষতের মতো গভীর প্রবঞ্চনায় প্যাভেলের জীবনের উৎস-ধারা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিলো। অথচ স্ত্রীকে সে সত্যিই ভালোবাসতো, ভালোবাসতো ওর বিরাট স্বাস্থ্যল উচ্চ

শরীরটাকে দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতে। ওর বাঁকানো ভ্রূ, ওর সম্মোহিত কালো চোখের আবিল কটাক্ষ তাকে রীতিমত প্রলুব্ধ করতো।

যখন ওর মন ভালো থাকতো মাঝে মাঝে তাকে ঠাট্টা করে বলতো, 'একটা আধটা চুমুর জন্যে মিছিমিছি একটা গোটা বউ পুষে কি লাভ!'

কয়েকদিন কয়েকটা সপ্তা কেটে যাবার পর মেয়েটার কথা সে প্রায় ভুলেই গেলো। ভুলে গেলো অন্ধকার কাঠের দেওয়ালওয়ালা সেই ছোট্ট ঘর, শেওলা-পড়া চৌকো কাচের জানলা, রিমঝিম বৃষ্টিপাতের মতো নম্র-মধুর সেই কণ্ঠস্বর। আজ সেইসব স্মৃতি তার কাছে বিষণ্ণ কোন দুঃস্বপ্নের মতো কেমন যেন অস্পষ্ট ম্লান মনে হয়। মনে মনে প্যাভেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে :

'এ যেন বেশ ভালোই হলো!'

প্রথম সে ভেবেছিলো দাশাকে সব কথা খুলে বলবে এবং এমনভাবে বুঝিয়ে বলবে যাতে নিজের ত্রুটিটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারে, বুঝতে পারে নৈতিক দিক থেকে সংসারের ওপর কত বড় একটা বিপদ নেমে আসছে। কিন্তু না, ভয়ে সে দাশাকে সব কথা খোলাখুলি বলতে পারেনি। তবু রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে যখনই সুযোগ পেয়েছে, বউয়ের মেজাজ ভালো দেখেছে, তখনই সে ঘটনাটা উত্থাপন করেছে। আর দাশা স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে ঘুমজড়ানো চোখে হাই তুলতে তুলতে কাটা কাটা ভঙ্গিতে সাফসুফ জবাব দিয়েছে : 'ওসব পাগলামি ছেড়ে দাও তো। কাজ থেকে ফিরে এসে যদি কিছু করতে ভালো না লাগে ঘরে বসে বসে বই পড়বে, ঘরে তোমার তো এক আলমারি ভর্তি বই রয়েছে। শোন, একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট বলে রাখি—তোমার ঘর-সংসার ছেলেপুলে রয়েছে, তোমার মতো বিবাহিত লোকের অন্তত ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো শোভা পায় না, বুঝলে? আর পাঁচজন লোকের দিকে তাকিয়ে ছাখো দিখিনি, ওরা কেমন নিঃশব্দে কাজ করছে, যা রোজগারপাতি করছে বউ ছেলেপুলের জন্যে ঘরে নিয়ে আসছে! শুধু তুমি আর ওই ঢালাইমিস্ত্রি সেরদিউকভ, তোমরা দুজনেই যা সৃষ্টিছাড়া। ওটা তো বুড়ো বয়েসেও মাশার সঙ্গে দিনরাত প্রেম করছে আর মাসে মাসে জরিমানা কাটিয়ে খালিহাতে ঘরে ফিরছে। গত মাসে ও তো দু দুবার জরিমানা দিয়ে মাত্র তিরিশ রুবল নিয়ে ঘরে এসেছিলো…'

'মিথ্যে কথা!' প্যাভেল প্রতিবাদ করে। দাশার ওই আর এক বিশ্রী স্বভাব —শহরতলির যত নোংরা গুজব আর কেচ্ছা কুড়িয়ে বেড়ানো, অথচ লোকের

মধ্যে ভালোটা ও কোনদিন চোখে দেখতে পায় না। এতে প্যাভেল মনে মনে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়, ইচ্ছে করে ওর চোখে আঙুল দিয়ে আসল সত্যিটা দেখিয়ে দেয়। তাই মাঝে মাঝে সে প্রতিবাদ না করে পারে না। 'লোকের মুখে যা শুনেছো তার সবটা সত্যি নয়, দাশা।'

অশ্লেষে দাশার জ্রদুটো আপনা থেকেই কুঁচকে ওঠে। 'কেন, তোমার কমরেডের হাঁড়ির খবর তুমি ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না বুঝি?'

ঠিক এমনি কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্ষোভে প্যাভেলের শরীরের সমস্ত রক্ত এক সঙ্গে মাথায় চলকে ওঠে, অথচ বুকের ভেতরটা তার হিমেল বিষণ্ণতায় জমে যেন স্থবির হয়ে যায়। স্বভাবতই এমনি মুহূর্তে সে কোন জবাব দেয় না। জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকাটাই এখন তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। যদি তার স্ত্রীর তখনও কিছু বলার থাকে বলে যায়, আর প্যাভেল নিঃশব্দে শোনে। নিঃশব্দে শোনার পর বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বিষণ্ণ মনে ভাবে—নাঃ, ওকে আমি আর বুঝিয়ে পারলাম না! ও বুঝতে চায় না! সত্যিই কি ও কোনদিন বুঝবে না।

নারীর কোমল ভালোবাসা, একমুঠো স্নিগ্ধ মধুরিমার জন্যে সে লালায়িত। সে চায় পরিপূর্ণ গভীর এমন একটা কিছু যা তার হৃদয়কে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলবে, দাউদাউ অগ্নিশিখার মতো রক্তের প্রতিটি কণাকে করে তুলবে প্রদীপ্ত আবিল। সেদিক থেকে লিজা, শহরতলির সেই মোরদ্‌ভিনিয়ান্‌ মেয়েটি নিঃসন্দেহে হৃদয়ের স্নেহস্পর্শে তাকে যথেষ্ট আনন্দ দিতে পেরেছিলো। তার অসুখী জীবনের কথা, তার অনাগত স্বপ্নের কথা ও গভীর আগ্রহে মন দিয়ে শুনতো। আর প্যাভেলও তার বুকের ভেতরে জমানো সমস্ত গ্লানি সমস্ত অবসাদ সেই নিঃশব্দ শ্রোতার কাছে উজাড় করে দিতে পেরে শান্তি পেতো তৃপ্তি পেতো। অথচ লিজার মনের গহন গভীরেও এমন একটা দুরজ্ঞেয়তা ছিলো যাকে প্যাভেল চিনতে পারতো না, তাকে স্পর্শ করতে পারতো না—মাঝে মাঝে তার মনে হতো কোনো অচিন পাখি যেন ওর বুকের মধ্যে গান গাইছে।

একবার আদর করতে করতে লিজা তাকে জিগেস করেছিলো, 'তুমি গির্জায় যাও?'

'না, মানে···'

প্যাভেল যখন অসীম উৎসাহে গাঢ় স্বরে ব্যাখ্যা করে ওকে বুঝিয়ে দিলো কেন সে গির্জায় যায় না, মেয়েটি তখন শান্ত স্বরে বললো, 'ব্যাপারটা কিন্তু

একই। তুমি যে শান্তির কথা বলছো, গির্জাতেও অন্তত এ নিখিলে সেই শান্তির জন্যেই প্রার্থনা করা হয়…'

'এক মিনিট! আমি কিন্তু সংগ্রামের কথা বলছিলাম।'

'কিন্তু কিসের জন্যে সেই সংগ্রাম? এ পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্যেই তো।'

প্যাভেল আবার লিজার সঙ্গে তর্কের ঝড় তুললো। কখনও উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নেড়ে, কখনও টেবিলে ঘুষি মেরে বিপুল আবেগে সে একটানা বলে চললো। এবং যখন বুঝতে পারলো সুসংলগ্ন যুক্তিগুলোকে পর পর সাজিয়ে সে চমৎকার বলছে, তখন নিজের বাগ্মিতায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলো।

লিজা তবু জেদ ছাড়লো না। প্যাভেলের মুখোমুখি বসে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন শঙ্কাতুর অথচ কোমল স্বরে ও বলে চললো, 'কিন্তু জানো, গির্জার ধর্মযাজক যখন জলদমন্দ্রিত স্বরে বলেন—'হে ঈশ্বর, এ পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই,' তখন আমার শুনতে ভীষণ ভালো লাগে। কথাটা কে বলছে সেটা বড় কথা নয়, সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনবে সেইটাই বড় কথা। তুমিই বলো, সেদিন আমাদের সমাজের কি চেহারা ছিলো…চারদিকে, যেখানে যাও, সবাই নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, মারামারি করছে…একজন আর একজনকে ঠকাবার চেষ্টা করছে, বাচ্চাদের ধরে পিটছে। পুলিস তো আছেই, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করছে তার চাইতে বেশি। সত্যিই, সে সময়ে ভয়ে ঘৃণায় আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। তুমিই বলো, সে সময়ে আমি একা কি করতে পারতাম? এখানে ওখানে দু একজন যে ভালো লোক ছিলো না, তা নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত কম যে সচরাচর চোখেই পড়ে না…'

ওর ছেলেমানুষি ভঙ্গি দেখে প্যাভেল হেসে ফেললো। কিন্তু এমন সরল এমন সুন্দর ভাবে লিজা কথাগুলো বললো যে প্যাভেলের বুকের মধ্যে গেঁথে গেলো। এমনি ভাবে ওর স্নিগ্ধ আত্মপ্রত্যয় আর প্যাভেলের দুর্দম তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে যেন বোঝাপড়ার এক অদৃশ্য সেতুবন্ধন গড়ে উঠলো।

বহু সময়ে অনেক জটিল গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়েও সে আলোচনা করেছে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই প্যাভেল দেখেছে ওর চরিত্রের সেই একই অনমনীয় কোমল মাধুর্য—কোনদিন যেমন তার কথায় প্রতিবাদ করেনি, তেমনি আবার অহেতুক তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টাও করেনি।

মাঝে মাঝে প্যাভেল ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে বলতো, 'তুমিও যে ভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছো, তাতে মনে হচ্ছে তুমি আমি আমরা দুজনেই

কোনদিন শান্তি পাবো না, সংগ্রাম করতে করতেই আমাদের জীবনটা কেটে যাবে…'

লিজা কিন্তু রীতিমত গম্ভীর হয়েই জবাব দিতো, 'তুমি যদি জানতে পারো আগামীকালটা বেশ সুন্দর কাটবে আর আজকের এই কুৎসিত দিনটা যেভাবে কাটলো সেটা নিতান্ত ভয়ে আঁতকে ওঠার মতো কিছু নয়, তাহলে কিন্তু ওদেরকে প্রচণ্ড শক্তিধর বলে মনে করার কিছু নেই।'

কখনও লিজার ঘরে বসে যদি দাশার কথা মনে পড়ে যেতো, রাগে লজ্জায় অপমানে প্যাভেলের সারা শরীর বিবশ হয়ে উঠতো। অসহ্য যন্ত্রণা আর সীমা-হীন তিক্ততায় সমাচ্ছন্ন তন্ময় হয়ে সে ভাবতো—এই যে আমি এখানে বসে রয়েছি, এ তো বুর্জোয়া ভাবনারই ভগ্ন প্রতিচ্ছবি! একে কি প্রগতিশীল বলে! আমি কি শ্রমিক শ্রেণীর কোন প্রতিনিধি!

অস্বস্তিকর এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই এলোমেলো আরও অজস্র ভাবনা তার মাথার মধ্যে ভিড় করে আসতো। কখনও লিজাকে তার পারিবারিক জীবনের কথা শোনাবার জন্যে সে উন্মুখ হয়ে উঠতো। তখন সে সমস্ত বুক উজাড় করে একের পর এক বলে যেতো তার স্ত্রীর কথা, বৃদ্ধ শ্বশুর আর বাচ্ছা মেয়েটার কথা।

'সত্যি, তুমি বিশ্বাস করো লিজা…আমি আমার স্ত্রীকে দারুণ ভালোবাসি, কিন্তু এখন পরস্পরে একত্রে বাস করা অসম্ভব। কিন্তু তোমাকে ছাড়া এসব কথা আমি আর কাউকে বলতে পারি না। আমার সব সময়ই কেমন যেন মনে হয় মানুষের কিছু কিছু কথা আছে যা কেবল মেয়েদেরই বলা যায়। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকেও তা বলতে পারি না, বন্ধুদের তো নয়ই…সত্যি, এক বিশ্রী অবস্থা। নিজের সম্পর্কে অনেকেই এ কথা বলতে লজ্জা পায়, কিন্তু বুকের ভারি বোঝাটা নামিয়ে দিতে না পারলে একা একা সে কেমন করে বাঁচবে বলো?'

লিজা তখনই কোন জবাব দিতো না, সরু সরু দীঘল আঙুল দিয়ে প্যাভে-লের চুলে বিলি কাটতে কাটতে ও কান পেতে চুপ করে শুনতো।

'আমি কয়েকজনের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করারও চেষ্টা করেছি, পুঁথি-পড়া জবাব ছাড়া আর কিছুই পাইনি…বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার আদৌ কোনো মিল নেই। নিজেদের সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করতে তারা লজ্জা পায়। অথচ আমার ধারণা বাস্তব জীবনে অনেকেরই এই ধরনের নানান

সমস্যা আছে, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে যা তারা নিঃশব্দে মুখ বুজে সহ্য করে। এও তো এক ধরনের সামাজিক নির্যাতন, তাই কিনা বলো ?'

তার উত্তেজিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে, প্যাভেল দেখলো ওর সংবেদনশীল আঙুল-গুলো তার চওড়া কাঁধের ওপর মৃদু কাঁপছে আর স্বচ্ছ নীল চোখের মণিদুটো আরও দীপ্ত আরও গাঢ় উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

কামনা-বিধুর এমনি কোন বিহ্বল মুহূর্তে প্যাভেল ওকে হঠাৎই বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে চুমু দেবে। আর বিস্ফারিত চোখে প্যাভেলের মুখের দিকে তাকিয়ে লিজা অস্ফুট স্বরে বলবে, 'দুঃখ কোরো না প্যাভেল, এ বাধা তুমি একদিন ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারবে···'

কখনও কখনও সে ওর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো, আর জাগিয়ে দেওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত লিজা নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো চুপটি করে বসে থাকতো। বসে বসে তার চুলের মধ্যে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতো।

কখনও কখনও দৈনিক সংবাদপত্রটা টেবিলের উপর বিছিয়ে সে পড়তো আর লিজা তার পাশে ছোট্ট পুশির মতো গুটিসুটি হয়ে বসে থাকতো। তখন ইউরোপের সংগ্রামী কমরেড, পার্টির নেতৃত্ব আর দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে অক্লান্ত কর্মীদের সম্পর্কে সে আলোচনা করতো আর লিজা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতো।

বহু সময়ে প্যাভেল লক্ষ্য করেছে যখনই সে কোন বীর বা সংগ্রামী নায়কের নাম উচ্চারণ করেছে, লিজার নীল চোখদুটো রূপকথার-গল্প-শোনা বাচ্ছাদের মতো খুশিতে আশ্চর্য ঝিকমিক করে উঠেছে। তখনই তার মনে হয়েছে কোমল স্বরে কথা-বলা ছোটখাটো চেহারার এই মোরদ্ভিনিয়ান মেয়েটা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে!

মাঝে মাঝে লিজা মৃদু স্বরে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, ওর নামটা কি যেন বললে ?'

নামটা শোনার পর একটু থেমে ও আবার জিগেস করে, 'রাশিয়ান ভাষায় ওই নামের কি মানে ?'

'আমি ঠিক জানি না। আমাদের রাশিয়ান ভাষায় তো এ নাম নেই।'

'আচ্ছা, ওদের মতো আমাদের পবিত্র কোন শহীদ নেই ?'

'নিশ্চয়ই, আমাদেরও শহীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, লিজা। তবে তারা পবিত্র কিনা জানি না, কেননা আমরা তো নরকের মধ্যে বাস করি···'

'তা হোক। তবু ওদের নাম শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

তখন লিজার কণ্ঠস্বর মনে হয় ঠিক যেন মাঝরাতে ঘুমের-মধ্যে-শোনা ঘন্টা-ধ্বনির মতো আশ্চর্য কোমল আর মিষ্টি।

'কেন?'

'ঘুমোবার আগে ওদের নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আমি করি, ঈশ্বরকে বলি—মানুষের জন্যে যারা ভালো কিছু করছে তুমি তাদের শুভ করো।'

'এসব অর্থহীন, লিজা!'

লিজা গম্ভীর হয়ে জিগেস করে, 'কেন?'

'ওভাবে সত্যিকারের কারুর ভালো করা যায় না।'

'তাহলে?'

'তার জন্যে আলাদা ভাবে শিখতে হয়, মানুষের মধ্যে নেমে আসতে হয়।'

'বেশ তো, তুমি আমাকে সেই শিক্ষা দাও। আমি তোমার কাছে শিখবো।'

অবাক চোখ তুলে তাকাতেই প্যাভেল দেখলো লিজা ঠোঁট টিপে মুচকি মুচকি হাসছে। তখনই প্যাভেলের বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না এতক্ষণ ও দুষ্টুমি করছিলো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সে লিজাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো আর লিজা ঢল-বেয়ে-নামা দুরন্ত পাহাড়ি ঝরনার মতো খিলখিল করে হেসে উঠলো।

শ্রমিক বন্ধুরা লক্ষ্য করলো প্যাভেল কেমন যেন তাদের এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে, তবু তারা মুখ ফুটে কিছু জিগেস করলো না। কেবল সেরদিউকভ, হাসিখুশি আর আমুদে সেই ঢালাই মিস্ত্রি একদিন তাকে জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার প্যাভেল, আজকাল তুমি খুব প্রেম করছো বলে মনে হচ্ছে?'

অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে প্যাভেল কেমন যেন হকচকিয়ে গেলো।

'কে বললো?'

'কে আবার বলবে? নিজে দেখেছি! আমি কিন্তু দাশাকে বলে দেবো।'

'দোহাই সেরদিউকভ, তুমি ওকে কিছু বোলো না।'

'বেশ, আমি ওকে কিছু বলবো না। কিন্তু তার বদলে আমাকে নেকরাসভের কবিতার বইটা দিতে হবে।'

'না, ও বই আমি কাউকে দেবো না। আর দাশাকে আমি নিজেই সব বলবো।'

সেরদিউকভ প্যাভেলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো।

'তুমি নিজে বলবে ? দাশাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'যেহেতু বলা উচিত !'

সেরদিউকভ ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবলো, তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'তার মানে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে। বেশ, সেই ভালো ! তাছাড়া সবাই জানে ও তোমার সমকক্ষ নয়, ওরা ফিলিস্টাইন···প্রাচীন সংস্কার যাবে কোথায়? তুমি তো আর ধুয়ে রগড়ে কালো ঘোড়াকে সাদা করে ফেলতে পারো না !'

প্যাভেল মনে মনে ভাবলো আসলে ও কিছুই জানে না।

'তোমার ওকে কোনমতেই ভালোবাসা উচিত নয়, প্যাভেল।'

'এ তুমি কি বলছো, সেরদিউকভ ? আমি ওকে সেভাবে ভালোবাসি না।'

'ও, তাই বলো !' সেরদিউকভের সারা মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠলো। 'ও-ও তাহলে আমাদের কমরেড !'

দুজনে কারখানার মধ্যে পেচ্ছাবখানার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। হাতে-পাকানো সিগারেটের অর্ধেকটা ফেলে দিয়ে ও চলে গেলো। প্যাভেলের মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে গেলো, এইমাত্র যার সঙ্গে কথা বললো সে যেন বৃদ্ধ সেরদিউকভ নয়, তার চাইতেও বয়েসে ছোট উচ্ছল কোন তরুণ যুবক। মনে পড়লো হাসি গানে অভিনয়ে একদিন ও সবাইকে কেমন মাতিয়ে রাখতে পারতো। আজ ওকে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো মনে হলো।

চলন্ত লেদ-মেশিনটার সামনে দাঁড়িয়ে প্যাভেল ভাবলো, 'আমার কথা শুনে ও তো হাসেনি বা বিদ্রূপ করেনি। বরং সরল আন্তরিকতা আমার প্রতিটা কথা ও বিশ্বাস করে নিয়েছে। এবার থেকে সত্যিকারের বন্ধুর মতো সব কথা আমি ওকে খুলে বলবো !'

কিন্তু সে সুযোগ প্যাভেল পেলো না। এ ঘটনার দু একদিন পরেই ইঁট-খোলার একটা ঝোপের মধ্যে ওকে মুমূর্ষু অবস্থায় পাওয়া গেলো—কে বা কারা যেন ওকে নির্মম ভাবে মেরে ফেলে রেখে গেছে। হাসপাতালে ওকে দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ বন্দী হয়ে কাটাতে হলো।

'উঃ, কি দুঃসহ জীবন !' ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারী করতে করতে প্যাভেল আর্তনাদ করে উঠলো। 'সত্যি দাশা, ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়, ভীষণ

দুঃখ হয়। আমি যেন এখনও ভাবতে পারছি না···এমন সুন্দর উচ্ছল হাসিখুশি একটা মানুষ···'

'সুন্দর না ছাই!' দাশা ফোঁস করে উঠলো। 'তুমি ওই ধেড়ে শয়তানটার কথা আমার কাছে বলতে এসো না। তুমি কি ভাবো আমি জানি না কেন ওকে মেরেছে?

'শোন, দাশা···'

'আমি জানি তুমি কি বলবে। এককালে ওই ইতরটা তোমার গলায় গলায় কমরেড ছিলো···'

'দাশা!' অসম্ভব জোরে প্যাভেল চিৎকার করে উঠলো। 'ও কোনকালেই ইতর ছিলো না, আমার কমরেডদের মধ্যে আজও কোন ইতর নেই।'

'চুপ করো, ষাঁড়ের মতো অমন চেঁচিও না!'

প্যাভেল চুপ করে গেলো। কিন্তু নেকরাসভের কবিতা পড়তে-চাওয়া সেই মানুষটার জন্যে করুণ বিষণ্ণতায় তার মন নিঃশব্দে কান্নায় কান্নায় ভরে উঠলো।

'নাঃ, আজ হয় এস্পার, না হয় ওস্পার, কিছু একটা করতেই হবে!'

ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে কোনরকমে শহরতলির এক পথ থেকে আর এক পথে টেনে নিয়ে যেতে যেতে প্যাভেল ভাবলো। দাশা আর বুড়ো ভাসিগিনের সঙ্গে এক প্রস্থ নতুন করে ঝগড়া হবার পর নিঃসীম হতাশায় প্যাভেলের মনটা সত্যিই ভেঙে গিয়েছিলো। এলোমেলো হিমেল ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বন্ধ-জানলা, নির্জন গাছের ছায়া অতিক্রম করে সেই সন্ধ্যে থেকে সে সমানে ঘুরছে।

'চুলোয় যাক সব! হয় আমি যেভাবে চাই সেইভাবে বাঁচতে হবে, না হয় তো ওর খেয়ালখুশি মতো···অসম্ভব! জীবনের জন্যেই আমি বাঁচতে চাই!'

ম্লান জ্যোৎস্নালোকিত চওড়া পথটা পেরিয়ে কোনরকমে টলতে টলতে, যেন পায়ের নিচের চোরাবালি, অন্ধকার কানাগলি হাতড়ে হাতড়ে সে পার্কটায় এসে পৌঁছলো। বসন্তের মিঠে আমেজ নিয়ে সারাটা শহর নিদ্রালস। ব্যর্থ হতাশার মতো কালো কালো কয়েকটা ছায়ামূর্তি তখনও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উগ্রমূর্তি একজন অশ্বারোহী-পুলিস একজন শ্রমিককে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে গেলো।

শোনা গেলো গির্জায় ঘন্টা পড়ার শব্দ।

টলটলে এক এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে-পড়ার মতো ঘন্টাধ্বনিগুলো নীলিম

বাতাসে সম্পূর্ণ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্যাভেল বসে বসে গুনলো—'দশ।'

হঠাৎ মোরদ্‌ভিনিয়ান মেয়েটার কথা তার মনে পড়লো। এবং এতক্ষণ যে কেন মনে পড়েনি সে কথা ভাবতেই প্যাভেল অবাক হয়ে গেলো। এখন একটু একটু করে স্পষ্ট ফুটে উঠলো ওর সমস্ত অবয়ব—কাকের ডানার মতো কালো চুলের নিচে স্নিগ্ধ মুখশ্রী, আয়ত টানা টানা দুটো চোখ। ধূসর রঙের ঘাঘরার ওপর লেস-বোনা হলদে ব্লাউজ। যখন নিচু হয়ে কিছু করে ঘরে-তৈরি শেমিজের নিচে বুকের অনেকটা অংশ স্পষ্ট চোখে পড়ে।

হঠাৎ কেন জানি লিজাকে এখন তার আশ্চর্য রূপসী মনে হলো।

মন্ত্রোচ্চারণের মতো প্যাভেল বারবার উচ্চারণ করলো, 'লিজা, লিজা! লিজা তোমার চোখদুটো কি আশ্চর্য সুন্দর! সুন্দর তোমার নরম চুলের গুচ্ছ।'

প্যাভেল উঠে পড়লো।

ক্লান্ত শ্রান্ত পায়ে ফিরে এসে দেখলো লিজার ঘরের জানলাটা বন্ধ। কাচের সার্সিতে চোখ রেখেও অন্ধকার ঘরের ভেতরে কিছু দেখতে পেলো না। তখন জানলা ধাক্কালো, অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই, হঠাৎ এক সময়ে ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'কে? কাকে চাই?'

'লিজা আছ?'

'ও এখানে থাকে না।'

'কি বলছেন আপনি!'

'ও চলে গ্যাছে।'

'সে কি! কবে?'

'চারদিন আগে। এখন আপনি বিদেয় হতে পারেন।'

'শুনুন, এক মিনিট···' উৎসুক মুখটা সে জানলার সার্সিতে আরও জোরে চেপে ধরলো। 'আমার জন্যে ও কোন খবর রেখে যায়নি?'

'কে আপনি? কি নাম বলুন তো?'

'ম্যাকভ—প্যাভেল ম্যাকভ।'

'ও হ্যাঁ, আপনার নামে একটা চিঠি আছে। দাঁড়ান, দিচ্ছি।'

এবার ঘরের ভেতরে একটা আলো জ্বলে উঠলো। ধুলোয়-ভরা কাচের সার্সির মধ্যে দিয়ে প্যাভেল দেখলো হোঁদল-কুতকুতের মতো একটা বেঢপ চেহারা টেবিলের টানা হাতড়ে কি যেন খুঁজছে। একটু পরেই গভীর একটা ক্ষতের মতো চৌকা জানলাটা খুলে গেলো, আর চকিতে এক ঝলক আলো

ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লো সামনের অন্ধকারে। থলথলে মাংসল একটা হাত জানলা গলিয়ে এগিয়ে দিলো এক চিলতে কাগজ। প্যাভেল ছোঁ মেরে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরলো।

প্রিয়তম প্যাভেল,

আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি, কিন্তু এটা বেশি দূর গড়াক তা আমি চাই না। কেননা আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার স্ত্রীকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছি, হয়তো বা ঘৃণাও, এবং এ দুটোই হয়তো তোমার জীবনকে আবার সেই একই পাঁকে টেনে নামবে। তাই আমি চলে যাচ্ছি, কোথায় এখনও পর্যন্ত জানি না।

তোমার লিজাভেতা

দলে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও প্যাভেল আবার সেই স্বল্প আলোয় চিঠিটা মেলে ধরলো, তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে করতে অবজ্ঞাভরে বলে উঠলো, 'এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবতে পারলে না, লিজা!'

হাতের মুঠোটা আলগা করে মেলে দিতেই ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো উড়ে গেলো হাওয়ায়, আর হঠাৎ-আতঙ্কে ভরে ওঠা তার নিঃস্ব রিক্ত বুকেরই মতো নির্জন নিঃসঙ্গ অন্ধকারের দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো।

'আচ্ছা বোকা মেয়ে তো···'

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা তার হাহাকার করে উঠলো, 'আঃ লিজা, কোথায় কেন তুমি চলে গেলে?'

১৯১৫

ঘুমপাড়ানি গান

গ্রীষ্মের গুমোট এক রাতে শহরতলির একেবারে নির্জন এক প্রান্তে আমি অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলাম। বড় একটা গর্তের মাঝখানে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা পা ঠুকছে আর বাচ্ছাদের মতো কাদা ছিটোচ্ছে···কাদা ছিটোচ্ছে আর খনা গলায় অশ্লীল গান গাইছে।

বেলার দিকে শহরের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় বহে গিয়েছিলো, অঝর বৃষ্টিধারায় রাস্তার মাটি গলে কাদার সৃষ্টি হয়েছে। গর্তটা বেশ গভীর, মেয়েটার প্রায় হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেছে। ওর গলার স্বর শুনে মনে হলো মাতাল। নাচতে নাচতে একবার যদি পড়ে যায় তো সহজেই কাদার মধ্যে ডুবে যাবে।

উঁচু বুট জোড়া খুলে গর্তের ধারে গিয়ে আমি ওর হাত ধরে শুকনো জায়গায় টেনে নিয়ে এলাম। প্রথমে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কোন কথা না বলে নম্রভাবে আমার পেছন পেছন এলো। কিন্তু পর মুহূর্তেই দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডান হাতটা ছাড়িয়ে আমার বুকে ধাক্কা মারলো, তারপর পরিত্রাহি চিল-চেঁচানি জুড়ে দিলো, 'বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও!'

তারপরেই আবার আমাকে পর্যন্ত টানতে টানতে কাদার মধ্যে নিয়ে গেলো।

'আচ্ছা শয়তান তো! না, আমি যাবো না···দূর হয়ে যা···বাঁ-চা-ও!'

অন্ধকার ফুঁড়ে একজন নৈশপ্রহরী আমাদের দিকে ছুটে এলো, রুক্ষ স্বরে জিগেস করলো, 'কি হচ্ছে কি এখানে, এত গোলমাল কিসের?'

আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে মেয়েটি কাদায় ডুবে যাবার ভয়ে ওকে টেনে তুলতে চেয়েছিলাম। নৈশপ্রহরী দুপা এগিয়ে এসে খুব কাছ থেকে মাতাল মহিলাটিকে লক্ষ্য করলো, তারপর জোরে থুতু ফেলে হুকুম দিলো, 'মাশকা, উঠে এসো।'

'না, আমি যাবো না।'

'উঠে এসো বলচি!'

'না, আমি উঠবো না।'

'না এলে আমি কিন্তু বেদম মার লাগাবো।' মুখে বললেও প্রহরীর কণ্ঠস্বরে তেমন কোন ধার ছিলো না। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, 'মেয়েটি এই কাছে-পিঠেই থাকে, বেশ্যা, নাম মাশকা ফ্রোলিখা। সিগরেট আছে নাকি?'

আমরা সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি আবার কাদার মধ্যে নাচতে গিয়ে শুরু করলো, আর চিৎকার করতে লাগলো, 'আমিই আমার মনিব, ইচ্ছে হলে আমি এখানে চান করবো।'

'দাঁড়া, তোর আমি চান করাচ্চি!' বেশ শক্ত সমর্থ দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ প্রহরী ওকে ভয় দেখালো। 'জানেন, রোজ রাত্তিরে ও এই রকম হল্লা করে। অথচ বাড়িতে ওর একটা পঙ্গু ছেলে আছে।'

'ও কি অনেক দূরে থাকে?'

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রহরী বললো, 'ওর মরাই উচিত।'

আমি বললাম, 'ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো।'

প্রহরী দাড়ি নাড়লো। তারপর সিগারেটের আলোয় আমার মুখটা দেখে নিয়ে পিছোল পথে জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেলো। হঠাৎ আবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দূর থেকে চেঁচিয়ে বললো, 'নিয়ে যান আপত্তি নেই, তবে পানপাত্রের ওপর নজর রাখবেন।'

ইতিমধ্যে মেয়েটির কাদার মধ্যে বসে পড়ে দু হাতে জল ছিটোচ্ছে আর খনা গলায় বীভৎস ভাবে চেঁচাচ্ছে, 'সুমুদ্দুরে আমি দাঁড় টানচি।'

ওর খুব কাছেই বড় একটা নক্ষত্রের ছায়া পড়েছে ঘোলা জলে। হাতের আঘাতে যখনই তরঙ্গ উঠছে, প্রতিবিম্বটা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি আবার কাদার মধ্যে পা বাড়িয়ে মেয়েটির বগল ধরে টেনে তুললাম, হাঁটু দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ওকে বেড়ার বাইরে বার করে আনলাম। শক্ত কাঠ হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ও আমাকে গালাগাল দিলো। 'ঠিক আছে, মার না, মার। আমি থোড়াই পরোয়া করি! এই বদমাস, কসাই কোথাকার···ছাড়, ছাড় আমাকে, ছাড়···'

বেড়ার গায়ে ওকে হেলান দিয়ে বসিয়ে আমি জিগেস করলাম ও কোথায় থাকে। মাতাল মুখ তুলে কুচকুচে কালো চোখে ও আমার দিকে তাকালো। আমি দেখতে পেলাম ওর বসে-যাওয়া নাকের সামনের দিকটা বোতামের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। ওপরের ঠোঁটটা ক্ষতে মুচড়ে গেছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁতের সারি। ছোট্ট ফোলা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বিকৃত ভাবে হাসলো। 'ঠিক আছে, তবে চলো।'

উঠতে গিয়ে ও বেড়ার গায়ে টলে পড়লো। ভিজে ঘাঘরার প্রান্তটা ছলকে লাগলো আমার পায়ে।

জড়ানো স্বরে ও বললো, 'চলো, প্রিয়তম। আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবো। তোমাকে সুখ দেবো।' ওর কণ্ঠস্বর এখন অনেকটা কোমল হয়ে গেছে।

মেয়েটা আমাকে বিরাট একটা দোতলা বাড়ির উঠোনে নিয়ে এলো। সারা উঠোন জুড়ে ঠেলাগাড়ি, পিপে, কাঠের বাক্স আর একগাদা জ্বালানি কাঠের মধ্যে দিয়ে পথ করে অন্ধের মতো সন্তর্পণে ও আমাকে একটা গর্তের সামনে এনে বললো, 'এসো।'

মেয়েটি যাতে পড়ে না যায় তার জন্যে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে অন্য হাতে পিছোল দেওয়ালে ভর রেখে আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলাম, একটু পরে বন্ধ একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমি শিকলটা খুঁজে পেলাম, শিকলটা টেনে খুললাম, কিন্তু এমন জমাট অন্ধকার যে চৌকাঠের ওপারে পা বাড়াতে সাহস হলো না।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এলো মৃদু একটা কণ্ঠস্বর, 'মামণি· তুমি ?'

'হ্যাঁ সোনা, আমি।'

আলকাতরা আর বদ্ধ বাতাসের এক ঝলক ভ্যাপসা গন্ধ আমার নাকের সামনে এসে আছড়ে পড়লো। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠলো, আর তার ক্ষীণ আলোয় মুহূর্তের জন্যে আমি দেখতে পেলাম একটি শিশুর বিবর্ণ মুখ। তারপরেই কাঠিটা নিভে গেলো।

কোমর থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বললো, 'আমি ছাড়া তোর কাছে আর কে আসবে বল্ ?'

আর একটা কাঠি জ্বলে উঠলো। চিমনির মৃদুশব্দ শোনা গেলো। অদ্ভুত শীর্ণ হাতে ছেলেটা টিনের একটা কুপি জ্বালালো।

'ছোট্ট সোনা আমার!' মেয়েটি টলতে টলতে ঘরে এক কোণে মেঝের ওপর চওড়া বিছনাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

কুপির শিখা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে ছেলেটা পলতে নামিয়ে দিলো। ছোট্ট মুখটা ওর থমথমে গম্ভীর, তীক্ষ্ণ নাক, মেয়েদের মতো টুকটুকে দুটো ঠোঁট। এই রকম অন্ধকারে স্যাঁতস্যাতে একটা খুপরির মধ্যে তুলি দিয়ে আঁকা ওর আশ্চর্য সুন্দর মুখটা যেন সম্পূর্ণ বেমানান। আলোটা ঠিক করে অদ্ভুত সুন্দর পল্লবিত চোখে ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে জিগেস করলো, 'মাতাল হয়েছে, না ?'

ওর মা বিছনায় পড়ে নাক ডাকছে আর মাঝে মাঝে হেঁচকি তুলছে।

আমি বললাম, 'ওর পোশাকটা পালটানো দরকার।'

ছেলেটা চোখের পাতা নামিয়ে বললো, 'তাহলে পালটে দিন।'

আমি যখন মেয়েটির ঘাঘরা খুলতে শুরু করলাম, ও খুব শান্ত স্বরে সহজ গলায় জিগেস করলো, 'আলোটা কি নিভিয়ে দোবো?'

'কেন, কি জন্যে?'

ও কোন জবাব দিলো না। মার পোশাক পালটাতে পালটাতে আমি ছেলেটিকে লক্ষ্য করলাম। জানলার ধারে মেঝের ওপর ভারি একটা কাঠের বাক্সের ওপর ও বসে রয়েছে। বাক্সটার গায়ে কালো ছাপানো অক্ষরে লেখা: 'সাবধানে তোলা নামা করবেন। এস. আর অ্যাণ্ড কোং।'

চৌকনো জানলার নিচেটা ওর কাঁধ-পর্যন্ত পৌঁচেছে। তার সামনের দেওয়ালে সরু সরু অনেকগুলো তাক। তাকগুলো দেশলাই বাক্স আর সিগারেটের খোলে ঠাসা। যে কাঠের বাক্সটার ওপর ছেলেটা বসে রয়েছে তার সামনেই হলদে কাগজে ঢাকা আর একটা কাঠের বাক্স, নিশ্চয়ই ওটা ওর টেবিল। লিকলিকে শীর্ণ হাতদুটো মাথার পিছনে রেখে অন্ধকার কাঁচের সার্সির দিকে ও তাকিয়ে রয়েছে।

পোশাক পালটে ভিজে জামা-কাপড়গুলো উনুনের ওপর মেলে দিয়ে আমি এক কোণে মাটির পাত্রে হাত ধুয়ে নিলাম, তারপর রুমালে হাত মুছতে মুছতে বললাম, 'এবার চলি।'

আমার দিকে তাকিয়ে আধো ধরা গলায় ও বললো, 'এখন কি আলোটা নিভিয়ে দোবো?'

'সে তোমার যা খুশি।'

'আপনি কি চলে যাচ্ছেন? এখানে শোবেন না···ওর সঙ্গে?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি জিগেস করলাম, 'কেন, কিসের জন্যে?'

'সে আপনি ভালো করেই জানেন।' আড়মোড়া ভেঙে আশ্চর্য সহজ সুরে ও বললো, 'সবাই তাই করে।'

বিহ্বল চোখে আমি চারদিকে তাকালাম। ডান দিকে বিশ্রী একটা উনুন, তার ওপর চাপানো রয়েছে নোংরা বাসনকোসন। কাঠের বাক্সের পেছনে একগাদা ছেঁড়া দড়া-দড়ি, শনের কাছি, জ্বালানি কাঠ, ভাঙা তক্তা আর একটা জোয়াল। তার গায়ে ঝুলছে একটা জলের বালতি। আর আমার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে নাক-ডাকানো একটা দেহ।

ছেলেটাকে জিগেস করলাম, 'আমি কি তোমার কাছে একটু বসবো ?'

ভ্রূ কুঁচকে ও আমার দিকে তাকালো। 'মা কিন্তু সকালের আগে আর উঠবে না।'

'ওকে আমার কোন দরকার নেই।'

ওর পাশে বসে আমি বললাম কেমন করে এই অদ্ভুত রাতে ওর মার সঙ্গে আমার দেখা হলো, কেমন করে কাদার মধ্যে বসে হাত দিয়ে দাঁড় টানছিলো আর গান গাইছিলো। ম্লান হেসে সরু বুকটা চুলকতে চুলকতে ও বললো, 'মাতাল হোলে ও ওইরকম করে। এমন কি যখন ভালো থাকে তখনও সব সময় গান গায়। ঠিক বাচ্চা মেয়ের মতন…'

এখন আমি ছেলেটার চোখদুটো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আশ্চর্য সুন্দর বড় বড় দুটো চোখের পাতা, দীঘল বাঁকানো ভ্রূ। চোখের পাতার নিচে নীলাভ একটা ছায়া বিবর্ণ মুখের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে গেছে। তীক্ষ্ণ নাক, চওড়া কপালে গভীর একটা বলিরেখা। গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়ানো বাদামী চুল। চোখের অভিব্যক্তি বর্ণনাতীত ভাবে শান্ত আর মনোযোগী। বিচিত্র এই অমানুষিক দৃষ্টিকে ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই অসম্ভব।

'তোমার পায়ে কি হয়েছে ?'

ছেঁড়া কম্বলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ও বিশীর্ণ একটা পা বের করে আনলো, দেখতে ঠিক বাঁধাকপির-ডাঁটার মতো। হাতে করে তুলে পা-টা ছড়িয়ে রাখলো কাঠের বাক্সের ওপর। 'দেখছেন তো? এ দুটো জন্ম থেকেই এ রকম। হাঁটতে পারি না, একদম মরা।'

'আর এই বাক্সগুলোয় সব কি আছে ?'

'আমার পোষা পোকা-মাকড়।' পলকা কাঠির মতো পাটাকে হাত দিয়ে তুলে ও আবার ছেঁড়া কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। তারপর ছোট্ট একটু মিষ্টি করে হাসলো। 'দেখবেন নাকি ? তাহলে ভালো হোয়ে বসুন। এমন সব জিনিস আপনি আর কক্ষোনো দেখেননি।'

অসম্ভব লম্বা, সরু হাতের ওপর ভর রেখে ছেলেটা নিপুণ দক্ষতায় নিজেকে তুলে তাক থেকে বাক্সগুলো নামাতে লাগলো আর একটার পর একটা আমার হাতে এগিয়ে দিলো।

'দেখবেন, খুলবেন না যেন, পালিয়ে যাবে। কানের কাছে ধরে শুনুন, শুনতে পাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, কি যেন নড়ছে।'

'ওটা একটা মাকড়সা। যেমন বদমাস, তেমনি চালাক। ওর নাম বাজন-দার।'

আশ্চর্য সুন্দর চোখদুটো ওর আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, প্রাণছলবলে মুখে খেলে গেলো নম্র হাসির রেখা। ক্ষিপ্র হাতে ও তাক থেকে বাক্সগুলো নামিয়ে ফেললো। প্রথমে নিজের কানের কাছে তুলে ধরলো, তারপর আমার হাতে দিয়ে উদ্দীপ্ত স্বরে বললো, 'এটা একটা আরসোলা, আনিসিম। সৈনিকের মতো খুব ছটফটে। এটা একটা মাছি, ইনেসপেকটারের বউ। পাজী আর সবচেয়ে বাজে। সারাদিন খালি ঘ্যানঘ্যান করে, সব্বাইকে গালাগালি দেয়, এমনকি মার চুল ধরে টানে। মাছি তো নয়, সত্যিকারের ইনেসপেকটারের বউ, রাস্তার ওপারে থাকে। ওকেও দেখতে ঠিক মাছির মতো। আর এটা একটা গুবরে-পোকা, মস্ত বড়, বাড়ির কর্তা। কোন ঝামেলা নেই, শুধু যা একটু মাতাল আর নিলোজ্জো। যখন ল্যাংটো হয়ে হামাগুড়ি দেয়, ঠিক কালো কুকুরের মতো দেখায়। এটা একটা তেলাপোকা, নিকোদিম খুড়ো। আমি ওকে বাইরের উঠোনে ধরেছি। আসলে ও তীর্থযাত্রী, বাঁকা লাঠি হাতে গির্জের জন্যে টাকা তুলতে বেরোয়। মা ওকে বলে ঠগী, মার একজন নাগরও বটে। মার যে কত নাগর আছে সে আপনি ভাবতেও পারবেন না। নাক না থাকলে কি হবে, মার চারপাশে ওরা সব সময় ভনভন করে।'

'মা কি তোমাকে খুব পেটায়?'

'কে, ও? আপনি পাগোল হয়েছেন! আমাকে ছাড়া ও বাঁচতেই পারবে না। ভীষণ ভালো, শুধু যা মাতাল। আমাদের এ রাস্তায় মাতাল সব্বাই। ও খুব সুন্দর, হাসিখুশি···শুধু যা পাঁড় মাতাল আর বেশ্যা। আমি ওকে কতবার বলেছি, 'মদ খাওয়া ছেড়ে দাও, দেখবে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।' ও শুধু হাসে। মুখ্যু মেয়েমানুষ হোলে যা হয়। কিন্তু এমনিতে ও খুব ভালো। আচ্ছা উঠুক, তখন আপনি চোখেই দেখবেন।'

এমন বিমুগ্ধ ভঙ্গিতে ছেলেটা হাসলো, ইচ্ছে হলো চিৎকার করে কেঁদে উঠি, যাতে সারা শহরের সব্বাই শুনতে পায়। ছেলেটির প্রতি আপ্লুত করুণায় সারা বুক আমার ভরে গেলো। শীর্ণ ঘাড়ের ওপর ছোট্ট মাথাটা আশ্চর্য সুন্দর একটা ফুলের মতো দুলে উঠলো, আর ওর চোখের উদ্দীপ্ত আবেগ অদম্য শক্তিতে আমাকে কেবলই আকৃষ্ট করছিলো।

শিশুসুলভ ওর মজার কথাগুলো শুনতে শুনতে মুহূর্তের জন্যে আমি ভুলে গিয়েছিলাম এখন আমি কোথায় রয়েছি। কিন্তু পরমুহূর্তেই কারা-কুঠরির এই বন্ধ জানলা, ঝুল-কালো উনুনের ওপর ছড়ানো কাদামাখা পোশাক, ঘরের কোণে তাল করে রাখা দড়িদড়া,দরজার কাছে ছেঁড়া কম্বলের ওপর শুয়ে থাকা দেহটাকে দেখে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম।

ছেলেটি গর্বিত স্বরে বললো, 'ভালো সংগ্রহ নয়. বলুন ?'

'সত্যিই ভালো।'

'আমার কিন্তু কোন প্রজাপতি নেই। প্রজাপতি বা মথ, কিচ্ছু নেই।'

'কি নাম তোমার ?'

'লেয়নকা।'

'এ কি, তোমার নাম আমার নাম দেখছি একই !'

'সত্যি। আপনি কি ধরনের লোক বলুন তো ?'

'আমি ? আমি কোনো ধরনেরই লোক নই।'

'মিথ্যে কথা। সব্বাইয়েরই কোন না কোন পরিচয় থাকে। আমি জানি, আপনি খুব ভালো লোক।'

'হয়তো হবে।'

'আমি ঠিক ধরেছি। তা ছাড়া আপনি খুব ভীতু।'

'ভীতু ! কেন ?'

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ও মুচকি মুচকি হাসলো, 'নিশ্চয়ই।'

'কি করে তুমি বুঝলে ?'

'আমার কাছে এখানে আপনি বসে আছেন, তার মানে রাত্তিরে আপনি বাড়ি যেতে ভয় পান।'

'ও-হো, এই কথা ! কিন্তু রাত তো প্রায় শেষই হয়ে গ্যাছে।'

'আপনি একখুনি চলে যাবেন ?'

'আমি আবার আসবো।'

লেয়নকা আমার কথা বিশ্বাস করলো না। সুন্দর চোখের ঘন-পল্লব দুটো বন্ধ করে একটু চুপ করে রইলো, তারপর জিগেস করলো, 'কিসের জন্যে ?'

'এমনি, দেখতে। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আসবো তো ?'

'নিশ্চয়ই। এখানে অনেকেই আসে।'

'না, সে জন্যে নয়।'

'আপনি আমাকে ভোলাচ্ছেন না তো ?'

'বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই আসবো।'

'ঠিক আছে, তাহোলে কিন্তু আমার কাছে আসতে হবে, মার কাছে নয়। আসুন না আপনাতে আমাতে বেশ বন্ধু হোই ?'

'নিশ্চয়ই। আমরা দুজনে বন্ধুই তো।'

'বাঃ, খুব মজা! তুমি বড় তো কি হোয়েছে, বলো? তোমার বয়েস কতো?'

'কুড়ি।'

'আমার এগারো। ভিস্তিওয়ালার মেয়ে কাতকা ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই। তাও আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে ওর মা ওকে মারে···আচ্ছা, তুমি কি চোর ?'

'না না, চোর কেন হবো ?'

'তোমার মুখটা কেমন বিশ্রী, নাকটা ঠিক চোরের মতন। মার কাছে দুজন চোর আসে—একজন সাশকা, যেমন হাঁদা তেমনি নোংরা। অন্যজন ভানিচকা, ওর মনটা খুব ভালো। আচ্ছা, তোমার কাছে ছোট বাক্সো আছে?'

'নিয়ে আসবো।'

'এনো। আর আমি মামণিকে বলবো না তুমি আসবে।'

'কেন ?'

'ঘরে কেউ এলেই ও খুশি হয়। তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে, আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার এই মামণিটা খুব মজার। যখন পনেরো বছর বয়েস, আমি ওর পেটে আসি। ও নিজেই জানে না কেমন করে তা হোলো। আচ্ছা, তুমি আবার কখন আসবে ?'

'কাল সন্ধ্যেবেলায়।'

'সন্ধ্যেবেলায় ? ঠিক আছে, ও তখন মাতাল হোয়ে পড়বে। আচ্ছা, চুরি না করলে তুমি কি করো ?'

'আচার বিক্রি করি।'

'সত্যি ? আমার জন্যে একটু নিয়ে এসো, কেমন ?'

'নিশ্চয়ই। এখন আমি যাই।'

'যাও। আবার আসবে তো ?'

'অবশ্যই।'

লেয়নকা তার লম্বা হাতদুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। ঠাণ্ডা সরু সরু

হাতদুটো জড়িয়ে আমি ঝাঁকুনি দিলাম। তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে সোজা উঠোনে বেরিয়ে এলাম।

ভোরের আলো তখন ফুটছে। শিশির-ভেজা ভাঙা বাড়ির মাথার ওপর ম্লান শুকতারাটা মৃদু কাঁপছে। নোংরা দেওয়ালের নিচে মাটির তলার চৌক জানলার খুপরিগুলো মাতালের কুৎসিত চোখের মতো আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ফটকের সামনে একটা ঠেলাগাড়ির ওপর লালমুখো একজন চাষা খালি পাদুটো দুদিকে ছড়িয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে। তার ঘন রুক্ষ দাড়ি উঁচিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করছে। যেন চোখ বন্ধ করে লোকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসছে। কোত্থেকে বুড়ো একটা ঘেয়ো কুকুর এসে আমার পা শুঁকলো, মৃদু অথচ লোলুপ স্বরে কুঁই কুঁই করে ডাকলো। কেমন যেন সমবেদনায় বুকের ভেতরটা আমার করুণ হয়ে উঠলো।

রাস্তার কাদার ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে ভোরের আরক্ত আলো। যদিও অহেতুক, কদর্য, তবু এই সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সেইদিনই আমি রাস্তার ছেলেদের কয়েকটা কাচপোকা আর প্রজাপতি ধরে দিতে বললাম। ডাক্তারখানা থেকে কয়েকটা সুন্দর ছোট ছোট বাক্স কিনে আনলাম। তারপর লেয়নকাকে দেখতে গেলাম। সঙ্গে নিলাম দুশিশি আচার, কিছু মিষ্টি, রুটি আর রোল। লেয়নকা অপার বিস্ময়ে আমার উপহারগুলো গ্রহণ করলো, সুন্দর চোখের মণিদুটো আরও বড় বড় হয়ে গেলো। দিনের আলোয় দেখলাম চোখদুটো ওর সত্যিই অনন্য।

'আঃ-হা!' আনন্দে ও যেন আত্মহারা হয়ে গেলো। 'এত কিছু তুমি নিয়ে এসেছো! তুমি বড়লোক নাকি? নিশ্চয়ই তুমি বড়লোক, শুধু যা নোংরা জামা-কাপড় পরে রয়েছো! আর তুমি তো নিজেই বললে, তুমি চোর নও, তাহলে? ইস্, বাক্সোগুলো কি সুন্দর! ছুঁতেও ভয় করে, আমার হাত তো পরিষ্কার নয়। এর মধ্যে কি আছে। আরে, এটা একটা কাচপোকা! কি সুন্দর সবুজ! বুঝেছি তুমি উড়ে পালাবার মতলবে আছো। উঁহু, ওটি হোচ্ছে না!' হঠাৎ উল্লাসে লেয়নকা চেঁচিয়ে উঠলো, 'মামণি, শিগগির এসো, আমার হাতটা ধুইয়ে দাও। আর ছাখো, ও আমার জন্যে কি এনেছে! কাল যে তোমাকে ঘরে নিয়ে এসেছিলো, তুমি তো ওকে চেনো—ওর নামও লেয়নকা।'

'ওকে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।' ঠিক আমার পেছনেই শুনতে পেলাম আশ্চর্য নম্র একটা কণ্ঠস্বর।

ছেলেটি ঘাড় নাড়লো। 'নিশ্চয়ই, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ঘরে ঘন ধুলোর মেঘের মধ্যে আমি দেখলাম উনুনের ধারে উসকো খুসকো চুল, বিবর্ণ একটা মেয়ের মুখ, জুঁই জুঁই দাঁতে অবাধ হাসির ঝলক।

'কেমন আছেন?'

'ভালো।' মেয়েটির চাপা কণ্ঠস্বর সামান্য একটু খনা হলেও, আনন্দে উচ্ছল। অনেকটা যেন ব্যঙ্গের ছলে ও আমার দিকে চোখ ছোট করে তাকালো।

লেয়নকা আমার কথা ভুলে গিয়ে রুটি চিবুচ্ছে আর বাক্সগুলো সাবধানে খুলতে খুলতে বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে। বিশাল দুটো চোখের পাতার ছায়া পড়েছে ওর চিবুকে। বুড়ো মানুষের মতো বিষণ্ণ সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে নোংরা কাচের সার্সিতে, তার সামান্য একটু আলো পড়েছে ওর বাদামী চুলে। গলার কাছে ওর শার্টের বোতামগুলো খোলা। আমি দেখতে পেলাম সরু সরু বুকের পাঁজরার নিচে ওর হৃদপিণ্ডটা কেমন যেন দ্রুত ওঠা-নামা করছে, আর পিঙ্গল একটা স্তনবৃন্ত উঁকি মারছে।

উনুনের পাশ থেকে উঠে এসে ওর মা ভিজে তোয়ালে দিয়ে ছেলের হাত মোছাতে এলো। ওর বাঁ হাতটা ধরতেই লেয়নকা বাক্সটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো, 'পালাচ্ছে! ধরো, ধরো, ওকে ধরো!'

সমস্ত শরীর ওর থরথর করে কাঁপছে, ছেঁড়া কম্বলের মধ্যে থেকে অনড় পা দুটো অনাবৃত হয়ে গেছে। পা দুটো আবার কম্বলে জড়িয়ে দিয়ে ঝরঝর ঝরনার মতো হাসতে হাসতে মাও চিৎকার করে উঠলো, 'ধরো, ধরো, ওকে ধরো।'

কাচপোকাটোকে ধরে হাতের তালুর ওপর রেখে মা আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখে সেটাকে পরীক্ষা করতে করতে গাঢ় স্বরে বললো, 'এখানেও এ পোকা অনেক আছে!'

'দেখো, আবার চেপে ধোরো না যেন!' লেয়নকা মাকে সতর্ক করে দিলো। 'একবার তো ও মাতাল হয়ে আমার পোকা-মাকড়ের ওপর বসে পড়ে সব পিষে মেরে ফেলেছিলো!'

'সেদিনের কথা ভুলে যাও, সোনা।'

'সেদিন একটা একটা করে আমি সব্বাইকে কবর দিয়েছিলুম!'

'কিন্তু তারপরেই আমি তোমাকে আবার অনেকগুলো ধরে দিয়েছি।'

'দিলে কি হবে, সেগুলো সব মুখ্যু! ওগুলো ছিলো আমার শেখানো গুবরে পোকা। আমি নিজে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে উনুনের নিচে তাদের কবর দিয়েছি,

ওখানে একটা গোরস্থান আছে। জানো, আমার একটা মাকড়সা ছিলো, নাম মিনকা—ওকে দেখতে ঠিক মার একজন প্রেমিকের মতো, লোকটা এখন জেলে রয়েছে। ঠিক সেই রকম হোঁতকা মতন দেখতে, হাসিখুশি …'

'ও আমার ছোট্ট সোনা!' ছেলের কোঁকড়ানো কালো চুলে হাত বোলাতে বোলাতে মা বললো। তারপর কনুই দিয়ে আমাকে গোঁতা মেরে হাসি হাসি চোখে তাকালো। 'আমার ছেলেটা খুব ভালো নয়, বলো? ওর চোখদুটো কি সুন্দর, তাই না?'

'একটা চোখ নিয়ে আমার পাদুটো ফিরিয়ে দাও না, পারবে?' কাচ-পোকাটাকে পরীক্ষা করতে করতে লেয়নকা হাসলো। 'ছাখো মামণি, এটাকে দেখতে সেই পাদ্রিটার মতন, যার জন্যে তুমি একটা দড়ির মই বুনে দিয়েছিলে, মনে আছে?'

'খুব মনে আছে।' হাসতে হাসতে মা আমাকে বললো, 'একবার মোটা-সোটা দেখতে একজন পাদ্রী এসে বললো, 'তুমি তো বেশ্যা, আমার জন্যে একটা দড়ির মই বুনে দিতে পারবে?' আমি তো তেমন কোন মইএর কথা জন্মেও শুনিনি। তাই বললুম, 'না, পারবো না।' ও বললো, 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।' তখন ও আলখাল্লাটা খুলে ফেললো, দেখলুম ওর সারা ভুঁড়ি শক্ত সরু দড়ি দিয়ে জড়ানো। কেমন করে মই বুনতে হয় ও আমাকে শিখিয়ে দিলো, আর আমি বুনতে বুনতে ভাবলুম—এটা দিয়ে ও কি করবে? নিশ্চয়ই গির্জায় চুরি করবে!'

খিলখিল করে মা হেসে উঠলো। সারাক্ষণ ও ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করছিলো।

'উঃ, ভারি মজার লোক! ঠিক সময়ে যখন এলো, আমি বললুম, 'এটা যদি চুরি করার জন্যে হয় তাহলে অবশ্য আমার কিছু করার নেই।' ও তখন ছোট্ট করে হেসে বললো, 'না, এটা শুধু একটা দেওয়াল টপকাবার জন্যে। আমাদের ওখানে খুব উঁচু একটা পাঁচিল আছে…আমরা তো পাপী, দেওয়ালের ওপারে আমাদের জন্যে পাপ জমা হয়ে রয়েছে, বুঝতে পেরেছো?' রাত্তিরে ও যে মেয়ে-মানুষের কাছে যাবে, সেটা আমি আগেই আঁচ করেছিলুম। তাই দুজনে খুব হাসতে লাগলুম।'

'হেসেছো, ভালো করেছো।' লেয়নকা বয়স্কদের মতো গম্ভীর গলায় বললো। 'এবার একটু চায়ের জল চাপাও দিকিনি।'

'কিন্তু চিনি যে নেই।'

'কিনে নিয়ে এসো।'

'আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।'

'সব মদ গিলে উড়িয়ে দিয়েছো? ঠিক আছে, ওর কাছ থেকে চেয়ে নাও।' লেয়নকা আমার দিকে ফিরে বললো, 'তোমার কাছে পয়সা আছে?'

আমি মেয়েটিকে কিছু খুচরো পয়সা দিলাম। ও আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। তারপর উনুন থেকে কালিপড়া ছোট কেটলিটা নিয়ে গুনগুন একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

'মামণি,' লেয়নকা চেঁচিয়ে ডাকলো। 'জানলাটা খুলে দাও, আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। খুব চালু যা-হোক বাবা...' পতঙ্গভরা বাক্সগুলো সাবধানে তাকে তুলতে তুলতে ও রাগ দেখালো। কয়েকটা পিচবোর্ডের বাক্স ঝুলছে দেওয়ালের গায়ে আটকানো পেরেকে। '...অবশ্য খাটতেও পারে খুব। বাইরের লোক যখন আসে, সারা ঘর ধুলোয় ভরে যায়। আমি যত চিৎকার করে বলি, 'মামণি, আমাকে বাইরের উঠোনে নিয়ে চলো, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।' মামণি বলে, 'না, তুমি এখানেই থাকো সোনা। তোমাকে ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচতে পারবো না। ও আমাকে খুব ভালোবাসে, আর খালি গান গায়। কত যে গান জানে...' অনন্য চোখের মণিদুটো ওর আশ্চর্য ঝিকমিক করে উঠলো। সুন্দর ভ্রূ বেঁকিয়ে ও আনাড়ি গলায় গেয়ে উঠলো:

'সোফায় গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে সোফিয়া...'

একটু শুনে আমি বললাম, 'গানটা একটুও ভালো নয়।'

'সব গানই এই রকম।' লেয়নকা বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করলো, তারপরেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই যে, বাঁশিওয়ালা এসে গ্যাছে! ধরো ধরো, আমাকে শিগগির তুলে ধরো।'

পাতলা চামড়ায় মোড়া ওর পলকা দেহটা আমি তুলে ধরলাম। সাগ্রহে খোলা জানলা দিয়ে ও মাথাটা গলিয়ে দিলো। নিশ্চল সারা দেহ, কেবল শীর্ণ পাদুটো মৃদু কাঁপছে। রাস্তায় কে যেন মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে, বাচ্চাদের অস্পষ্ট চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। লেয়নকা সুরটা শুনে নিজের মনেই গুনগুন করে ভাঁজতে শুরু করলো।

ঘরের মধ্যে ধুলো থিতিয়ে গিয়ে জায়গাটাকে এখন হালকা মনে হচ্ছে। মার বিছনার ওপারের দেওয়ালে টাঙানো সস্তা দামের একটা ঘড়ি, তামার পয়সার

মতো তার ছোট্ট দোলকটা টিকটিক করে দুলছে। উনুনের ওপর এঁটো থালা-বাসনগুলো তখনও ধোয়া হয়নি, কোণগুলো মাকড়সার ঝুলে ভরা।

অন্য উনুনে চাপানো কেটলির জলটা ফুটছে। 'দূর হয়ে যা, হতভাগা!' বলে কে যেন হেঁড়ে গলায় ধমকাতেই বাঁশির সুর থেমে গেলো।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেয়নকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, 'আমাকে নামিয়ে দাও। ওরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

ওকে আমি আবার বাক্সের ওপর বসিয়ে দিলাম। দু হাতে বুক রগড়াতে রগড়াতে লেয়নকা কাশতে শুরু করলো। 'বেশিক্ষণ বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া নিলে আমার আবার কাশি হয়, বুক ব্যাথা করে। আচ্ছা, তুমি কখনও ভূত দেখেছো?'

'না।'

'আমিও না। রাত্তিরে আমি অনেক সময় উনুনের নিচে তাকিয়ে থেকেছি, যদি ওদের কাউকে দেখা যায়। কিন্তু দেখতে পাইনি। ওরা তো গোরস্থানেই ঘুরে বেড়ায়, তাই না?'

'ওদের নিয়ে তুমি কি করবে?'

'খুব মজার হবে। বলা যায় না, ওদের মধ্যে কেউ আবার ভালো ভুতও হতে পারে। কাতকা, ভিস্তিওয়ালার মেয়ে, ভাঁড়ারঘরে ও একবার ভুত দেখে খুব ভয় পেয়েছিলো। আমার কিন্তু ওসব কিছু দেখলে ভয় করবে না!' ছেঁড়া কম্বলে পাদুটো ও ঢেকে নিলো! 'এমন কি আমার ভয়ের স্বপ্ন দেখতেও ভালো লাগে। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। একবার স্বপ্নে দেখেছিলুম একটা গাছ উলটে গ্যাছে, পাতাগুলো মাটিতে আর শেকড়গুলো সব আকাশে উঠে গ্যাছে। ঠিক সেই সময় আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, দেখি কি সারা গা ঘামে ভিজে গ্যাছে। আর একবার দেখেছিলুম—মামণি ল্যাংটো হয়ে শুয়ে রয়েছে আর একটা কুকুর ওর পেট খাচ্ছে। এক এক খাবলা করে মাংস তুলছে আর থু-থু করে ফেলে দিচ্ছে, এক এক খাবলা করে তুলছে আর থু থু করে ফেলে দিচ্ছে। আর একবার দেখেছিলুম—আমাদের বাড়িটা ভীষণ ভাবে কাঁপছে। তারপরেই সেটা রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করলো। দরজা-জানলাগুলো সব ঠকঠক করে কাঁপছে, আর তার পেছনে পেছনে ইনেসপেকটারের বউএর বেড়ালটাও ছুটছে…'

লেয়নকা এমনভাবে ওর সরু কাঁধদুটো ঝাঁকালো যেন ওর ঠাণ্ডা লাগছে। বাক্স থেকে একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে তার রঙিন কাগজটা সাবধানে সমান করে জানলার ওপর রেখে দিলো। 'এগুলো দিয়ে আমি সুন্দর কিছু বানাবো, কিংবা

কাতকাকে দিয়ে দোবো। কাচের টুকরো, মাটির খেলামালি, এইরকম রঙিন কাগজ ও খুব ভালোবাসে। আচ্ছা, কোন গুবরেপোকাকে ঠিকমতো খাওয়ালে ওটা ঘোড়ার মতো বড় হয়ে যাবে ?'

বুঝলাম এটা ওর স্থির বিশ্বাস, তাই বললাম, 'ভালো করে খাওয়ালে হতে পারে।'

'সত্যি ?' লেয়নকা উল্লসিত হয়ে উঠলো। 'কিন্তু মামণি খালি হাসে, বলে, বাজে কথা।' মার প্রতি অশ্লীল অপমান করে একটা শব্দ ব্যবহার করে ও বললো, 'বড্ড বোকা! বেড়ালকে ভালো খাইয়ে আরও তাড়াতাড়ি ঘোড়া বানানো সম্ভব, তাই কি না বলো ?'

'হ্যাঁ, তা সম্ভব বই কি।'

'কিন্তু আমাদের তো অত খাবার নেই, থাকলে খুব ভালো হোতো!' বুকের ওপর হাত চেপে উত্তেজনায় ও অস্থির হয়ে উঠলো। 'মাছিগুলো বেশ কুকুরের মতো বড় হোতো। গুবরেপোকাগুলো ইঁট বইতে পারতো···ঘোড়ার মতো বড় হোলে তার গায়ে খুব জোরও হবে, তাই কি না বলো ?'

'কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে তাদের বড় বড় কেশর থাকবে।'

'ভালোই তো, কেশরগুলো বেশ লাগামের মতো ধরা যাবে। আচ্ছা, একটা মাকড়সা কার মতো বড় হবে ? বেড়ালছানার মতো ? ইস্, আমার যদি শুধু পাদুটো থাকতো ! তাহলে খুব খাটতুম আর কীটপতঙ্গগুলোকে খাইয়ে খাইয়ে বড় করে তুলতুম। আমি কোন ব্যবসা করতুম, তারপর মামণিকে সবুজ মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি কিনে দিতুম। সবুজ মাঠ তুমি কখনও দেখেছো ?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখতে বলো তো ?'

আমি ওকে সবুজ মাঠ আর উন্মুক্ত প্রান্তরের গল্প বললাম। চোখের পাতা নামিয়ে এমন গভীর মনোযোগ দিয়ে ও শুনতে লাগলো, মনে হলো বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই দেখে আমি গলার স্বর নামিয়ে নিলাম। একটু পরেই ওর মা গরম কেটলি নিয়ে ফিরে এলো। হাতে কাগজের থলে, বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা ভদকার একটা বোতল।

'এসে গেছি।'

'খোলা মাঠ আমার খুব ভালো লাগে,' বাদামের মতো বড় বড় চোখের পাতাদুটো মেলে দিয়ে লেয়নকা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'শুধু সবুজ ঘাস আর

ফুল। মামণি, একটা ঠেলাগাড়ি যোগাড় করে তুমি বেশ আমাকে মাঠে নিয়ে যাও না কেন? আমি এসব কিছু দেখিনি। মামণি, তুমি···তুমি একটা কুত্তী···' বিমর্ষ ব্যথায় গলার স্বর ওর রুদ্ধ হয়ে এলো।

'ছিঃ, সোনামণি, এমন গালাগাল দেয় না। তুমি এখনও অনেক ছোট···'

'গালাগালি দেয় না! তোমার আর কি, কুত্তীর মতো যেখানে খুশি যেতে পারো, যা খুশি করতে পারো। আমার মতন তো আর···' হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ও জিগেস করলো, 'আচ্ছা, ভগবানই কি সবুজ মাঠ বানিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেন?'

'যাতে সবাই ঘুরে বেড়াতে পারে।'

'আমি বেশ কীটপতঙ্গগুলোকে সবুজ মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতুম, আর ওরা বেশ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো। আচ্ছা, ওদের অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিলে ভগবান কি মনে করবেন?'

'ওরে ব্বাবা রে ব্বাবা! ছেলের কি কথা···' মা হাসতে হাসতে বিছনায় লুটিয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো···'উঃ পেটে খিল ধরে গ্যালো! হাসতে হাসতে আর বাঁচি না!'

লেয়নকা সস্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'ঠিক বাচ্ছাদের মতো হাসছে। দেখছো তো, হাসতে কেমন ভালোবাসে?'

'হাসতে যদি চায় তো হাসুক না। তুমি কিছু মনে কোরো না।'

'না না, আমি কিছু মনে করি না। শুধু জানলার সার্সিটা পরিষ্কার করে মুছে না দিলে আমার খুব রাগ হয়, সূয্যের আলো দেখতে পাই না। ও কিন্তু খালি ভুলে যায়।'

চায়ের সব সরঞ্জাম গুছতে গুছতে মা উজ্জ্বল নীল চোখে আমার দিকে তাকালো। 'আমার ছোট্ট সোনাটা খুব সুন্দর, তাই না? ও না থাকলে কবে আমি ডুবে মরতুম কিংবা গলায় দড়ি দিতুম।'

ওর দু ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠলো স্নিগ্ধ একটুকরো হাসি।

হঠাৎ লেয়নকা আমাকে জিগেস করলো, 'আচ্ছা, তুমি কি বোকা?'

'কি জানি। কেন বলো তো?'

মামণি বললো, 'তুমি একটা বোকা।'

'কেন বলবো না?' মা অকপটেই স্বীকার করলো। 'মাতাল একটা মেয়ে-

মানুষকে রাস্তা থেকে তুলে এনে বিছনায় শুইয়ে দিয়ে চলে গ্যালে, তাকে কি বলবো? আমি খারাপ ভাবে কথাটা বলিনি।' ঠিক বাচ্ছা মেয়ের মতো কাটা ঠোঁটে ও হাসলো। 'এসো, চা খাওয়া যাক।'

কেটলিটা ও রাখলো লেয়নকার পাশে কাঠেরবাক্সটার ওপর। তোবড়ানো ঢাকনির নিচে থেকে বেরিয়ে-আসা বাষ্পের দুটো রেখা স্পর্শ করলো লেয়নকার কাঁধ। হাত দিয়ে আড়াল করতে গিয়ে বাষ্পে ওর হাতের তালু ভিজে গেলো। ভিজে হাতদুটো ও চুলে মুছে নিলো। তারপর স্বপ্নিল চোখে তাকালো।

'আমি যখন বড় হবো, মামণি আমার জন্যে একটা ঠেলাগাড়ি কিনে দেবে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি ভিক্ষে করবো। আর আমাদের যখন অনেক টাকা হবে, আমি বেশ সবুজ মাঠে ঘুরে বেড়াবো।'

'আহা, রে!' নম্রভাবে মা হাসলো, তারপরেই গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'মাঠ আমার ছোট্ট সোনাটার কাছে নন্দন-কানন! কিন্তু ও তো আর জানে না সেখানে শুধু তাঁবু, নির্লজ্জ সৈনিক আর পাঁড় মাতালরাই থাকে।'

'মিথ্যে কথা।' ওকে বাধা দিয়ে লেয়নকা ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। 'তুমি ওকেই জিগেস করো না মাঠ কেমন দেখতে। ও অনেক দেখেছে।'

'আর আমি দেখিনি বুঝি?'

'হ্যাঁ, যখন কেবল মাতাল হোয়েছো।'

ঠিক দুটো শিশুর মতো ক্রুদ্ধভাবে অর্থহীন কথা নিয়ে ওরা পরস্পরে ঝগড়া শুরু করলো। ইতিমধ্যে সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, আরক্ত আকাশে নিশ্চল হয়ে রয়েছে ধূসর ঘন মেঘ। নিচের তলার ঘরগুলো আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে।

এক পেয়ালা চা খাবার পর লেয়নকা ঘামতে লাগলো। প্রথমে আমার দিকে, তারপর মার দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'একদম পেট ভরে। এখন আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুমিয়ে পড়ো, সোনা।'

'তাহলে ও চলে যাবে। এই, সত্যি তুমি চলে যাবে?'

'না না, ও যাবে না।' মা আমাকে হাঁটু দিয়ে গোঁতা দিলো। 'ওকে আমি যেতেই দেবো না।'

'তুমি যেও না।' চোখ বন্ধ করে মিনতির মতো করুণ স্বরে লেয়নকা বললো। তারপর আড়মোড়া ভেঙে বাক্সের ওপর শুয়ে পড়লো। হঠাৎ মাথা তুলে মাকে ভর্ৎসনার সুরে বললো, 'তুমি একে বিয়ে করো না কেন? অনেক মেয়েরাই তো

বিয়ে করে। যেসব লোকের সঙ্গে ঘোরো, সব্বাই তোমাকে মারে···এ কিন্তু খুব ভালো।'

'চুপ করো, সোনা।' মা ওর ওপর ঝুঁকে এলো। 'এবার লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোও।'

'আর এ খুব বড়লোক।'

কিছুক্ষণের জন্যে মা চুপচাপ বসে রইলো। কাটা ঠোঁটে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলো। তারপর আমার দিকে ফিরে পুরনো পরিচিতের মতো আন্তরিক স্বরে বললো, 'এইভাবে শান্তিতে আমরা বাস করি। শুধু ও আর আমি, আর কেউ নয়। উঠোনের সবাই আমাকে গালাগালি দেয়, বলে নষ্ট মেয়েমানুষ। ভারি বয়েই গেলো। এখন আমি আর লজ্জা পাই না। তাছাড়া আমি যে বাজে সবাই জানে, সে তো তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো। ছোট্ট সোনাটা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে, কি সুন্দর ছাখো!'

'সত্যিই সুন্দর।'

'তবু তো আমি ওর দিকে একটুও নজর দিতে পারি না। জানো, ওর মাথা কিন্তু খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, খুব চালাক।'

'সত্যি। ওর বাবা ছিলেন ভদ্রলোক। বয়েস হয়েছিলো। এক ডাকে সবাই চিনতো। বাড়িতে কাগজপত্তর লেখালেখি করতেন···ওঁদের কি যেন বলে···'

'উকিল নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। খুব ভালো লোক। আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তখন ওঁর বাড়িতে আমি ঝিয়ের কাজ করতুম।' কম্বলে ছেলের পা-দুটো ও ভালো করে ঢেকে দিলো, নোংরা একটা বালিশ গুঁজে দিলো ওর মাথার নিচে। তারপর সহজ গলায় বলতে শুরু করলো। 'কিন্তু হঠাৎ উনি মারা গ্যালেন। তখন রাত্তির। সবে ওঁনার ঘর থেকে ফিরে এসেছি, এমন সময় মেঝেতে পা পিছলে পড়ে মারা গ্যালেন। ব্যাস, সব শেষ হয়ে গ্যালো। তুমি তো আচার বিক্রি করো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'নিজের ব্যবসা?'

'না। মালিকের হয়ে কাজ করি।'

মা আমার আরও কাছে সরে এলো। 'তুমি অমন মুখ ফিরিয়ে রয়েছো কেন? আমার কোন খারাপ রোগ নেই, যাকে জিগেস করবে সেই বলবে।'

'না না, কই আমি মুখ ফিরিয়ে রয়েছি?'

ভাঙা নখ, খসখসে হাতটা আমার হাঁটুর ওপর রেখে গাঢ় স্বরে মা বললো, 'লেয়নকার জন্যে আমি তোমার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। ওর জীবনে এটা একটা পবিত্র দিন। তুমি আজ ওর বড় উপকার করলে।'

আমি বললাম, 'এবার কিন্তু আমায় যেতে হবে।'

'কোথায়?' মা অবাক হয়ে গেলো।

'আমার কাজ আছে।'

'আর একটু থাকো।'

'তা হয় না।'

মা ছেলের মুখের দিকে তাকালো, তারপর জানলা আর আকাশের দিকে। শেষে শান্ত স্বরে বললো, 'কেন হয় না? আমি আমার মুখ রুমালে ঢেকে নিচ্ছি। ছেলের হয়ে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি নিজেকে ঢেকে রাখবো, কেমন?'

দৃঢ় প্রত্যয়ে মানবিক উষ্ণতা দিয়ে ও আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাগুলো বললো। কুৎসিত মুখে ফুটে উঠলো শিশুর মতো সরল একটুকরো হাসি—সে হাসি প্রার্থীর নয়, সম্রাজ্ঞীর, যে দুহাতে বিলিয়ে দিতে পারে তার যাকিছু সম্পদ, কৃতজ্ঞতার ঋণ।

'মামণি!' ঘুমের মধ্যেই লেয়নকা হঠাৎ ককিয়ে উঠলো। 'ওরা গুঁড়ি মেরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! এসো এসো, শিগগির এসো!'

'ও স্বপ্ন দেখছে।' মা ছেলের ওপর ঝুঁকে পড়লো।

গভীর মগ্ন মন নিয়ে আমি উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। নিচের তলার খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে, গানের সুর। মা তার ছোট্ট সোনাটাকে গেয়ে শোনাচ্ছে ঘুমপাড়ানি গান। আমি তার কলিগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি:

অসহ কামনা টেনে আনে যত দুখ
দাঁতে টেনে বুঝি ছিঁড়ে খুঁড়ে দেয় বুক,
দুঃখ বেদনা স্নেহ—আপ্লুত বিহ্বল
আমি তাকে আহা, কোথায় লুকোই বল?

পাছে চিৎকার করে কেঁদে উঠি, তাই দাঁতে দাঁত চেপে আমি দ্রুত উঠোন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

১৯১৭